تعليم السنة

তালীমুস সুন্নাহ

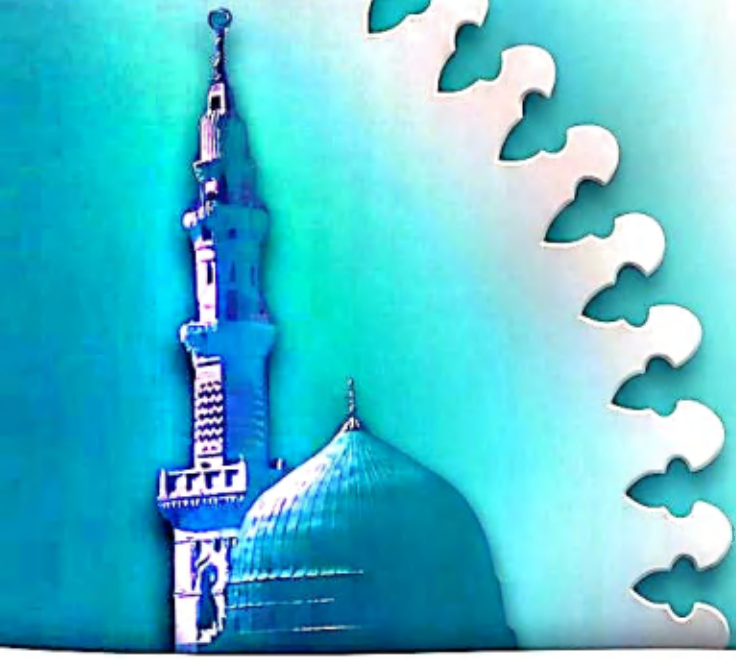


অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী

উৎসর্গ

মুজাদ্দীদে দ্বীন মুহিউস সুন্নাহ
হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আবরারুল হক (রহ.)
এর ফয়েজ বরকতের ওসিলায় সংকলিত কিতাবখানা
তাঁরই দারাজাতবুলন্দী এবং সুন্নাতের প্রচার-প্রসার
কামনায় উৎসর্গ করলাম।

–সংকলক



তা'লীমুস সুন্নাহ

ও

আমালে প্রচলিত ভুল সংশোধন

সংকলক

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী

খলীফা: মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.)

মুহিউস সুন্নাহ প্রকাশনী

মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা

পো. ভুলেশ্বর, পো. কোড নং : ১৭৪৩, কাপাসিয়া, গাজীপুর

মোবাইল : ০১৭১২-২৮৬০২৩, ০১৭১৯-৯৮৩৫১০

A GUIDE BOOK OF SUNNAH

TALIMUS SUNNAH

(The corrections of common mistakes in the daily activities of the Muslims in accordance with the messagesof the holy prophet Hazrat Mohammad (S.M.)

Compiler

Principal Mohammad Mizanur Rahman Chowdhury

[Khalifa, Mohius-sunnah Shah Abrarul Haq (RH.)]

Nazem, Madrasha Dawatul Haq, Deona

Nineth Edition 2017

Published by

MOHIUS SUNNAH PRAKASANI

MADRASHA DAWATUL HAQ DEONA

P. O. BHULESWAR, POST CODE NO. : 1743

KAPASIA, GAJIPUR

তা'লীমুস সুন্নাহ

ও

আমালে প্রচলিত ভুল সংশোধন

সংকলক

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী

খলীফা: মুহিউস সুন্নাহ শাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক (রহ.)

নবম সংস্করণ

৫ সফর ১৪৩৯ হিজরী। ২৬ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বত্ব : মুহিউস সুন্নাহ প্রকাশনী, মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা

প্রচ্ছদ : মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২২০/- (দুইশত বিশ টাকা)

Price : $ 10.00

ISBN : 978-984-33-5417-4

প্রাপ্তিস্থান

রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড
বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবা : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

হাবিবিয়া বুক ডিপো
১৬নং আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বাইতুল মুকার্‌রম ঢাকা, ১০০০
মোবাইল : ০১৮২৮৫০৯৮৪৮

মাদরাসা ক্যান্টিন
মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা
কাপাসিয়া, গাজীপুর,
মোবাইল : ০১৭২৪৯৩৬৮৫০

আল আখতার লাইব্রেরী
জামেয়া মার্কেট, হোটেল আল
মুবারকের নিচ তলায়, কিশোরগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯২০৩৮৬৪২২

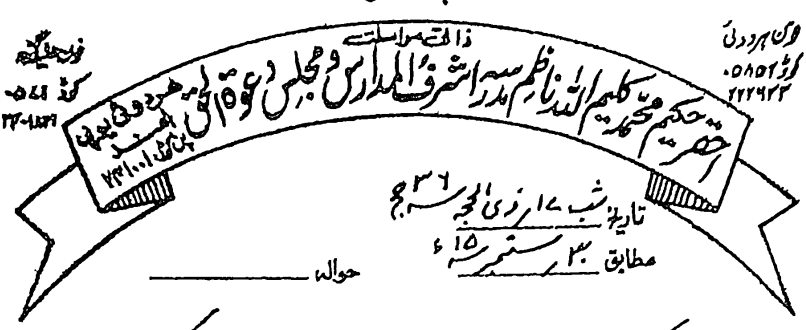
দেওয়ান স্টোর
মসজিদ রোড, টাঙ্গাইল।
মোবাইল : ০১৭১২১৪৩০৬৪

আল কাউছার লাইব্রেরী
জামিল মাদরাসা গেইট, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭১২৩৪০৩৪৫

মাকতাবাতুশ শামস
৭নং (আন্ডারগ্রাউন্ড) কেন্দ্রীয় জামে
মসজিদ মার্কেট, বন্দর বাজার, সিলেট
মোবাইল : ০১৭১৮৩৭৭৪৭৭

অভিমত

মজলিসে দাওয়াতুল হক-এর আলমী আমীর, মুহিউস সুন্নাহ হযরত ওয়ালা হারদুঈ (রহ.)-এর জানেশীন তবীবুল উম্মাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ কলীমুল্লাহ সাহেব (দা.বা.)



باسمہ تعالیٰ

ذاتی مراسلت

حضرت حکیم محمد کلیم اللہ ناظم مدرسہ اشرف المدارس و مجلس دعوت حق

تاریخ شب ۱۷ ذی الحجہ ۳۶ھ

مطابق ۳۰ ستمبر ۱۵ء

حوالہ _____

عزیز مکرم جناب میزان الرحمٰن صاحب زیدت معالیکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ نے اپنی مرتب کردہ کتاب "تعلیم السنۃ" پیش کی، چونکہ وہ بنگلہ زبان میں ہے اور میں اس سے واقف نہیں ہوں۔ آپنے اس کے مندرجات سنائے، اس کو سن کر دلی مسرت ہوئی۔

اسکی اشاعت کیلئے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو اہل مدارس اور عوام کیلئے نافع بنائے۔ آپ کی اس سعی کو قبول فرمائے

والسلام

محمد کلیم اللہ عفی عنہ

وارد حال مکۃ المکرمہ

অভিমত

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক্ব বাংলাদেশ
প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত কাজ-কর্ম দুই ভাগে বিভক্ত। ১.ইবাদত– যথা : নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি। ২.আদত-আখলাক অর্থাৎ সংসারের কাজ-কর্ম ও রীতি-নীতি। যথা : খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি। প্রত্যেক কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা সকল মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাবেদারী করার হুকুম দেননি; বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করার আদেশ দিয়েছেন। দৈনন্দিন জীবনে সবকিছুর সুন্নাত কোনো একটি নির্দিষ্ট কিতাব থেকে শিখে আমল করা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব—এরকম কোনো কিতাব বর্তমান বাজারে নেই, তাই এ-ধরনের সুন্নাতের কিতাব সংকলন খুবই প্রয়োজন। প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান চৌধুরী হযরতওয়ালা হারদূঈ রহ.-এর স্নেহভাজন খলীফা ও মজলিসে দাওয়াতুল হকের একজন সত্যিকার কর্মী। তিনি হযরতের চিন্তা-চেতনা অর্থাৎ সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-প্রসার করার ইচ্ছায় মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সুন্নাত সম্বলিত 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামক এই গ্রন্থটি সংকলন করেছেন।

আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা সংকলকের মেহনত কবূল করুন। সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। কিতাবটিকে সকলের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

১৪৩১/২/৭

অভিমত

মাওলানা ক্বারী আবুল হাসান আ'যমী

পরিচালক, ক্বিরআত বিভাগ, দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ শাহ্ সৈয়দ আবরারুল হক রহ.

Abul Hasan Azmi

Ustaz Tajweed -O-Qira'at Darul Uloom Deoband

ابوالحسن اعظمی

خادم التجوید و القراءۃ دارالعلوم دیوبند الهند

Ref .....

Dated .....

حمدہٗ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم، اما بعد:

ارشاد ربانی ہے: "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (آل عمران ۳۱)

اللہ رب العزۃ جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے اور ایسا مالک اور سب سے جس کی محبت ہر حال مقتضائے فطرت ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ ایسی ذات سے محبت ہو، تو بتا دیا جائے اسکی ارحم الراحمینی پر کہ اپنے اسکا سہل اور آسان طریقہ بھی بتلو دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت مقصد ہے پیغمبر علیہ السلام کی کامل اتباع میں۔ اتباع سنت سے نہ صرف اللہ کا محبوب بنا جاتا ہے۔

دین اسلام جو مکمل دین ہے یہ اتباع سنت ہی کا نام ہے، کما قال الشاعر ؎

محبت اتباع سنت سے ظاہر ہوتی ہے ★ ہوس رانوں کو یارب یہ حقیقت کون سمجھائے!

سنت کیا ہے اسکی تعریم اور تفصیلی معلومات بھی ہر مسلمان، محمد تو [illegible] ضروری ہے ——— یہ سب کی باتیں ہے، کہ محبوب العلماء، عارف باللہ حضرت مولانا میزان الرحمٰن صاحب پرنسپل دار العلوم دیوبند کی تصنیف لطیف "تعلیم السنۃ" ہمارے سامنے ہے اور غور سے دیکھا، اتباع سنت اور اسکے مختلف پہلوؤں پر بہت ہی عمدہ اور مدلل انداز میں لکھا ہے، یعنی ازدواجی زندگی سے نماز، روزہ، حج وعمرہ کے تمام تعلقات کی ایک انسانی زندگی کے آغاز سے انجام تک، یعنی ازدواجی زندگی سے نماز، روزہ، حج وعمرہ کے تمام تعلقات کی ایک ضروری اور مفید ترین تفصیلات، اور باب المعاشرت جو اسلام کا بہت اہم جز ہے اسکی بنیادی اہم معلومات اور تمام ضروری اور کی سنن اور مستحبات، جو عبادات کی جان ہے جس کی ادائیگی سے عبادت کے حقیقی ثمرات مرتب ہوتے ہیں، سب کا دلنشیں بیان، غرضیکہ ایک انسان کو دنیا میں کامیاب اسلامی اور شرعی زندگی گذارنے کیلئے وہ سب کچھ ہے جس کی پابندی اور عمل سے بہ طفیل اتباع سنت ایک مسلمان اپنے پروردگار کا محبوب بندہ بن سکتا ہے، یہی دراصل ایک مسلمان کی اصلی حیات ہے۔

اس کتاب "تعلیم السنۃ" سے راقم الحروف بے حد مستفید ہوا ہے۔ حضرت پرنسپل صاحب کی یہ کتاب بجا طور پر مقبول ہے اور ہونی بھی چاہئے۔ کیونکہ مقبولیت کے سارے ہی عناصر اس کی یہ جامع ہے۔

اس کتاب کا ہر ہر جز "اصلاح تسکرات" ہے، خوب معلوم ہونا چاہئے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت زیادہ اہم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا "امر بالمعروف ——— کے ساتھ ہی نہی عن المنکر کا بیان ہے۔ اس عنوان سے یہ کتاب انتہائی طور پر جامع مطالب ہو جاتی ہے، جس کی کوتاہیوں سے مصنف کیلئے دعائیں نکلتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں و بیش از بیش استفادہ کی توفیق بخشے! آمین!!

احقر

ابوالحسن اعظمی

خادم التجوید والقراءۃ، دار العلوم دیوبند۔ ۲۵ رمضان ۱۴۳۰ھ

حسن منزل (اشرف آباد) محلہ خانقہ دیوبند، ۲۴۷۵۵۴ موبائل نمبر۔ ۹۴۱۲۶۵۱۰۲۷

অভিমত

মাওলানা আযহার আলী আনোয়ার শাহ

খলীফা মুহিউসসুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.
অধ্যক্ষ, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া, কিশোরগঞ্জ

দ্বীনের ধারক-বাহক উলামায়ে কিরাম কুরআন ও সুন্নাহর হিদায়াতের মশাল হাতে নিয়ে মেহনত চালিয়ে আসছেন। যার ফলশ্রুতিতে আজকে দ্বীনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও তা'লীম বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও চলে আসছে। এর পিছনে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই কাজ করেনি। বরং আকাবিরে উলামায়ে কিরামের সোহবতের দ্বারায় যারা নিজেকে সমর্পণ করতে পেরেছেন তারাও একাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে বাস্তব দৃষ্টান্ত প্রিন্সিপাল মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান চৌধুরী। যার উপর মুহিউস সুন্নাহ হযরত শাহ আবরারুল হক নাওয়ারাল্লাহ মারকাদাহ-এর রূহানী দৃষ্টি পড়েছিল। সে দৃষ্টি তাঁকে মাটি থেকে স্বর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। ان را بنظر خاک را کیمیا کند তাই তো তিনি মাদরাসার লাইনে খুব উচ্চশিক্ষিত না হওয়া সত্ত্বেও হযরতওয়ালা মুহিউসসুন্নাহ রহ. এর খিলাফত লাভের গৌরব অর্জন করে সুন্নাতের প্রচার প্রসার কল্পে কিতাব রচনা করে ঐ নূরানী কাফেলার মশাল হাতে নিয়ে অগ্রসরমান। এবং সোহবতের ধারা বজায় রেখে দ্বীনের একনিষ্ট খাদেম হিসাবে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা তাঁর রচিত তা'লীমুস সুন্নাহ গ্রন্থটির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জনগণের চলার পথ প্রশস্ত করে দিন। আমীন।

১৮,০২.৩৭ হি.

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাওলানা কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ্

প্রিন্সিপাল ও শাইখুল হাদীস, জামিয়া শারঈয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা

জনাব আলহাজ্ব মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব (এম. এ.) শুধু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিই নন, তিনি একটি উন্নত কলেজের সফল অধ্যক্ষও বটে। কিন্তু তাঁর চেহারা-ছবি, লেবাস-পোশাক, কথা-বার্তা, চাল-চলন প্রথম দর্শনে আপনাকে ভ্রমে ফেলে দিবে যে, তিনি হয়তো কোনো কওমী মাদরাসার মুহতামিম বা শাইখুল হাদীস। সেই সঙ্গে তাঁকে সাহেবে নিসবত বুযূর্গ মনে করে তাঁর দস্ত মুবারকে বাই'আত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগতে থাকবে আপনার মনে। এ আকাঙ্ক্ষা জাগলে আপনি মাহরূম বা নিরাশ হবেন না নিশ্চয়। তিনি মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. (খলীফায়ে খাস হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ.) قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ الْعَزِيْزُ এর ইজাযত লাভে ধন্য একজন বিশিষ্ট খলীফা। এই পরশ পাথরের স্পর্শে তিনি আজ নিখুঁত স্বর্ণে পরিণত। ফলে তিনি 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামে একটি নাতি-দীর্ঘ গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দিয়ে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে নববীর উজ্জ্বল আদর্শ ও শিক্ষা সিহাহ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ থেকে মণি-মুক্তা আহরণ করে তিনি তা পাঠকসমাজকে উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে অন্য আর কারও নয়। সেই ইবাদত বন্দেগী আমি কীভাবে করবো? জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তেবা বা অনুসরণের মাধ্যমে। আমাদের শাইখ ও উস্তাদ শাইখুল ইসলাম, হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. বুখারী শরীফের দরসের শুরুতে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইত্তেবায়ে সুন্নাতের গুরুত্ব, ফযীলত ও মাকাম বর্ণনার পরে আয়াত–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ الاية

তিলাওয়াত করে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলতে থাকতেন–

تم طالب تھے مطلوب بن جاؤ گے *تم عاشق تھے معشوق بن جاؤ گے* تم محب تھے محبوب بن جاؤ گے

এই তো চাওয়া পাওয়ার চূড়ান্ত পর্যায়। এই তো যিন্দেগী منتهى كمال

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا هٰذَا الْمَقَامَ اِيَّانَا وَكُلَّ مَنْ سَلَكَ هٰذَا الطَّرِيْقَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

মুহ্‌তামিম
আল জামিয়াতুল শারইয়াহ
শালিবাগ, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ

মাওলানা মুফতী মনসূরুল হক

খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক (রহ.)
প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মুহিউস সুন্নাহ হযরতওয়ালা হারদূঈ রহ.-এর সুযোগ্য খলীফা, জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান চৌধুরী দা.বা.-এর সংকলিত তা'লীমুস সুন্নাহ কিতাবের ৩য় সংস্করণের কপি এ বছর (রমযান ১৪৩০হি.) উমরার সফরে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি কিতাবটির আদ্যোপান্ত দেখে সাধ্যানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করে দিয়েছি। মা-শা-আল্লাহ সংকলক কিতাবটিতে সুন্নাতের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে সংকলন করেছেন। অনেক বিষয়ের সুন্নাত এবং একই সঙ্গে মুনকারাতের ইসলাহের বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করেছেন। আশা রাখি, কিতাবখানা মুতালা'আ করে ইহইয়ায়ে সুন্নাত ও ইসলাহে মুনকারাতের বিষয়ে পাঠকসমাজ উপকৃত হবে এবং এটি সময়ের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আমি দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা সংকলকের মেহনত কবূল করুন। সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন এবং কিতাবটিকে সকলের জন্য ইহকালীন মুক্তি ও পরকালীন নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

০৫.১১.২০০৯

আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

মুহতামিম, মাদরাসায়ে নূরে মদীনা, শায়েস্তাগঞ্জ, হবিগঞ্জ

পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ যে পথে জীবন-যাপন করলে আল্লাহ পাকের চিরসন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে, পরকালে জাহান্নামের ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং অকল্পনীয় সুখ-শান্তির চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত লাভ করবে, সেই পথ প্রদর্শনের জন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদেরকে অন্যান্য সকল নবীর উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই আমাদের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ বা সুন্নাত তরীকাই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পথ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আজকাল আমরা অনেকেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত থেকে বহু দূরে সরে গেছি। এমনকি জীবনের কোন্ কাজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কী সুন্নাত আছে, তা আমরা অনেকেই জানি না।

তাই জীবনের সর্বস্তরে কোন্ কাজে নবীজীর সুন্নাত কী? তা সবিস্তারে জেনে পালন করা ছাড়া আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের বিকল্প ব্যবস্থা নেই। আর এ কাজটা সহজ করে দিয়েছেন মুহিউস সুন্নাহ হযরতুল আল্লামা শাহ আবরারুল হক সাহেব (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা, মুর্শিদে কামিল হযরত শাইখ মিজানুর রহমান সাহেব দা.বা.। তাঁর লিখিত 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামের এ গ্রন্থটি পড়ামাত্রই পাঠকের অন্তরে এ মর্মে জাগরণ সৃষ্টি হবে, এটা গতানুগতিকভাবে লিখিত গ্রন্থাবলির মতো নিছক নীতিবাক্যের খোলস নয়, বরং লেখকের হৃদয় নিংড়ানো লেখা, যার উপর আগে তিনি নিজে আমলে অভ্যস্ত হয়েছেন। তারপরে অন্যদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখাবার মহান উদ্দেশ্যে তা গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেছেন। সমাজে এমন লেখকের লেখার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ গ্রন্থটি পাঠকবৃন্দকে অতিসহজে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের পথ প্রর্দশন করবে। তাই এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

নূরুল ইসলাম ওলীপুরী
১৫.০৬.০৯

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ শাহ্ সৈয়দ আবরারুল হক (রহ.)
মুহাদ্দিস, ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা

দ্বীন কেবল নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি বাহ্যিক কিছু আমলের নাম নয়। সেই সঙ্গে সর্বোচ্চস্তরের বিষয় হলো, আকায়েদ-ঈমানিয়্যাত। এভাবে ইখলাস, সবর, শোকর, বিনয় ইত্যাদিও দ্বীনের এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেগুলো নামায রোযার মতোই ফরয। কেউ যদি শুধু কয়েকটি জাহেরী আমল নিয়ে চলে, অথচ তার আকাইদ দুরুস্ত নয়, আখলাক ঠিক নয়, তবে তাকে পূর্ণ মুসলমান বলা যাবে না। তাযকিয়া-সুলূকের গুরুত্ব ও প্রয়োজন এখানেই।

আর এই তাযকিয়া ও সুলূকে পূর্ণতা লাভ হয় ইত্তিবায়ে সুন্নাতের মাধ্যমে এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে তা'আল্লুক-এর বিষয়টি শীঘ্র হাসিল হয়। যার প্রমাণ হচ্ছে, এই আয়াত–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ الخ

আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়ের দান করুন খলীফায়ে মুহিউস সুন্নাহ হযরতওয়ালা হারদূঈ রহ.-এর সুযোগ্য খলীফা অধ্যক্ষ জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেবকে, তিনি দ্বীনের মূল পাঁচটি অধ্যায় (ঈমানিয়াত, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত, আখলাক)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতসমূহকে একত্রে সন্নিবেশিত করতে একনিষ্ঠ মেহনত করেছেন। এ-ধরনের ব্যাপক সংকলন একটি বিরল প্রয়াস।

আশা করি সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য বিশেষত সালেকীনের জন্য এই কিতাবটি অনেক বেশি উপকারী হবে। আল্লাহ পাক কবূল করুন। আমীন।



মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ সুহাইল

খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ শাহ্ সৈয়দ আবরারুল হক (রহ.)
মুফতী, বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

আল্লাহপাক সৃষ্টিজগতকে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং মানুষকে আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের পথ-প্রদর্শনের লক্ষ্যে অসংখ্য নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষে সর্বশ্রেষ্ঠনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে এই ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির মুক্তি ও সফলতার জন্য হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ তথা সুন্নাত ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। এটাই একমাত্র জান্নাতের পথ।কবির ভাষায়–

تیرے ہاتھ سے نہ چھوٹے کبھی دامن محمد + یہ نجات کا ذریعہ کوئی دوسرا نہیں ہے
نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے + اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

আজ মুসলিমজাতি এই পথ ভুলে গিয়ে বিজাতির অনুসরণে বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ঠ অর্জন করা সত্ত্বেও দিন দিন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি এর অকাট্য প্রমাণ। বর্তমানে অর্থ-সম্পদ, অস্ত্র ও জনশক্তি মুসলমানদের হাতে যে পরিমাণ বিদ্যমান, প্রাথমিক যুগে এতো শক্তি-সামর্থ্য তাদের কখনো ছিলো না। এতো শক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের লাঞ্ছিত হওয়া এ-কথাই প্রমাণ করে যে, বাহ্যিক শক্তি নয়; বরং আল্লাহ পাকের গায়েবী সাহায্যই মুসলমানদের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি।

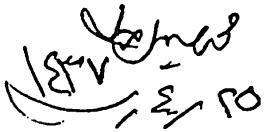
تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین وایمان پر + تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قران پر
تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر + نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ ساماں پر

ایمان کی تھی قوت اخلاص کی تھی برکت + ایک ایک ہزار کے تھے ایک ایک جوان ہمارا
جبکہ خدا پہ تھی نظر کچھ نہ تھا دشمنوں کا ڈر + دس بھی ہوئے تو بے خطر گھس گئے ہم ہزار میں

আল্লাহ পাকের সাহায্য পাওয়ার উপায় হলো তাঁকে সন্তুষ্ট করা। যার একমাত্র পথ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা। সুন্নাতের অনুসারে মুসলমান যে কাজ করবে তা-ই ইবাদত তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের ওসীলা হবে। তবে যে কোনো ইবাদত আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত (১) ইখলাস তথা বিশুদ্ধ নিয়্যত। (২) সঠিকভাবে সুন্নাত অনুযায়ী আদায়। এভাবেই আমলের গুণগত মান তৈরি হয়। কোনো বস্তুর গুণগত মান না থাকলে শুধু নামের দরুন যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, তেমনি আমলও সুন্নাত তরীকায় না হলে আল্লাহ পাকের দরবারে কবূল হয় না। কবির ভাষায়–

خلاف پیمبر کسے راہ گزید + کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

আল-হামদুলিল্লাহ! বন্ধুবর, প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান চৌধুরী হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক (রহ.)-এর খলীফা ও হযরত রহ.-এর সত্যিকার আশেক। তিনি হযরতের যে চিন্তা-চেতনা ছিল অর্থাৎ সুন্নাতকে যিন্দা ও প্রচার-প্রসার করা, সুমহান এ-কাজ হাতে নিয়ে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রের সুন্নাত সম্বলিত 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামক এই গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ পাক তাঁর এ মেহনত কবূল করেছেন। কারণ, গ্রন্থটি দেখলেই এবং বিষয়গুলি পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যার অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিন্দু পরিমাণ মুহাব্বত আছে, সে এই কিতাবটি পসন্দ করবে। আমি লেখকের জন্য দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদেরকে ইখলাসের তাওফীক দান করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একে নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দেন। আমীন।



অভিমত

মাওলানা শফীকুল হক আমকুনী

মুহতামিম, জামি'আ মাহমূদিয়া ইসলামিয়া সোবহানীঘাট, সিলেট

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মহাজ্ঞানী ও মহাপুরুষ তৈরীর মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-যাপনের তরীকা অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে অনেক ভাষায় লিখে এসেছেন। বাংলা ভাষায় হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত একত্রিত করে 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামে বাংলাভাষীদের জন্য সহজ তরীকায় বর্তমান কিতাবটি সংকলন করেছেন অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব দা.বা.।

মাদরাসা দাওয়াতুল হক দেওনা, কাপাসিয়া, গাজীপুরের তিনি মহাপরিচালক। যিনি উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক রাহবার ও বিশিষ্ট লেখক হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সফফে আউওয়ালের খলীফা মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর ইজাযত লাভে ধন্য বিশিষ্ট খলীফা। তিনি 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামে যে গ্রন্থটি জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তা দ্বীনের বিরাট খেদমত হিসেবে পরিণত হবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, তা'লীমুস সুন্নাহ কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেসব সুন্নাতের বিবরণ দিয়েছেন তা তিনি নিজে আমল করার পর এ-গ্রন্থটি জনসাধারণের আমলের সহজ তরীকাস্বরূপ প্রকাশ করে জনসাধারণকে সেসব সুনানে মুস্তফার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। কাজটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত-বন্দেগী করতে হবে, অন্য কারো নয়। সেই ইবাদত-বন্দেগী আমি কীভাবে করবো? জনাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তিবা বা অনুসরণের মাধ্যমে। তাই আমি এই গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি এবং লেখক মুহিউস সুন্নাহ অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেবের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করি।

শফীকুল হক আমকুনী
১২.০২.১২

মাওলানা উবাইদুর রহমান খান নদভী

সহকারী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব

যথাযোগ্য হামদ ও সালাতের পর, আমার অগ্রজপ্রতিম জনাব প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব দা.বা.-এর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই দুই যুগ আগে। তিনি আমাদের পরিবারের সবাইকে চেনেন। আমরাও তাকে চিনি, জানি, মুহাব্বত করি। কাপাসিয়ার এক সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের সন্তান তিনি। স্থানীয় কলেজের প্রিন্সিপাল। অনন্য সাধারণ তার দৈহিক সৌন্দর্য ও প্রিয়দর্শন ব্যক্তিত্ব। অতীব বিরল উদাহরণ হলেও তিনি সবদিক দিয়েই তার বাহ্যিক নূরানী অবয়বের মতোই সুন্দর। ভদ্রতা, বিনয়, মমত্ববোধ, উদারতা, সদালাপ ইত্যাদি বহুদিক দিয়েই তিনি অসাধারণ। আমার মরহুম আব্বা খতীবে মিল্লাত, মুফাক্কিরে যামান হযরত মাওলানা আতাউর রহমান খান (রহ.) মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেবকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। ৩১ জুলাই ২০০৮ তারিখে ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে তিনি চৌধুরী সাহেবের মাদরাসায় (দেওনা, কাপাসিয়া) যান এবং ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বয়ান রাখেন। একজন উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র, বিনয়ী, সুদর্শন, সদালাপী মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন সাফল্যের মানে উত্তীর্ণ। এর পাশাপাশি সৌভাগ্যেও আরো এক অমূল্য বরমালা। তাঁর কণ্ঠে সুশোভিত হয় মহান আল্লাহর নিঃশর্ত কৃপা ও করুণার উদার নীতিতে মুহিউস সুন্নাহ শাহ্ আবরারুল হক শাইখে হারদূঈ (রহ.) নিজ খেলাফত ও ইজাযত দ্বারা অলঙ্কৃত করেছেন এই জীবন্তদিল প্রিয় মানুষটিকে। যার চেহারা দেখলেই একজন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে শীতলতার স্পর্শ লাগে। মুখের কথা শুনলে উপলব্ধি জুড়ে নেমে আসে সতৃপ্ত প্রশান্তি। তরীকতের শাইখ হিসেবেও অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব দা.বা. আল্লাহর বিপুল সংখ্যক তৃষিত বান্দার হৃদয়জমিতে সুন্নাতের সুমিষ্ট, সুপেয়, সুশীতল বারিধারা সিঞ্চন করে চলেছেন। যার প্রয়োজন লোকসমাজে দিনদিনই তীব্র হয়ে উঠছে।

যুগপৎ শ্রদ্ধা ও প্রিয়জন এই শাইখের নিষ্ঠাপূর্ণ নানাবিধ উদ্যোগের মধ্যে কিতাব সংকলনও অন্যতম। তাঁর সংকলিত একটি সুন্নাত বিষয়ক কিতাব বেশ ক'বছর

আগে ছোটভাই হিসেবে আমি একটু দেখে দিয়েছিলাম। অতি যত্নসহকারে তৈরী এ কিতাবটিই আরো সমৃদ্ধ আকারে বর্তমানে কিঞ্চিত বর্ধিত কলেবরে 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ায় বইটির একের পর এক সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। সর্বশেষ মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের সালানা ইজতিমায় মানুষের হাতে হাতে তা'লীমুস সুন্নাহ'র শান্তিময় সবুজ মলাটের উপর স্বর্ণময় কালিতে উৎকীর্ণ প্রিয় কিতাবের শিরোনামে ও শ্রদ্ধেয় সংকলকের নাম দেখে নতুন করে আনন্দিত হই। দেখা হলে সবসময়ের মতোই মিজান ভাই আমাকে ছোট ভাইয়ের মতোই আদর জানান। বলেন, বইটি আবার রিভিউ করার কথা। আমি ধীরে ধীরে এ কাজটি করতে পারবো বলে মত প্রকাশ করি। এর পরপরই তিনি (এপ্রিল '১২) উমরায় চলে যান। সেখান থেকে এই অভাজনকে ফোন করেন এবং আমাদের সবার জন্য দোয়া করেছেন বলে জানান। আমি আপ্লুত হই, আনন্দিত হই এবং এই শুভেচ্ছাবাণী লিপিবদ্ধ করি।

বাংলাদেশের পাঠকসমাজে এ বইটি সর্বোচ্চ সমাদৃত হবে। ভবিষ্যতে এটি দ্বীনের নাগরিকদের কমন পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হবে। এ আশা ব্যক্ত করে, আমি এর সংকলকের সুস্বাস্থ্য ও বরকতময় দীর্ঘ নেক হায়াত কামনা করছি।



১১. ৫. ২০১২

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাওলানা মুফতী আবুল কালাম যাকারিয়া

মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, জামিয়া ক্বাসিমুল উলূম,
দরগাহ হযরত শাহ জালাল (রহ.) সিলেট

যথাযোগ্য হামদ ও সালাতের পর আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক (রহ.)-এর সুযোগ্য খলীফা আরেফ বিল্লাহ অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান চৌধুরী দা. বা.-এর সংকলিত 'তা'লীমুস সুন্নাহ' যা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ ও চারিত্রিক নমূনার জীবন্ত প্রতীক। সর্বজন সমাদৃত, সুন্নাতে নববীর বিভায় উদ্ভাসিত, হযরত ওয়ালা হারদুঈ (রহ.)-এর প্রিয়তম সুযোগ্য খলীফার ক্বলবের ভাষা ও প্রেমের কলমের মধ্য দিয়ে যার বহিপ্রকাশ; সেই মাকবূল কিতাবটির এক কপি আমার পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এমনিতেই আসেনি, বরং এসেছে কঠিন ও সময় স্বাপেক্ষ একটি গুরু দায়িত্বের ভার নিয়ে, যেন আমি কিতাবটির কোনো প্রকার সমালোচনা করে দেই। শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর কোনো সমস্যা থাকলে সমাধান বের করে দেই।

বাস্তবতা হলো আমি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বর্তমান সময়গুলো বিভিন্ন দ্বীনী মাশগালার ভিতর দিয়ে ব্যয় করছি। তা সত্ত্বেও মহান ব্যক্তির আদেশকে সাদরে গ্রহণ করি এবং যথাসময়ে কিতাবের বিভিন্ন স্থান খুলে খুলে দেখার চেষ্টা করেছি।

আলহামদুলিল্লাহ কিতাবটিকে প্রিয় নবীজীর মুহাব্বত ও ভালোবাসার যেমন ভরপুর পেয়েছি, শরঈ নীতিমালার আলোকে এবং আহকামের তারতীবের বিবেচনায়ও সমৃদ্ধ পেয়েছি। শরঈ বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আলোচনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি।

পরবর্তীতে সুযোগ হলে কিতাবটির আদ্যোপান্ত দেখার ইচ্ছা রইল।

আমি কিতাবের আরো ব্যাপক প্রচার ও প্রসার কামনা করছি। মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি যেন তিনি কিতাবটিকে পুরো উম্মতের হেদায়াতের জন্য কবুল করেন এবং সংকলক-সহ এর সঙ্গে শ্রম-পরামর্শ, অভিমত দিয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নাজাতের উছিলা বানিয়ে দেন। আমীন।



অভিমত

মাওলানা মুফতী আহ্‌মদ আলী

শাইখুল হাদীস
জামিআ আরাবিয়া মিফতাহুল উলূম মাসকান্দা, মোমেনশাহী

সকল কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা মুসলিম জাতির একান্ত কর্তব্য। আজ সকল কাজে সুন্নাত তো দূরের কথা ইবাদত-বন্দেগীতে কি পরিমাণ সুন্নাত ছুটে গেছে তার কোনো পরওয়া নেই। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর খিলাফতের যুগে কাফেরদের মুকাবিলায় একটি মাত্র সুন্নাতের কমতির কারণে মুসলিম মুজাহিদগণের বিজয় আসছিল না। আমিরুল মুমিনীনের নির্দেশে পরবর্তীতে একটি মাত্র ছুটে যাওয়া সুন্নাতের আমল পুরা করা হলো, তখনই মুলমানদের বিজয় লাভ হলো। বর্তমানে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মুল কারণ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহের আধিক্য এবং সুন্নাত ছেড়ে দেয়া। বিপর্যস্ত উম্মতের নাজাতের উপায় হলো সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা এবং গুনাহ বর্জন করা। এ যুগ সন্ধিক্ষণে শাইখে দেওনা কর্তৃক সংকলিত 'তা'লীমুস সুন্নাহ' কিতাবটি পথহারা উম্মতের পথ নির্দেশ হিসাবে অবদান রাখবে। তা'লীমুস সুন্নাহ কিতাবখানা মসজিদ, মাদরাসা, বাড়ি-খরে ব্যাপকভাবে তা'লীমের উপযোগী বলে আমি মনে করি।

৯.৯.২০১৪

মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ্

পরিচালক, সেন্টার ফর ইসলামিক নলেজ এন্ড থট, ঢাকা
সম্পাদক, মাসিক হুজ্ব

নবীপ্রেমীদের পাথেয় এবং আত্মার খোরাক

দিয়ারে ইয়াসরিব মে ঘুমতাহোঁ, নবী কি দহলিজ চুমতাহোঁ।
শরাবে ইশকে নবী কো পি কর, মজে মজে সে মাই জুমতাহোঁ।

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার অশেষ ফযল ও করমে তা'লীমুস সুন্নাহর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সালে বইটির প্রথম প্রকাশ। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ হয়েছিল বইটির চতুর্থ সংস্করণ। আল্লাহর রহমতে নবীপ্রেমী পাঠক বইটি আপন করে নিয়েছেন। বাংলাভাষী পাঠক নববী জীবনের আলোকে নিজেকে আলোকিত করার পথ খুঁজে পান এই বই পড়ে। রওযায়ে আতহারের সবুজ গম্বুজের সঙ্গে বাংলার সবুজ ভূমির ইশক ও প্রেম গভীর। অবিনাশী সেই মুহাব্বত ও ভালোবাসা অকৃত্রিম। নবীর নাম শুনেই যাঁরা অশ্রু ফেলেন বিরহের। দূর মদীনার স্বপ্ন তাঁদের হৃদয়ে, তাঁদের ভাবনায়। সেই ইশক-মুহাব্বত জাগ্রত রাখার আয়োজন হলো 'তা'লীমুস সুন্নাহ'। মহান আল্লাহকে পেতে হলে রাসূল পাককে ভালোবাসতে হবে। সুন্নাতের অনুসরণ, সুন্নাতের প্রতি অনুরাগ হলো ভালোবাসার আলামত। প্রিয়তম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ ও মতকে আমাদের চোখের সুরমা বানাতেই এই তা'লীমুস সুন্নাহ। কাবাপ্রেমী কাফেলা তৈরীর জন্য এই কিতাব। এই কিতাবের সংকলক শাইখে দেওনা। যিনি মুহিউস সুন্নাহ হযরতওয়ালা হারদূঈ (রহ.)-এর প্রিয়জন ও খলীফা। নিজের জীবনকে তিনি সুন্নাতের আলোয় আলোকিত করেছেন। আলোকিত করেছেন নিজ প্রতিষ্ঠানকেও। তিনি সুন্নাতের আশিক ও দিওয়ানা। তিনি মুরীদ ও মুতাআল্লিকীনকেও সুন্নাতে নববীর রাজপথের পথিক বানাতে ব্যাকুল। মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনায় সফর করলে তার কিছু নমুনা

দেখা যায়। হযরত সুন্নাতের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে দেশজুড়ে সফর করেন। মাহফিল করেন সুন্নাত প্রসারের। হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর সংস্কারমূলক সংগঠন মজলিসে দাওয়াতুল হকের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে ব্যাকুল তিনি। মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, সুন্নাতের মাহফিল এবং প্রয়োজনীয় কিতাবপত্র লিখে সুন্নাতের প্রসারে নিরলসভাবে যে কাজ করে যাচ্ছেন তার জাযা ও বিনিময় মহান আল্লাহই দেবেন। তার বহুমুখী কলমী খিদমতের একটি হলো তা'লীমুস সুন্নাহ। বইটি অনেক মসজিদে তা'লীম হয়। তা'লীম হয় ঘরে ঘরে। কোনো কোনো সংগঠন তাদের সদস্যদের জন্য এই বই পড়া বাধ্যতামূলক করেছে। সহজ-সরল ভাষায় লেখা বইটির পাঠকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ সংকলকের ইখলাস। আকাবিরদের দু'আ এবং বর্তমান ওলামায়ে কিরামের সুদৃষ্টি। যারা নবীজীকে প্রাণ থেকে ভালোবাসেন তারা নবীজীর কথা, কাজ ও আমলকেও ভালোবাসবেন এটাই স্বাভাবিক। বইটি প্রিয় হওয়ার কারণ প্রিয়তমের কাজের কথা লেখা আছে এতে।

প্রিয় নবীপ্রেমী পাঠক! হযরত নিজ হাতে আমাকে বইটির একটি কপি হাদিয়া দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দেখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি আশরাফী বাগানের ফুল ভালোবাসি। হোক তা গোলাপ, চামেলী, জবা বা বেলী। তবে বেলী আমার প্রিয়ফুল। আমার শিক্ষা ও শিক্ষাগুরু ছিলেন সরাসরি হাকীমুল উম্মত (রহ.)-এর সোহবতধন্য। মোমেনশাহীর দ্বীনী শিক্ষাবিদ ও অনেকগুলো মসজিদ-মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মঞ্জুরুল হক (রহ.)। তিনি ছিলেন আশরাফী বাগানের ফুটন্ত ফুল। হযরতও সেই আশরাফি বাগানের সুরোভিত গোলাপ, হযরতওয়ালা হরদূঈ-র প্রিয়ভাজন খলীফা। যিনি সুন্নাতের সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছেন। সেই সূত্রে হযরতের নির্দেশকে আমি গণিমত মনে করছি। বইটি সম্পাদনা করার যোগ্যতা আমার নেই। তবে বারবার পড়ে আমি মুগ্ধ ও উপকৃত হয়েছি। ভাষা ও বিষয়গতির কিছু দিক পরিমার্জন, সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। হযরত নিজেই বইটির প্রতি আন্তরিক। মনে হয় হযরতের সন্তান এটি। পাঠক যেন নির্ভুল ও সঠিক বিষয় জানতে পারে এ-জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। হৃদয় থেকে উৎসারিত তার ভাবনা, তাই বইটির স্থান পাঠকের হৃদয়ের অন্দরে। শিকড় সাহিত্য মাহফিলের স্নেহের কবি ওয়ালিউল ইসলাম পরিমার্জনের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাকে জাযা দান করুন। নবীপ্রেমীদের পাথেয় ও আত্মার খোরাক তা'লীমুস সুন্নাহর কাজে হযরত আমাকে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন এ-জন্য আমি ধন্য। সুন্নাত প্রচার-প্রসারের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত

হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। বইটি নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য দলিলসমৃদ্ধ ও সাবলীল করার জন্য অনেকেই সুপরামর্শ দিয়ে, নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য দরবারে ইলাহিতে হজ্ব ও উমরার পুরস্কার কামনা করি। তারা যেন রওযায়ে আতহারে সালাম জানাতে পারে মদীনায় গিয়ে।

প্রিয় দ্বীনী ভাই! জীবনের বরফ বিগলিত হচ্ছে। ডাক আসবে ওপারের। নবীজীর শাফায়াত ছাড়া সম্ভব নয় আখেরাতের পথ চলা। এ জগতেও সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া সম্ভব নয় টেনশনমুক্ত জীবন-যাপন করা। তাই বইটি আপন ভেবে প্রতিদিন পড়বেন, সহযোগিতা করবেন প্রচার-প্রসারে– এই দাবি ও আবেদন করছি। আপনাদের কোনো পরামর্শ থাকলে জানাবেন, অবশ্যই সাদরে গৃহীত হবে। ভুল-ত্রুটি ধরে দিলে খুশি হবেন প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ।

সুন্নাতের ভালোবাসায় আমাদের জীবন হোক আনন্দঘন। নবীপ্রেমের একটু সুধা দাও হে খোদা! তুমি কবুল করো সংকলকের এই মেহনত। তা'লীমুস সুন্নাহ পঠিত হোক ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।

সবশেষে পাঠক শুনে খুশি হবেন, দেশের বাইরেও রয়েছে এই বইয়ের ব্যাপক চাহিদা। তাই শুরু হয়েছে ইংরেজি অনুবাদ। দু'আ করবেন যেনো দ্রুত ইংরেজিভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমিন।

এই মন ঘুরে ফিরে মদীনার গাঁয়, চুমু দেই বারবার প্রেম-দরজায়।
পান করি প্রেমসুরা মদীনার কোলে, তবু মন জপে নাম দহলিজে ঝুলে।

লাবীব আবদুল্লাহ

তা'লিমুস সুন্নাহ কিতাবের নবম সংস্করণে সভাপতি, মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা'র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আলহামদুলিল্লাহ! মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা'র প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'তা'লীমুস সুন্নাহ' কিতাবটি অষ্টম সংস্করণের ছাপানো কিতাবসমূহ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে নবম সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। মাশাআল্লাহ দ্বীনের পাঁচটি বিষয়ের সুবিন্যস্ত আলোচনাসহ দ্বীন সম্পর্কিত নিত্য নতুন ভুল ধারণা ও আমলের প্রচলিত সংঘটিত ভুলের সংশোধনী সন্নিবেশিত হয়ে কিতাবটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের স্থান লাভ করেছে। শাইখে তরীকত, জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান চৌধুরী সাহেব কিতাবটির সংকলনের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তিনি এবং তাঁর সঙ্গে অন্য যারা মেহনত করেছেন, পরামর্শ ও অর্থ যোগান দিয়েছেন তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে কামনা করি তিনি যেন কিতাবটির ওসীলায় আমাদেরকে এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সুন্নাতের প্রচার ও প্রসারকারী হিসেবে কবূল করেন। আমীন!

২৪. ১০. ২০১৭

(মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন মোল্লা)

মুজাদ্দিদে দ্বীন মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক (রহ.) কর্তৃক সংকলিত ওলামায়ে কিরাম, আইম্মায়ে মাসাজিদ, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং মুবাল্লিগীনে দ্বীনের উদ্দেশ্যে অধঃপতিত উম্মতের সংশোধনের

ইলহামী সাহল নুসখা

[মাত্র ৪০ দিন আমল করলে ইনশাআল্লাহ এর গুরুত্ব বুঝে আসবে]

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

আপনারা অবগত আছেন, বর্তমানে মুসলিমজাতি বিভিন্ন প্রকার বালা-মুসীবতে পরিবেষ্টিত। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ ও স্থান নেই যেখানে মুসলিমজাতি আজ অশান্তির আগুনে প্রজ্বলিত নয়। এ অবস্থার অনেক কারণ আছে। এর আসল কারণ হলো দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া এবং অধিক পরিমাণে গুনাহে লিপ্ত হওয়া। আর এটা খুব স্পষ্ট কথা, গুনাহ'র আধিক্যের একটি বড় কারণ হলো দ্বীন সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলার অনেক বান্দা আছে, যারা দ্বীনের অতি প্রয়োজনীয় ইলম সম্পর্কেও অজ্ঞ। এতদসত্ত্বেও তারা প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম হাসিল করার ফিকিরও করে না। মুসলিম জাতির যুগসন্ধিক্ষণে সঙ্কট নিরসন ও নাজাতের একটি সহজ পন্থা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহপাক আমার দিলে ঢেলে দিয়েছেন– তা হলো মুসলিম জাতির গাফলতী ও অলসতার ব্যাধি দিন দিন বেড়েই চলছে। চাকরী-নকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, নানা ব্যস্ততার অজুহাতে দ্বীন শেখা এবং লম্বা ওয়ায নসীহত শোনার সময় এখন সকলের জন্য হয়ে উঠে না। এমতাবস্থায় মাত্র ১ মিনিটে ব্যস্ত লোকেরা সহজ পন্থায় দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো শিক্ষা করতে পারবেন। তার জন্য প্রতিদিন মসজিদে ফজর বা আসর অথবা উভয় নামাযের পর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা।

প্রথমতঃ তাসহীহে তিলাওয়াতে কালামে পাক অর্থাৎ, সাধারণতঃ মাগরিব ও ইশার নামাযে যে সমস্ত সূরা তিলাওয়াত করা হয়, সূরা ফাতিহাসহ সে সূরাগুলো একেকটি শব্দ সহীহ উচ্চারণ করিয়ে মশক করানো। এক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে

সমস্ত ভুল হয় তা শুধরিয়ে দেয়া এবং শুদ্ধ পড়ার নিয়ম খুব সহজভাবে বলে দেয়া।

[মারূফ ও মাজহুলের পার্থক্য বুঝানোর জন্য উত্তম হলো উর্দূ, বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সাহায্য নেয়া। যেমন (ِ) 'যের' এর উচ্চারণ বুঝানোর জন্য বলবে 'লিফট' এর (ি) হ্রস্ব- ই কারের মতো আওয়াযই হলো যেরের সহীহ উচ্চারণ। লিফ্টকে কেউ লেফ্ট বলে না, অদ্রূপ যেরের উচ্চারণ হ্রস্ব- ই কারের মতো হবে। (ُ) 'পেশ' এর সহীহ উচ্চারণ বুঝানোর জন্য বলবে ইংরেজী গণনার ২য় সংখ্যা 'টু' এর (ু) হ্রস্ব-উ কারের আওয়াযই হলো পেশের সহীহ উচ্চারণ। 'টু'কে কেউ 'টো' বলে না, অনুরূপ পেশের উচ্চারণ হ্রস্ব উ কারের মতো হবে।]

দ্বিতীয়তঃ যে কোনো কাজের সুন্নাতসমূহ থেকে একেকদিন একটি করে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা। যেমন, 'উযূ'। অযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা।

তৃতীয়তঃ নেক কাজের ১টি করে ফায়দার কথা বলে দেয়া। যা দুনিয়াতে পাওয়া যায়। দুনিয়ার নগদ ফায়দার কথা শুনে মানুষ নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত হয়। যেমন- নেক কাজের দ্বারা দুনিয়াতে রিযিক বৃদ্ধি পায়[১]।

চতুর্থতঃ ১টি কবীরা গুনাহ ও তার দুনিয়াবী ক্ষতি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা। যা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না এবং একটি গুনাহই জাহান্নামে নেয়ার জন্য যথেষ্ট; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যার উপর দয়া করেন। কবীরা গুনাহ'র মধ্যে ১টি গুনাহ হলো যেমন 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কারো প্রতি বিদ্রূপ করে হাসা।'

পঞ্চমতঃ গুনাহ'র দুনিয়াবী ক্ষতি শুনিয়ে দেয়া। গুনাহ'র পরকালীন ক্ষতি তো আছেই; কিন্তু অন্তত পক্ষে দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে বাঁচার স্বার্থে যাতে মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। দুনিয়াবী একটি ক্ষতি– যেমন- গুনাহ'র কারণে ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

ষষ্ঠতঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ, আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একবার করে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার

---

১. নোট : মুখস্থ করার সুবিধার জন্য দুজন দুজন করে গ্রুপ বানিয়ে নেয়া উত্তম।

আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া মুস্তাহাব। (ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর সুরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিন বার।) দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার ইস্তিগফার, ১০০ বার দুরূদ শরীফ, ১০০ বার কালিমায়ে তাইয়িবাহ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির করা।

সপ্তমতঃ দৈনিক কোনো নেক আল্লাহওয়ালার সোহবতে নেক নিয়্যতে বসা। (অর্থ্যাৎ, আস্থা ও ভক্তির সাথে) তা সম্ভব না হলে বুর্যূর্গানে দ্বীনের মাওয়ায়েয ও মালফুযাত বা জীবনী ইত্যাদি পড়তে থাকা।

অষ্টমতঃ সহজ তিনটি সুন্নাতের উপর আমল শুরু করে দেয়া। এর বরকতে অন্যান্য সুন্নাতের ওপরে চলার শওক, যওক পয়দা হবে; সুন্নাতী যিন্দেগী গঠিত হবে। সুন্নাত তিনটি যেমন-

১. বেশি বেশি সালাম দেয়া। অর্থাৎ সালামের ব্যাপক রেওয়ায চালু করা। আসসালামু শব্দের শুরুতে হামযা, শেষে মীমের পেশকে খুব স্পষ্ট ও মারূফ উচ্চারণ করা। যেমন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।) সালামের জবাবেও সহীহ-শুদ্ধতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা। যেমন-

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ (ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।)

২. প্রতিটি উত্তম কাজে ও উত্তম স্থানে ডান দিককে অগ্রাধিকার দেওয়া। যেমন, ক. জামা পরা উত্তম কাজ, তাই ডান দিক থেকে আগে পরা। জামা খোলা তার তুলনায় নিম্ন মানের কাজ, তাই বাম দিক থেকে খোলা। খ. মসজিদ উত্তম জায়গা, তাই প্রবেশের সময় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা। মসজিদের বাহিরটা ভিতরের তুলনায় নিম্ন মানের স্থান, তাই বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া।

৩. বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকির করা। সর্বদা মহান আল্লাহর ধ্যান ও যিকির করা। চলতে-ফিরতে যবানে সুবহানাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ, ওপরে উঠার সময় আল্লাহু আকবার, নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলতে থাকা। প্রতিটি নেক আমলের শুরুতে দিলে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বৃদ্ধি ও গাইরুল্লাহর মুহাব্বত কমানোর নিয়্যত করা।

মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) বলেন, উপরোক্ত নিয়মে মসজিদের ইমাম ও উলামায়ে কিরাম কাজ শুরু করেছেন। মাশাআল্লাহ উম্মতের খুবই উপকৃত হওয়ার সংবাদ পাচ্ছি। এক সময়ে আমার আলীগড় সফরে সেখানে কয়েক দিন অবস্থানকালে উল্লিখিত নিয়মে কাজ করা হয়। মাত্র ১৯ দিনে অনেক বয়স্ক লোকও ১৯টি কবীরা গুনাহ, ১৯টি সুন্নাত মুখস্থ করে নিয়েছেন। একই সময়ে তারা সূরা ফাতিহা, সূরায়ে ফালাক, সূরায়ে নাস তাজবীদসহ শুদ্ধভাবে পড়তে শিখেছেন। যেহেতু এ পদ্ধতি অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক সহজ ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছে, তাই আপনাদের প্রতি আমার আবেদন হলো, আপনারাও আপনাদের কর্তৃত্বাধীন মসজিদ ও মাদরাসাসমূহে উপরোক্ত নিয়মে কাজ শুরু করুন এবং নেগরানী করুন। ইনশা-আল্লাহ অনেক উপকার হবে এবং ব্যস্ত লোকেরাও দ্বীনের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করতে পারবে।

আবরারুল হক
হারদুঈ, ইউ, পি, ভারত

বি. দ্র. মুহীউস সুন্নাহ হযরত ওয়ালা শাহ হরদুঈ রহ. এর এই ইলহামী সাহল নুসখার সমন্বিত রূপ হলো এক মিনিটের মাদরাসা। –সংকলক

সংকলকের সবিনয় আরজ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।"

-সূরা হাশর, আয়াত ৭

ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ.

'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব পবিত্র কুরআন, অপরটি হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত।' মিশকাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১

আজ আমরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধারণ করেছি ঠিকই কিন্তু কেউ তিন আঙ্গুলের সাহায্যে, কেউবা দুই আঙ্গুল দিয়ে আবার কেউ নামে মাত্র। সারকথা, নিরাপত্তা ও সফলতা লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৃঢ়তার সঙ্গে পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা। চৌদ্দ শত বছরের ইতিহাস সাক্ষী, যতদিন মুসলমানগণ পরিপূর্ণ সুন্নাতের উপর আমল করেছে, ততদিন গোটা পৃথিবীজুড়ে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ইজ্জত-সম্মান, উন্নতি-অগ্রগতি অক্ষুণ্ন ছিল। যখন থেকে কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে দিয়েছে, তখন থেকেই বিপর্যয় ও অধঃপতন শুরু হয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম জাতি কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে জাগতিক শিক্ষাকে একমাত্র শিক্ষা হিসাবে গ্রহন করে বিজাতীয়দের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরনের মাধ্যমে ইহকাল-পরকাল উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ও তাঁর পবিত্র আদর্শ তথা সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যই মানবজীবনের পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধির একমাত্র উপায় এবং

দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সমস্যার মূল চাবিকাঠি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই মনে করেন যে, এই অনুসরণ ও আনুগত্য শুধু নামায-রোযাসহ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি, লেন-দেন, আচার-আচরণ, পারস্পারিক হক আদায় এবং অন্তরের গুণাবলী, ইখলাস, সবর, শুকর, তাকওয়ার গুণ অর্জন ও রিয়া, হিংসা, লোভ, অহংকার ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা অর্থাৎ জাহের-বাতেনে আহকামে ইলাহী পরিপূর্ণ আমলে মানব জীবনের সর্বাঙ্গনে নববী শিক্ষা ও আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন কোনো অত্যাবশ্যক বা দ্বীনের অপরিহার্য অঙ্গ নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নামায-রোযায় পাবন্দ এবং দ্বীনদার হিসেবে পরিচিত কিন্তু লেন-দেন, পরস্পরের হক-হুকুকের বিষয়ে কোনো সুন্নাতের অনুসরণ না থাকায় মুসলিম নামের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়ায়। আচার-আচরণে ইসলামের অনুপম মাধুর্য না থাকায় ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদের বদনাম করার সুযোগ পায়। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং তাঁর অনুপম জীবনাদর্শ ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সুন্নাতের অনুশীলনের ব্যাপারে মনোযোগের অভাব।

নিরাপত্তা, শান্তি ও মুক্তির পথ সুন্নাত

মানুষের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ ও সফলতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে। হযরাত সূফিয়ায়ে কেরাম সকলেই এ কথার উপর একমত যে, তাসাওউফের যত তরীকা, যত সিলসিলা এবং যত আ'মাল তার মধ্যে সবচেয়ে আফযাল, আসহাল ও আকমাল তরীকা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের সুন্নাত। পূর্ণ দ্বীন, পূর্ণ তাসাওউফ এবং পূর্ণ তাযকিয়ার খুলাসা/সারমর্ম হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার খাঁস নিসবত কায়েম করা। আর এই খাঁটি সম্পর্ক করার সহজ তরীকা ইত্তেবায়ে সুন্নাত। এ কারণে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ: আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের কৃত গুনাহসমূহকে মাফ করে দিবেন। আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াময়। - সূরা আ-লি ইমরান : ৩১

উম্মত যখন নবীজীর সুন্নাতের অনুসরণ করবে তখন আল্লাহপাক তার গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তাঁর প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করে নিবেন।

"হযরত ইবনে আতাউল্লাহ ইস্কান্দারী রহ. অত্যন্ত উঁচু স্তরের বিজ্ঞ বুর্যুগ ছিলেন। তিনি বলেছেন, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে পরিমাণ অনুসরণ করবে সে পরিমাণ কল্যাণের দিকে অগ্রসর হবে। তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ থেকে যে পরিমাণ শুণ্যতা সৃষ্টি হবে সে পরিমাণ ধ্বংস ও গোমরাহী আসবে।

হযরত বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে মাকবুল হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুকরণ ব্যাতিরেকে কেউই মুক্তি লাভ করতে পারবেন না।"

শরীয়তের বিধনাবলী হলো হুকুকের সমষ্টি; আল্লাহ এবং বান্দার হক। অর্থাৎ আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায়ের নাম শরীয়ত। আর এর সীমানা হলো সুন্নাত। আমলযোগ্য বিষয় হলো সুন্নাত। এখানে অনেকেই ভ্রমে আছেন যা হাদীসে আছে তা আমল করতে হবে। কুরআন হাদীস মতে সব হাদীস সুন্নাত নয় কিন্তু সব সুন্নাতই হাদীস। সুন্নাত হলো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় আমল করেছেন। মুসলিহাতের কারণে কোন একটি কাজ করেছেন অথবা পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে তা সুন্নাত নয়। কাজেই সুন্নাতের মাধ্যমে জানা যাবে কোন্ হকের সীমা কতটুকু। শরীয়তের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতের অনুসরণ করলে জীবনের সব কর্মকাণ্ডই ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে। প্রত্যেক ইবাদত ও সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা মুসলিম জাতির একান্ত কর্তব্য। অথচ আজ সকল কাজে সুন্নাতের অনুসরণ করা থেকে উম্মত কী পরিমাণ গাফেল! উম্মত যেই পরিমাণ গাফেল আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বান্দা হিসেবে তার সম্পর্কের ততোটুকুই অবনতি ঘটেছে। সুন্নাতী যিন্দেগী এখতিয়ার করে উম্মত পৃথিবীর অপরাপর জনগোষ্ঠির মধ্যে অনণ্য হয়ে উঠেছিলো। যার বিনিময়ে জীবনের প্রতিটি মুআমালায় আল্লাহ পাকের মদদ ও সন্তুষ্টি লাভ করেছিলো। আজকে ভূপৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সেই সুন্নাতী যিন্দেগীর নকশা পাওয়া দুষ্কর। উম্মত আছে সুন্নাত নেই। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এই উম্মতের সংশোধন ও সফলতা একমাত্র পূর্বসূরীদের অনুসরণের মাঝেই নিহিত। আমাদের পূর্ব পুরুষ তথা সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও সলফে সালেহীন যে পথে চলে সফলতা ও কল্যাণ লাভ করেছিলেন, শেষাংশের কামিয়াবীও সে পথেই হাসিল হবে। ইমাম জুহরী (রহ.) বলেন, নাজাত ও মুক্তির একমাত্র পথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যতোদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত জীবনে

বাস্তবায়ন না হবে ততোদিন পর্যন্ত আমাদের সফলতা, উন্নতি এবং মুক্তি আশা করা নিছক বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। সুন্নাতের রঙ্গে নিজেকে রঙ্গীন করার অব্যর্থ ব্যবস্থা হলো সুন্নাতওয়ালা ব্যক্তির সোহবত ও মুহাব্বত।

সুন্নাত অনুসরণে হযরত মুহিউস সুন্নাহ (রহ.)-এর তাকীদ

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.) পতনোন্মুখ রূহানী ব্যধিগ্রস্ত উম্মতের সুস্থতার উপায় দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যেমন- যক্ষা রোগীকে দৈনিক একটি করে ট্যাবলেট খাওয়ালে ধীরে ধীরে সুস্থতা লাভ করে, অনুরূপভাবে অধঃপতিত উম্মতকেও সুন্নাতের আমালের ট্যাবলেট সেবনের বরকতে সুন্নাতওয়ালা হয়ে আল্লাহওয়ালা বনে যাবে। উম্মতের নারী পুরুষ সকলকেই সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।

আজ জাতির যুগ সন্ধিক্ষণে যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ বিদআত, রুসুমাত ও মুনকারাতের মুকাবিলায় হযরত ওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) বলেন, সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার প্রসার করতে হবে। হযরত বলেন, যখন সুন্নাতের স্বচ্ছ পানির স্রোত আসবে তখন বিদআতের নোংরা পানি আপনা আপনিই বিদূরিত হবে।

মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) মাদরাসা ও মসজিদকে সুন্নী বানানোর তাকীদ করতেন। মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মারকায এবং মাদরাসা হলো নববী ইলমের মারকায; এই দুটি কেন্দ্র মুসলমানদের আশ্রয়স্থল, এখানে মুসলমানগণ বার বার উপস্থিত হন। এ দুটি স্থানে সুন্নাতের শিক্ষা, চর্চা ও সুন্নাতের আমলী মশক যদি যথাযথ রূপে সম্পন্ন হয় এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ যদি কথা, কাজ ও অবস্থা সকল দিক দিয়ে সুন্নাতের আমলকারী ও প্রচারক হন তাহলে হেদায়াতের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছতে খুব বেশিদিন লাগবে না। মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) মাদরাসাসমূহে স্বতন্ত্রভাবে সুন্নাত শিক্ষাদানের জন্য জোর তাকিদ করতেন এবং বলতেন, মসজিদ মাদরাসা, দ্বীনী মাহফিলে সুন্নাত শিক্ষাদান কর্মসূচী গ্রহণ করলে অতি দ্রুত এর ফল প্রকাশ পাবে। প্রাথমিকভাবে 'এক মিনিটের মাদারাসা' নামক কিতাবখানা তা'লীমের মাধ্যমে কাজ শুরু করা যেতে পারে। সুন্নাতের আমলের জন্য সুন্নাতের ইলম জরুরী। হাদীস ও ফেকাহর কিতাবসমূহে সুন্নাতসমূহ বিদ্যমান। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ের দ্বীনশিক্ষার্থী অনেকেই ঐ স্তরে পৌঁছতে পারে না। সাধারণ মুসলমানগণ তো ভাষাগত দুর্বলতার কারণে আরবী-উর্দু কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারে না, যার ফলে উম্মতের বৃহৎ অংশ সুন্নাতের ইলম থেকে বঞ্চিত হয়ে কালক্রমে সুন্নাতশূন্য হয়ে যাচ্ছে। কাজেই সুন্নাতের গুরুত্বের কারণেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাংলা ভাষায় সুন্নাতের কিতাব রচনা ও প্রচার-প্রচারণা সময়ের দাবি। তা'লিমুস সুন্নাহ কিতাবখানা এরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'তা'লীমুস সুন্নাহ' হযরতওয়ালার ফিকিরের বহিঃপ্রকাশ

আলহামদুলিল্লাহ, অধম (সংকলক) মুজাদ্দিদে দ্বীন মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর নগণ্য খাদেম হওয়ার সুযোগে হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সুন্নাতে রাসূলের প্রতি ইশক ও জযবা থেকে প্রভাবিত হয়েছি। এ লক্ষ্যে ২০০৭ সালে মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনার ছাত্রদের পাঠ্য উপযোগী করে ছোট কলেবরে মুহিউস সুন্নাহ (রহ.)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত সুন্নাত সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক প্রচারপত্র সংগ্রহ করে 'তা'লীমুস সুন্নাহ' নামে একটি কিতাব সংকলন করা হয়। আল্লাহ পাকের শুকর, এরই ধারাবাহিকতায় আজ সেটির নবম সংস্করণ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অষ্টম সংস্করণে ছাপানো কিতাবসমূহ পাঠকগণের খেদমতে আল্লাহ কবুল করেছেন। বিধায় নবম সংস্করণের ছাপানোর প্রয়োজন হয়েছে।

সংকলিত কিতাবে (তা'লীমুস সুন্নাহ) দ্বীনের পাঁচটি বিধান সংক্রান্ত সুন্নাত এবং প্রচলিত মুনকারাতের ইসলাহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কিতাবখানা সুন্নাতের অনুসারীদের গাইড বই (Guide Book) হিসেবে কাজ দেবে ইনশাআল্লাহ।

কিতাবটি সংকলনের কাজে প্রথমত যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে অত্র মাদরাসার উস্তাদ মুফতী মুহাম্মাদ আব্বাস শরীয়তপুরী ও মাওলানা মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম সাহেবের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। মাওলানা লাবীব আবদুল্লাহ যথেষ্ট মেহনত করেছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের মাদরাসার আসাতিযায়ে কিরামের সহযোগিতাও কম নয়। সর্বোপরি অষ্টম সংস্করণে বর্তমান আমার শাইখ আরেফে রব্বানী হযরতওয়ালা শাহ হাকিম কালিম উল্লাহ সাহেব দা.বা.সহ হালযামানার বিশিষ্ট কয়েকজন আকাবিরে দ্বীনের মহামূল্যবান অভিমত ও দু'আয় কিতাবখানা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে উন্নীত হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে কবুল করে আমাকে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এটিকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে নেন। আমীন। তাকাব্বাল ইয়া রাব্বাল আলামীন।

২৫-১০-২০১৭
মুহতাজে দু'আ
(মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান চৌধুরী)
খলিফা, মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক হারদুঈ (রহ.)
নাযেম, মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈমান-আকাইদ

ঈমান ——— ৬১
ঈমানের ৭৭ শাখা ——— ৬৩
কোন্ অঙ্গের দ্বারা কতটি কাজ সম্পন্ন করতে হয় ——— ৬৩
দিলের দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের ৩০টি কাজ ——— ৬৩
যবানের দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের ৭টি কাজ ——— ৬৪
শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের কাজ ৪০টি —— ৬৪
নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত ১৬টি কাজ ——— ৬৫
নিজের পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের সঙ্গে করণীয় ৬টি কাজ - ৬৫
জনসাধারণের সঙ্গে করণীয় ১৮টি কাজ ——— ৬৫
আকাইদ ——— ৬৬
ইহতিসাব ——— ৬৯
ইসলাম ——— ৭০
ইসলামের পাঁচটি শাখা ——— ৭১
দ্বীনী ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় দ্বীনের পরিপূর্ণ মেহনত ——— ৭২
মানব জাতির মুক্তি ও কামিয়াবী সূরাতুল আসরের ৪ মূলনীতির
আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ——— ৭৩
দাওয়াতের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা——— ৭৬
প্রতিবেশীর হক হলো তাঁদেরকে দ্বীন শিখানো, সৎকাজের
আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ অন্যথায় শাস্তি অনিবার্য ——— ৭৯
আহকামে তাবলীগের অনুসরণে এ লাইনে মেহনত করতে হবে- ৮০
দ্বীনের উন্নতী নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
সুন্নাতের উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করা ——— ৮১

উপস্থিত শ্রোতাগণের দ্বীনী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে ——— ৮২
আল্লাহওয়ালা বুর্যূগানেদ্বীনের সোহবত ——— ৮৫
শ্রোতাদের অবস্থাভেদে সহজভাবে দ্বীনী বিষয় বুঝাতে হয় ——— ৮৬
দ্বীনী মাদরাসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের কর্মনীতি ——— ৮৭
আম জনতা ও এলাকাবাসীর উপর দুই ধরনের মেহনত ——— ৮৮
ছাত্রদের মধ্যে দুই ধরনের মেহনত করতে হবে ——— ৮৮
শাগরেদের তিনটি হক ——— ৯০
সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি আরজ ——— ৯১
ছাত্রদের শিক্ষা বহির্ভুত বিষয়ে না জড়ানো ——— ৯৩
বর্তমানে ছাত্রদের মোবাইল ফোন ব্যবহার ইলমের পথে বড় অন্তরায় ——— ৯৪
মুবাল্লিগে দ্বীনের জন্য জরুরী কিছু আদব ও আহকাম ——— ৯৪
ওয়ায়েয ওয়াযের সময় নিজেকে ভুলবে না ——— ৯৯
মুবাল্লিগে দ্বীনের জন্য তাযকিয়াতুন্নফস জরুরী ——— ১০০
মাহফিলের আয়োজকদের প্রতি বিশেষ হেদায়াত ——— ১০২
মাহফিলের শ্রোতাদের প্রতি হেদায়াত ——— ১০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা

ইস্তিঞ্জার (পেশাব-পায়খানা) সময় আট কাজ সুন্নাত ——— ১১২
পাঁচ দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ——— ১১৩
ছয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ——— ১১৩
দশ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ ——— ১১৩
ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা নিষেধ ——— ১১৩
ইস্তিঞ্জায় দশ জিনিস ব্যবহার করা নিষেধ ——— ১১৪
পেশাব-পায়খানার কতিপয় আদব ——— ১১৪

মিসওয়াক, অযূ, গোসল, তায়াম্মুম

মিসওয়াকের ফযীলত ——— ১১৬
মিসওয়াকের ধরন ——— ১১৭

মিসওয়াক ধরার পদ্ধতি ——— ১১৭
মিসওয়াক করার সুন্নাত তরীকা ——— ১১৭
যে যে সময়ে মিসওয়াক করা সুন্নাত ——— ১১৮
উযূর ফযীলত ——— ১১৮
উযূর ফরয ৪টি ——— ১১৯
উযূর সুন্নাতসমূহ ——— ১১৯
উযূর আদবসমূহ ——— ১২১
উযূ আমলী মশকের মাধ্যমে শিখতে হবে ——— ১২২
উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ ——— ১২৩
গোসলের ফরয ৩টি ——— ১২৩
গোসলের সুন্নাত ৫টি ——— ১২৪
গোসলের সুন্নাত তরীকা ——— ১২৪
চার ক্ষেত্রে গোসল করা সুন্নাত ——— ১২৪
গোসলের আদবসমূহ ——— ১২৪
তায়াম্মুমের ফরয ৩টি ——— ১২৫
তায়াম্মুমের তরীকা ——— ১২৫
মোজায় মাসেহ্ করার আহ্কাম ——— ১২৬
কোন্ ধরনের মোজায় মাসাহ্ করা জায়েয ——— ১২৭
মোজায় কতোদিন মাসাহ্ করা জায়েয ——— ১২৭
মোজায় মাসাহের তরীকা ——— ১২৭
যেসব কারণে মোজায় মাসাহ্ ভঙ্গ হয়ে যায় ——— ১২৭
নাপাক কাপড় পাক করার পদ্ধতি ——— ১২৮
নারীদের পাক-পবিত্রতার মাসআলা না জানার
কারণে নামায আদায়ে গাফলতি ——— ১২৯
উদাসীনতার প্রতিকার ——— ১৩০

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

আযান ইকামতের ফযীলত ——— ১৩১
আহকামে আযান ও ইকামত ——— ১৩২

মুয়াযযিন সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ ——— ১৩৩
আযান দেয়ার সুন্নাত ও মুস্তাহাব তরীকা ——— ১৩৪
আযানের শব্দসমূহ আদায় করার নিয়ম ——— ১৩৫
আযানের জওয়াব দেয়ার সুন্নাত তরীকা ——— ১৩৭
আযানের দু'আ ——— ১৩৮
আযান ও ইকামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ——— ১৩৯
ইকামত দেয়ার সুন্নাত তরীকা ——— ১৩৯
ইকামতের জওয়াব দেয়ার সুন্নাত তরীকা ——— ১৪০
ফজরের আযানের পর সুন্নাতসমূহ ——— ১৪১
আযান ও ইকামতে প্রচলিত কিছু ভুল সংশোধন ——— ১৪১
মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৫টি ——— ১৪২
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৫টি ——— ১৪৩
আদাবুল মাসাজিদ ——— ১৪৩
মসজিদে যে সব কাজ করা নিষেধ ——— ১৪৪

নামায

কিয়ামত দিবসে বেনামাযীর করুণ পরিণতি ——— ১৪৭
জামা'আতে নামায আদায় না করার কত বড় হুশিয়ারী ——— ১৪৭
নামাযের বাইরের ফরয ৭টি ——— ১৪৮
নামাযের ভিতরের ফরয ৬টি ——— ১৪৮
নামাযের ওয়াজিবসমূহ ——— ১৪৯
নামাযে নিয়্যতের গুরুত্ব ——— ১৪৯
তাকবীরে তাহরীমা ——— ১৫০
তাকবীরের তিন অবস্থা ——— ১৫০
নামাযের সুন্নাত ৫১টি ——— ১৫৩
দাঁড়ানো অবস্থার ১১টি সুন্নাত ——— ১৫৩
কিরা'আতের সুন্নাত ৭টি ——— ১৫৪
কিরা'আত আস্তে ও জোরে পড়ার বিধান ——— ১৫৪
রুকূর সুন্নাত ৮টি ——— ১৫৫
সিজদার সুন্নাত ১২টি ——— ১৫৬

বসার সুন্নাত ১৩টি ——— ১৫৬
সালাম ফিরানোর সুন্নাত ——— ১৫৭
নামাযে পঠিত কতিপয় দু'আ ও দুরূদ ——— ১৫৭
তাশাহ্হুদ ——— ১৫৭
দুরূদ শরীফ ——— ১৫৮
দু'আয়ে মাসূরা ——— ১৫৮
দু'আয়ে কুনূত ——— ১৫৮

মহিলাদের নামাযের মাসায়েল

মাসাইলে কিয়াম ২৭টি ——— ১৬০
তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোর নিয়ম ——— ১৬০
হাত বাঁধার সময় ৪ কাজ ——— ১৬১
হাত বাঁধার পর ৮ কাজ ——— ১৬১
মাসাইলে রুকূ ——— ১৬১
রুকূ থেকে উঠতে ৩ কাজ ——— ১৬২
মাসাইলে সিজদা ৩৪টি ——— ১৬২
সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ ——— ১৬২
মাসাইলে কু'ঊদ (বৈঠক) ১৬টি ——— ১৬৩
সালাম ফিরানোর ৬ কাজ ——— ১৬৪
পুরো নামাযের সময় ৬ মাসায়িল ——— ১৬৪
পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য ——— ১৬৪
মহিলাদের জামা'আতে শরীক হওয়া নিষেধ ——— ১৬৫
নামায ভঙ্গের কারণসমূহ ——— ১৬৬
নামাযের মাকরূহসমূহ ——— ১৬৭
উযূ-নামাযের আমলী মশকের অপরিহার্যতা ——— ১৬৯
আমলী মশকের ধারাবাহিকতা ——— ১৭১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-এর নামাযের নেগরানী করতেন ——— ১৭২
উযূ ও নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় না করা আল্লাহ পাকের হকে কম করা ——— ১৭৩

নামাযে খুশু-খুযুর গুরুত্ব ——— ১৭৪
খুশুহীন নামায সম্পর্কে কতিপয় ইমামের ফতওয়া ——— ১৭৪
নামাযে 'হুযূরে কলব' বা একাগ্রচিত্ততার তাৎপর্য ——— ১৭৬
নামাযে খুশু-খুযূ হাসিলের উপায় ——— ১৭৭
সহীহভাবে নামায আদায় না করার শাস্তি ——— ১৮০

নামাযে ঘটে যাওয়া কতিপয় ভুলের সংশোধন

কাতারের ভুলসমূহ ——— ১৮১
নামাযে কাতার দুরস্ত করা ও খালি জায়গা পূরণ করার গুরুত্ব — ১৮২
তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার পর যদি সামনের কাতারে
খালি জায়গা থাকে ——— ১৮৩
কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলত ——— ১৮৩
কাতার ঠিক হলে ইমাম তাকবীর বলবেন ——— ১৮৩
জামা'আতে প্রথম কাতারের গুরুত্ব ——— ১৮৪
প্রথম তাকবীর ——— ১৮৪
ইচ্ছাকৃত পিছনের কাতারে থাকা ——— ১৮৪
চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরয়ী বিধান ——— ১৮৪
কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি ——— ১৮৬
ইকামাতের সময় ভুলসমূহ ——— ১৮৬
তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ভুলসমূহ ——— ১৮৬
কিয়াম অবস্থায় ভুলসমূহ ——— ১৮৭
কিরা'আত অবস্থায় ভুলসমূহ ——— ১৮৮
রুকূ অবস্থায় ভুলসমূহ ——— ১৯০
সিজদা অবস্থায় ভুলসমূহ ——— ১৯২
বসা অবস্থার ভুলসমূহ ——— ১৯৩
মাসবুকের ব্যাপারে জরুরী কয়েকটি মাসআলা ——— ১৯৪
নামাযের সালামের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ ——— ১৯৫
নামাযে নড়াচড়া করা নিষেধ ——— ১৯৫
নামাযের সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা ——— ১৯৬
নামাযে মোবাইল ফোন বন্ধ করার বিধান ——— ১৯৬

ইমামের আগে রুকূ সিজদা করার পরিণাম ——— ১৯৭
নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচল করা গুনাহ ——— ১৯৭
দু'আর ফায়দা ও আদব ——— ১৯৭
মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা ——— ১৯৯
ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের শরঈ বিধান ——— ২০০

জুমু'আ

জুমু'আর দিনের সুন্নাত ও আদবসমূহ ——— ২০১
জুমু'আর খুতবার সুন্নাত তরীকা ——— ২০২
খুতবার সুন্নাত ——— ২০২
জুমু'আর নামাযে সুন্নাত কিরা'আত ——— ২০৪
জুমু'আর প্রথম খুতবা ——— ২০৫
জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবা ——— ২০৬

ঈদ

ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ ——— ২০৭
ঈদের নামাযের পদ্ধতি ——— ২০৭
সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ জায়েয নয় ——— ২০৮
কোন এলাকার জন্যে কতো দূরের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে? ——— ২০৯
মুসাফিরের নামায ——— ২১০
সফরে কেবলার হুকুম ——— ২১০
বাস ও ট্রেনে বসে নামায পড়ার বিধান ——— ২১০
বিমানে নামায ——— ২১১

নফল নামায

নফল ও মুস্তাহাবসমূহের গুরুত্ব ——— ২১২
নফল নামাযের ফযীলত ——— ২১৩
তাহাজ্জুদ ——— ২১৪
তাহাজ্জুদ নামাযের সহজ পন্থা ——— ২১৪
আসরের পূর্বে ৪ রাকা'আত ——— ২১৫
ইশরাকের নামায ——— ২১৫

চাশতের নামায ——— ২১৬
আওয়াবীনের নামায ——— ২১৬
আওয়াবীন পড়ার অতি সহজ নিয়ম ——— ২১৭
সালাতুত তাসবীহ ——— ২১৭
তাওবার নামায ——— ২১৮
সালাতুল হাজত ——— ২১৮
তাহিয়্যাতুল উযূ ——— ২১৯
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ——— ২১৯
সালাতুল কুসূফ ——— ২২০
সালাতুল খুসূফ ——— ২২১
সালাতুল ইস্তিখারা ——— ২২১
এস্তেস্কার নামায ——— ২২৩

জানাযা

মৃত্যুকালীন সুন্নাতসমূহ ——— ২২৫
কাফনের কাপড়ের সুন্নাতসমূহ ——— ২২৬
কাফন পরানোর সুন্নাত তরীকা ——— ২২৭
জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার ফযীলত ——— ২২৮
জানাযার নামাযের ফরয ৩টি ——— ২২৮
জানাযার নামাযের সুন্নাত ৩টি ——— ২২৮
জানাযা পড়ার সুন্নাত তরীকা ——— ২৩০
কবর খনন করার সুন্নাত তরীকা ——— ২৩০
সিন্দুকী কবর খনন করার তরীকা ——— ২৩১
বুগলী কবর খনন করার তরীকা ——— ২৩১
দাফনের সুন্নাত তরীকা ——— ২৩১
মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সহীহ তরীকা ——— ২৩১
দাফন-কাফনে দেরি করা ——— ২৩৩
জানাযা নামাযের আগে মৃত ব্যক্তি 'ভালো ছিল'
এ-কথার স্বীকৃতি নেয়া ——— ২৩৩
জানাযার পর মাইয়্যেতের চেহারা দেখানো ——— ২৩৩

জানাযায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে দ্বীনী বিষয় ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করা ——— ২৩৪
জানাযার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিলম্ব করা ——— ২৩৪
দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন ——— ২৩৪
পারিবারিক গোরস্থান ——— ২৩৪
দাফনের পূর্বে সশস্ত্র সালাম ও বিউগল বাজানো ——— ২৩৫
ঈসালে সওয়াবের তরীকা ——— ২৩৫
কবর যিয়ারত ——— ২৩৬
সওয়াব রেছানীর গলদ তরীকা ——— ২৩৭
কবর স্থানান্তর ——— ২৩৮
মাইকে শবীনা পড়ানো ——— ২৩৮
মীলাদ পড়ানো ——— ২৩৯
অসীয়ত লেখার ফযীলত ও গুরুত্ব ——— ২৪০
সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর অসিয়্যতের গুরুত্ব ——— ২৪১

যাকাতের গুরুত্ব ও আহকাম

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও যাকাতের নিসাব ——— ২৪৩
যাকাত যার উপর ওয়াজিব ——— ২৪৩
যাকাত কাকে দিবেন-কাকে দিবেন না? ——— ২৪৪
শুধু সোনা বা রূপার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি ——— ২৪৪
দোকান/বাড়ি ভাড়ার জন্য প্রদত্ত জামানতকৃত টাকার যাকাত ——— ২৪৪
করয দেয়া টাকার উপর যাকাত ——— ২৪৪
নফল সদকা খয়রাত ——— ২৪৫
দান-সদকার বরকত ——— ২৪৫
দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সদয় হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য ——— ২৪৬
আল্লাহর ওয়াস্তে যদি কেউ কিছু চায় ——— ২৪৬
ভিক্ষুক বেশে পরীক্ষার জন্য ফেরেশ্তাগণও আসেন ——— ২৪৭
আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্যকিছু চাইবে না ——— ২৪৭

রমযানের রোযা

ফাযায়েলে রমযান ——— ২৪৮
আল্লাহওয়ালা হওয়ার মাস ——— ২৫০
মান বিবেচনায় রোযা ৩ প্রকার ——— ২৫০
চাঁদ দেখা ——— ২৫১
সন্দেহের দিনে রোযা ——— ২৫২
রোযার নিয়্যত ——— ২৫২
রোযাদারের করণীয় আমলসমূহ ——— ২৫২
রমযানে বর্জনীয় বিষয় ——— ২৫৩
রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ ——— ২৫৩
তারাবীহ ——— ২৫৪
তরাবীহ সংক্রান্ত ইসলাহযোগ্য আরও কয়েকটি জরুরী বিষয় ——— ২৫৫
তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত ৮ রাকা'আত নয় ——— ২৫৫
ভ্রান্তি নিরসন ——— ২৫৬
তাহাজ্জুদ ——— ২৫৬
সাহরী ও ইফতার ——— ২৫৭
সাহরী ও ইফতার সংক্রান্ত কিছু ইসলাহযোগ্য বিষয় ——— ২৫৭
সময়ের ব্যাপারে অবহেলা ——— ২৫৭
ইফতারে অধিক সময় নেয়া প্রসঙ্গ ——— ২৫৮
শবে ক্বদরের ফযীলত ও আমল ——— ২৫৮
খুব বেশি দু'আর ইহতিমাম করা ——— ২৫৯
ই'তিকাফের ফযীলত ও গুরুত্ব ——— ২৬০
ইসলাহ: রমযানে ও রমযানের বাইরে ফজরের মাসনূন ওয়াক্ত ——— ২৬১

নফল রোযা

নফল রোযার ফযীলত ——— ২৬২
আইয়্যামে বীযের রোযা ——— ২৬৩
সপ্তাহে ২ দিন রোযা ——— ২৬৩
মুহাররমের রোযা ——— ২৬৩
আরাফার দিনের রোযা ——— ২৬৩

শাওয়ালের রোযা ——— ২৬৩
শাবানের রোযা ——— ২৬৪

হজ্ব

খালেছ নিয়্যতে হজ্ব করা ——— ২৬৪
মক্কা ও হারামে প্রবেশের সুন্নাত ও আদবসমূহ ——— ২৬৬
তালবিয়া পড়া সুন্নাত ——— ২৬৬
হজ্বের ফরয ৩টি ——— ২৬৬
হজ্বের ওয়াজিব ৬টি ——— ২৬৬
হজ্বের সুন্নাতসমূহ ——— ২৬৭
ইহরামের সুন্নাত ৯টি ——— ২৬৮
ইহরামের মুস্তাহাব ১০টি ——— ২৬৮
তাওয়াফের সুন্নাত ১০টি ——— ২৬৮
তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২টি ——— ২৬৯
সাঈ-এর সুন্নাত ৯টি ——— ২৭০
সাঈ-তে মুস্তাহাব কাজ ৫টি ——— ২৭০
উকূফে আরাফার সুন্নাতসমূহ ——— ২৭০
উকূফের মুস্তাহাবসমূহ ——— ২৭১
হজ্বের আদবসমূহ ——— ২৭২
এক নজরে হজ্বের ধারাবাহিক নক্শা ——— ২৭৩
৮ জিলহজ্ব - হজ্বের প্রথম দিন ——— ২৭৩
৯ জিলহজ্ব - হজ্বের দ্বিতীয় দিন ——— ২৭৩
১০ জিলহজ্ব - হজ্বের তৃতীয় দিন ——— ২৭৩
১১ জিলহজ্ব - হজ্বের চতুর্থ দিন ——— ২৭৪
১২ জিলহজ্ব - হজ্বের পঞ্চম দিন ——— ২৭৪
১৩ জিলহজ্ব - হজ্বের ষষ্ট দিন ——— ২৭৪
হজ্বের পরিপূর্ণ বরকত লাভের জন্য জরুরী হিদায়াত ——— ২৭৫
হজ্ব কামেল হওয়া ——— ২৭৫
হজ্ব গোপন রাখা ——— ২৭৬

উমরা

উমরার ফযীলত ——— ২৭৮
হজ্ব বা উমরার সফরে নামাযের বিধান ——— ২৭৮
হারামাইন শরীফাইন ও মহিলাদের নামায প্রসঙ্গ ——— ২৭৯
যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা ——— ২৮০
মদীনা মুনাওয়ারা সফরের আদব ——— ২৮১
সফরের নিয়্যত ——— ২৮১
মসজিদে নববীতে প্রবেশ ——— ২৮১
রওযা-পাকে সালাম পেশ করার নিয়ম ——— ২৮১
রিয়াযুল জান্নাত ——— ২৮৩
রওযা শরীফ ও রিয়াযুল জান্নাত যিয়ারতে সতর্কতা ——— ২৮৩
মসজিদে নববীতে জামা'আতে নামায ——— ২৮৪

হজ্ব ও উমরা পালনে সংশোধনযোগ্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হজ্ব ও উমরা পালনে প্রচলিত ভূলসমূহ ও তার ইসলাহ
ইহরাম বিষয়ক ভ্রান্তিসমূহ ——— ২৮৫
ইহরামের দুই রাকা'আত নামায ——— ২৮৫
অকারণে ইহরাম বাঁধায় বিলম্ব করা ——— ২৮৫
ইহরামের কাপড় পরিবর্তন ——— ২৮৬
ইহরামের পুরো সময় ইযতিবা করা ——— ২৮৬
ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের পর্দা ——— ২৮৬
মাহরাম পুরুষ ব্যতীত হজ্বের সফর ——— ২৮৭
বাইতুল্লাহর প্রথম দর্শন ——— ২৮৭
বাইতুল্লাহর স্পর্শ ও আলিঙ্গন ——— ২৮৭
তাওয়াফের দু'আ ——— ২৮৭
তাওয়াফে রমল করা ——— ২৮৮
তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকা'আত পড়ার স্থান ——— ২৮৯
কুরবানীর ভুলসমূহ ——— ২৮৯
হজ্বের সফরে গুনাহ'র কাজ থেকে বেঁচে থাকা ——— ২৮৯
হারাম শরীফের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য সামনে

বিস্তর জায়গা ফাঁকা রেখে যথা-তথায় দাঁড়িয়ে ইক্তেদা করা ——— ২৯০
পবিত্র স্থানে ফটো উঠানোর হিড়িক ——— ২৯০
মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা ——— ২৯১
সালামের প্রতি উদাসীনতা ——— ২৯১

কুরবানী

কুরবানীর ফযীলত ——— ২৯২

কুরবানী সম্পর্কে জরুরী কিছু মাসায়েল

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব ——— ২৯২
নেসাবের পরিমাণ ——— ২৯২
কুরবানীর সময় ——— ২৯৩
কোন্ কোন্ পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয ——— ২৯৩
কুরবানীর পশুর বয়স-সীমা ——— ২৯৩
এক পশুতে শরীকের সংখ্যা ——— ২৯৩
সাত শরীকের কুরবানী ——— ২৯৩
কোনো অংশীদারের গলদ নিয়্যত হলে ——— ২৯৪
কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ ——— ২৯৪
কুরবানীর উত্তম পশু ——— ২৯৪
যে সমস্ত পশু দ্বারা কুরবানী করা যায় না ——— ২৯৪
নিজের কুরবানীর পশু নিজেই যবাই করা ——— ২৯৫
যবাই একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে ——— ২৯৫
কুরবানীর পশু থেকে যবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া ——— ২৯৫
কুরবানীর পশুর দুধ পান করা ——— ২৯৫
কুরবানীর গোশত বণ্টন- ——— ২৯৫
যবাইকারীকে চামড়া, গোশত দেওয়া ——— ২৯৬
পশু নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ——— ২৯৬
অন্য পশুর সামনে যবাই করা ——— ২৯৬
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কুরবানী ——— ২৯৬
কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ সদকা করা ——— ২৯৬

কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা ——— ২৯৬
যবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া ——— ২৯৭
তাকবীরে তাশরীক ——— ২৯৭

চতুর্থ অধ্যায়
মু'আমালাত

ইসলামে মু'আমালাতের গুরুত্ব ——— ২৯৮
প্রাপ্য হক আদায়ে যারা কম করে তারা অপরাধী ——— ২৯৯
নেককাজ ও পাপকর্মের সংমিশ্রণ ——— ৩০১
হালাল রুযির ফযীলত ও উপকারিতা ——— ৩০৬
হালাল রুযীর বরকত ——— ৩০৮
হারাম খাদ্যের কু-প্রভাব ——— ৩০৮
নিজ উপার্জন খাওয়া সুন্নাত ——— ৩০৮
নারীদের ঘরে বসে হাতের কাজের ফযীলত ——— ৩০৯
ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণিত পেশা ——— ৩১০
হারাম উপার্জনের পরিণাম ——— ৩১০
ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কিছু বিধি-বিধান ——— ৩১০
শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার ——— ৩১৪
শেয়ার ব্যবসাকারীর করণীয় কি? ——— ৩১৫
ঋণ নেয়া ও দেয়ার আদব ——— ৩১৫
এতীমের প্রতি দয়া করা ——— ৩১৬
এতীমের ভালোবাসা ——— ৩১৭
অন্তরের কোমলতা ও প্রয়োজন পূরণের আমল ——— ৩১৭
জান্নাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-এর সাথী হওয়া ——— ৩১৭
আজীবন জিহাদকারীর সওয়াব ——— ৩১৭
এতীমের মাল খাওয়া ——— ৩১৭
মীরাস বণ্টন ——— ৩১৮
বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেয়া জরুরী ——— ৩১৮

বিবাহ শাদীর আহকাম

বিয়ের সুন্নাতসমূহ ——— ৩২০
বিয়ে ও দাম্পত্যের কিছু আদব ——— ৩২১
বিয়ে পড়ানোর নিয়ম ——— ৩২৩
বিয়ের খুতবা ——— ৩২৪
বিয়ে-শাদীর প্রচলিত ভুলসমূহ ——— ৩২৪
বিয়ের পূর্বের ভুলসমূহ ——— ৩২৪

বিয়ে শাদীতে প্রচলিত ভুল ভ্রান্তি

বরপক্ষের ভুলসমূহ ——— ৩২৬
কন্যাপক্ষের ভুলসমূহ ——— ৩২৭
বিয়ের কিছু কু-প্রথা ——— ৩২৭
বিয়ে-শাদীর আরো কতিপয় কুসংস্কার ——— ৩২৭

পর্দার গুরুত্ব ও বিধান

পর্দাহীনতার কুফল ——— ৩৩৫
বেপর্দেগীর খারাবী ও ক্ষতি ——— ৩৩৮
মহিলাদের পর্দা করার সময় ও পরিমাণ ——— ৩৩৯
সতর ঢাকা ও খোলার আদব ——— ৩৪০
পুরুষগণ যেসব মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে ——— ৩৪১
মহিলাগণ যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে ——— ৩৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

মু'আশারাত

হুকূকুল ইসলাম ——— ৩৪৩
আল্লাহ তা'আলার হক ——— ৩৪৩
কুরআন পাকের হকসমূহ ——— ৩৪৪
নবী রাসূলগণের হক ——— ৩৪৪
ফেরেশতাদের হক ——— ৩৪৫
সাহাবা ও আহলে বাইতের হক ——— ৩৪৫
ওলামা-মাশায়েখগণের হক ——— ৩৪৫

উস্তাদ ও পীরের হক ——— ৩৪৬
উস্তাদের হকসমূহ ——— ৩৪৬
পীরের হক ——— ৩৪৮
ছাত্র ও মুরীদের হক ——— ৩৫০
পিতা-মাতার হক ১৪টি ——— ৩৫০
দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা-মামা, চাচা ও ফুফুর হক ——— ৩৫১
সন্তানের হক ——— ৩৫১
দুধমাতার হক ——— ৩৫২
সৎ মায়ের হক ——— ৩৫২
ভাই-বোনের হক ——— ৩৫২
অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক ——— ৩৫২
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফায়দা ——— ৩৫৩
স্বামী-স্ত্রীর হক ——— ৩৫৩
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ——— ৩৫৪
শাসক ও শাসিতের হক ——— ৩৫৪
প্রজাদের প্রতি বাদশাহর দায়িত্ব ——— ৩৫৪
শাসকের প্রতি শাসিতের হক ——— ৩৫৪
শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের হক ——— ৩৫৫
সাধারণ মুসলমানের হক ——— ৩৫৫
প্রতিবেশীর হকসমূহ ——— ৩৫৭
অনাথ ও এতীমের হক ——— ৩৫৮
মেহমানের হক ——— ৩৫৮
মেযবানের হক ——— ৩৫৯
বন্ধু-বান্ধবের হক ——— ৩৬০
অমুসলিমদের হক ——— ৩৬১
জীব-জন্তুর হক ——— ৩৬১
আদব সৌভাগ্যের সিঁড়ি ——— ৩৬৩
কুরআন শরীফের আদব ——— ৩৬৭
কুরআন পাকের সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় আদব ——— ৩৬৭

তিলাওয়াতের বিশেষ ৩ টি ফায়দা ——— ৩৭০
তিলাওয়াতের বিশেষ ২ টি আদব ——— ৩৭০
কুরআন পাক দেখে পড়ার বিশেষ ৩ টি ফায়দা ——— ৩৭০
হাদীসে পাকের আদব ——— ৩৭০
হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর আদব ——— ৩৭২
হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.)-এর আদবের নমুনা ——— ৩৭৩
রণাঙ্গনে আদব রক্ষার দৃষ্টান্ত ——— ৩৭৩
ইমাম মালেক (রহ.)-এর আদবের নমূনা ——— ৩৭৪
পাহলোয়ান থেকে আধ্যাতিক জগতের সম্রাট
জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) ——— ৩৭৪
দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম
কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর আদবের নমুনা ——— ৩৭৬
বেআদবীর কারণে ইলমী ফয়েয থেকে বঞ্চিত হতে হয় ——— ৩৭৭
ইসলাম তলোয়ারে নয় আখলাকে ছড়িয়েছে ——— ৩৭৮
অনুপম ধৈর্য ও সহনশীলতা ——— ৩৭৯

ইসলামের সৌন্দর্য

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
মক্কী জীবনের একটি ঘটনা ——— ৩৮২
মাদানী জীবনের একটি ঘটনা ——— ৩৮৩
মানবসেবায় খলীফাতুল মুসলিমীন ——— ৩৮৪
জীবন সায়াহ্নে সহানুভূতি ও হামদর্দীর বিরল দৃষ্টান্ত ——— ৩৮৫

মানব সেবায় নিকট অতীতের আকাবিরে দ্বীন

হযরত মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্দলবী (রহ.) ——— ৩৮৬
শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) ——— ৩৮৬
হযরত মাওলানা সৈয়দ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) ——— ৩৮৬
দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত
মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহ.) ——— ৩৮৭
আজকের ইউরোপ আমেরিকা মুসলমানদের আখলাক
থেকে গ্রহণ করে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে ——— ৩৮৭

সৃষ্টির সেবার সুফল ——— ৩৮৮
জনৈক পতিতার মাগফেরাতের ঘটনা ——— ৩৮৯
একটি অসুস্থ কুকুরের সেবা দানের পুরস্কারস্বরূপ
যুগশ্রেষ্ঠ বুর্যূগ হযরত আহমাদ কবীর রেফায়ী
(রহ.)-কে তরীকতের সবক প্রদান ——— ৩৮৯
বিড়াল ছানাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি ——— ৩৯২
মাজলুমকে সাহায্য করা ——— ৩৯৪
মজলুম ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না ——— ৩৯৪
সঙ্গীদের খেদমত করা নফল ইবাদত থেকে উত্তম ——— ৩৯৪
সঙ্গীর কাছে সর্বোত্তম আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম ——— ৩৯৪
খেদমতের আদব ——— ৩৯৪
খেদমতের তিনটি শর্ত ——— ৩৯৫

দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাতসমূহ

সালামের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালামে মুহাব্বত ও ঐক্য সৃষ্টি হয় ——— ৩৯৬
সালাম প্রদান সম্পর্কিত আদবসমূহ ——— ৩৯৮
সালাম প্রেরণের সুন্নাত তরীকা ——— ৩৯৮
সালামের উচ্চারণে প্রচলিত ভুল ——— ৩৯৯
মুসাফাহার সুন্নাত ও আদবসমূহ ——— ৩৯৯
মু'আনাকার আদবসমূহ ——— ৪০০
কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত ——— ৪০১
বিসমিল্লাহ সম্পর্কিত কতিপয় আদব ——— ৪০২
ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ বলা সুন্নাত ——— ৪০২
মুলাকাতের সুন্নাত ——— ৪০৩
মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ফযীলত ——— ৪০৩
সাক্ষাতের সময় প্রচলিত কিছু ভুলের সংশোধন ——— ৪০৪
খানা খাওয়ার সুন্নাত ১৬টি ——— ৪০৪
খানা খাওয়ার সময় যে সব বিষয় আলোচনা নিষেধ ——— ৪০৬
খানা খাওয়ার বিশেষ কিছু আদব ——— ৪০৬

পানি পান করার সুন্নাতসমূহ ——— ৪০৭
সম্মিলিতভাবে খানা খাওয়ার সুন্নাত ——— ৪০৯
একত্রে খানা খাওয়ার আদব ——— ৪১০
একত্রে খানা খাওয়ার ফায়দাসমূহ ——— ৪১০
খানা বণ্টনের পদ্ধতি ——— ৪১০
পড়ে যাওয়া খানা উঠিয়ে খাওয়ার ফায়দা ——— ৪১০
মেহমানদারী করা ——— ৪১০
হাদিয়া দেয়ার ফায়দা ও আদব ——— ৪১১
ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ ——— ৪১২
ঘুমানোর আরো কিছু সুন্নাত ——— ৪১৩
ঘুম থেকে উঠার সুন্নাতসমূহ ——— ৪১৪

লেবাসের সুন্নাত ও আদব

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ ——— ৪১৫
টাখনুর নীচে পোশাক পরিধানের ক্ষতি ——— ৪১৫
জুতা পরার আদব ——— ৪১৭
লুঙ্গি পরিধান করার সুন্নাত তরীকা ——— ৪১৮
পাগড়ি পরার সুন্নাতসমূহ ——— ৪১৯
টুপি পরার সুন্নাতসমূহ ——— ৪১৯
চুলের সুন্নাতসমূহ ——— ৪১৯
চিরুনি করার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২০
দাঁড়ি রাখার সুন্নাত ও আদবসমূহ ——— ৪২১
দাঁড়ি মুণ্ডানো চব্বিশ ঘণ্টা লাগাতর গুনাহ ——— ৪২২
গোঁফ রাখার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২২
নখ কাটার আদবসমূহ ——— ৪২২
তেল, সুরমা, আতর ব্যবহারের সুন্নাতসমূহ ——— ৪২২
হাঁচির সুন্নাত ——— ৪২৩
হাই ঠেকানোর আদব ——— ৪২৩
হাসির সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৪
ক্রন্দনের সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৪

কথোপকথনের সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৫
অন্যের কথাবার্তা শোনার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৫
অন্যকে ডাকার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৬
কারো ডাকে সাড়া দেয়ার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৬
পত্র লেখার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৬
মজলিসে বসার সুন্নাত তরীকা ——— ৪২৭
রাস্তায় বসার আদব-কায়দা ——— ৪২৯
বিচার করার আদব ——— ৪২৯
রাষ্ট্র পরিচালনার আদব ——— ৪৩০
বিবিধ আদব-কায়দা ——— ৪৩১
রাগ স্তিমিত করার সুন্নাত তরীকা ——— ৪৩৪
সফর সম্পর্কীয় সুন্নাত ও আদব ——— ৪৩৪
ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ ——— ৪৩৫
রাস্তায় চলার সুন্নাত ও আদবসমূহ ——— ৪৩৫
সফরে নিরাপত্তার আমল ——— ৪৩৬
স্থলযানে আরোহণের সুন্নাত ——— ৪৩৭
নৌযানে আরোহণের সুন্নাত ——— ৪৩৭
উড়োজাহাজে আরোহণ করার আদব ——— ৪৩৮
নিজ ঘরে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা ——— ৪৩৯
বিদায় কালীন সুন্নাত ——— ৪৪০
চিকিৎসা করার সুন্নাত তরীকা ——— ৪৪১
রোগী দেখার সুন্নাত তরীকা ——— ৪৪২
রোগীর সেবাযত্ন করার ফযীলত ——— ৪৪৪

বিবিধ সুন্নাত

সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে নির্দেশনা ও সুন্নাতসমূহ ——— ৪৪৫
শিশু জন্মকালীন পাঁচটি সুন্নাত ——— ৪৪৫
আকীকার সুন্নাতসমূহ ——— ৪৪৫
শিশু সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা ——— ৪৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মশুদ্ধি

যাহের ও বাতেনের ইসলাহ্ জরুরী ——— ৪৫২
তরীকতের উদ্দেশ্য বাতেন সংশোধন ——— ৪৫৫
তাসাউফ-তরীকত তথা পীর-মুরিদী বিষয়ে ভ্রান্তির নিরসন ——— ৪৫৬
আখলাকে হামীদা বা উন্নত চরিত্র ——— ৪৫৭
আখলাকে রাযীলা বা কু-চরিত্র ——— ৪৫৯

আত্মার রোগসমূহ

আত্মার প্রথম রোগ : অধিক খাওয়ার লোভ ——— ৪৬১
আত্মার দ্বিতীয় রোগ : অধিক কথা বলার আগ্রহ ——— ৪৬১
আত্মার তৃতীয় রোগ : অনর্থক রাগ করা ——— ৪৬১
আত্মার চতুর্থ রোগ : হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ ——— ৪৬২
আত্মার পঞ্চম রোগ : কার্পণ্য বা বখীলী ——— ৪৬২
আত্মার ষষ্ঠ রোগ : সম্মান কামনা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা ——— ৪৬২
আত্মার সপ্তম রোগ : দুনিয়ার মুহাব্বত ——— ৪৬৩
আত্মার অষ্টম রোগ : তাকাব্বুর বা আত্মগরিমা ——— ৪৬৩
আত্মার নবম রোগ : খোদ-পছন্দি বা নিজেকে ভালো মনে করা ——— ৪৬৩
আত্মার দশম রোগ : রিয়া বা লোক দেখানো ভাব ——— ৪৬৪

আত্মার দশটি সৎ গুণাবলী

আত্মার প্রথম গুণ : তাওবা ——— ৪৬৫
আত্মার দ্বিতীয় গুণ : খওফ বা খোদা-ভীতি ——— ৪৬৫
আত্মার তৃতীয় গুণ : যোহদ বা দুনিয়া বিমুখতা ——— ৪৬৬
আত্মার চতুর্থ গুণ : সবর বা ধৈর্যশীলতা ——— ৪৬৬
সবরের চারটি স্তর ——— ৪৬৭
আত্মার পঞ্চম গুণ : শোকর বা কৃতজ্ঞতা ——— ৪৬৮
আত্মার ষষ্ঠ গুণ : ইখলাস বা খালেস নিয়্যত ——— ৪৬৮
আত্মার সপ্তম গুণ : তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভর করা ——— ৪৬৯

আত্মার অষ্টম গুণ : মুহাব্বত ——— ৪৬৯
আত্মার নবম গুণ : তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি ——— ৪৬৯
আত্মার দশম গুণ : মৃত্যুচিন্তা ——— ৪৭০
আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও মুহাব্বত ——— ৪৭০
আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও মুহাব্বতের
বরকতে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু লাভ হয় ——— ৪৭১
ঈমানের স্বাদ লাভের উপায় ——— ৪৭২
সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত ——— ৪৭৩
আওলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর দরবারের গেইট ——— ৪৭৪
রূহানী চিকিৎসক দিয়ে আত্মার চিকিৎসা জরুরী ——— ৪৭৪
বাইআত সুন্নাত হওয়ার দলীল ——— ৪৭৫
শাইখ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ৪টি অপরিহার্য শর্ত ——— ৪৭৬
আত্মশুদ্ধির সহজ উপায় ——— ৪৭৬

গুনাহ'র দুনিয়াবি ক্ষতি এবং নেককাজে নগদ উপকারিতা

রাষ্ট্রীয় যুলুম ——— ৪৮০
গুনাহ'র কারণে দুনিয়াতে ২৭ প্রকার ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে ——— ৪৮১
নেক কাজের ২৭ প্রকার উপকার যা দুনিয়াতে পাওয়া যায় ——— ৪৮৩
৫০টি কবীরা গুনাহ ——— ৪৮৫

প্রচলিত খেলাফে সুন্নাত ও বদ রুসুমাত

প্রচলিত উরসের স্বরূপ ——— ৪৮৮
প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী ——— ৪৯০
বর্ষবরণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ——— ৪৯১
জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গুনাহের মহোৎসব ——— ৪৯৩
বিজাতীয়দের তরীকা মুহাব্বতের কারণে এক আবেদের
নির্মম পরিণতি ——— ৪৯৩
বলার ভুল: মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া! ——— ৪৯৫
ভুল আমল : গোসল শেষে ওযু করা! ——— ৪৯৬
বিদআত : জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা! ——— ৪৯৬

ভুল রীতি : সালাম বা মুসাফাহার পর বুকে হাত রাখা! ——— ৪৯৬
একটি প্রচলিত মারাত্মক গুনাহ্
মামি, চাচি এবং সৎ-শাশুড়ীর সাথে পর্দা না করা! ——— ৪৯৬
একটি ভয়াবহ ভুল : কুরবানীর ঈদ কি যবাইয়ের উৎসব? —— ৪৯৭
ভুল মাসআলা : মহিলারা নামাযে বিলম্ব করা! ——— ৪৯৭
একটি মারাত্মক গুনাহ্
রিংটোন হিসেবে বাদ্য ও গানের ব্যবহার ——— ৪৯৮
একটি মারাত্মক গুনাহ্
রিংটোন হিসেবে তিলাওয়াত, আযান ও যিকির ——— ৪৯৮
চিন্তাগত ভুল : আদাব ও নফল বিষয়াদির
জ্ঞানচর্চাও কি নফল? ——— ৪৯৯
হালাল জানোয়ার সহীত তরীকায় যবাই না হলে হারাম ——— ৪৯৯
যবাইকৃত মুরগীর নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার পূর্বেই
ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে দেওয়া ——— ৫০০
যবাইকৃত মুরগীকে কম গরীম পানিতে চুবানো ——— ৫০০

আল্ আসমাউল হুসনা ——— ৫০১
আল্লাহ্র গুণবাচক ৯৯টি নামের অর্থ ——— ৫০২

দুরূদ শরীফের ফযীলত ও মাসায়েল
অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ ——— ৫০৬
দুরূদে তুনাজ্জিনা ——— ৫০৯

মাসনূন দু'আ
ফরয নামাযের পর যে সমস্ত আমল করা মুস্তাহাব ——— ৫১১
ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে এই দু'আ ৭বার পড়বে —— ৫১২
ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে এই দু'আ পড়বে ——— ৫১২
সায়্যিদুল ইস্তিগ্ফার (সকাল-সন্ধ্যা ১বার) ——— ৫১২
ঘরে প্রবেশের সময় এ দু'আটি পড়বে ——— ৫১৩
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে ——— ৫১৩
বাজারে প্রবেশকালে অসংখ্য নেকী অর্জন ও

গোনাহ্ মাফির দু'আ ——— ৫১৪
আল্লাহর রহমত ও বৃষ্টি লাভের দু'আ ——— ৫১৪
রহমতের বৃষ্টির জন্য নিম্নের দু'আটি পড়বে ——— ৫১৫
উপকারী ও দ্রুত বৃষ্টি পাওয়ার জন্য দু'আ ——— ৫১৫
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে এ দু'আ পড়বে ——— ৫১৫
বৃষ্টি শুরু হলে পড়বে ——— ৫১৬
মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের অনিষ্টতা থেকে হেফাযতের
জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে থাকবে ——— ৫১৬
ঝড়-তুফান শুরু হলে এ দু'আটি পড়বে ——— ৫১৬
সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণের সময় বার বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ
পড়তে থাকবে ——— ৫১৭
নতুন চাঁদ দেখে নিম্নের দু'আটি পড়বে ——— ৫১৭
রজব ও শা'বানের চাঁদ দেখে নিম্নের দু'আটি পড়বে ——— ৫১৭
যখন চাঁদের উপর দৃষ্টি পড়ে তখন এই দু'আ পড়বে ——— ৫১৭
মজলিস শেষে কাফ্ফারা স্বরূপ নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে ——— ৫১৮
কেউ হাদিয়া দিলে অথবা কোনো ইহসান করলে
এই দু'আ পড়তে হয় ——— ৫১৮
আয়নায় নিজেকে দেখার সময় এ দু'আটি পড়তে হয় ——— ৫১৮
কোনো দুঃসংবাদ শুনলে পড়বে ——— ৫১৮
কোনো সুসংবাদ শুনলে অথবা কেউ
কেমন আছেন বললে পড়বে ——— ৫১৯
ভবিষ্যতে কোনো বিষয়ে ওয়াদা করলে বলবে ——— ৫১৯
মনের চাহিদা মোতাবেক অবস্থা হলে পড়বে ——— ৫১৯
মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পড়বে ——— ৫১৯
কাউকে হাসি মুখে দেখলে পড়বে ——— ৫১৯
ইফতারের পূর্বে নিম্নের দু'আটি বেশি বেশি পড়বে ——— ৫১৯
ইফতারের পর এই দুটি দু'আ পড়বে ——— ৫২০
নতুন ফুল দেখার দু'আ ——— ৫২০
সূর্য উঠার সময় পড়বে ——— ৫২০
মাগরিবের আযানের সময় পড়বে ——— ৫২০

কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়বে ——— ৫২১
সাপের ভয় হলে এ দু'আ পড়বে ——— ৫২১
সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্তির বিশেষ আমল ——— ৫২১
কাউকে কঠিন রোগাক্রান্ত বা খারাপ অবস্থায়
দেখলে চুপে চুপে পড়বে ——— ৫২১
দুর্ভিক্ষের সময় নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পড়বে ——— ৫২২
নতুন ফল সামনে এলে নিম্নের দু'আটি পড়বে ——— ৫২২
রোগী দেখে দ্রুত সুস্থতার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি ——— ৫২২
আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক
নামাযের পর ১বার পড়বে ——— ৫২২
গুনাহ মাফ ও আল্লাহর রহমত কামনার জন্য
বেশি বেশি পড়বে ——— ৫২৩
দ্বীনের উপর দৃঢ়তার জন্য প্রত্যেক ফরয নামাযের পর
নিম্নের দু'আটি ১১ বার পড়বে ——— ৫২৩
চরিত্র সংশোধনের পরীক্ষিত আমল ——— ৫২৩
হেদায়াতের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণের
জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি ——— ৫২৪
দ্বীন-দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ
এ দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার পড়বে ——— ৫২৪
জান-মাল, দ্বীন-ঈমান ও আওলাদ-পরিজনের হেফাযতের
জন্য সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে ——— ৫২৪
নেয়ামত, আফিয়াত বা সুখ শান্তি-লাভ ও বিপদাপদ
থেকে নিরাপদ যিন্দেগীর দু'আ ——— ৫২৪
সন্তান-সন্ততির হেফাযত ও বালা-মসিবত থেকে নিরাপদ
থাকার আমল ——— ৫২৫
সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ
(প্রতিদিন বাদ মাগরিব ৩ বার) ——— ৫২৫
সর্ব প্রকার আসমানী-যমীনী বালা-মুসীবত থেকে
হেফাযতের আমল ——— ৫২৬
সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে হেফাযতের জন্য
সকাল-বিকাল ৭ বার পাঠের দু'আ ——— ৫২৬

সর্ব প্রকার অশান্তি ও পেরেশানি থেকে মুক্তির জন্য
নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পড়বে ——— ৫২৬
অবাধ্য সন্তান বাধ্য করার জন্য প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত
দু'আটি সন্তানের নাম মনে করে কমপক্ষে তিনবার পড়বে ——— ৫২৭
ঋণ পরিশোধের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে ——— ৫২৭
দুশ্চিন্তা ও ঋণ থেকে মুক্তির জন্য আমল ——— ৫২৭
কারো অত্যাচারের আশঙ্কা হলে এই দু'আ প্রত্যেক
ফরয নামাযের পর ১১ বার পড়বে ——— ৫২৮
যাদু থেকে নিরাপদ থাকার বিশেষ আমল ——— ৫২৮
অন্তরকে অহঙ্কারমুক্ত রাখার জন্য বেশি বেশি পড়ার দু'আ ——— ৫২৯
সুস্বাস্থ্যের জন্য নিম্নের দু'আটি পড়বে ——— ৫২৯
কঠিন মুসীবত ও শত্রু থেকে হেফাযতের জন্য নিম্নোক্ত
দু'আটি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১১ বার করে পড়বে ——— ৫২৯
দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত
দু'আটি সকাল-সন্ধ্যায় ১ বার করে পড়বে ——— ৫২৯
শিরকে খফী (সূক্ষ্ম শির্ক) থেকে
রক্ষাকারী দু'আ (সকাল-বিকাল ৩ বার) ——— ৫৩০
কঠিন বিপদ-আপদ ও শত্রুর কবল
থেকে হেফাযতের আমল (সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার) ——— ৫৩১
দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি
নিয়মিত পড়বে প্রত্যেক নামাযের পর ——— ৫৩১
অন্তরে হেদায়াত লাভ ও নফসের
খারাবী থেকে হেফাযতের দু'আ ——— ৫৩২
কঠিন কঠিন রোগ থেকে হেফাযতের জন্য
নিম্নোক্ত দু'আটি সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার পড়বে ——— ৫৩২
কবর-আযাব, দোযখ, ধন-দৌলতের খারাবী ও
অভাব-অনটনের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ দু'আ ———৫৩৩
সন্তান, স্ত্রী, উপরস্ত কর্মকর্তা অথবা কঠিন সমস্যায়
নিম্নের দুটি দু'আ প্রত্যেক নামাযের পর ৭ বার পাঠ করে
এভাবে দু'আ করুন ——— ৫৩৩
নিম্নের দু'আটি বিভিন্ন বালা-মুসিবত থেকে রক্ষার জন্য

আগে ও পরে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়বে ——— ৫৩৪
জরুরত পুরা করা, আরোগ্য লাভ অথবা আপনজন দূরে
কোথায় গেলে নিরাপদে ফিরে আসার আমল ——— ৫৩৪
শত্রুর অনিষ্ঠ থেকে নিরাপদ ও
বিজয় লাভের জন্য বিশেষ আমল ——— ৫৩৪
উপরস্ত ব্যক্তির জুলুম থেকে হেফাজতের তদবীর ——— ৫৩৪
হার্টের রোগীদের জন্য বিশেষ আমল ——— ৫৩৪
বাতেনী পরিপক্কতার বিশেষ আমল ——— ৫৩৫
যে কোনো হাজত পূরণের জন্য নিম্নের দু'আটি ——— ৫৩৫
সর্ব প্রকার রোগ থেকে মুক্তির আমল ——— ৫৩৫
যে কোনো অনিষ্টতা ও শত্রু থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল ——— ৫৩৫
গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিশেষ আমল ——— ৫৩৬
রোগ মুক্তির বিশেষ আমল ——— ৫৩৬
রিযিকের বরকত ও সর্বপ্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ
ধনাঢ্যতা হাসিলের আমল ——— ৫৩৬
তাড়াতাড়ি বিবাহ্ ও উত্তম আত্মীয় লাভের আমল ——— ৫৩৬
সকল কাজের সফলতার আমল ——— ৫৩৬
সন্তানের হেফাজতের তদবীর ——— ৫৩৭
সূরা ফালাকের আমল ——— ৫৩৭
জামে দু'আ ——— ৫৩৭
মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আবরারুল হক
(রহ.) কর্তৃক মনোনীত সংক্ষিপ্ত অথচ জামে দু'আ ——— ৫৩৮
মুনাজাতে মকবূল ——— ৫৪০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

প্রথম অধ্যায়

ঈমান-আকাইদ

ঈমান

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকার করা, ভরসা করা ও নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি। ধাতুগত অর্থে ঈমান হলো ধর্মীয় আকীদা বা বিশ্বাস, আর ইসলাম ধর্মীয় আমল ও কাজ-কর্মকে বুঝায়। ঈমানের বিশেষণে 'মুমিন' এবং ইসলামের বিশেষণে 'মুসলিম' বা মুসলমান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটির জায়গায় আরেকটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ঈমান যদি দালানের ফাউন্ডেশন বা গাছের শিকড় হয়, তাহলে ইসলাম হলো দালানের দেয়াল বা গাছের ডাল-পাতার মতো। দালানের ভিত্তি ছাড়া যেমন দেয়ালের অস্তিত্ব থাকে না তেমনি গাছের মূল শিকড় ছাড়া ডাল-পালার কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অপরদিকে দেয়াল না থাকলে শুধু ভিত্তির এবং ডাল-পালা না থাকলে শুধু শিকড়ের তেমন কোনো মূল্য থাকে না। তাই ধর্মীয় ঈমান-আকীদা সহীহ না থাকলে শুধু বাহ্যিক ইসলামেরও কোনো মূল্য থাকে না।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা সেসব বিষয়, যা স্পষ্টভাবে ও অবধারিতরূপে প্রমাণিত। সেসব বিষয় মনে প্রাণে মেনে নেয়া। দিলে দিলে বিশ্বাস স্থাপন করার পর মুখে তা স্বীকার করা এবং কুরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত অনুসারে আমল করা। সংক্ষেপে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহকেও ঈমান বলা হয়।

ঈমানের মর্ম হলো, আল্লাহ তা'আলার ওহীসমূহের উপর পুরোপুরি একীন ও আস্থা রাখা। অর্থাৎ অন্তরের গভীরে নির্দ্বিধায় এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই অনন্ত অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দুনিয়ার যে কোনো জিনিসের মধ্যে নিজ ইচ্ছায় যে কোনো গুণ, বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া দিয়ে রাখতে পারেন। আবার যে কোনো সময় তা রহিত করতে পারেন। আমল ও ইবাদতসমূহের কোনটির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কী বৈশিষ্ট্য রেখেছেন, তা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঈমানের দাবি হলো, নিজকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সর্মপণ করা আর এই ওয়াদাবদ্ধ হওয়া যে, এখন থেকে আর আমার নিজের কোনো ইচ্ছা চলবে না। এখন থেকে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন হয়ে জীবন-যাপন করবো। কিভাবে জীবন-যাপন করতে হবে, ইবাদত বন্দেগী করতে হবে, মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও লেনদেন কিভাবে চলবে, আখলাক-চরিত্র কেমন হবে ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কে রয়েছে হেদায়াত ও দিক-নির্দেশনা এবং তা সবই এ কালেমার আওতাভুক্ত। সেসব দিক-নির্দেশনা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বাণী দ্বারা দিয়ে গেছেন তেমনি নিজ জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্মের দ্বারা তিনি তাঁর বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়ে গেছেন। পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকে তিনি তাঁর পবিত্র জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন।

ঈমান হচ্ছে অমূল্য রত্ন। জীবনের চেয়ে ঈমানকে বেশি ভালোবাসতে হবে। আসন্ন বিপদ নিজের প্রাণের উপর দিয়ে পার করে নিতে হবে, তবুও ঈমানের গায়ে একটু চোট লাগানো যাবে না। স্মরণ রাখতে হবে, ঈমান নষ্ট হলে ইহকাল-পরকাল, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, শান্তি-সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য-সম্পদসহ সবই নষ্ট হয়ে যাবে।

অনেকের ধারণা— মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেই মুসলমান হওয়া যায়, নিজের কিছু করার দরকার নেই। কিছু না করে শুধু মুসলমান নাম ধারণ করলেই বেহেশতে যাওয়া যাবে— এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা ঈমান ও ইসলাম কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়। ঈমান ও ইসলাম এমন কতগুলো কাজের সমষ্টি, যেগুলো সাদা-কালো, আরব-অনারব, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের যে ব্যক্তিই সম্পন্ন করবে, সে-ই মানবতার উন্নতির উচ্চাসনে সমাসীন হবে, তাঁর ইহ-পরকাল ধন্য হবে। সে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের কাছে মাহবূব হয়ে থাকবে।

ঈমানের ৭৭ শাখা

ঈমান ও ইসলাম কতগুলো কাজের সমষ্টির নাম। সেগুলোর কিছু দিল অর্থাৎ অন্তঃকরণ দ্বারা, কিছু যবান দ্বারা আর কিছু শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়। বড় বড় ইমামগণ গভীর গবেষণার মাধ্যমে কুরআন-হাদীস থেকে ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কিত সে সমস্ত কাজের সংখ্যা নির্ণয় করেছেন এবং কোন্ অঙ্গের দ্বারা কতগুলো কাজ সমাধা হয়, তাও নির্ধারণ করেছেন। কাজগুলো মোট ৭৭টি। এগুলোকে ঈমানের শাখা বলা হয়।

কোন্ অঙ্গের দ্বারা কতটি কাজ সম্পন্ন করতে হয়

১. দিলের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৩০টি।
২. যবানের দ্বারা ৭টি।
৩. হাত-পা ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ৪০টি।

দিলের দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের মোট ৩০টি কাজের মধ্যে ৯টি আকাইদ, অবশিষ্ট ২১টি হলো দিলের আখলাক ও আমল।

দিলের দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের ৩০টি কাজ

১. আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনা।
২. আল্লাহ ব্যতীত বাকী সবকিছু ধ্বংসশীল ও তাঁর সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করা।
৩. ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনা।
৪. আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা।
৫. সমস্ত পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামগণের উপর ঈমান আনা।
৬. তাকদীরের উপর ঈমান আনা।
৭. কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনা।
৮. বেহেশতের উপর ঈমান আনা।
৯. দোযখের উপর ঈমান আনা।
১০. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মুহাব্বত ও ভক্তি রাখা।
১১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা রাখা।
১২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দুনিয়ার অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি মুহাব্বত রাখা।
১৩. ইখলাস অর্থাৎ যে কোনো কাজ একমাত্র আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে করা।

১৪. তাওবা করা।
১৫. 'খওফ' অর্থাৎ সবসময় অন্তরে আল্লাহ্ পাকের ভয় রাখা।
১৬. 'রজা' অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা রাখা।
১৭. 'হায়া' অর্থাৎ অন্যায় কাজে লজ্জাবোধ করা।
১৮. 'ছবর' অর্থাৎ বিপদে ধৈর্য ধরা।
১৯. 'শুকর' অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা আদায় করা।
২০. 'ওয়াদা' বা অঙ্গীকার রক্ষা করা।
২১. 'তাওয়াযু' অর্থাৎ নম্রতা অবলম্বন করা।
২২. সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া করা।
২৩. 'রেযা বিল কাযা' অর্থাৎ আল্লাহ্র ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা।
২৪. 'তাওয়াক্কুল' অর্থাৎ আল্লাহ্র উপর ভরসা করা।
২৫. 'খোদপসন্দী' তথা অহংকারী ভাব বর্জন করা।
২৬. 'কীনা' অর্থাৎ অন্যের প্রতি ঈর্ষা না রাখা।
২৭. 'হাসাদ' অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করা।
২৮. রাগ দমন করা।
২৯. কারও অকল্যাণের চিন্তা না করা।
৩০. দুনিয়ার মায়া-মুহাব্বত পরিত্যাগ করা। –ফুরুউল ঈমান, পৃষ্ঠা ৪

যবানের দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের ৭টি কাজ

১. কালিমায়ে তাইয়্যিবাহ পড়া।
২. কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা।
৩. দ্বীনী ইলম শিক্ষা গ্রহণ করা।
৪. দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া।
৫. দু'আ করা।
৬. যিকির করা।
৭. নাজায়েয ও অনর্থক কথা থেকে যবানকে বাঁচিয়ে রাখা।

শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পন্ন ঈমানের কাজ ৪০টি

এই কাজগুলো থেকে নিজেরই করতে হয় ১৬টি। নিজের লোকদের সঙ্গে করতে হয় ৬টি এবং অন্য জনসাধারণের সঙ্গে করতে হয় ১৮টি।

নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত ১৬টি কাজ

১. পবিত্রতা অর্জন করা।
২. নামায কায়েম করা।
৩. যাকাত আদায় করা।
৪. রোযা রাখা।
৫. হজ্ব ও উমরা করা, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয এবং সুন্নাত।
৬. ই'তিকাফ করা।
৭. ঈমান রক্ষার্থে প্রয়োজনে হিজরত করা।
৮. মান্নত মানলে তা আদায় করা।
৯. কসম করলে তা ঠিক রাখা।
১০. কাফফারা ওয়াজিব হলে তা আদায় করা।
১১. কুরবানী করা।
১২. মুসলমান মারা গেলে তার জানাযা ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।
১৩. ঋণ পরিশোধ করা।
১৪. হালাল পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা। নাজায়েয কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করা।
১৫. সত্য সাক্ষ্য দেয়া।
১৬. ছতর ঢাকা।

নিজের পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থদের সঙ্গে করণীয় ৬টি কাজ

১. বিবাহ করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা।
২. পরিবার ও অধীনস্থদের হক আদায় করা।
৩. পিতা-মাতার খেদমত করা এবং তাঁদেরকে কোনোরূপ কষ্ট না দেয়া।
৪. ছেলে-মেয়েদের লালন-পালন করা।
৫. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।
৬. চাকর মুনিবের আস্থাভাজন হওয়া।

জনসাধারণের সঙ্গে করণীয় ১৮টি কাজ

১. বিচার করতে হলে ন্যায়বিচার করা।
২. মুসলমানদের জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত থাকা।
৩. মুসলমান বাদশাহ'র হুকুম পালন করা।
৪. মানুষের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ থাকলে তা মিটিয়ে দেয়া।

৫. সৎকাজে সাহায্য করা।
৬. আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার (তথা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করা)।
৭. হদ (অপরাধের দণ্ড) কায়েম করা।
৮. জিহাদ করা।
৯. আমানত হুবহু তার হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়া।
১০. অভাবগ্রস্তকে ঋণ দেয়া।
১১. প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করা।
১২. মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।
১৩. অর্থের সদ্ব্যবহার করা (অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকা)।
১৪. সালামের উত্তর দেয়া।
১৫. হাঁচি দিয়ে যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে, তার জওয়াবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা।
১৬. অন্যের ক্ষতি না করা, কাউকে কষ্ট না দেয়া।
১৭. ক্রীড়া-কৌতুক, রং-তামাশা ও নাচ-গান থেকে দূরে থাকা।
১৮. রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস– যেমন ঢিলা, ইট, কাঁটা, আবর্জনা ইত্যাদিকে সরিয়ে দেয়া। –ফুরুউল ঈমান, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

উপরে ঈমানের (৭৭) সাতাত্তরটি শাখার বিবরণ দেয়া হলো। ঈমান রক্ষা করার জন্য এ-বিষয়গুলো রক্ষা করতে হবে। এর কোনো একটি না থাকলে ঐ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে হবে। অনুরূপভাবে ঈমান রক্ষা করার জন্য ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে অস্বীকার করলে ঈমান বিনষ্ট হবে। তাই ঈমানের জন্য গ্রহণীয় ও বর্জনীয় উভয় প্রকার বিষয়াদির প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখতে হবে।

আকাইদ

'আকীদা' শব্দের শাব্দিক অর্থ কোনো বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের পরিভাষায় আকীদার অর্থ দৃঢ়-মযবুত ঈমান, অকাট্য প্রমাণভিত্তিক খবরাখবর ও বিষয়াবলীর প্রতি মনের অটল বিশ্বাস। 'আকীদা' শব্দের বহুবচন হলো আকাইদ। আকাইদ, আকীদা, ই'তিকাদাত এসব আরবী শব্দ; এগুলোর অর্থ একই। অর্থাৎ মনের অটল বিশ্বাস। এই আকীদাই ঈমানের মূল। আকীদার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আনলেই মানুষ বেঈমান হয়ে যায় এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামী হতে

হয়। যার আকীদা ঠিক নেই তার কখনও মুক্তি নেই। পক্ষান্তরে যার আকীদা ঠিক থাকবে, অন্যান্য পাপের শাস্তি ভোগ করে সে মুক্তি পাবে।

অর্থ্যৎ, দ্বীনের যে সমস্ত কথা প্রত্যেক মুসলমানের উপর মানা জরুরী সেগুলোকে আকীদা বলে। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় আকীদা নিচে দেয়া হলো :

১. আল্লাহ্ তা'আলার যাত ও অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করা।
২. আল্লাহ্ তা'আলার সকল গুণ বিশ্বাস করা।
৩. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্তা ও গুণাবলীসহ এক ও অদ্বিতীয়—এ কথা বিশ্বাস করা।
৪. আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত হুকুম যেমন— নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদিকে অবশ্য পালনীয় মনে করা।
৫. সমস্ত ফেরেশতার ব্যাপারে বিশ্বাস করা, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার মাখলুক, নূরের তৈরি ও নিষ্পাপ। তাঁদের মধ্যে প্রধান চারজন হলেন— ক. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম, খ. হযরত মিকাঈল আলাইহিস সালাম, গ. হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস সালাম ঘ. হযরত আজরাঈল আলাইহিস সালাম ।
৬. হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলকে সত্য মনে করা।
৭. সকল নবী (আ.) গণকে মা'সূম অর্থাৎ নিষ্পাপ মনে করা।
৮. নবী (আ.) গণ মানুষ। তাঁরা ইলাহ নন, আল্লাহ্ তা'আলার পুত্র বা রূপান্তরও নন; বরং তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা ও প্রতিনিধি।
৯. নবী (আ.) গণ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী হুবহু উম্মতের কাছে পৌছিয়েছেন।
১০. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল।
১১. নবী (আ.) গণ কবরে জীবিত, আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রওযা শরীফে জীবিত আছেন।
১২. নবী (আ.) গণের মাধ্যমে যে সমস্ত মু'জেযা অর্থাৎ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে— সব সত্য বলে বিশ্বাস করা।
১৩. মি'রাজ বিশ্বাস করা।
১৪. সমস্ত আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করা।
১৫. সমস্ত আসমানী কিতাবকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী জ্ঞান করা।

১৬. আল্লাহ তা'আলা যেমন চিরন্তন, তাঁর বাণীও চিরন্তন, ক্ষণস্থায়ী নয়– এ-কথা বিশ্বাস করা।

১৭. সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআন মাজীদকে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব মনে করা।

১৮. সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে কুরআন মাজীদ হলো সর্বশেষ কিতাব, এরপর কোনো কিতাব অবতীর্ণ হবে না।

১৯. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদকে হেফাযত করার অঙ্গীকার করেছেন, তাই কুরআন মাজীদকে সর্বদা অবিকৃত মনে করা।

২০. সকল সাহাবীকে 'আদেল' অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা।

২১. সকল সাহাবীর (রাযি.) প্রতি মুহাব্বত, ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যতম শে'আর বা প্রতীক।

২২. সকল সাহাবায়ে কিরামকে (রাযি.) মর্তবার দিক দিয়ে ওলি-আউলিয়াদের ঊর্ধ্বে মনে করা।

২৩. সকল সাহাবীর (রাযি.) মধ্যে প্রধান চারজন হলেন, ক. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) খ. হযরত উমর ফারুক (রাযি.) গ. হযরত উসমান গনী (রাযি.) ঘ. হযরত আলী (রাযি.)।

২৪. সকল সাহাবীর (রাযি.) প্রতি আল্লাহ তা'আলার চির সন্তুষ্টি ও সুসংবাদকে বিশ্বাস করা।

২৫. আখেরাত বিশ্বাস করা।

২৬. কবরের সুওয়াল-জওয়াবকে বিশ্বাস করা।

২৭. কবরের আযাবকে বিশ্বাস করা।

২৮. হাশরের ময়দানে হাযির হওয়াকে বিশ্বাস করা।

২৯. আল্লাহ তা'আলার বিচার, হিসাব-নিকাশকে বিশ্বাস করা।

৩০. নেকী-বদির (ভালো-মন্দের) ওজন হওয়াকে বিশ্বাস করা।

৩১. আমলনামা-প্রাপ্তিকে বিশ্বাস করা।

৩২. হাউজে কাউসারকে বিশ্বাস করা।

৩৩. পুলসিরাতকে বিশ্বাস করা।

৩৪. শাফা'আতকে বিশ্বাস করা।

৩৫. জান্নাতকে বিশ্বাস করা।

৩৬. জাহান্নামকে বিশ্বাস করা।

৩৭. তাকদীরকে বিশ্বাস করা।

৩৮. আরশ ও কুরসীকে বিশ্বাস করা।

৩৯. আল্লাহ্ তা'আলার দিদারকে বিশ্বাস করা।
৪০. কেয়ামতের ছোট-বড় সকল আলামতকে বিশ্বাস করা।
৪১. হযরত ইমাম মাহ্দী আ.-এর আবির্ভাব বিশ্বাস করা।
৪২. হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন বিশ্বাস করা।
৪৩. দাজ্জালের ফিতনা ও তার আবির্ভাব বিশ্বাস করা।
৪৪. কেয়ামতের পূর্বে ইয়াজূজ-মাজূজ-এর আবির্ভাব বিশ্বাস করা।
৪৫. কেয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া বিশ্বাস করা।
৪৬. কেয়ামতের আগে দাব্বাতুল আরদ (মাটির নিচ থেকে অদ্ভুত ধরনের এক জীব)-এর আবির্ভাব বিশ্বাস করা।
৪৭. জ্বীনজাতি আগুনের তৈরি, তারা আল্লাহ্ তা'আলার মাখলুক, তারা গায়েব জানে না— এ-কথা বিশ্বাস করা।
৪৮. সুন্নাতের অনুসারী বুর্যূগানে দ্বীনের কাশফ, কারামত ও ইলহামকে বিশ্বাস করা।
৪৯. পীর, ফকীর, মাযার ইত্যাদিকে সিজদা করা হারাম বলে বিশ্বাস করা।
৫০. ঈসালে সওয়াব ও নেক বান্দাদের ওসীলাকে সহীহ্ মনে করা।
৫১. প্রসিদ্ধ চার মাযহাব ও চার তরীকাকে সুন্নাত মোয়াফেক মনে করা।

–আহকামে যিন্দেগী ১ম অধ্যায়

ইহ্তিসাব (দ্বীনের প্রাণবস্তু)

ইহ্তিসাব অর্থ যে কোনো আমল, ইবাদত বা কাজ করার সময় আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদাসমূহকে অন্তরে একীনের সঙ্গে চোখের সামনে উপস্থিত রাখা এবং ওয়াদাকৃত পুরস্কারসমূহ পাওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমলে মশগুল হওয়া। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আমল ও ইবাদতের সঙ্গে ঈমান-ইহ্তিসাবের বিষয়টি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ, যে ঈমানের সঙ্গে (খাঁটিভাবে) সওয়াবের নিয়্যতে রমযান মাসের রোযা রাখবে তার অতীতের গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

–সহীহ্ বুখারী, ঈমান অধ্যায়, খ. ১, হাদীস নং ৩৭

যেহেতু দ্বীনের প্রাণবস্তু হলো ঈমান ও ইহতিসাব, কাজেই দ্বীনী কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে। এই প্রাণবস্তু হাসিলের ক্ষেত্রে কুতুবুল আলম মুজাদ্দিদে দ্বীন হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর কতিপয় মূল্যবান হেদায়াত প্রণিধানযোগ্য।

বস্তুত ঈমান ও ইহতিসাব নামক এ দু'টি বিষয় সমস্ত আমলের রূহ বা আত্মাস্বরূপ। এর দ্বারাই আমলের মূল্যায়ন হয়। আমলের মধ্যে ওজনও এর দ্বারাই পয়দা হয় এবং এর সংশ্লিষ্টতায় মানুষ উন্নতির চরম শিখর আরশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর শুধু এতটুকু বিষয়ের অভাব ও শূন্যতার কারণে বড় বড় আমলও উপরে উঠার ক্ষমতা রাখে না। সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) জীবনী ও ইতিহাস পাঠ করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, পরবর্তী উম্মতদের তুলনায় তাঁরা ঈমান ও ইহতিসাবের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য তাঁদের আমলের ওজনকে অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। বাহ্যিক আমল ও ইবাদত হয়তো পরবর্তীগণের কারো কারো ক্ষেত্রে অনেক বেশি হতে পারে। কিন্তু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সোহবত ও সাহচর্যের বরকতে তাঁদের একীন নেহায়েত গভীরতায় পৌঁছেছিলো। ফলে ঈমান ও ইহতিসাব তাঁদের অন্তরঙ্গ ও মজ্জাগত বিষয়ে পরিণত হওয়ায় স্বভাবত তাঁদের আমল ও ইবাদতের ওজন অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উলামায়ে কিরাম বলেছেন, অন্যদের উপর সাহাবা আজমাঈনগণের ফযীলত ও প্রাধান্য অধিক পরিমাণ আমল ও ইবাদতের জন্যে নয়; বরং অধিক সওয়াব ও মাকবূলিয়্যতের কারণে। যেমন হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ পাকের কসম তাঁরা অধিক পরিমাণে নামায রোযা করতেন না। কিন্তু একটি বিষয় তাঁদের অন্তরে গেঁথে গিয়েছিলো। নিঃসন্দেহে বলা যায় সেটি ছিলো ঈমান ও ইহতিসাব।

ইসলাম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।

-সূরা বাকারা : ২০৮

ইসলাম একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে কারো সামনে মস্তক অবনত করা। অর্থাৎ কোনো বড় শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে নিজেকে তার তাবেদার বানিয়ে নেয়া। তাহলে ঈমানদারকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান

করার অর্থ হলো, শুধু মুখে কালিমায়ে তাইয়্যিবা পড়ে নেয়া, আল্লাহ পাককে এক জানা, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল বলে স্বীকার করা এবং আখেরাতকে সত্য মনে করাই ইসলামে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সমস্ত জরুরী আকাইদ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষার সামনে বিলীন করে দেবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না।

ঈমান ইসলামের ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। আমরা মুখে বলি আমরা মুসলমান। খোদা, রাসূল ও কিয়ামতের উপর আমাদের অটল অবিচল বিশ্বাস আছে। কুরআন, হাদীস আমরা বিশ্বাস করি এবং মানি। কিন্তু চিন্তা করে দেখি না যে, ঈমানের অর্থ মুসলমানির অর্থ এবং মানার অর্থ শুধু মতামত গুলি মানা নয় বরং অক্ষরে অক্ষরে সবগুলি মেনে নেয়া, তদানুযায়ী কাজ করা। কিছু মানলাম কিছু মানলাম না, একে ঈমান বলে না। ইসলামও বলা চলে না।

পূর্ববর্তী ইয়াহুদ-নাসারাগণ কিছু মানত, আর কিছু মানত না। তাদেরকে কুরআনের ভাষায় এইরূপ ধমকি দেওয়া হয়েছে–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

''তবে কি তোমরা কিতাবের কতক মান আর কতক মান না?'' (এইরূপ মুসলমান হতে চাও?) –সূরা বাকারা : ৮৫

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।' অর্থাৎ দ্বীনে মুকাদ্দাসের কোনো একটি শাখা অথবা কতগুলো শাখা আঁকড়ে ধরলেই পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়া যায় না; বরং ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, রাষ্ট্র পরিচালনার রীতি-নীতি, সমাজনীতি, আখলাক-চরিত্রসহ মানবজীবনের সকল পর্যায়ে আহকামে ইলাহিয়া এবং সুন্নাতে নববিয়্যার ছায়াতলে এলেই পূর্ণ মুসলিম হওয়া যায়। সুতরাং সে ব্যক্তি মুসলমান, যে মসজিদেও মুসলমান, বাজারেও মুসলমান, কর্মক্ষেত্রে, গৃহে এবং পরিবারের মধ্যেও মুসলমান, সে মুসলমান বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও। –ইসলামী জিন্দেগী : পৃ. ১০৪

ইসলামের পাঁচটি শাখা

আল্লাহ তা'আলা দ্বীনে ইসলাম-এর বিধি-বিধানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। এ পাঁচটি শাখা মিলেই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম।

১. আকাইদ : ঈমান-আকীদা তথা ধর্মীয় বিশ্বাস ঠিক করা এবং কুফর, শির্ক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা।

২. ইবাদত : নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতসহ সকল ইবাদতের পাবন্দ হওয়া।

৩. মু'আমালাত : তথা পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেন। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার, বিয়ে, তালাক ইত্যাদি মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা মোতাবেক হওয়া। নাজায়েয বা হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন ও খরচ না করা।

৪. মুআ'শারাত : পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিকতা, একে অন্যের সঙ্গে মেলামেশা, উঠা-বসা এবং একত্রে থাকার রীতি-নীতি ও বান্দার হকের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যে সকল আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন, সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা এবং হুকূকুল ইবাদ নষ্ট করা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

৫. আখলাক অথবা আত্মশুদ্ধি : অভ্যন্তরীণ চরিত্র, চিন্তা-চেতনা ঠিক করা এবং খাঁটি রূহানী চিকিৎসক আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের মাধ্যমে লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, গীবত, কু-দৃষ্টিসহ অন্তরের ১০টি রোগের সংশোধন করা এবং ১০টি সৎ গুণ দ্বারা অন্তরকে উজ্জীবিত করা। যেমন ইখলাস, বিনয়, ছবর, শোকর ইত্যাদি।

ফলকথা, দ্বীনের বিধি-বিধানের শাখা বা অংশ পাঁচটি আর এই পাঁচের সমন্বিতস্বরূপ বা সমষ্টির নাম দ্বীন। যদি কোনো মানুষের মধ্যে এই পাঁচটির মধ্য থেকে কোনো একটিও কম থাকে, তবে তা নাকেস বা অপূর্ণ দ্বীন।

দ্বীনী ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় দ্বীনের পরিপূর্ণ মেহনত

পরিপূর্ণ দ্বীন পাঁচটি বিষয়ের সমষ্টি।

১) ঈমান-আকাইদ, ২) ইবাদত-বন্দেগী, ৩) মু'আমালাত ৪) মুআশারাত ৫) আত্মশুদ্ধি

আহকামে শরীয়তের এই পাঁচটি বিষয়কে সামনে নিয়ে আমাদের আকাবিরে দ্বীন কর্তৃক বাতানো তরীকায় নিম্নোক্ত তিন ক্ষেত্রে মেহনত করতে হবে।

১. তাবলীগ তথা 'উভয় জগতের কামিয়াবীর একমাত্র রাস্তা দ্বীনের উপর চলা', একথা বুঝিয়ে সর্বসাধারণকে দ্বীনের উপর চলতে উৎসাহিত করা।

২. তা'লীম তথা ইসলামের আদর্শ, নীতিমালা ও হুকুম-আহকাম নিজে শিক্ষা করা ও অপরকে শিক্ষা দান করা।

৩. আত্মশুদ্ধি তথা আহলুল্লাহ বুর্যূর্গানে দ্বীনের সোহবতে গিয়ে জাহের ও বাতেনের আমল ঠিক করা। আর একজন মুমিনকে পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ মুমিন হওয়ার জন্য তৃতীয় বিষয়টি হাসিল করা সবচেয়ে বেশি জরুরী।

মানব জাতির মুক্তি ও কামিয়াবী সূরাতুল আসরের ৪ মূলনীতির আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক

সূরাতুল আসরে যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ○ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○

এই সূরাটি এমন অর্থপূর্ণ সূরা যার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মানুষ শুধু এ সূরাটিকেই গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে এবং এর মর্ম বুঝে সেমতে আমল করলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা যমানার কসম করে বলেছেন, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। ১. ঈমান গ্রহণ করা, ২.আমলে সালেহ তথা সৎকর্ম সম্পাদন করা, ৩. অপরকে সত্যের উপদেশ দান করা, ৪. অন্যদের সবরের উপদেশ দান করা।

দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা-উপকার লাভ করার চার বিষয়সম্বলিত এ-ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় অপর মুসলমানদের হেদায়াত ও সংশোধন বিষয়ক। সারকথা হলো বর্ণিত সূরায় দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে–

১. সালাহ্ অর্থাৎ নিজের সার্বিক মঙ্গলের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন।

২. ইসলাহ অর্থাৎ অপরের সার্বিক সংশোধনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে অন্যের আত্মশুদ্ধি সাধন।

সালাহ এর মাঝে আবার দুটি জিনিস রয়েছে, ১. ঈমান, ২. আমলে সালেহ। আর ইসলাহের মধ্যে রয়েছে আরো দুটি বিষয়-১. তাওয়াসী বিল হক ২. তাওয়াসী বিসসবর।

প্রথমত : সহীহ ঈমান ও আকাইদ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা

মুমিনের জীবনে ঈমান সবচে মূল্যবান সম্পদ। ঈমানকে সুদৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরী। কারণ ঈমান ঠিক না করে সারা জীবন ইবাদত করলেও লাভ হবে না। ঈমানের মৌলিক ছয়টি বিষয়ের সঙ্গে ঈমানের ৭৭টি শাখার পূর্ণজ্ঞান এবং সহীহ আকীদা-বিশ্বাসে অটল-অবিচল থাকতে হবে। এভাবে নিজের যাহের ও বাতেনকে সংশোধন করে পরিপূর্ণ আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে হবে। যা মূলত: ঈমানেরই অংশ বিশেষ। যাতে ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঈমান রক্ষা করা সহজ হয়। হাদীস শরীফে আছে, (ফিতনার যামানায়) অনেক মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকেলে হয়ে যাবে কাফের। (নাউযুবিল্লাহ) -জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২১৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮

দ্বিতীয়ত : আমালে সালেহা অর্থাৎ নেক আমল করা

জাহের-বাতেনের আমলগুলো দুরস্ত করা অর্থাৎ সকল কাজে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ করা। আমলে সালেহ-এর মানদণ্ড হচ্ছে সুন্নাত। আমলে সালেহ শুধু মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কার্যকলাপের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। দেহ ও আত্মার সমষ্টির নাম মানুষ। ইসলাম যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ও পরিপূর্ণ জীবনদর্শন, এজন্য উভয়বিধ বিষয়ে শরীয়তের আহকাম-বিধানাবলী রয়েছে। কুরআন ও হাদীসে মানুষের সংশোধন ও সফলতা বিষয়ের উপর সুনির্ধারিত বিধান রয়েছে। এ মর্মে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'তোমরা যাহেরী ও বাতেনী সর্বপ্রকার গুনাহ পরিত্যাগ কর।'

-সূরা আনআম: ১২০

যাহেরকে দুরস্ত করার অর্থ উযূ, নামায, রোযা, আযান, ইকামত ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী যেগুলো প্রকাশ্যভাবে করা হয় এবং করা জরুরী সে আমলগুলো সুন্নাত মোতাবেক করা।

দিলের মধ্যে খাঁটিভাবে ইসলামের আকীদা পোষণ করা। অন্তরের রোগসমূহ যেমন: রিয়া, হাসাদ, অহঙ্কার, নামযশ কামনা ইত্যাদি আরো যে সমস্ত রোগ আছে সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং ইসলাহ করা। অন্তরের সৎ গুণ তথা ইখলাস, সবর, মহান আল্লাহ ও আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত, আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি ইত্যাদি সৎ গুণাবলীর দ্বারা অন্তরকে

আলোকিত করা। আর এই দুটি বিষয়ে আমলের পাবন্দি তখনই সম্ভব হবে যখন কোনো শাইখে কামেলের সোহবতে তরবীয়্যত গ্রহণ করা হবে, এটাই ইসলাহে জাহের-বাতেনের ক্ষেত্রে সুন্নাতুল্লাহ ও সুন্নাতে সাহাবা। সারকথা সুন্নাতের অনুসরণে মুসলমান যে কাজ করবে তা হবে ইবাদত। আর এরই নাম আমলে সালেহা।আর সুন্নাতের অনুসরণে ইখলাসের সঙ্গে ইবাদত করলে পরেই আল্লাহ পাকের দরবারে তা মকবূল হওয়ার আশা করা যাবে অন্যথায় নয়।

কুরআন সুন্নাহর মধ্যে মানুষের বাহ্যিক সূরত শেকেল ও মুআমালা-মুআশারা এবং বাতেনী আকীদা ও আখলাক সবকিছুর সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা রয়েছে। উম্মতের মধ্যে সাহাবা (রাযি.) ও তাবেঈ (রহ.) গণ থেকে বর্তমান যুগের বিশিষ্ট নেককার ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত যে যতটুকু পূর্ণতা লাভ করেছেন, তা শুধুমাত্র কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত আমল পরিপূর্ণ রূপে মানার দ্বারাই হয়েছে। তারা সেভাবে নামায রোযা, হজ্জ, যাকাতের অনুগামী ছিলেন। তেমনিভাবে বাতেনী আমলে অর্থ্যাৎ, সিদক, ইখলাস তাওহীদ, তাওয়াযু, সবর- শোকর, তাওয়াক্কুল, যুহুদ ইত্যাদি বাতেনী আমলের মধ্যেও পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন। তারা যেভাবে মিথ্যা, গীবত, ধোকা, চুরি, ব্যভীচারী, নির্লজ্জতা ইত্যাদি গোনাহকে ভয় করতেন এবং তা থেকে বেঁচে থাকতেন ঠিক একইভাবে অহংকার, রিয়া, হিংসা, পদলিপ্সা, ধনলিপ্সা, লোভ, কার্পণ্য ইত্যাদি বাতেনী গোনাহসমূহকে হারাম জানতেন এবং তা থেকে বাঁচার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমানে দ্বীন ও দ্বীনী ইলম সম্পর্কে একটি সীমাবদ্ধ চিন্তা ফিকির ও দ্বীনের সকল বিষয়ের মেহনতের মধ্যে এক বিরাট উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে ইলমে তাসাউফের চর্চা যার সম্পর্ক মানুষের বাতেনী আমল সংশোধনের সঙ্গে তা এমনই পরিত্যক্ত হয়েছে যে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা ইল্লা মা-শা-আল্লাহ আলেমগণের অধিকসংখ্যক এর থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে। শুধু আমল সম্পাদনের মতো দ্বীনকে সীমাবদ্ধ মনে করা হচ্ছে। শুধু পরিভাষাগত শব্দ যেমন সিদক, ইখলাস, তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, সবর, শোকর, কানা'আত, যুহুদ, তাকওয়া ইত্যাদি শুধু মুখে মুখেই উচ্চারিত করছে পক্ষান্তরে অহংকার, হিংসা, হুব্বে মাল, হুব্বেজাহ রিয়া ইত্যাদি হারাম ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধিসমূহ থেকে মুক্তিলাভের চিন্তাও অন্তর থেকে মিটে গেছে। অথচ আত্মশুদ্ধির মূল কথাই হলো, শরীয়তের জাহের বাতেনের পূর্ণাঙ্গ বিধি বিধানের উপর আমল করা। ইতিহাস সাক্ষি যে দুনিয়াতে শুধু ঐ সমস্ত মনিষীগণের তা'লীম, তাবলীগ, ইসলাহ ও তারবীয়্যতের রীতি ও ধারা স্থায়ীত্ব লাভ করেছে, যাদের মধ্যে উভয়টির পরিশুদ্ধি ছিল। অন্যথায় বিভিন্ন যুগের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিগণের অনেক ধরনের গবেষণা ও চিন্তাধারা পেশ

করেছেন কিন্তু বর্তমানে তার নাম নিশানাও চোখে পড়ে না। মোদ্দা কথা আমলে সালেহ বলতে জাহের-বাতেন উভয়কে দুরস্ত করাকেই বুঝায়। দ্বিতীয়ত : উক্ত সূরায় প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্বে প্রথমত নিজের ঈমান-আমল দুরস্ত করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একই সাথে সাধ্যনুযায়ী অন্য মুসলমানকে ইলম ও আমলের দিকে আহ্বান করাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু নিজের আমল ঠিক করাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশেষতঃ নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বদ আমলের ব্যাপারে গাফেল হওয়া অনিবার্য ফল হলো, নিজের নাজাতের পথ বন্ধ করা। চাই যত আমলকারী হোক না কেন। কুরআনে পাকের আয়াতে কারীমায় প্রত্যেক মুসলমানের উপর যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক যেমনিভাবে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে ইলম ও আমলে সালেহ অর্জন করার হুকুম দিয়েছেন, তেমনিভাবে অন্যকে সৎ বানানো বা অন্যের ইসলাহের জন্য প্রচেষ্টা চালানোরও ফিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসের কিতাব তিরমিযী, ইবনে মাযাহ সহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবের বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ; তোমরা হয় আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার করতে থাকবে, না হয় অচিরেই গোনাহগারদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আযাব পাঠিয়ে দিবেন। তখন তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল হবে না।

দাওয়াতের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা

কুরআন পাকে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

যার অর্থ হচ্ছে, 'হে ঈমানদারগণ! নিজকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে দোযখ হতে বাঁচাও।' -সূরা তাহরীম : ৬

ইহার তাফসীরে হযরত আলী (রাযি.) বলেন, পরিবারবর্গকে দোযখ হতে বাঁচাও। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদিগকে ধর্ম বিষয় শিক্ষা দেয়া ফরয। অন্যথায় পরিণাম ফল দোযখ। -তারগীব।

যদি পরিবারের সকল লোক একই পথের অনুসারী না হয় তাহলে একারপক্ষে তাকে দ্বীনের উপর অটল অবিচল রাখা কঠিন। পুরো পরিবারে যদি একজন নামায রোযার পাবন্দ হয় তখন পাকা নামাযী হলেও তাকে অনেক প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়।

হযরত ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার স্ত্রী, সন্তানদেরকে হালাল-হারামসহ শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া এবং সে অনুযায়ী তাদেরকে আমল করানোর চেষ্টা করা ফরয। অপর এক হাদীসে এসেছে– কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আযাব তাদের হবে, যাদের পরিবার-পরিজন দ্বীনের বিষয়ে জাহেল ও গাফেল ছিল।

–রুহুল মাআনী

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

অর্থ : 'আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন।'

–সূরা শু'আরা : ২১৪

এই আয়াতের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁর বংশের লোকদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত : তাওয়াসী বিল হক, চতুর্থত : তাওয়াসী বিসসবর।

অর্থাৎ উম্মতকে সত্যের পথে আহবান করা এবং তাদেরকে কষ্টক্লেশ ও বিপদ আপদের সময় ধৈর্যের উপদেশ দান করা এবং এভাবে তাদের ইসলাহ করা। তথা আত্মীক ও মানসিক ভাবে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালনো। আর এ দুটির সম্পর্ক হচ্ছে অন্যের সঙ্গে। ইসলাহ বলা হয় অন্যকে নেক ও ভালো বানানোর চেষ্টা করাকে। অপরকে ঈমান ও আমলে সালেহের জন্য উৎসাহিত করা এবং তার জন্য চেষ্টা করা। সালাহ এবং ইসলাহ হলো দুটি বুনিয়াদি কাজ। যা প্রত্যেকের জন্য সাধ্যানুযায়ী করা জরুরী। যারা কাজ দুটি করেন এবং-এর জন্য ফিকির রাখেন, মেহনত করেন, তারাই কামিয়াব। তারাই ক্ষতি ও লোকসানমুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা বাঞ্ছনীয় যারা (অন্যান্য

লোকদেরকে) মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে। নেক কাজ করার জন্য বলবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। এরাই পুরোপুরি সফল হবে।"

—আ-লেইমরান : ১০৪

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

ভালো কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাক।

—সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০০৪

হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.) বলেন, "যেভাবে আমর বিল মারূফ বা সৎকাজের আদেশ-এর দ্বারা বিভিন্ন পন্থায় কাজ হচ্ছে অনুরূপভাবে নাহী আনিল মুনকার বা অসৎ কাজে বাধা প্রদানের ব্যাপারেও গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। উভয়টি ফরযে কেফায়া।" ইদানিং অন্যায় কাজে বাঁধা না দেওয়ার কারণে অন্যায় দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এ উম্মতের জিম্মাদারী ও দায়িত্ব। ভালো কাজের প্রসার যেমন ভাবে ফরযে কিফায়াহ। তেমনিভাবে মন্দ কাজের সংশোধন করাও ফরজে কিফায়াহ। ভালো কাজের উপর তো মা-শা-আল্লাহ বেশ মেহনত হচ্ছে কিন্তু মন্দ কাজে বাধা প্রদানকারী জামাআত খুব কমই নযরে পরে। আজকাল এ কাজ খুব কমই হচ্ছে। এটার জন্য স্বতন্ত্র জামাআত থাকা অপরিহার্য।

আল্লাহ পাক যেভাবে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়াকে ঈমান ও আমলে সালেহ-এর উপর মওকূফ করেছেন, তেমনি হক ও সবরের ব্যাপারে পারস্পরিক দাওয়াত, ফরমায়েশ ও তাগাদা প্রদানের উপর ক্ষতি থেকে বাঁচাকে মওকূফ করেছেন।

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ এর অর্থ—সহীহ ঈমান ও আমালে সালেহের সমষ্টি। আর সবর হচ্ছে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি। ইবাদতে অটল থাকা, যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।

উক্ত আয়াতে দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। ১. তাওয়াসি বিলহক ২. তাওয়াসি বিস্সবর। তাওয়াসি বিলহক বলা হয় একে অন্যকে হকের অসিয়্যত করা। হকের তাবলীগ করা। দ্বিতীয় বিষয় হলো তাওয়াসি বিসসবর। এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমল। আর "সবর"-এর সংজ্ঞা নফস বা প্রবৃত্তিকে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয় ও কর্ম হতে অবদমিত রাখা।

ইবাদতে সবর অর্থাৎ ইস্তেকামাত, গুনাহ থেকে হিম্মত করে বেঁচে থাকা অর্থাৎ সংযম করা, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা।

আজ উম্মত সালাহ ও ইসলাহের দুটি বুনিয়াদি কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের দ্বীন মাযহাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, আজ মুসলমানদের আমল-আখলাক খারাপ হয়ে যাওয়ার দরূন যাহেরী, বাতেনী তথা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অধঃপতন চরমে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন রকম বালা-মসীবত পরিবেষ্টিত হয়ে তাদেরকে একের পর এক ফিতনা-ফাসাদ ঘিরে ধরেছে। যদি এর প্রতিকারের আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে প্রবল আশঙ্কা করা হচ্ছে, (আল্লাহ না করুন) মুসলিমজাতিসত্তাই হুমকির সম্মুখীন হবে। এ মুহূর্তে এ সঙ্কট নিরসনে সকলেরই সজাগ হওয়া সময়ের বড় দাবি। মুসলিমজাতির এ যুগসন্ধিক্ষণে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সফলতা এবং সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য উক্ত সূরার চারটি বিষয় সম্বলিত এ খোদায়ী ব্যবস্থাপত্রের আলোকেই আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। উম্মাহর প্রত্যেক মুমিনই যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বান্দা, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত তাই তাদের যিম্মায় চারটি কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়া ফরয। একেই কুরআনে পাকে আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার আখ্যায়িত করা হয়েছে। উম্মতে মুসলিমার দায়িত্বে আরোপিত উভয়বিদ কাজ অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ যথাযথ পালন করলে, উম্মাহ'র সামগ্রিক জীবনে সফলতা আসবে।

প্রতিবেশীর হক হলো তাঁদেরকে দ্বীন শিখানো, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ অন্যথায় শাস্তি অনিবার্য

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওয়ায করেন এবং মুসলমানদের কয়েকটি জামাআতের প্রশংসা করেন। অতঃপর বলেন– "ঐ সব লোকের কী অবস্থা যারা নিজেদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের কথা বুঝায় না, দ্বীন শিখায় না, উপদেশও দেয় না, সৎকাজেরও আদেশ করে না, অসৎকাজেও বাঁধা দেয় না!! আর ঐসব লোকের কী হালত যারা নিজেদের প্রতিবেশীদের থেকে দ্বীনের কথা শিখে না, বুঝে না, উপদেশ গ্রহণ করে না!! আল্লাহর কসম! হয়ত সকলেই নিজ নিজ প্রতিবেশীদের অবশ্য অবশ্যই দ্বীন শিখাবে, দ্বীনের কথা বুঝাবে, উপদেশ প্রদান করবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন অবশ্য অবশ্যই নিজ প্রতিবেশীদের থেকে দ্বীন শিক্ষা করে, দ্বীনের কথা বুঝে, উপদেশ মান্য করে। নতুবা আমি অতি

অবশ্যই এদের সকলের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবো।" অতঃপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নিচে নেমে গেলেন।-তাবারানী, কাবীর

ফায়েদা ঃ এ হাদীসে প্রতিবেশীদের প্রতি যে দ্বীনী দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, আলেম সমাজ শরীয়ত নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে থেকে মহল্লাবাসীদেরকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করবে। আর যেসব ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় দ্বীনী ইলম নেই তারা আলেমদের নিকট থেকে দ্বীনী বিষয়সমূহ অর্জন করতে লজ্জাবোধ করবে না। নতুবা ভীষণ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। বুঝা গেল দুনিয়াবী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যেরকম একে অন্যের সহযোগিতা কামনা করে, অনুরূপভাবে দ্বীনী ক্ষেত্রেও সহযোগিতা নিবে। দ্বীনী ক্ষেত্রে এ সহযোগিতা দুনিয়াবী সহযোগিতার তুলনায় অনেক বেশি জরুরী।

সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝা গেল যে, যেমনিভাবে মহল্লার কেউ শারীরিক কোনো ক্ষতির শিকার হলে তাকে সাহায্য করা হয়, অনুরূপভাবে যখন কেউ দ্বীনী দিক দিয়ে কোনো ক্ষতির শিকার হবে, তখন সাধ্যানুযায়ী তাকেও সহযোগিতা করতে হবে।

আহকামে তাবলীগের অনুসরণে দাওয়াতী মেহনত করতে হবে

বর্তমানে মা-শা-আল্লাহ দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, দ্বীনী মেহনতের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক বেশি হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমাদের অবস্থার সংশোধন, দ্বীনী উন্নতি সে তুলনায় কতোটুকু হচ্ছে? উম্মতের প্রকৃত চিকিৎসক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কী রোগ সাব্যস্ত করেছেন এবং সেসব রোগের জন্য কী চিকিৎসা বাতলে দিয়েছেন? সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করা হচ্ছে? যা রোগ বৃদ্ধির কারণ অর্থাৎ যে কারণে রোগ দেখা দিয়েছে তাই প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দ্বীন ও দ্বীনের আহকামকে উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া চিন্তাধারার মাধ্যমে দ্বীনের উন্নতি কামনা করা হচ্ছে। নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ অসৎ কাজে বাধা প্রদান যদি সঠিক মূলনীতির আলোকে হয়, তাহলে সেখানে ফিৎনা-ফাসাদের কোনো আশঙ্কা থাকে না। উসূলের খেলাফ করে ভুল পন্থায় কাজ করলেই তখন ফাসাদ দেখা দেয়। তাছাড়া এই নাহি আনিল মুনকার যদি বাস্তবেই মুশকিল কাজ হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনও আমাদেরকে এ-ব্যাপারে হুকুম করতেন না। শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, তিনটি হক যদি এক সঙ্গে পাওয়া যায়, তাহলে কখনো তা ফিৎনার কারণ হবে না।

১. হক কাজ

২. হক পদ্ধতি

৩. হক নিয়্যত

মুসলিম জাতির অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য যেখানে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দুটি বিষয় শর্ত করে দেয়া হয়েছে সে বিষয় দুটি সেখানে বর্তমানে চরমভাবে উপেক্ষিত।

মুহিউস সুন্নাহ হযরতওয়ালা হারদূঈ (রহ.) এ-প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শেরগুলো তুলে ধরেন–

تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لئے
تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لئے
وعدۂ غلبہ ہے مومن کیلئے قرآن میں
پھر جو تو غالب نہیں کچہ ہے کسر ایمان میں

জন্ম তোমার এই ধরাতে মুখ লুকোবার জন্য নয়,
দাও জাগিয়ে তাদের যারা গভীর ঘুমে মগ্ন রয়।
মুমিন তরে বিজয় বার্তা পাক কুরআনের ঘোষণা
এরপরেও হারলে তুমি বুঝবে ঈমান কামেল না।

দ্বীনের উন্নতি সাধন ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত যিন্দা করার উদ্দেশ্যে ওয়ায-নসীহত করা

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا

অর্থাৎ- তোমরা তাদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চায় না। -সূরা ইয়াসিন- ২১

হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) বলেন, ইদানীং ওয়ায করে টাকা-পয়সা নেয়া হয়, এতে ওয়াযের কার্যকারিতা ও প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরামের (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম) তরীকায় ওয়ায নসীহত করতে হবে। যেন শ্রোতা এবং বক্তার পরিপূর্ণ ফায়দা হয়। সুতরাং উলামায়ে কিরামের উচিত ওয়াযের দাওয়াতের অপেক্ষায় বসে না থেকে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন

মসজিদে, সমাবেশে গিয়ে সামান্য সময়ের জন্য হলেও দ্বীনের কথা বলতে থাকা এবং গাফেল দুনিয়াদারের অন্তরে দ্বীনের তলব পয়দা করা।

উপস্থিত শ্রোতাগণের দ্বীনী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে

যাদের ঈমান-আকীদা, উযূ, নামায, খাওয়া-দাওয়ার জরুরী মাসআলা-মাসায়েল ও সুন্নাত জানা নেই তাদের সামনে শুধু মারিফাত আর সূক্ষ্ম দর্শনের কথা বলে কী লাভ? তাদেরকে আগে দ্বীনের জরুরী বিষয় শেখাতে হবে তারপর অন্য কিছু। হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলতেন, তোমরা মসজিদ এবং মাদরাসাকে সুন্নী বানাও। অর্থাৎ এই দুই স্থানে সুন্নাত জারী কর। তাহলে পুরো এলাকায় সুন্নাত জারী হবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমানে দ্বীনের এই দুই মারকাযে সুন্নাতের আলোচনা ও চর্চা কম থাকার কারণে মুসলিম জনসাধারণ থেকেও অনেক সুন্নাত ছুটে গেছে। যদি সমাজের মানুষকে সহীহভাবে সুন্নাতের তা'লীম দেয়া হয় এবং তার উপর পাবন্দীর সঙ্গে আমল করা হয়, তাহলে সমাজে প্রচলিত বিদ'আতী কর্মকাণ্ড, মুনকারাত আপনা আপনি খতম হয়ে যাবে। বৃষ্টির পানিতে যেমন নালা পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি সুন্নাতের উপর আমলের দ্বারা সমাজ থেকে সমস্ত গুনাহ-এর কাজ বিদূরিত হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, দ্বীনী বিবর্তন বর্তমানে যদি এভাবে পরিমাপ করা যায়— শরীয়তের বিধি-নিষেধের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব হাতে নিয়ে মুসলমানদের দ্বীনী পরিবর্তনের একটি চিত্র একেকজন উম্মতের মাঝে দেখতে থাকুন, মিলাতে থাকুন বিস্ময় ও তাজ্জব হবেন মুসলমানদের জিন্দেগির সঙ্গে দ্বীনের আহকাম ও বিধি-নিষেধের কতটুকু সম্পর্ক বিরাজমান। দ্বীনের শাখাসমূহে যেমন, আকাইদ বিশ্বাসে কি পরিমাণ ত্রুটি! নামায, রোযা কি পরিমাণ বর্জন করে নিজকে মুসলমান ভাবছে, উম্মতের কত সংখ্যক এখন নামায রোযার কোনো ফিকিরই করে না, বিবাহ-তালাকের বিষয়টি দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার পরও ইসলামের বিধান এ দ্বীনী বিষয়টিতে চরমভাবে উপেক্ষিত। বিজাতীয় তরীকা গ্রহণ করার এ যেন সীমাহীন প্রতিযোগিতা।

যা হোক পয়লা শাখা আকাইদে মূল অবস্থান থেকে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ মূল বিষয় নামায, রোযাকে অধিকাংশই বর্জন ও উপেক্ষা করে চলছে। মুয়ামালাত, মুয়াশারাত ও আখলাক দ্বীনের তিনটি শাখায় সাধারণ মুসলমানতো অজ্ঞতার কারণে এগুলোকে দ্বীনের শাখাই মনে করছে না। এ তিন শাখায় বিবর্তন

ও বিবর্জন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বরং সেগুলোকে নিছক পার্থিব (দুনিয়াবী) ব্যাপার মনে করে নিজেদের খেয়াল খুশীমতো তা করে যাচ্ছে। এ সকলক্ষেত্রে শরীয়তের বিধানের বিকল্প নিজস্ব বিধান তৈরি করে নিয়েছে। আল্লাহর শরীয়তের মুকাবেলায় নিজেদের পসন্দমতো এক শরীয়ত বানিয়ে নিয়েছে। (নাউযুবিল্লাহ)

এ বিবর্তন আসলে খুবই মারাত্মক বিচ্যুতি। পয়লা দুটোর বিবর্তনে দ্বীনকে সমূলে বাতিল করা হয়নি, কিন্তু বিকৃত বা বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু তিন নম্বর শাখায় দ্বীনকে, দ্বীনের আহকামকে বা-দস্তুর বাতিল করে নতুন দ্বীন কায়েম করা হয়েছে। অথচ মানব জীবনে এ তিন ক্ষেত্র সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও প্রকাশ্য-দৃশ্যমান বিষয়। যখন কোনো অনুসন্ধানী উম্মতের মাঝে দ্বীনী আহকামের বিষয়গুলোকে পরিপূর্ণ অসামাঞ্জস্য অর্থাৎ পুরো উল্টো অথচ নিজকে উম্মতে মুহাম্মাদী বলে দাবী করছে। পরিমাপকারী বিস্মিত ও আক্ষেপের সঙ্গে বলবে "ইয়া আল্লাহ! এরা কোন্ বিষয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একমত? এরা কি করে উম্মতে মুহাম্মদী দাবি করছে। হে মুসলমান! এখনও কি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সর্তক হওয়া অর্থাৎ নিজের অবস্থা শোধরানো অপরিহার্য নয়? যদি অপরিহার্য হয় তবে কখন থেকে শুরু হবে? উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোন্‌টি অস্বীকার করার মতো? সাবধান! রোগ-চিকিৎসায় ব্যস্ততা যদি বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে তো মৃত্যু অনিবার্য। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো মুসলমানদের দ্বীনী অবক্ষয়ের সঙ্গে মুসলিম জাতির অধঃপতন ও ব্যর্থতার সম্পর্ক। কাজেই দ্বীনী অধঃপতন একটি আত্মিক ব্যাধি। দৈহিক রোগের যেমন বিশেষ কারণ থাকে, যেসব কারণ দূর করলে দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তেমনি আত্মিক রোগেরও বিশেষ বিশেষ কারণ রয়েছে। সেগুলো দূরা করাই তার চিকিৎসা ব্যবস্থা ও নিরাময়ের পথ। তাই রোগ নিরূপণ করা হলো চিকিৎসার পূর্ব শর্ত। রোগ যেমন বিভিন্ন রকম হয় তার চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুরুষ ও নারীদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। মুসলিম জাতির আসল রোগ হলো দ্বীনী অজ্ঞতা অথবা স্বল্প জ্ঞান। আমলযোগ্য ফরযিয়্যাতের ইলম না থাকা এবং ইলম মোতাবেক আমল না করা, যার কারণ রূহানী দূর্বলতা, মহান আল্লাহর ভয় ও মুহাব্বত না থাকা। উল্লেখিত উম্মতের দ্বীনী দূর্বলতা দূরীকরণের জন্য জোরদার মেহনত করতে হবে। এ-মেহনতে উলামা, তালাবা, সুলাহা ও জনসাধারণের সম্মিলত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

পুরুষের কর্মসূচী ঃ মুসলমানগণের সন্তানদেরকে সর্বপ্রথম ঈমান-ইসলামেরশিক্ষা দিতে হবে। তারপরে পার্থিব জরুরী ও বৈধ বিষয়সমূহের শিক্ষা

দিতে কোনো বাধা নেই। যাতে করে একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অর্থ্যাৎ সকল পেশাদারী সৎ নিষ্ঠাবান কর্তব্যপরায়ণ হয়। তখনই ইহকাল-পরকালে সফলতা লাভ হবে। দ্বীনী শিক্ষা প্রদান সন্তানের পিতামাতার উপর অপরিহার্য্য হক। অন্যথায় পিতা-মাতা সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত করলে উভয় জাহানে লাঞ্চিত ও বঞ্চিত হবে। ধনী স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানদেরকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য উৎসর্গ করবে। অবশ্য পার্থিব প্রয়োজনে অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দ্বীনী কর্মসূচী ঃ বয়স্ক পুরুষগণ নিজেদের দ্বীনী দূর্বলতা দূর করার জন্য আলেম, তালেবে ইলমদের কাছে গিয়ে নিজ মাতৃভাষায় লিখিত মাসায়েলের কিতাব এক একটি বিষয় সবক নিয়ে শিক্ষা করবে। সুন্নাতের অনুসারী কোনো খাঁটি আলেমকে জিজ্ঞাসা করে কিতাব নির্বাচন করে নিবে। কিতাবটি এমন হওয়া চাই যার মধ্যে দ্বীনের প্রতিটি শাখা যেমনঃ আকাইদ, ইবাদাত, মুয়ামালাত, মুয়াশারাত ও আখলাক সর্ম্পকিত বিধি-নিষেধ পাওয়া যায়। যেমন- বেহেশতী জেওর, হায়াতুল মুসলিমীন, আদাবুল মুআশারাত, ছাফাইয়ে মুআমালাত ও তা'লীমুস সুন্নাহ, এক মিনিটের মাদরাসা ইত্যাদি কিতাবের ধারাবাহিক তা'লীম করতে হবে। কিতাবের বিষয়টি যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোভাবে আয়ত্তে না আসবে ততক্ষণ বার বার পড়তে থাকবে। যেখানে বুঝে না আসে নিজের খেয়ালখুশী মতো না বুঝে বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট থেকে বুঝে নিবে। যাদের অক্ষর জ্ঞান নাই তাদের দৈনিক অথবা সপ্তাহে কোনো আলেমকে দাওয়াত দিয়ে মজলিসে দ্বীনী বিষয়সমূহ শিখে নিবে। দ্বীনী শিক্ষক যদি বিনা টাকায় না পাওয়া যায়, তাহলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে হলেও জরুরী বিষয়ের ইলম শিখতে হবে। মশকের মাধ্যমে নামাযে পঠিতব্য সূরাসমূহ সহীহ-শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিখতে হবে। উলামা-মাশায়েখগণের মজলিস ও সোহবত নিজের উপর আবশ্যকীয় করে নিতে হবে। রূহানী দূর্বলতার জন্য বুর্যূগানে দ্বীনের সোহবত অবলম্বন করা নিজের উপর জরুরী করে নিবে।

মহিলাগণের কর্মসূচীঃ দ্বীনদার পরহেযগার শিক্ষিকা পাওয়া গেলে অল্পবয়স্কা মেয়েদেরকে তার সাহায্যে কুরআন মাজীদ ও ধর্মীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেবে। তাদের জন্য বেহেশতী জেওরের দশ খণ্ড ও তা'লীমুস সুন্নাহ কিতাবখানা ইনশা-আল্লাহ যথেষ্ট হবে। বরং বেহেশতী গাওহার নামক একাদশ খণ্ডসহ তা পূরুষদের জন্যও যথেষ্ট হবে। যদি কোনো মহিলা শিক্ষিকা না পাওয়া যায়, তাহলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

এক : ঘরে যদি কোনো শিক্ষিত মাহরাম পুরুষ থাকে, তাহলে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি সময় নির্ধারণ করে নিবে। এ সময় সবাইকে একত্রিত করে ধর্মীয় বই পড়ে শুনাতে থাকবে এবং বুঝিয়ে দিবে। এভাবে নেসাবের কিতাবসমূহ কয়েকবার খতম করবে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা হলো : মাঝে মাঝে কোনো বুর্যূগ আলেমকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে ওয়ায শুনতে থাকবে।

তৃতীয় মৃত্যুর চিন্তা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মূলরোগ সাব্যস্ত করেছেন দুনিয়ার মোহগ্রস্থতা। যার ফলে আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা ও গাফলতি সৃষ্টি হয়। আর তার প্রতিকার বলেছেন মৃত্যুর চিন্তা করা, মৃত্যুকালীন ও মৃত্যুপূর্বে মৃত্যুর পথযাত্রীর মৃত্যু অবস্থা নিজের মধ্যে চিন্তায় আনা। রূহ কবয থেকে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত অবস্থার মোরাকাবা করা। যেমন মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব, কবর ও হাশরের আযাব ও নেয়ামতসমূহের হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দৈনিক কমপক্ষে বিশ বার বিশ মিনিট নির্জনতায় চিন্তা করা। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি বিশ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে তার শহীদী মর্যাদা লাভ হবে।

মোরাকাবা ও মোহাসাবা : অধিকাংশ সময় এরূপ খেয়াল করবে যে, আমি আমার প্রভু মহান আল্লাহর সামনে আছি। আমার সমস্ত কাজ তিনি দেখছেন এবং সমস্ত কথা তিনি শুনছেন। তিনি আমার অন্তরের কল্পনা-জল্পনারও খবর রাখেন। এটাই মোরাকাবা।

মোহাসাবা : দিবা রাত্রের মধ্যে কোনো একটি সময় নির্জনে বসে সারা দিনের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া। নির্জনে বসে এরূপ খেয়াল করবে– এখনি আল্লাহর দরবারে আমার হিসাব নিকাশ হচ্ছে, আমি উত্তর দিতে সক্ষম হচ্ছি কি?

তওবা ও ইস্তিগফার : যখনই কোনো গোনাহের কাজ হয়ে যায়, তখনই নির্জন স্থানে সিজদায় পড়ে নম্রতার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদি কান্না আসে তবে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করবে। আর যদি কান্না না আসে, তবুও নিজের মাঝে কান্নার ভাব সৃষ্টি করবে। তওবা করতে কখনও দেরী করবে না। কে বলতে পারে কখন মৃত্যু এসে জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেয়?

আল্লাহওয়ালা বুর্যূগানেদ্বীনের সোহবত

ইলম ও আখলাক বা জ্ঞান ও উন্নত চরিত্রলাভের সর্বোত্তম পন্থা হলো নেক সোহবত। আহলুল্লাহ ও বুর্যূগানে দ্বীনের খেদমতে অবস্থান করে তাদের যবানী নছিহত শ্রবণ কলে হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করে। তাদের সোহবতের বরকতে

স্বভাব-চরিত্র, আমল-আখলাক সুন্দর হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মুহাব্বত সৃষ্টি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বীনের উপর পূর্ণ আমলকারী হওয়া সম্ভব নয়। এ দৌলত হাসিল করতে হবে বুর্যূগানে দ্বীনের সোহবত ও মুহাব্বত থেকে।

শ্রোতাদের অবস্থাভেদে সহজভাবে দ্বীনী বিষয় বুঝাতে হয়

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন :

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

অর্থাৎ এই দুনিয়াতে যারা অন্ধ থাকবে আখেরাতও তারা অন্ধ থাকবে।

- সূরা বনী ইসরাইল :৭২

মুসলমানগণের দ্বীনি হালত সাধারণত তিন প্রকার।

এক. শুধু নামকা ওয়াস্তে মুসলমান। ইসলামের ইলম ও আমলের সঙ্গে তাদের কোনো সর্ম্পক নাই।

দুই. নামায রোযার পাবন্দী আছে, দ্বীনের অন্যান্য সকল বিষয়ে তথা মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাকিয়াতে দ্বীনের এ-সমস্ত শাখার কোনো ইলম ও আমল নাই অথচ নিজেকে পরিপুর্ণ দ্বীনদার মনে করে আছে।

তিন. নগন্য সংখ্যক আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা। যাদের জীবন তেমনই যেমনটি একজন মুসলমানের জীবন হওয়া উচিত। যারা দ্বীনের রংধারী মুসলমান। মহান আল্লাহ এবং আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বস্ততা পূর্ণ জীবন।

ওয়াযের বিষয় স্থান কাল পাত্র বিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখা। সেখানে দ্বীনী তাকাযা কি? তা পুরা করা। দ্বীনী দাঈ মুবাল্লিগগণের প্রতি অনুরোধ, ওয়াযের বিষয়বস্তু দ্বীনের সব শাখাই হবে। শুধু আকাইদ, ইবাদত না হওয়া চাই। মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাকের বিষয়ে আলোচনায় গুরুত্ব দিতে হবে। দ্বীনের প্রতিটি বিষয়কে খুবই সহজভাবে উপস্থাপন করা। শ্রোতারা যেন সহজে বুঝতে পারে। যদি সাধারণ শ্রোতা হয় তাহলে তাদের মতো করে বুঝাতে হবে। যদি আলেম-উলামা হয়, তাদের বিষয়ে যে সমস্ত ইসলাহযোগ্য বিষয় তা তাদের খাছ মজলিসে আলোচনা করা। কোন ক্রমেই আলেম উলামাদের ত্রুটি বিচ্ছুতির কথা সাধারণ লোকদের মজলিসে না বলা।

দ্বীনী মাদরাসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের কর্মনীতি

পৃথিবীর বুকে দ্বীন ও ধর্ম টিকিয়ে রাখার জন্য মাদরাসার অস্তিত্ব জরুরী। কিন্তু মাদরাসা দ্বারা তখনই দ্বীন রক্ষার খেদমত আশা করা যাবে, যখন মাদরাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে সহীহ উসূল অনুযায়ী চলবে এবং মাদরাসাও সহীহ উসূল মোতাবেক পরিচালিত হবে। অন্যথায় না দ্বীনের হেফাজত হবে আর নিজেদের উন্নতি সাধন হবে; বরং সময় আর অর্থ নষ্ট ছাড়া কোনো ফায়দা হবে না।

প্রতিটি মাদরাসা যেন দ্বীন রক্ষার একেকটা কেল্লায় পরিণত হতে পারে তাই নিম্নে মাদরাসার কমিটি, ছাত্র, শিক্ষক ও মুহতামিমের জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু নির্দেশনা দেয়া হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উক্ত আলোচনার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

১. মুহতামিম বা সাধারণ শিক্ষক অথবা ম্যানেজিং কমিটিসহ মাদরাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দু'টি কাজ করতে হবে।

ক. কোনো হক্কানী বুর্যূগের সোহবত অবলম্বন করতে হবে এবং তার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম রাখার মাধ্যমে অন্তরের দশটি রোগমুক্তি ও দশটি গুণ অর্জনের মেহনত করতে হবে।

খ. নিজ ঈমান ও আমলের তারাক্কীর নিয়্যতে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করতে হবে। কারণ ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের উন্নতির ফিকির না করে, সে যতই উম্মতের ফিকির করুক তার দ্বারা কোনো কাজ হয় না। খুব ভলো করে জানা প্রয়োজন যে, কোনো ব্যক্তি নিজের ঈমান, আমলের উন্নতির চিন্তা-ফিকির না করলে তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইসলামের খেদমত নিবেন না। বস্তুতঃ নিয়্যত থাকবে নিজের উন্নতির, এর মধ্য দিয়ে অন্যেরও উন্নতি হয়ে যাবে। শুরুতেই যদি অন্যের উন্নতির চিন্তা মাথায় আসে তাহলে এর মাধ্যমে অহঙ্কার প্রকাশ পাবে। আর আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কারীকে দ্বীনের কাজে লাগান না।

২. এ বিষয়টিও ভাবতে হবে যে, আমাদের মাদরাসা জীবিত মাদরাসা না মৃত মাদরাসা? মৃত মাদরাসা বলে ঐ মাদরাসাকে বুঝানো হচ্ছে, যেখানে শিক্ষকদের সকল মেহনত ছাত্রদের মধ্যে সীমিত; বাইরের জনগণের দ্বীনী উন্নতির জন্য তাদের কোনো ফিকির ও মেহনত নেই।

একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয় ছাত্রের মাধ্যমে এবং তা পরিচালিত হয় অর্থের মাধ্যমে। ছাত্র ও অর্থ এ উভয় উপাদান তো আসবে জনগণ থেকে। আর জনগণ এ ক্ষেত্রে তখনই আগ্রহী হবে, যখন তাদের জন্য আমাদের মেহনত থাকবে এবং তাদের মধ্যে দ্বীন থাকবে। আর এটাই মূলনীতি যে, কিছু পেতে হলে কিছু দিতে

হয়। সুতরাং একটি জিন্দা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে হলে ছাত্রদের জন্য মেহনতের পাশাপাশি জনগণের দ্বীনী তারাক্কীর বিষয়েও মাদরাসা পরিচালক ও আসাতিযায়ে কিরামকে নিম্নোক্ত উপায়ে ফিকির করতে হবে।

আম জনতা ও এলাকাবাসীর উপর দুই ধরনের মেহনত

ক. তাবলীগের মেহনত।

খ. দাওয়াতুল হকের মেহনত।

তাবলীগের মাধ্যমে ঈমানের মেহনত করবে এবং দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে আমলের মেহনত করবে। তাবলীগের মেহনত দ্বারা জনগণের ঈমান মযবুত হবে এবং তাদের মাঝে আমলের আগ্রহ পয়দা হবে। আর দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় আমল বিশুদ্ধ ও সুন্নাত তরীকায় হবে এবং তারা সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখবে।

প্রয়োজনে আশপাশের একেক গ্রামকে একেক শিক্ষকের দায়িত্বে দিয়ে দিতে হবে। তারা ঐ গ্রামের মানুষের মাঝে দ্বীনি মেহনত করবে। আমলী মাশকের মাধ্যমে উযূ, নামায ও যাবতীয় আমলের সুন্নাত তরীকা শেখাবে। নূরানী পদ্ধতিতে ২/৩ মাসে চক শ্লেটের মাধ্যমে তাদের কুরআন সহীহ করে দেবে। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে নূরাণী ট্রেনিং-এর হাতিয়ার থাকতে হবে। এভাবে ২/৩ মাস চলার পর তৎপার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামে পর্যায়ক্রমে কাজ করতে থাকবে। এতে কোনো গ্রামের কোনো লোক মাদরাসার বিরুদ্ধে থাকবে না; বরং প্রতিটি লোক মাদরাসার পক্ষে এসে যাবে। আর এভাবেই মাদরাসা যিন্দা মাদরাসা হবে। নতুবা মাদরাসা নিষ্প্রাণ থেকে যাবে।

শুধু শিশু ছাত্রদেরকে পড়ালে হবে না; যুবক শ্রেণীকে এবং পাকা দাঁড়িওয়ালাদেরকেও ছাত্র বানাতে হবে, যাদের কবরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। মুহতামিম সাহেব সর্বস্থানে তদারকী করবেন। কোন্ উস্তায কতটুকু কাজ করলেন তার তদারকী করবেন এবং ঐ সকল গ্রামবাসীর সাক্ষাৎকার নেবেন। দায়িত্বশীল উস্তাযগণ স্ব-স্ব গ্রামে গিয়ে আসরের নামায আদায় করবেন এবং মাগরিবের আগ পর্যন্ত সেখানে মেহনত করবেন।

ছাত্রদের মধ্যে দুই ধরনের মেহনত করতে হবে

ক. তা'লীমের মেহনত ।

খ. তরবীয়তের মেহনত ।

তা'লীম অর্থ কিতাবের শব্দ পড়ানো আর তরবিয়াত হলো কিতাবের লেখাগুলো ছাত্রের দেহে ও হৃদয়ে এঁকে দেয়া অর্থাৎ তার আমলী জীবন গঠন করে দেয়া। এর জন্য উস্তাদের 'সোহবত ইয়াফতা' (সান্নিধ্যপ্রাপ্ত) হতে হবে এবং ছাত্রদেরকে হক্কানী শাইখের সোহবতে বসার সুযোগ করে দিতে হবে।

দ্বীনী মাদরাসাগুলোর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সিনা থেকে সিনায় ইলম স্থানান্তরিত করা বা শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি অবশিষ্ট রাখা নয়। বরং তা প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য হলো- মিরাছে নববী তথা কুরআন ও সুন্নাহর ইলম ও আমল সংরক্ষণ এবং এর প্রচার ও প্রসার। আর সে জন্য তা'লীম ও তরবীয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা) উভয়টা প্রয়োজন। কেননা তা'লীমের মাধ্যমে ইলমে নববী এবং তরবীয়তের মাধ্যমে আমলে নববীর প্রকাশ ঘটবে। এ দুটি বিষয়ই হলো প্রকৃত পক্ষে মিরাছে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বর্তমানে যেহেতু দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে তা'লীমের পাশাপাশি তরবীয়তের যথাযথ গুরুত্ব না থাকায় ফারেগীনদের মধ্যে আমলী জিন্দেগী ঠিক হচ্ছে না, সেহেতু এ দুটি বিষয়ই গুরুত্ব দেয়া অতিব জরুরী। দ্বীনী মাদরাসার মূলনীতি যদি দ্বীনের ভাব-মূর্তি রক্ষা করা না হয়, তাহলে এটা শুধু এমন শরীর হবে যার মধ্যে প্রাণ নেই। ইলমী যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে যেভাবে ধারাবাহিক মেহনত দরকার, আমলী জিন্দেগী গঠনের জন্য ধারাবাহিক মেহনত আবশ্যক।

ইলমের মাকসাদ হলো আমল। বর্তমানে তা'লীমকে যে পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় তরবীয়তকে সে পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ তরবীয়তের গুরুত্ব তা'লীমের চেয়েও বেশি। অনেক সাহাবা (রাযি.) এমন আছেন যাঁরা কিতাবী ইলম থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাই বলে সে বিদ্যা অর্জন তাঁদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি। অথচ তরবীয়ত সবার জন্য ফরযে আইন। যেহেতু তা'লীমের লক্ষ্য আমল, আর আমল ঠিক হয় তরবীয়তের মাধ্যমে। তাই তা'লীমের চেয়ে তরবীয়তের গুরুত্ব বেশি।

মাদরাসাসমূহ নববী ইলম-আমল অর্জনের একমাত্র মারকায এবং মসজিদ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মারকায। এখানে মুসলমানগণ বারবার উপস্থিত হন। এ দু'টি স্থানে যদি নববী আদর্শ উজ্জলরূপে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ সুন্নাতের শিক্ষা ও অনুশীলন বা বাস্তব প্রশিক্ষণ থাকে এবং এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা, কাজ ও অবস্থা সকল দিক দিয়ে সুন্নাতের দাবী অনুযায়ী হয়, তবে হেদায়েত ব্যাপক হবে। এর মাধ্যমে হেদায়াতের আলো অতি দ্রুত ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে। হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ (রহ.) বলেন, দ্বীনী মাদরাসার

শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাম "তালিবুল ইলম ওয়াল আমল" কিন্তু এখন সংক্ষিপ্তভাবে শুধু "তালিবে ইলম" বলা হয়। কাজেই দ্বীন শিক্ষার্থীরা আমলকে এখন মাকসুদই মনে করে না। মাদরাসা পড়ুয়াদের ছাত্র যামানা থেকেই আমলের ইহতিমাম করা উচিত। আজ শিক্ষকগণ ছাত্রদের তরবীয়ত ও নফসের ইসলাহের ফিকির করেন না, শুধু তাঁদের থাকা খাওয়ার ফিকির করেন, যদ্দরুন তারা আকৃতিতে তালিবে ইলম হলেও রূহ এবং হাকীকত গায়েব হয়ে গেছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক ও তাঁর ভয় শিক্ষকবৃন্দের আদব ও ইহতিরাম সব খতম। এর পরে স্ট্রাইক আর বিদ্রোহ হবে না তো কী হবে? হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) আফসোসের সঙ্গে বলতেন, আহ! তালিবে ইলমদের তো শতভাগ আল্লাহওয়ালা হওয়ার কথা ছিল। যেসব তালিবে ইলম বে-আমল এবং বে-উসুল হবে, তাদের তো সংগে সংগেই বের করে দেওয়া উচিত। বৃক্ষের খারাপ শাখাটিকে কেটে দূরে নিক্ষেপ করা মালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। ছাত্রদের সংখ্যা বা বিল্ডিং কোনোটাই মূল মাকসাদ নয়। ছাত্রের মতো ছাত্র কয়েকজন হলেই যথেষ্ট।

শাগরেদের তিনটি হক

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাযি.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে আমাদের পেছনে পড়ে গেলেন। তিনি এসে আমাদের সঙ্গে এমন সময় মিলিত হলেন যে, তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে (বা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে) এবং আমরা উযূ করছিলাম। (তাঁকে দেখে তাড়াহুড়ার কারণে) আমরা মাসেহ করার মতো করে পা ধৌত করলাম। (যার কারণে আমাদের পায়ের গোড়ালীর কোথাও কিছুটা শুষ্ক থেকে গেল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লক্ষ্য করে দু'তিনবার জোরে জোরে বললেন, খবরদার! দোযখের আগুন সেসব গোড়ালীর জন্যে যা উযূর সময় শুষ্ক থাকে। –সহীহ বুখারী, ১/১৪

এ হাদীস থেকে শাগরেদদের তিনটি অধিকার প্রমাণিত হয়। একটি হলো এই যে, তারা শুধু তা'লীমই পাবে তা নয়, উপরন্তু তাদের তরবীয়াতও দিতে হবে। যেমন– হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের পায়ের গোড়ালী

শুষ্ক থাকার ব্যাপারে সাবধান করলেন। অথচ এ কাজটা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। ওস্তাদগণ শুধু তা'লীম দেয়াই যথেষ্ট ভাবেন, তরবীয়ত দানের কোন প্রয়োজনই ভাবেন না। সেক্ষেত্রে তা'লীমের ক্ষেত্রেও ত্রুটি থেকে সতর্ক না করা তো আরও মারাত্মক কথা। অথচ এ ব্যাপারটাও দেখা যায় তারা হরহামেশা চালাচ্ছেন। কোনো কোনো কুরআনের শিক্ষককে দেখা যায় যে, ছেলেরা তার পাশে বসে দেদারছে ভুল পড়ে যাচ্ছে আর তিনি মূক ও বধির হয়ে দিব্যি বসে আছেন। তার চাইতেও মারাত্মক ব্যাপার এই যে, কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রদের থেকে এমন সব খেদমত নেন, যাতে তার চরিত্র ধ্বংস হয়। যদি সংশোধন না করেন তাহলে অন্তত বরবাদ করা থেকে বিরত থাকুন। দ্বিতীয় অধিকারটি হল এই যে, যদি বুঝা যায় জোরে জোরে আলোচনা না করলে ছাত্ররা সবাই তা শুনতে পাবে না, যেমন ছাত্র বেশি কিংবা অন্য কোনো সমস্যা রয়েছে, তাহলে শিক্ষককে জোরে জোরে কথা বলতে হবে। এটাও ছাত্রদের অধিকার। তা না হলে আলোচনাই নিরর্থক হবে। যেমন প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরে জোরে বলেছিলেন।

তৃতীয় অধিকার হল এই যে, যদি বুঝা যায় যে একবারের আলোচনায় বিষয়টি ছাত্রের বোধগম্য হয়নি, তাহলে দুবার এমন কি তিনবার আলোচনা করবে। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক একটি কথা দু'তিন বার বলেছেন। পরবর্তী হাদীসেও দেখা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এটা প্রায় নিত্যকার অভ্যাস ছিল। যেমন–

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ

অর্থ- আনাস (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলতেন, তখন তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন যেন বিষয়টি বুঝে নেয়া যায়। -সহীহ বুখারী, ১/২০

এ হাদীসটি তিন অধিকারের তৃতীয়টির সমর্থনে সুস্পষ্ট দলিল।

সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি আরয

শিক্ষা দেয়ার বেলায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বিবেচনায় রাখতে হবে।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, লোকদের এমন কথা বল যা তারা বুঝতে পারে।

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৭

উপরোক্ত বাণী থেকে ছাত্রদের আরেকটি হক বুঝা যায় যে, ছাত্রদের মেধা অনুসারে আলোচনা করতে হবে। তাদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কিতাব এবং সবকের পরিমাণ ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা না করে সকল ছাত্রকে একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে গিয়ে কোনো কোনো শিক্ষক দুর্বল মেধার অধিকারীকে অধিক চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এমনকি নির্দয়ভাবে মারপিট করে থাকে। এমতাবস্থায় ছাত্ররা ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে সবক আদায়ে ব্যর্থ হয়ে অনেক সময় মাদরাসা থেকে পলায়ন করে থাকে। এমনকি জীবনের জন্য দ্বীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) ওস্তাদগণকে সবসময় বলতেন, দেখ! ছাত্রদেরকে মারামারি কর না। সবার মেধা একরকম হয় না। কারও মেধা খুব ভালো হয়। কেহ দুই রুকূ মুখস্ত করতে পারে, কারও দ্বারা সম্ভব হয় না। কাজেই কারও উপর মেধাতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিও না। কেউ যদি দু'বছরে হাফেয না হতে পারে তবে হয়ত তিন বছরে হয়ে যাবে। এ জন্য মারপিট কর না। কাউকে মারপিট করে হাফেয বানানো তোমার প্রতি ফরয করা হয়নি। মারপিট করা হারাম। এমন উস্তাদদের থেকে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন এর বদলা নিবেন । –ফাতাওয়ায়ে শামী

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নাম আছে। কিন্তু কুরআন শিক্ষার সঙ্গে আয়াতে 'আর রহমান' নামটি নাযিল করেন।

ইরশাদ করেন– اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ "রহমান কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন"

এখানে আল্লাহর নিরান্নব্বই নামের কাহ্হার, জব্বার এ-ধরনের কোনো নামই উল্লেখ না করে 'রহমান' নাম নাযিল করা হয়েছে। এ রহমান নাম উল্লেখ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সব কুরআনের শিক্ষককে শিক্ষা দিয়েছেন যে, দয়ার অনুভূতিতে সিক্ত হয়ে ছাত্রদেরকে পড়াও। এটা কুরআন পাকের দলিল।

আল্লাহর ওয়াস্তে শিক্ষক মহোদয়গণ! কিয়ামতের দিন নিজেদের জন্য দোযখের রাস্তা প্রশস্ত করবেন না। আপনাদের ভুলের কারণে যদি মাদরাসাগুলো বন্ধ হয়ে যায় বা কোনো অভিভাবক যদি তার সন্তানকে মাদরাসা থেকে নিয়ে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দেয়, ছাত্রটি মাদরাসা থেকে ঝরে যায় তবে কিয়ামতের দিন দোযখে যাবার জন্য এ নিকৃষ্ট ঘৃণিত কাজই যথেষ্ট।

কুরআনের শিক্ষকগণ আন্তরিকতার সঙ্গে ছাত্রদের সঠিক তা'লীম তরবীয়তের হক আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জন্য দরবারে এলাহীতে দু'আরও ইহতেমাম

করবেন। কেননা একদিক দিয়ে তারা হলেন আপনাদের জন্য জরিয়ায়ে মা'আশ অর্থাৎ কামাই রোযগারের মাধ্যম। উপর দিকে সদকায়ে জারিয়া।

প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَشْرَافُ اُمَّتِیْ حَمَلَةُ الْقُرْاٰنِ وَاَصْحَابُ اللَّیْلِ

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক হলেন হাফেযে কুরআন এবং রাতে ঘুম থেকে উঠে যারা নামায পড়ে।

-মুজামে কাবীর, তবারানী, হাদীস নং ১২৬৬২ (বুখারী রাহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ নয়। দ্রষ্টব্য, লিসানুল মিযান ৩/১৬ সাআদ ইবনে সাঈদ আলজুরজানী-এর তরজমা: মিযানুল ইতিদাল ৩১১২ সাআদ ইবনে সাঈদ আলজুরজানী-এর তরজমা: মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১১৬৪০)

'হামালাতুল কুরআনের' সঙ্গে আসহাবুল্লাইল অর্থাৎ হাফেযে কুরআনের রাত জেগে নামায আদায়কারীর কথা বলা হয়েছে। শুধু নিরালা হাফেয নয় বরং আল্লাহওয়ালা হাফেয। সুতরাং হাফেযে কুরআন এবং রাতে উঠে নামায আদায়কারীর মধ্যে একটা যোগ সূত্র আছে।

ছাত্রদের শিক্ষা বহির্ভূত বিষয়ে না জড়ানো

প্রচলিত রাজনীতি এমনিতেই শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ। ছাত্র রাজনীতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ছাত্রদের দায়িত্ব ইলমের সঙ্গে সঙ্গে আমলী যিন্দেগী গঠন করা। কিন্তু যখন ছাত্ররা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বে তখন অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা ব্যহত হবে। এমতাবস্থায় তাদের তালিম ও তরবীয়তে ভাটা পরবে এবং স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের ইস্তেদাদ দূর্বল হয়ে যাবে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় রাজনীতিতে জড়িত ছাত্রদের ইলমী অধঃপতন হচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালকদের প্রতি অনুরোধ আপনারা কোনো ভাবেই ছাত্রদেরকে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে দিবেন না। অন্যথায় ধীরে ধীরে ইলম উঠে যাবে এবং এর দায়ভার আপনাদেরকেই বহন করতে হবে।

তবে হাঁ! ইসলামী রাজনীতির প্রয়োজন রয়েছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। এর জন্যও আমাদের আকাবির ও আসলাফদের মাঝে নমুনা রয়েছে। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) যখন পরিপূর্ণভাবে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ইস্তেফা নিয়েছিলেন। এমনিভাবে মুফতী আযম আল্লামা শফী (রহ.) এবং আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) যখন পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পরেছিলেন তখন তাঁরাও দারুল উলূম থেকে ইস্তেফা দিয়ে রাজনীতির মাঠে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বর্তমানে ছাত্রদের মোবাইল ফোন ব্যবহার ইলমের পথে বড় অন্তরায়

কওমী মাদরাসাসমূহের ছাত্রদের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বাস্তবে ছাত্ররা তা উপেক্ষা করে। লুকিয়ে গোপনে যেভাবেই হোক তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। অথচ মোবাইল ফোন ব্যবহারে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশি। সমস্ত গুনাহের মাধ্যম মোবাইল হাতের মুঠোয় থাকা অবস্থায় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। আর যারা গুনাহের সঙ্গে জড়িত থাকে, তারা কখনই ইলম পায় না। হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) জাযাউল আমাল কিতাবে লিখেছেন গুনাহের সাতাইশ প্রকার ক্ষতি যা দুনিয়াতেই হয় তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে গুনাহের কারণে ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

মুবাল্লিগে দ্বীনের জন্য জরুরী কিছু আদব ও আহকাম

শরীয়তের প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-পদ্ধতি, আহকাম ও আদব রয়েছে। সেগুলোর অনুসরণ করলে কাজটি পরিপূর্ণ হয়, -এর ফায়দা জাহের ও ফলপ্রসূ হয়। ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় এবং আল্লাহ পাকের নিকট মকবূল হয়। অনুরূপ দাওয়াত ও তাবলীগের কিছু আহকাম ও আদব রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

১. যে বিষয় সম্পর্কে তবলীগ করবে, সে সম্পর্কে শরীয়তের পূর্ণজ্ঞান থাকা দরকার।

২. নেক কাজের আদেশ করার জন্য প্রথম শর্ত ইখলাস। অর্থাৎ শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে নসীহত করবে, নিজের নফসকে খুশি করা অথবা অন্যকে দেখানোর জন্য নসীহত করবে না। আর এটার মাপকাঠি হলো, উপদেশ দান করার সময়ও উপদেশদাতা শ্রোতামণ্ডলীকে নিজ থেকে অধিক ভালো মনে করবে। দ্বীনি কাজে যাদের লোক দেখানো মনোভাব থাকে তাদের ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠিন সর্তক বাণী এসেছে। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ''কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে সমস্ত লোকের ফায়সালা শুনানো হবে, তাদের মধ্যে একজন ঐ শহীদ হবে। যাকে ডেকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঐ সমস্ত নেয়ামত স্মরণ করাবেন যা তাকে দান করেছেন। নিয়ামত সমূহ দেখে সে চিনিতে পারবে এবং স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা

হবে, এ সকল নিয়ামত সমূহ দ্বারা তুমি কি করেছ? সে উত্তর দিবে, তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছি; এমনকি শহীদ হয়ে গেছি। ইরশাদ হবে– তুমি মিথ্যা বলছ; লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলবে এই জন্যই সবকিছু করেছ। সুতরাং তা তো বলা হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছিলে তা হাসিল হয়ে গেছে। অতঃপর তাকে হুকুম শুনানো হবে এবং অধঃমুখী করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। দ্বিতীয় ঐ আলেমেও হবে যে নিজে ইলেম শিখেছে, অন্যকে শিখিয়েছে এবং কুরআন পাক অর্জন করেছে। তাকে ডেকে দুনিয়াতে যে সমস্ত নেয়ামত দেওয়া হয়েছিল স্মরণ করানো হবে। সে স্বীকার করবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে–এইসব নেয়ামত পেয়ে তুমি কি কি কাজ করেছ? সে আরজ করবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিজে ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাক হাসিল করেছি। উত্তর হবে–তুমি মিথ্যা বলছ; বরং লোকে তোমাকে আলেম বলবে এই জন্য ইলম শিখেছ এবং লোকে তোমাকে ক্বারী বলবে এই জন্য কুরআন পড়েছ। আর তা বলা হয়েছে। (অর্থাৎ শেখা ও শেখানো যা উদ্দেশ্য ছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে) অতঃপর তাকেও হুকুম শুনানো হবে এবং অধঃমুখী করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তৃতীয় ঐ ধনী ব্যক্তিও হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা রিযিকের প্রশস্ততা প্রদান করেছিলেন এবং সবরকম ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তাকে ডাকা হবে এবং নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে এবং স্বীকারোক্তির পর জিজ্ঞাসা করা হবে–এই সমস্ত ধন-সম্পদ পেয়ে তুমি কি আমল করেছ? সে উত্তর করিবে, এমন কোন উত্তম স্থান নেই যেখানে খরচ করলে আপনার সন্তুষ্টি লাভ হয় আর আমি খরচ করিনি। ইরশাদ হবে–তুমি মিথ্যা বলছ; বরং লোকে তোমাকে দানশীল বলবে এই জন্য তুমি এইসব করেছ। সুতরাং তা বলা হয়েছে অতঃপর তাকেও হুকুম অনুযায়ী জাহান্নামে টেনে ফেলে দেওয়া হবে।

–মিশকাত, মুসলিম

৩. তাবলীগ করার সময় একমাত্র দ্বীনী খেদমতকেই মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করবে, সুফলপ্রাপ্তির প্রতি লক্ষ্য করবে না। কারণ এটা গায়রে ইখতিয়ারী জিনিস। মনে মনে এই অনুভূতি লালন করবে– নিজের ইসলাহ এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়ায করছি। যশ ও খ্যাতির নিয়্যতে নয়।

৪. ওয়ায শুধু তাবলীগের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। উপদেশদানকারী হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। ওয়ায যখন পার্থিব উদ্দেশ্যমুক্ত হবে, তখন যাদেরকে সম্বোধন করা হবে, তাদের অন্তরে নসীহত বড় প্রভাব সৃষ্টি করবে। ওয়ায করে চুক্তিভিত্তিক বিনিময় নেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

৫. মজলিসে কোনো ব্যক্তিকে খাসভাবে সংশোধন করা উচিত নয়। কেননা এতে অন্যকে লজ্জিত করা হয়। আর এই লজ্জা পাওয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ

নসীহতকারীর প্রতি বিদ্বেষের উদ্রেক হয় বরং কোনো কোনো সময় ওই মন্দ কাজ বর্জন করার পরিবর্তে সেই কাজে আরো পরিপক্ক হয়ে যায়। কেননা সে মনে করে, আমার মান-সম্মান তো নষ্ট হয়েই গেছে, তাহলে এই কাজ আর কেন ছাড়বো? সুতরাং উত্তম পন্থা হলো, হয় নিজে তাকে নির্জনে ডেকে বুঝিয়ে দিবে কিংবা এমন কোনো লোক দ্বারা বলাবে, যে তাকে সংশোধন করতে পারে, কিন্তু তার শত্রুর দ্বারা বলাবে না। কেননা শত্রুর দ্বারা বলানোতে সংশোধন তো হবেই না; বরং তাকে অপদস্থ করা হবে।

৬. নরম ব্যবহার এবং স্নেহ-মুহাব্বতের সঙ্গে নেক কাজের আদেশ করবে; এতেও যদি বিরোধিতা হয়, তবে ধৈর্যধারণ করবে। আর যদি ধৈর্যধারণের ক্ষমতা না থাকে, তাহলে ব্যক্তি বিশেষকে সম্বোধন করবে না। শুধু ব্যাপকভাবে নসীহত করা যথেষ্ট মনে করবে। নরমভাবে নসীহত করবে, কোনো লোককে তুচ্ছ মনে করে কটাক্ষ করবে না।

৭. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ানের শুরুতে আল্লাহ্ পাকের হামদ ও ছানা পড়ে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতেন এবং তিনি ইরশাদ ফরমান, কালেমায়ে শাহাদত ছাড়া বয়ান হাতকাটা মানুষের মতো। তার সঙ্গে কুরআনে পাকের আয়াত তিলাওয়াত করতেন। –মুসলিম শরীফ, যাদুল মাআদ

৮. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো তিন-তিনবার বলতেন।

৯. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

অর্থাৎ অতএব যখন আপনি অবসর হবেন একান্তে ইবাদত করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন।' –সূরা ইনশিরাহ : ৭-৮

হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) বলেন, ওয়ায়োয, মুবাল্লিগগণের মামূলাত এবং আল্লাহর সঙ্গে ধ্যানমগ্নতায় কিছু সময় কাটানোরও খুব বেশি ইহতিমাম করা উচিত।

হযরত আরেফে রূমী (রহ.) বলেন, যদি কূপ থেকে অনবরত পানি উঠানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে পানির পরিবর্তে কাদা আসছে। যেমন- মা শিশু বাচ্চাকে অনবরত দুধ পান করালে এক সময় দুধ নিঃশেষে রক্ত আসবে। সুতরাং লোক সমাবেশে নূর পৌঁছানো যেমন জরুরী, নির্জনতায় আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে কলবে নূর হাসিল করাও তেমন জরুরী।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস দেহলভী (রহ.) ইরশাদ করতেন, মুবাল্লিগেদ্বীন প্রকাশ্য অবস্থায় মানুষের সঙ্গে মেলামেশার দ্বারা অন্তরে যে ময়লা পড়ে সেটাকে নির্জনতার নূর তথা একাকীত্বের নাওয়াফেল, যিকির-ফিকির এবং কুরআন তিলাওয়াতের দ্বারা এবং আহলুল্লাহগণের খিদমতে উপস্থিতির দ্বারা ধৌত করা উচিত।

১০. দ্বীনের দাঈদের আরেকটি বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাহলো, অন্যকে যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে নিজেও তার উপর আমল করবে। যে মুনকারটি ইসলাহ করবে নিজেও তার থেকে বেঁচে থাকবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অন্যের সংশোধনের পাশাপাশি নিজেকেও গড়ে তোলার চিন্তা করতে হবে।

১১. মুহিউস সুন্নাহ হযরতওয়ালা হারদূঈ (রহ.) ফরমান, প্রত্যেক দ্বীনী মেহনতকারী ব্যক্তির জন্য সুন্নাতের অনুসরণকারী কোনো বুর্যূগকে আপন শাইখ বানানো জরুরী। যারা নিজেদেরকে আল্লাহওয়ালাদের থেকে অমুখাপেক্ষী ও পরওয়াহীন মনে করে তারা হয়তো مَغْضُوْب বা আল্লাহর গযবের শিকার হয় অথবা ضَآلِّيْنَ তথা পথভ্রষ্ট হয়। কেননা সূরা ফাতিহায় তিন ধরনের মানুষের রাস্তাই বর্ণনা করা হয়েছে। مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ তথা নেয়ামতপ্রাপ্তদের রাস্তা, مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ তথা গযবপ্রাপ্তদের রাস্তা, এবং ضَآلِّيْنَ তথা পথভ্রষ্টদের রাস্তা। এজন্য আল্লাহওয়ালাদের থেকে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করা অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেক ফেৎনার জনকের ব্যাপারে যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে এটাই জানা যাবে যে, সে ব্যক্তি কোনো দ্বীনী মুরুব্বীর তত্ত্বাবধানে থাকেনি। যখন মানুষ লাগামহীন হয়, কেউই তার মুরুব্বী হিসেবে না থাকে তখন সে বিগড়ে যায়। পদমর্যাদা আর মালের ফেৎনায় জড়িয়ে পড়ে।

১২. দশ মিনিট ওয়াযের এ'লান হলে দশ মিনিটেই ওয়ায সমাপ্ত করা উচিত। কেননা এরূপ ঘোষণা ওয়াদার অর্ন্তভুক্ত। একই মাহফিলে অন্যান্য বক্তা থাকতে পারে। তার জন্য নির্ধারিত সময়ে তাকেই সুযোগ দেয়া উচিত, অন্যথায় এটা হক নষ্ট করার শামিল হবে।

১৩. ওয়াযের সময়ে নিজের ইসলাহের নিয়্যত করা অত্যন্ত উপকারী। কেননা ওয়ায়েয নিজেও ইসলাহের মুখাপেক্ষী। তাছাড়া নিজের ইসলাহ কামনাকারী ওয়ায়েযের দ্বারা ফায়দাও অধিক হয়ে থাকে।

১৪. ওয়ায়েজীনে কিরাম শ্রোতাবৃন্দকে যেমন নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে তেমনি মশকের মাধ্যমে উযূ, নামায, আযান, ইকামত ঠিক করাবে। পাশাপাশি অর্জিত ইবাদতের নূর হেফাযতের জন্য গুনাহ'র ক্ষতি এবং গুনাহ'র পরিচিতিও তুলে ধরবে। সঙ্গে সঙ্গে দরবারে ইলাহীতে নিজের ইসলাহ ও উম্মতের ইসলাহের জন্য দু'আ-রোনাজারি করবে।

১৫. তাবলীগের কাজে সামান্যতম মেহনত করতে পারাও আল্লাহ্ পাকের খাস তাওফীক, তাই আল্লাহ পাকের দরবারে শুকর আদায়ের ব্যাপারেও সর্বদা সচেতন থাকবে।

১৬. দাওয়াতের কাজের দ্বারা আল্লাহর রেযামন্দী, দ্বীনের প্রচার, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালামের সুন্নাত। বিশেষ করে সাইয়িদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইত্তিবা ও অনুসরণের নিয়্যত করবে। দ্বীনের প্রতিটি হক লাইনের মেহনতে পরস্পরকে সহযোগিতা করা নেহায়েত আবশ্যক। তা'লীম, তাবলীগ, তাযকিয়া এক ও অভিন্ন তা সকলের জন্য জরুরী।

১৭. দ্বীনী ইলম শিক্ষাদান বা দ্বীন প্রচার কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ঠিক নয়। তাই পূর্ববতী ইমামগণ একে নাজায়েয বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের ফিকাহবিদগণ প্রয়োজনের তাকিদে একে বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

–মাসায়েলে মা'আরেফুল কুরআন

১৮. ওয়াযের দ্বারা একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়্যত করবে। সুর দিয়ে ওয়ায করে মানুষকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে না। কেননা যারা মাখলুককে খুশি করার নিয়্যতে ওয়ায করে তাদের অন্তরে হুব্বে জাহ হুব্বে মাল তথা প্রসিদ্ধি ও সম্পদ কামনার রোগ সৃষ্টি হয়। যার ইসলাহ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা এ ধরনের দ্বীনী খেদমত দ্বারা সওয়াব তো পাবেই না; বরং তা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে।

১৯. মুবাল্লিগে দ্বীন তথা দ্বীনের দাঈদের জন্য নিজেকে প্রচলিত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে এ খেদমত আঞ্জাম দিতে হবে।

২০.অনেক বক্তা চা পানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে লোকদেরকে মীলাদ-দুরূদে লাগিয়ে সে সুযোগে চা পান করেন। এটা অশোভনীয় কাজ। দ্বীনী উদ্দেশ্যহীন এ-ধরনের ক্ষেত্রে দুরূদ পড়াও নিষেধ।

ওয়ায়েয ওয়াযের সময় নিজেকে ভুলবে না

এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববী (রহ.) কুরআনে পাকের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন,

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদেরকে সম্বোধন করে বলেন, ''তোমরা অন্যদেরকে সৎ কাজের আদেশ কর, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও; অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর।''- সূরা বাকারা: ৪৪

অর্থাৎ তোমরা তাওরাতের আলেম। যার ফলে লোকেরা তোমাদের কাছে আসে। এ হুকুমটি যদিও ইয়াহূদীদের জন্য ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য হবে তো আরো আগেই। যে ব্যক্তি অন্যদেরকে উপদেশ দেয়, তার উচিত উক্ত উপদেশ আগে নিজে পালন করা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাবলীগের ব্যাপারে বিধান এটা নয় যে, যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত সে তাবলীগ করবে না, অন্যকে উপদেশ দিবে না; বরং হুকুম হলো– নিজে খারাপ কাজ ছাড়তে না পারলেও অবশ্যই নসীহত করবে। তবে নসীহত করার পর চিন্তা করবে, আমি যখন অন্যদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, নিজেও এর উপর আমল করবো এবং নিজেকে ভুলবো না। তাই ওয়াযকারী মনে করবে না, এ নসীহত অন্যের জন্য; বরং চিন্তা করবে– এ নসীহত আমার জন্যেও, আমাকেও এর উপর আমল করতে হবে।

এ আয়াত উল্লেখ করে আল্লামা নববী (রহ.) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাতে অত্যন্ত কঠিন কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা গলদ উদ্দেশ্য থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন! হাদীসটি হলো–

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُوْلُ : يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِي الرَّحٰى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ ، فَيَقُوْلُوْنَ : يَا فُلَانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُوْلُ : بَلٰى ، كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ ، وَأَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, অতঃপর তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের অগ্নিতে। আগুনে পড়তেই গরমের তীব্রতায় তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং গাধার চাক্কির পাশে ঘুর্ণয়নের ন্যায় সে তার নাড়িভুঁড়ির চারপাশে ঘুরতে থাকবে। (তৎকালে একটি বড় চাকা হতো। সে চাকায় গাধাকে বেঁধে দিত- গাধা তাকে ঘুরাতো।) জাহান্নামীরা যখন এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে, তারা তার আশেপাশে একত্রিত হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করবে, তোমার এ শাস্তি কেন? তুমি তো সৎ কাজের আদেশ করতে, অসৎ কাজ থেকে বারণ করতে। উত্তরে সে বলবে, হ্যাঁ! আমি সৎ কাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না। আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করতাম। কিন্তু নিজে অসৎ কাজে লিপ্ত হতাম। (এ কারণেই আজ আমার এই অশুভ পরিণাম।)

-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৯; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৯৮

মুবাল্লিগে দ্বীনের জন্য তাযকিয়াতুন্নফস জরুরী

প্রতিটি মুসলমানকে দ্বীনের মুবাল্লীগ হতে হবে তবে শর্ত হলো সে যে বিষয়ে মেহনত করবে সে বিষয়ে পুর্ণ ইলম থাকতে হবে। দ্বীনের দাঈকে তা'লীম, তাবলীগ ও তাযকিয়ার মাধ্যমে নিজকে খাঁটি মুবাল্লিগ হিসাবে তৈরি করতে পারলে তবেই নিজেরও ফায়দা হবে এবং উম্মতেরও ফায়দা পৌঁছবে।

তাযকিয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ নির্মাণ শেষে যে উদ্দেশ্যে একজন রাসূল প্রেরণের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন তা হলো–

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করবেন। তিনি তাদের সম্মুখে আপনার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তাযকিয়া করবেন।'

–সূরা বাকারা : ১২৯

এখানে দু'আকারী তাযকিয়াকে চতুর্থ উদ্দেশ্য রূপে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দু'আর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলার আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করতঃ এই চার উদ্দেশ্যের কথাই বলেছেন। কিন্তু দু'আ কবূলকারী আল্লাহ তা'আলা

বর্ণনার ধারায় ব্যতিক্রম করে তাযকিয়াকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রেখেছেন।

এতে প্রতীয়মান হয়, তাযকিয়া এত গুরুত্বপূর্ণ যে, একে চার নম্বরে না রেখে দুই নম্বরে রাখা হয়েছে। ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

অর্থাৎ 'তিনি ঐ সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন এ উদ্দেশ্যে যে, রাসূল তাদের সম্মুখে আয়াত তিলাওয়াত করবেন এবং তাদের তাযকিয়া করবেন।' -সূরা জুমু'আ : ২

এর দ্বারা তাযকিয়ার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া প্রমাণিত হয়।

তাযকিয়া ব্যতীত যেহেতু وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ (ইলম ও হিকমত) কোনো কাজেই আসে না, এ জন্য প্রথমে তাযকিয়ার কথা উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হে দ্বীনের মুবাল্লিগগণ! গভীর মনোযোগ সহকারে শুন ও অনুধাবন কর, প্রথমে তোমাদেরকে তাযকিয়ার আগুনে দগ্ধ হয়ে পরিশুদ্ধ হতে হবে। অতঃপর তোমরা সফলকাম হবে। তোমাদের শ্রম সার্থক হবে। অন্যথায় ইখলাস না থাকার কারণে তোমরা দ্বীনের নামে দুনিয়া অর্জন করবে। নিজের সঙ্গে প্রতারণা করবে এবং আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গেও প্রতারণা করবে। এজন্য তাযকিয়ার আলোচনা আগে করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে তাযকিয়া করেছে।"

হযরত মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.)-কে একজন প্রশ্ন করলেন, তা'লীম (মাদরাসা) বেশি গুরুত্বপূর্ণ না তাবলীগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ? জবাবে হযরত মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) বললেন, আচ্ছা বলুন তো শরীরের মধ্যে কান বেশি গুরুত্বপূর্ণ না কি চোখ? প্রশ্নকারী বললেন উভয়টিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটির কাজ অপরটির দ্বারা হয় না। হযরতওয়ালা বললেন, তাহলে বুঝা গেল তাবলীগ ও তা'লীম উভয়টিই জরুরী। উভয়টিই করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে তাবলীগ ও তা'লীমের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি। ইসলাহে নফস যদি না থাকে তাহলে রিয়ার কারণে তাবলীগ, তা'লীম সবকিছুই বরবাদ হয়ে যাবে।

বহু পীর-মাশায়েখ ও দ্বীনের মুবাল্লিগ ধ্বংস হয় অন্তরে তিনটি রোগ পয়দা হওয়ার কারণে।

১. উযব (নিজেকে ভালো মনে করা বা নিজের প্রতি মুগ্ধতা)।

২. হুব্বে জাহ (প্রসিদ্ধি কামনা)।
৩. হুব্বে মাল (মালের মুহাব্বত)।

ইসলামের ইতিহাসে আছে, শাইখে বাগদাদ আল্লামা আবু আবদুল্লাহ্ উন্দুলুসী (রহ.)-এর বেলায়েতকে আল্লাহ্ পাক বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। উজব অর্থাৎ নিজেকে ভালো মনে করার কারণে। দীর্ঘদিন পর আল্লাহ্ পাক তাঁর তাওবা কবূল করে পুনরায় বেলায়েতকে ফিরিয়ে দেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আহমদ কবীর রেফাঈ (রহ.) রওযা শরীফে সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত মোবারকের চুম্বন ও যিয়ারত লাভ করার কারণে নিজের অন্তরে উজব আসতে পারে এ আশঙ্কায় মসজিদে নববীর দরজার সামনে শুয়ে পড়েন। নিজেকে পদদলিত করে বের হওয়ার জন্য মুসল্লীদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করেন। এভাবেই বুযুর্গানে দ্বীন নিজেদের নফসের ইসলাহের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। পরিশেষে হযরত মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.)-এর একটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন–

دل میں لگا کے ان کی لو * کر دے جہاں میں نشر ضو
شمع تو جل رہی ہیں سو * لیکن بزم میں روشنی نہیں

হৃদয়ে জাগাও ভালোবাসার জোয়ার, আলোকিত কর পৃথিবী।
প্রদীপ জ্বলছে অনেক কিন্তু মাহফিল আলোহীন।

প্রথমে নিজেকে আলোকিত কর। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বতের নূরে নিজের অন্তরকে নূরানী করে নাও, তারপর দুনিয়াব্যাপী তা ছড়িয়ে দাও। আজ আলেমসমাজ যদিও হেদায়েতের নূর বিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে রৌশনী নেই। আজ আমাদের ওয়ায-নসীহতের কোনো প্রভাব নেই। তার জন্য আমরা নিজেদেরকে কতটুকু প্রস্তুত করে এ খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছি– সে বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

মাহফিলের আয়োজকদের প্রতি বিশেষ হিদায়াত

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন,

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

"আর তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছে, তারা নিষ্ঠার (খালেছ

নিয়্যতের) সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। –সূরা বাইয়্যেনাহ, আয়াত : ৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

"তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।"

-মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৭৮৪৪; শুআবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস নং ৬৪৪৪

ওয়ায মাহফিল অথবা সকল দ্বীনী কাজ খালেছ নিয়্যতে সহীহ পদ্ধতিতে করা শর্ত। নতুবা এ-ধরনের কাজের দ্বারা দ্বীনী কোনো ফায়দা হয় না। আল্লাহ তা'আলা এ-ধরনের আমল কবূল করবেন না।

১. যেহেতু ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরযে আইন এবং দ্বীনী মাহফিলের দ্বারা আসল উদ্দেশ্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা, সুতরাং প্রত্যেক এলাকায় হক্কানী ওলামায়ে কিরামের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে বৎসরে একাধিকবার মাহফিল করা উচিত।

২. হক্কানী আল্লাহওয়ালা সুন্নাতের পাবন্দ মুখলিস ওলামায়ে কিরামকে দাওয়াত দেবেন। বিশেষ করে যারা ওয়াযের বিনিময় গ্রহণ করেন না এমন বক্তাকে দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে প্রাধাণ্য দেবেন। কারণ ওয়ায করা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের কাজ। আর একাজ দ্বারা তখনই উম্মতের ফায়েদা হয়, যখন তা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের তরীকায় করা হয়। আর কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে আছে, নবী (আ.) গণ ওয়াযের বিনিময় গ্রহণ করতেন না। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময়ের আশায় ওয়ায করতেন।

৩. যেহেতু দীর্ঘ বক্তব্য সাধারণ মানুষ মনে রাখতে পারে না, এজন্য রাত ১০/১১ টার মধ্যেই মাহফিল শেষ করবেন। আজকাল অনেক স্থানে সারা রাতব্যাপী ওয়ায মাহফিলের নিয়ম চালু হয়ে গেছে। এটা বন্ধ করা উচিত। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততক্ষণ ওয়ায করতে বলেছেন যতক্ষণ শ্রোতাদের ওয়াজ শোনার আগ্রহ থাকে। আর মানুষের কমজোরীর কারণে সারারাত কথা শোনার আগ্রহ থাকে না। –সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৩৭

৪. ওয়ায চলাকালে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে জামা'আতে নামায আদায় করে নিবেন। বিশেষ করে ইশার নামাযের জামা'আত পার্শ্ববর্তী এলাকার মসজিদের সময়ই আদায় করে নিবেন। যাতে মাহফিলের মাইকের আওয়াযে

পার্শ্ববর্তী এলাকার মসজিদের জামা'আতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়, মুসল্লীগণ ইশার জামা'আতের ব্যাপারে পেরেশান না হয় এবং ওয়ায শেষ করে ইশার নামায মাকরূহ সময়ে পড়তে না হয়।

৫. মাহফিলের মধ্যে কোনো হক্কানী পীর শ্রোতাদের যিকিরের মশক করাতে চাইলে মাইক ছাড়াই করাবেন। মাইকে যিকির করা শরীয়তের দৃষ্টিতে পসন্দনীয় নয়। এতে আশপাশের মসজিদে এবং লোকদের অনেক সমস্যা হয় এবং এটা যিকরে জলীর মধ্যেও পড়ে না। তাছাড়া আজকাল হক্কানী পীর নয় এমন বক্তাও নিজের খেয়াল-খুশিমতো যিকির করাতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া শ্রোতাদের যিকিরে বা দুরূদ শরীফের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে কোনো কোনো বক্তা চা-দুধ পান করতে থাকেন। এটাও ঠিক নয়।

৬. মাহফিলের মধ্যে সুন্নাতের আলোচনার ব্যবস্থা করবেন এবং নামাযসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আমলের বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন। এটা খুবই গুরুতপূর্ণ বিষয়। এটা মাহফিলের মূল উদ্দেশ্যও বটে।

৭. বয়ানের মধ্যে তারগীবী কথার সঙ্গে যে পাঁচটি বিষয় ফরযে আইন তথা আক্বাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত (লেন-দেন), মু'আশারাত (সামাজিকতা) এবং আখলাক (আত্মশুদ্ধি) তার উপর আলোচনা রাখবেন। এর জন্য দ্বীনের সকল বিষয়ের আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যে বিষয়ে আলোচনা কম করা হয় সে বিষয়ের গুরুত্বও সর্বসাধারণের মধ্যে থাকে না। এমতাবস্থায় বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ ওয়ায়েজীনের মধ্যে ওয়াযের বিষয়বস্তু বণ্টন করে দেয়া ভালো।

৮. লোকদের ওয়ায শুনবার দাওয়াত দিয়ে এনে তাদের কাছ থেকে চাঁদা কালেকশান করবেন না। কারণ প্রচারপত্রে ওয়ায শুনানোর ঘোষণা বা ওয়াদা করা হয়। চাঁদার প্রয়োজন হলে জনসাধারণকে আলাদাভাবে ডেকে পরামর্শ সভা করবেন এবং সাহায্যের আবেদন করবেন।

৯. ওয়াযের মধ্যে ভিত্তিহীন কিসসা-কাহিনী বলে শ্রোতাদের হাসানো বা কাঁদানোর বদ রসম বন্ধ করে দেবেন।

১০. কোনো জাহেলকে বক্তা বানাবেন না। চাই সে যতো সুন্দর বয়ানই করুক না কেন। কারণ এটা কিয়ামতের আলামত।

১১. চুক্তি করে ওয়াযের বিনিময় গ্রহণকারী বক্তাকে বা ভ্রান্ত আকীদাহ ও বেআমল আলেম এবং টিভি চ্যানেলের কোনো আলেমকে বক্তা বানাবেন না। কারণ এ-ধরনের বক্তার বয়ানের দ্বারা জনগণের মধ্যে দ্বীনের পরিবর্তে বদ দ্বীনী সৃষ্টি হয়।

১২. ওয়াযের শেষে আম দাওয়াত ও তাবারক বা শিরনী বিতরণের ব্যবস্থা করবেন না। এতে লোকদের ধ্যানমগ্নতা ওয়াযের দিকে না থেকে খানার দিকে থাকে। এক্ষেত্রে বয়ানের দ্বারা কোনো উপকার হয় না।

১৩. ওয়ায মাহফিল জমানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াত করাবেন না। কারণ এ কাজের জন্য কুরআন নাযিল হয়নি। এর পরিবর্তে হামদে বারী তা'আলা ইত্যাদি পড়াতে পারবেন বা ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদর্শনী পেশ করতে পারবেন। নিয়মিত বয়ান শুরু হওয়ার পূর্বে খায়ের ও বরকতের জন্য তিলাওয়াতের আদব-ফায়দা বয়ান করে সকলকে তিলাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে তিলাওয়াত শুরুর ব্যবস্থা করবেন।

১৪. মাহফিলের রাস্তার মধ্যে কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করবেন না। কিংবা রং-বেরঙের পতাকা লাগাবেন না। এসব বিষয় অমুসলিমদের অনুকরণ। তেমনি স্টেইজের মধ্যে কোনো আলোকসজ্জা করবেন না। প্রয়োজনীয় লাইটের অতিরিক্ত লাইট কিংবা মাইক লাগাবেন না। কারণ এর দ্বারা লোকদেরকে অনর্থক বিরক্ত করা হয়। অর্থেরও অপচয় হয়।

১৫. প্রচারপত্রে দিন তারিখ ও স্থান উল্লেখ করবেন। বক্তাদের নাম ঘোষণার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষদেরকে ব্যক্তির আকর্ষণে জমা করবেন না। বরং দ্বীনের আকর্ষণে জমা করবেন। কারণ ব্যক্তি চিরকাল থাকে না। অনেক মাহফিলে কোনো কোনো বক্তার ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হয় "আপনাদের আকর্ষণীয় বক্তা এসে গিয়েছেন, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বয়ান শুরু হবে" এমনটি ঠিক নয়। কোনো ওযরে নির্ধারিত বক্তা যদি না আসেন, তাহলে সকল শ্রমই ব্যর্থ বলে মনে করা হয়। এমনকি আল্লাহ না করুক এ জাতীয় পরিস্থিতিতে হতাশার কারণে অনেক ব্যক্তি হকের রাস্তা থেকেও বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে।

১৬. পোস্টার, প্রচারপত্র, দৈনিক পত্রিকা, দাওয়াত কার্ড ইত্যাদিতে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান', 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' আরবীতে ও বাংলায় লেখা হয়। কিন্তু কুরআনের আয়াত লিখিত এ কাগজটিকে হিফাযত করা হয় না। বরং ময়লা-আবর্জনায়, পেশাব-পায়খানায় ও রাস্তাঘাটে যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং পদদলিত হয়। এটা কুরআনুল কারীমের প্রতি মারাত্মক বেয়াদবীর শামিল। যা অত্যন্ত গুনাহ'র কাজ। তাই এক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ-এর পরিবর্তে বিসমিহী তা'আলা লেখা যেতে পারে। বর্তমান মুসলমানদের দুঃখ, দুর্দশার একটি অন্যতম কারণ কুরআনে পাকের সঙ্গে বিভিন্ন রকম বেয়াদবী।

১৭. স্কুল-কলেজ ও বিভিন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলাদ ও দু'আর

অনুষ্ঠান এক সঙ্গে করা হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত, মিলাদ-মাহফিল ও দু'আর পরক্ষণেই শুরু করে গান-বাজনা, নৃত্য যা সম্পূর্ণ হারাম গুনাহ'র কাজ। যা মূলত গোনাহ ও নেকের কাজ মিলিয়ে করা হয়। এটা এদিক থেকে কুরআনে পাককে অবমাননা করা ও ধর্মদ্রোহিতার বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় শিক্ষকরা নির্বাক ভূমিকা পালন করেন। এ ধরনের গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সকলকেই সোচ্চার হতে হবে।

১৮. মাহফিলের পোস্টার এমন স্থানে লাগানো উচিত নয় যেখানে কারো বাড়ি-ঘরের রং, চুনের ক্ষতি হয় বা সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। এটা এক ধরনের জুলুম। যেমন মসজিদ-মাদরাসার দেয়ালে, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদির দেয়ালে। প্রত্যেক মাদরাসায় বা মসজিদে এ-ধরনের দ্বীনী দাওয়াতের পোস্টার টানানোর জন্য আলাদা একটি স্থান নির্ধারণ করা চাই। কেননা এতে অনেক সময় আল্লাহর তা'আলার নাম ও কুরআনের আয়াত লেখা থাকে। তাছাড়া এভাবে পোস্টার লাগানো বর্তমানে প্রচলিত আইনেরও পরিপন্থী।

১৯. মাহফিল শেষে পোস্টারগুলো নিজ দায়িত্বে উঠিয়ে নেয়া।

২০. মানুষ চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে মাহফিল করবেন না। এতে লোকদের কষ্ট দেয়া হয়, যা শরীয়তবিরোধী কাজ। সুতরাং মসজিদ বা কোনো মাঠ-ময়দানের মধ্যে মাহফিলের ব্যবস্থা করবেন।

২১. প্রকাশ্যে ফাসেক ফাজের বেআমল কোনো লোককে মাহফিলের সভাপতি বা পরিচালক কিংবা বিশেষ অতিথি ইত্যাদি বানাবেন না। এতে খোদাদ্রোহীদের সম্মান প্রদর্শন করা হয়। প্রকম্পিত হয় মহান আল্লাহর আরশ। এটা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। –সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯

২২. মাহফিলের কোনো ছবি তুলে রাখবেন না এবং কোনো প্রকার ভিডিও এবং সিডি করে রাখবেন না। এগুলো সব নিষিদ্ধ। এতে দ্বীনী মাহফিলের লক্ষ্য বরবাদ হয়ে যায় এবং বদ দ্বীনী ও গোমরাহী কায়েম হয়।

২৩. কোনো বক্তার আগমনে নারায়ে তাকবীর বা অন্য কোনো স্লোগান দেবেন না। এটা সুন্নাতের খেলাফ। বিশেষ করে ওয়াযের মধ্যে কোনো বক্তার বয়ান বন্ধ করে কোনো স্লোগান দিবেন না। কুরআন-সুন্নাহর আলোচনা অনেক উঁচু কাজ। কারো আগমনে তা বন্ধ করার অবকাশ নেই।

২৪. হযরতওয়ালা মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) প্রতিমাসে একদিন ইসলাহী ও তরবীয়তী মজলিস করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মাহফিলে যার যার খানা সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন এবং খানার পূর্বে খানার সুন্নাতসমূহ মুযাকারা করে

সে অনুযায়ী খানা খাবেন। এতে কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের দাওর করা, উযূ, নামায এবং জীবনের প্রত্যেকটি কাজের সুন্নাত ও মাসনূন দু'আসমূহ মুখস্ত করার মুযাকারা করতে হবে। হাযিরা খাতার মাধ্যমে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। যারা আসতে পারেননি তাঁদের খোঁজ-খবর নিতে হবে। –আ'মালুস সুন্নাহ: ২৩১-২৩৪

মাহফিলের শ্রোতাদের প্রতি হিদায়াত

ওয়ায মাহফিল যেহেতু দ্বীন শিক্ষার একটি মাধ্যম তাই বক্তা ও শ্রোতা সবার জন্য-এর দ্বারা ফায়দা হয়। উভয়েই উপকৃত হওয়ার জন্য কিছু আদব ও শর্ত আছে। এখানে শ্রোতাদের বিষয়ে কতিপয় আদব উল্লেখ করা হল।

সর্বপ্রথম একজন শ্রোতার জন্য যে কাজটি আবশ্যকীয় তা হলো, যখন কোন নতুন ওয়ায়েজ আসবেন, নিজের শহরের কিংবা কোনো কাছাকাছি শহরের নির্ভরযোগ্য কোনো আলেমের কাছ থেকে তার অবস্থা জেনে নেবেন। যদি তিনি ভালো বলেন তা হলে তার ওয়ায শুনবেন, তা না হলে শুনবেন না। কারণ কিছু কিছু ওয়ায়েজ জাহেল হয়ে থাকে। আর কোনো কোনো আলেম ভ্রান্ত মাযহাবের অনুসারী হয়। তাদের কেউ কেউ সরাসরি নিজ মত ও পথ তুলে ধরে তা শ্রোতার মন-মগজে বসিয়ে দেয়ার মতো কৌশল জানে। কেউ কেউ আবার শুরুতে শ্রোতাদের ধ্যান-ধারণা মতে কথা বলে জমিয়ে নিয়ে অবশেষে নিজের মত ও পথের দিকে আহবান জানায়।

১. শ্রোতা নিজে হেদায়েতের মোহতাজ হয়ে নেক নিয়্যতে বসবে।

২. যে সমস্ত দ্বীনী বিষয়ে নিজের মধ্যে কমতি আছে, ইলম হওয়া মাত্র তা দূর করবে।

৩. নসীহতের কথা কে বলছেন তার দিকে খেয়াল না করে কার কথা বলছেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

৪. মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূঈ (রহ.) বলতেন, যেখানেই যাও খালী হয়ে অর্থাৎ হিদায়াতের মুখাপেক্ষী হয়ে যাও, তাহলে ভরা অবস্থায় ফিরে আসবে।

৫. আমলের নিয়্যতে শোনা এবং অন্যকে আমলের দাওয়াত পৌঁছানো।

৬. ইলম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমলে লেগে যাওয়া।

৭. হযরত মুহিউস সুন্নাহ হারদূঈ (রহ.) ইরশাদ করেন, ওয়াযের সময় বা কিতাবের তা'লীমের সময় তিলাওয়াত, নফল নামায বা কোনো ওযীফা

সেখানে পড়া অনুচিত। দ্বীনের একটি মাসআলা শিক্ষা করা শত রাকা'আত নফল নামায অপেক্ষা উত্তম। –ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

উপরোক্ত আদবসমূহ ছাড়াও শ্রোতাবৃন্দের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা জরুরী।

সুরওয়ালা, টানওয়ালা আর কিসসা-কাহিনীনির্ভর সুন্দর বয়ানের আছর কেবল ক্ষণিকের। উপস্থিত সময়ে শুনতে মজা লাগলেও তার প্রভাব স্থায়ী থাকে না। এরকম বয়ান বাতাসের মতো অস্থায়ী। এদের বয়ান যদিও বাহ্যিকভাবে শ্রুতিমধুর থাকে কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় এতে হিদায়াত ও ইসলাহের কিছুই নেই। এমন ওয়াযের প্রতিক্রিয়া কান পর্যন্ত। ঐ ওয়ায অন্তর স্পর্শ করতে পারে না। বর্তমানে অনেক জায়গায় ওয়াযের বক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খেয়াল রাখা হয়, কোন্ বক্তাকে আনলে লোক সমাগম বেশি হবে। সুরের লহরী বা টানের ঝঙ্কারে মাহফিল গরম থাকবে। কালেকশনটা ভালো হবে। বরং এটা লক্ষ্য করা হয় না, কাকে দাওয়াত করলে দ্বীন, ঈমান, আমলের উন্নতি হবে। আখেরাতের চিন্তা-ফিকির পয়দা হবে। গুনাহ থেকে তাওবা করবে, বেনামাযী নামাযী হবে। সাধারণতঃ দেখা যায় ওয়ায-মাহফিলের যারা আয়োজন করেন তারা আম লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে বক্তা নির্বাচন করে থাকেন। তাছাড়া যারা যেই মতাদর্শের অনুসারী তারা সে পন্থী বক্তাকে দাওয়াত করে অর্থাৎ বেদআতী, ভণ্ড পীরের মুরীদ এসব লোকের চাহিদা মোতাবেক বক্তা নির্ধারণ করে থাকেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেমগণের সঙ্গে পরামর্শ করে বক্তা নির্বাচন করা উচিত। বেশি লোক জড়ো করা ওয়াযের মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য মানুষের হিদায়াত। আমাদের ওয়ায ব্যবস্থাপনার মূলে সহীহ নিয়্যত না থাকার কারণে দিন দিন ওয়ায-মাহফিলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ওয়াযের দ্বারা আমাদের আমল-আখলাকের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। কাজেই দ্বীন ঈমানের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদি নফসের চাহিদায় করা হয়, তাহলে তা কখনও দ্বীনী কাজ হতে পারে না। বর্তমান যুগে এমন অনেক বক্তা আছে, যারা নানা ঘটনা ও কিসসা কাহিনীকে রঙ-রস দিয়ে বর্ণনা করেন। শ্রোতাগণও তাদের বক্তব্য শোনার জন্য অধিক ঝুঁকে থাকেন। তাদের বক্তব্যে না আছে কোনো ইলমী আলোচনা, না পাওয়া যায় আখেরাতের অনুভূতি জাগাবার মতো কোনো কথা, না আছে নেক কাজের আগ্রহ সঞ্চারক কোনো বিবরণ, তারা না ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত শিক্ষা দেন, না কোনো পাপ থেকে বাঁচার কোনো পথ দেখান। তারা গ্রামে গ্রামে, শহরে বন্দরে ওয়ায করে বেড়ান অথচ মানুষের প্রকৃত করণীয় সম্পর্কে কিছুই বলেন না। কেউ কেউ অন্যের কণ্ঠ নকল করেন। একই বিষয়ে বার বার টেপের মতো শুনিয়ে

শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের খোরাক দিয়ে থাকেন। এটা ওয়ায নয়, নিছক অর্থহীন আওয়ায। যেমন– রূহানী রোগের রোগী আরেক রূহানী রোগগ্রস্থকে চিকিৎসা দিচ্ছে।

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান মুফতী শফী (রহ.)-এর মালফূযাতে আছে, এ-ধরনের বক্তাদের ওয়ায শোনার চেয়ে ঘরে ঘুমিয়ে থাকা উত্তম।

ইবনুল জাওযী (রহ.) 'তালবীসে ইবলিস' নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন, অনেক ওয়ায়েয আছে, যাদের কথার রঙ আছে অথচ কোনো অর্থ নেই। তারা মিষ্টভাষী। শুনতে ভালো লাগে অথচ তাদের কথায় দ্বীনী ফায়দা নেই। তিনি আরও বলেন, কিছু ওয়ায়েয আছে যারা অঙ্গভঙ্গি করে তিলাওয়াতে সুর লাগায়। গানের সুরে তিলাওয়াত করা শুধু মাকরূহই নয় বরং হারাম। তিনি আরও বলেন, আমাদের যুগে এমন কিছু ওয়ায়েযের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা ওয়ায করাকে টাকা-পয়সা উপার্জনের অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছে। ওয়াযের বাজার এখন চড়া। চড়া দাম না দিলে বক্তাও পাওয়া দুষ্কর। সম্মানিত বন্ধুগণ! এই সমস্ত ওয়াযকারীদের কথা চিন্তা করুন আর ভেবে দেখুন, মুসলমানদের ঈমান-আমলের ব্যাপারে তাদের কি কোনো মাথাব্যথা আছে? আশ্চর্যের বিষয় হলো যে সব বক্তা আমাদের আমলের উন্নতি, গোনাহ থেকে বাঁচানোর কোনো ফিকিরই করে না আজ আমরা তাদের নিয়েই ব্যস্ত। আমাদের আকর্ষণ ও গুরুত্ব কেবল সুরওয়ালা, টানওয়ালা, ভঙ্গিওয়ালা বক্তাদের প্রতি। আর যে সকল মুখলিস, আল্লাহওয়ালা, দ্বীনদরদী ওয়ায়েজ যারা নিজ গরজে দ্বীনের কথা শুনিয়ে থাকেন তাদের কোনো মূল্যায়নই করি না। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে সভাপতির আসনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে ওয়াযের পাহারাদার বানানো হয়। আলোচনা বা কোনো কথা বলার সুযোগ দেয়া হয় না। আর সুযোগ হলেও সুর পিয়াসীরা তাদের কথার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মজলিস থেকে উঠতে শুরু করে। এতে করে বুর্যূগানে দ্বীনকে এহানত করা হয়। এ ধরনের আচরণ দুঃখজনক। এ ধরনের দ্বীনী কাজে লিল্লাহিয়াত দিন দিন হ্রাস পাওয়ার কারণে এ-ধরনের ওয়ায-মাহফিল নিছক আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কিছু নয়। বর্তমানে ওয়াযের আনুষ্ঠানিকতার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ অর্থসম্পদহীন দরিদ্র লোকদের জন্য ওয়ায-মাহফিলের আয়োজন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতে করে দ্বীন শিক্ষার একটি মাধ্যম থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়, ইদানিং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে নতুন নতুন তথাকথিত ইসলামী বিশ্লেষক, গবেষক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে উদ্ভট মনগড়া নিত্য নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে অতিসূক্ষ্মভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মানুষের ঈমান-আকীদা বরবাদ করে যাচ্ছে। এ ধরনের গবেষকদের

জীবনাচরণে ইসলামের কোনো অনুশীলন লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই মিডিয়ার গবেষক-বিশ্লেষকদের অপপ্রচার, অপব্যাখ্যা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এ ধরনের ইসলামের প্রবক্তাগণ ইসলামের দুশমনদের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উম্মতের হিদায়াত ও সংশোধনের বিষয়ে ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, এই উম্মতের সংশোধন ও সাফল্য একমাত্র পূর্বসুরীদের সংশোধন ও সফলতার পথেই নিহিত। আমাদের পূর্বপুরুষ তথা সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন যে পথে চলে জীবনের সফলতা হাসিল করেছিলেন, আমাদেরকেও সে পথে চলে সফলতা হাসিল করতে হবে। আর সেই নূরানী পথের নামই হলো সুন্নাত।

সঠিক রাস্তায় চলার জন্যে দু'টি বিষয়কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ.

"আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ এ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহ তা'আলার কিতাব পবিত্র কুরআন, অপরটি হলো আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত।" -মুআত্তা মালেক, হাদীস ৩৩৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীকে পসন্দ করেন। -সূরা বাকারা : ২২২

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতার প্রতি বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বনকারীদের প্রশংসা করেছেন। ইরশাদ করেন–

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

অর্থ- সেখানে (মসজিদে কুবার আশপাশে) এমন লোক রয়েছে যারা পবিত্র থাকতে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রদেরকে ভালোবাসেন।

-সূরা তওবা : ১০৮

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.), হযরত জাবের ও হযরত আনাস (রাযি.) প্রমুখ বলেন, কুবায় বসবাসকারী আনসার সাহাবী (রাযি.) গণের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হলে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন– হে আনসারগণ! আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতার ব্যাপারে তোমাদের প্রশংসা করেছেন, এখন তোমাদের পবিত্রতার বর্ণনা দাও। তারা আরয করলেন, আমরা নামাযের জন্য উযূ করি। জানাবতের গোসল করি এবং ঢিলা ব্যবহার করার পর পানিও ব্যবহার করি। শুনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন:

فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ

হ্যাঁ এই সেই পবিত্রতা, তোমরা একে আকঁড়ে ধর।

-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৫; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ৫২৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ

অর্থ- পবিত্রতা ঈমানের অংশ। -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩

ইস্তিঞ্জার (পেশাব-পায়খানা) সময় আট কাজ করা সুন্নাত

১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা। -আবু দাউদ হা:নং ৩২
২. জুতা/স্যান্ডেল পায়ে রাখা। -তাবকাতে ইবনে সাদ:১৮৫, কানয-হা: ১৭৮৭
৩. মাথা ঢেকে রাখা। -সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ৪৬৪, ৪৬৫
৪. দিলে দিলে ইস্তিগফার করা।
৫. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।[১] -বাইহাকী হা : ৫১৭
৬. পানি খরচ করা। -সহীহ ইবনে খুযাইমা হা : ৮৩
৭. ডান পা দিয়ে বের হওয়া। -আবু দাউদ হা : ৩২
৮. আগে ও পরে দু'আ পড়া।[২]

ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের দু'আ–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

(আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি (দুস্কৃতিকারী) শয়তান জ্বীন থেকে।) -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং ৩০৫২২

ইস্তিঞ্জাখানা থেকে বের হওয়ার দু'আ–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِيْ

(হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন। সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। যিনি আমার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করেছেন এবং আমাকে শান্তি দিয়েছেন।) -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩০০, ৩০১; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৭; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ৯৮২৪, ৯৮২৫; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস নং ৩০৫৩০ (দ্বিতীয় অংশের ব্যপারে যাওয়ায়েদে আছে, في الزوائد هو متفق على تضعيفه)

---

১. টীকা: আধুনিক (স্যানিটারী) পায়খানায় মাটির ঢিলা বা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করলে অসুবিধা দেখা দেয়। এজন্য মুফতী রশীদ আহমদ রহ. টয়লেট পেপার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

২. বিসমিল্লাহ অর্থাৎ ইস্তিঞ্জাখানায় প্রবেশের পূর্বে বর্ণিত দু'আ পড়ে প্রবেশ করবে। কারণ এটা জিন ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা সৃষ্টি করে।

পাঁচ দিকে ফিরে ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

১. কিবলার দিকে মুখ করে।
২. কিবলার দিকে পীঠ করে।
৩. চন্দ্র ও সূর্যের দিকে মুখ করে।
৪. প্রবল বাতাসের দিকে মুখ করে।
৫. একেবারে উলঙ্গ হয়ে।

ছয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ

১. আল্লাহ্ তা'আলার নাম।
২. নবী (আ.)গণের নাম।
৩. ফেরেশতাগণের নাম।
৪. কুরআন শরীফের আয়াত।
৫. হাদীস শরীফের টুকরা।
৬. দু'আ কালাম (লিখিত বা অঙ্কিত)।

দশ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ

১. মানুষ চলাচলের রাস্তায়।
২. ছায়াদার কিংবা ফলদার গাছের নিচে।
৩. উযূ ও গোসলের স্থানে।
৪. গর্তের ভিতরে।
৫. গোরস্থানে।
৬. দাঁড়িয়ে বা হেঁটে হেঁটে।
৭. বিনা ওযরে পানিতে।
৮. ঘরে বা বিছানায়।
৯. মসজিদের আঙ্গিনায় বা ঈদগাহে।
১০. মানুষের সম্মুখে।

ইস্তিঞ্জার সময় আট কাজ করা নিষেধ

১. কথা বলা।
২. যিকির করা বা তাসবীহ্ পড়া।
৩. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৪. সালাম দেয়া।

৫. সালামের উত্তর দেয়া।
৬. খাওয়া ও পান করা।
৭. মিসওয়াক করা।
৮. কোনো কিছু পড়া বা লেখা।

ইস্তিঞ্জায় দশ জিনিস ব্যবহার করা নিষেধ

১. হাড্ডি।
২. কয়লা।
৩. কাগজ।
৪. কাঁচ।
৫. গাছের কাঁচা পাতা।
৬. খাদ্যদ্রব্য।
৭. শুকনো গোবর।
৮. যমযমের পানি।
৯. ডান হাত দ্বারা।
১০. ব্যবহৃত ঢিলা পুনরায় ব্যবহার করা।

ইসলাহ :

(ক) পেশাবের ছিটা থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা হাদীস শরীফে আছে, অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক না থাকার কারণে হয়। পেশাবখানা নির্মাণের ক্ষেত্রে এমনভাবে নির্মাণ করা চাই, যাতে করে পেশাবের ছিটা শরীরে এবং জামায় না পৌঁছতে পারে।

(খ) পেশাব করার জন্য নরম বা ঢালু জায়গা খুঁজে নিবে, যাতে পেশাবের ছিটা শরীরে না আসে বরং মাটি তা শুষে নেয় বা গড়িয়ে যায়।

পেশাব-পায়খানার কতিপয় আদব

১. পেশাব-পায়খানার বেগ থাকলে উযূ করার আগেই তা সেরে নিবে। পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রাখা উচিত নয় এবং এমতাবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ।

২. পেশাব-পায়খানার চাপ অনুভব হলে ঢিলা-কুলুখ এবং বদনা জাতীয় পাত্রে কিছু পানি নিয়ে ইস্তেঞ্জাখানা বা কোনো আড়াল জায়গায় গিয়ে প্রয়োজন সারবে।

৩. বসে পেশাব করবে। অপারগতা ছাড়া কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না। -জামে তিরমিযী

৪. বসার সময় জামা-কাপড় রীতিমতো ঠিক করে নিবে। যেন তাতে কোনো নাপাকী না লাগতে পারে।

৫. বসার কাছাকাছি গিয়ে কাপড় উঠাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় খুলবে না। -সুনানে আবু দাউদ

৬. ইস্তেঞ্জার সময় যথাসম্ভব গুপ্তাঙ্গের দিকে নযর করবে না এবং তাতে ডান হাত লাগাবে না।

৭. পুরুষের পেশাব করা শেষ হলে, বাম হাতে গুপ্তাঙ্গের মাথায় ঢিলা ধরে নির্জন স্থানে উঠা-বসা এবং প্রয়োজনে একটু হাঁটাহাঁটি করবে। তারপর পেশাবের নির্গমন বন্ধ হওয়া নিশ্চিত হলে পানি ব্যবহার করবে।

৮. কুলুখ ব্যবহাররত অবস্থায় কারও সঙ্গে কথা বলবে না এবং জনসম্মুখে হাঁটাহাঁটি করবে না।

৯. ডান হাতে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে শৌচকর্ম সমাধা করবে।

১০. কুলুখ ব্যবহার না করলে, পেশাবের ফোঁটায় কাপড়-চোপড় নাপাক হয়ে যেতে পারে এবং পেশাব নির্গমন বন্ধ হওয়ার আগে উযূ করলে উযূও সহীহ হবে না। কাজেই এরকম উযূ দিয়ে নামায আদায় করলে তাও সহীহ হবে না। উল্লেখ্য- একান্ত কারো নিকট কুলুখ না থাকলে কিছুক্ষণ বসে নড়াচড়া করবে এবং কয়েকবার কাশি বা খাকারী দিয়ে পেশাবের নির্গমন বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে পানি ব্যবহার করবে।

১১. মহিলাদের জন্য পেশাব করে কুলুখ নেয়া জরুরী নয়। তারা শুধু পানি ব্যবহার করবে। তবে পায়খানার পর অবশ্যই কুলুখ ব্যবহার করবে।

মিসওয়াক, উযূ, গোসল, তায়াম্মুম

মিসওয়াকের ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ.

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি উম্মতের জন্যে কঠিন হওয়ার আশঙ্কা না হতো, তবে আমি তাদের উপর প্রত্যেক নামাযের জন্যে মিসওয়াক করা ওয়াজিব করে দিতাম। -মিশকাত, ১/৪৪

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মিসওয়াক করা মুখের পবিত্রতার উপায় এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণ। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৩৩

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যখনই আমার কাছে এসেছেন, তখনই মিসওয়াক করার কথা বলেছেন। এবং বারবার তাকীদ করার কারণে এমন আশঙ্কা হয় যে, আমি আমার মুখের অগ্রভাগ মিসওয়াক করতে করতে ক্ষয় না করে ফেলি।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২২৬৯; মুজামে কাবীর, তবারানী, হাদীস নং ৭৮৪৭

৪. আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিলো দিনে অথবা রাত্রে যখনই তিনি ঘুমাতেন, ঘুম থেকে উঠার পর উযূ করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন। ওফাতের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ কাজ ছিলো মিসওয়াক করা। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৪৯০০ ; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ১৭০

৫. আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নামাযের জন্যে মিসওয়াক করা হয়, তা মিসওয়াকবিহীন নামাযের মোকাবেলায় সত্তরগুণ উত্তম। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৬৩৪০;সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ১৩৭; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ২৫১৮; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ১৬২

৬. সাধারণতঃ মহিলাদেরকে সুন্নাত তরীকায় মিসওয়াক ব্যবহার করতে দেখা যায় না। অথচ মিসওয়াকের গুরুত্ব ও ফযীলত পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

মিসওয়াকের ধরন

১. মিসওয়াক নিম, যাইতুন বা যে কোনো তেতো গাছের ডাল হওয়া উত্তম। -শামী : ১/১৩৪

২. মিসওয়াক কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মতো মোটা হওয়া উত্তম। -শামী : ১/২৩৪

৩. মিসওয়াক এক বিঘা থেকে অধিক লম্বা না হওয়া ভালো। -শামী : ১/২৩৫

৪. মিসওয়াক নরম হওয়া ভালো। -শামী : ১/২৩৪

৫. মিসওয়াকের ডাল কাঁচা হওয়া উত্তম। –রদ্দুল মুহতার, আলমগীরী -১/৭

মিসওয়াক ধরার পদ্ধতি

১. মিসওয়াক ডান হাতে ধরা মুস্তাহাব। -শামী : ১/২৩৪

২. কনিষ্ঠাঙ্গুলী নিচে, বৃদ্ধাঙ্গুলী অগ্রভাগে এবং বাকী আঙ্গুলগুলো উপরে স্থাপন করে মেসওয়াক ধরা উত্তম। -আলমগীরী : ১/৭

মিসওয়াক করার সুন্নাত তরীকা

১. মিসওয়াক শুরু করার পূর্বে মিসওয়াক ভিজিয়ে নিবে। -শামী : ১/২৩৫

২. বিসমিল্লাহ্ বলে মিসওয়াক শুরু করবে।

৩. প্রথমে দাঁতের উপরের সারির ডান দিকে ঘষবে তারপর বাম দিকে, এরপর নিচের সারির ডান দিকে তারপর বাম দিকে। অতঃপর দাঁতের ভিতরের দিকে অনুরূপভাবে ঘষবে। –দুররুল মুখতার, শামী : ১/২৩৫

৪. মিসওয়াক জিহ্বার উপরিভাগে ও তালুতেও ঘষা উত্তম।

৫. উপরের নিয়মে তিনবার করে ঘষা উত্তম। প্রতিবারেই নতুন পানি দিয়ে মিসওয়াক ধুয়ে নেয়া মুস্তাহাব।

৬. মিসওয়াক প্রথমে দাঁতের উপর চওড়াভাবে এবং পরে গোড়ার দিক থেকে আগার দিকে ঘষবে। -আলমগীরী : ১/৭

৭. শোয়া অবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরূহ। -শামী : ২/২৩৫

৮. মিসওয়াক করার পর তা ধুয়ে কোথাও খাড়া করে রাখবে। -শামী-২/২৩৫

যে যে সময়ে মিসওয়াক করা সুন্নাত

১. ঘুম থেকে উঠার পর। -শামী : ১/২৩৩
২. উযূর পূর্বে। -শামী : ১/২৩৩
৩. কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে। -শামী : ১/২৩৩
৪. হাদীস শরীফ পড়া ও পড়ানোর আগে। -শামী : ১/২৩৩
৫. (অনেক আগে উযূ করে থাকলে) নামাযে দাঁড়ানোর সময়।-শামী : ১/২৩৩
৬. খানায়ে কা'বা বা হাতীমে কা'বায় প্রবেশের সময়। -শামী : ১/২৩৩
৭. যিকির করার পূর্বে।
৮. মুখে দুর্গন্ধ হলে। -শামী : ১/২৩৩
৯. কোনো দ্বীনী মজলিসে যাওয়ার আগে।
১০. ঘরে প্রবেশের পরে। -শামী : ১/২৩৩
১১. স্ত্রী সহবাসের পূর্বে। -শামী : ১/২৩৩
১২. ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত হলে।
১৩. সফরে যাওয়ার পূর্বে।
১৪. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে।
১৫. খাদ্য গ্রহণের আগে।
১৬. ঘুমানোর পূর্বে।
১৭. সাহরী খাওয়ার সময়।
১৮. মৃত্যুর চিহ্ন ফুটে উঠার পূর্বে। –আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব

উযূর ফযীলত

● হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ঈমানদার উযূ করবে, সে যখন মুখ ধৌত করবে তখন পানির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে বা শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দ্বারা যতো (ছগীরা) গুনাহ হয়েছে সব মাফ হয়ে যাবে। তারপর যখন দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে, তখন পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে হাতের দ্বারা যতো (ছগীরা) গুনাহ হয়েছে সব মাফ হয়ে যাবে। তারপর যখন উভয় পা ধৌত করবে তখন পানির শেষ ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের দ্বারা যতো ছগীরা গুনাহ হয়েছে সব মাফ হয়ে যাবে এবং সে গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৪; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ১০৪০; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ২৪৭৬

● হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি উযূ শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ পড়বে এবং উযূ শেষ করে এই দু'আ পড়বে–

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে ইচ্ছামতো যে কোনো দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

–সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৪; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫

- আর যদি এরূপ উযূ করার পর অন্তরের একাগ্রতার সঙ্গে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল উযূ পড়ে, তাহলে নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর তার সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।

-বেহেশতী জেওর উর্দু ১/৯২ পৃ.

- যে উযূ করার সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করবে না, তার উযূ কামেল হবে না। -বেহেশতী জেওর উর্দু : ১/৯২ পৃ.

উযূর ফরয ৪টি

১. সমস্ত মুখ ধোয়া। –সূরা মায়িদাহ : ৬
২. উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া। –সূরা মায়িদাহ : ৬
৩. মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসাহ করা। –সূরা মায়িদাহ : ৬
৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা। –সূরা মায়িদাহ : ৬

বি. দ্র. উপরোক্ত চারটি কাজের কোনো একটি না করলে বা এর মধ্যে একচুল পরিমাণও শুকনা থাকলে উযূ সহীহ হবে না। –শামী ১/৯১

উযূর সুন্নাতসমূহ

উযূর সুন্নাত ১৮টি। উযূতে এই সুন্নাতগুলো যত্নের সঙ্গে আদায় করলে উযূ পরিপূর্ণ হয়, অন্যথায় উযূ অসম্পূর্ণ থাকে।

১. উযূ দ্বারা পবিত্রতা হাসিল, নামায দুরস্ত হওয়া এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের নিয়্যত করা। –সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৬৮৯

২. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে উযূ আরম্ভ করা। –নাসায়ী, হাদীস নং ৭৮

৩. উভয় হাত পৃথক পৃথক ভাবে কব্জি-সহ তিন বার ধৌত করা। তবে একসঙ্গে ধোয়াও জায়েয।

-ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি খণ্ড ১ : পৃ ৬, শরহুল ইনায়া ১/১৯, বুখারী, হাদীস নং ১৫৯

৪. মিসওয়াক করা। মিসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা উত্তমরূপে দাঁত পরিষ্কার করে নিবে। –মুসনাদে আহমদ হা: ৯২২৬, মারাকিল ফালাহ

৫. গড়গড়া করে তিনবার কুলি করা। তবে রোযা রাখা অবস্থায় গড়গড়া করবে না। -সুনানে আবু দাউদ

৬. তিনবার নাকের ভিতর পানি দেয়া। বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা নাকের ভিতরের অংশ পরিষ্কার করা (রোযাদার না হলে নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি টেনে নেয়া এবং ঝেড়ে ফেলা উত্তম)। -সহীহ ইবনে হিব্বান-হা:১০৭৭

৭. উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধোয়া।-সহীহ বুখারী, হা: নং ১৫৯

৮. মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় এক হাতে পানি নিয়ে থুতনিতে লাগিয়ে ঘষা তারপর হাতের তালু বাইরের দিকে রেখে গলার দিক থেকে দাঁড়ি খিলাল করা।
-সুনানে আবু দাউদ, শরহে বেকায়া

৯. কনুইসহ হাত এবং টাখনুসহ পা ধোয়ার সময় আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।
-জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮

উল্লেখ্য আঙ্গুল সমূহ খিলাল করার তরীকা হলো, এক হাতের আঙ্গুলের পেট অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের ফাঁকে রেখে খিলাল করা। আর ডান পায়ের কনিষ্ঠ থেকে বাম পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল পযর্ন্ত ধারাবাহিক ভাবে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করা।- মা'রিফুস সুনান ১/২৪৫

১০. সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসাহ করা। -শামী, তিরমিযী হা : নং ৩৪

১১. উভয় কানের ভিতর ও বাহির মাসাহ করা।
-নাসায়ী, তিরমিযী, হা. ৩৩, আবু দাউদ, হা. ১৩৫

১২. উযূর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে মেজে-ঘষে ধৌত করা।
-মারাকিল ফালাহ, মুস্তাদরাক, হা. ৫৭৬

১৩. প্রত্যেক অঙ্গ পর পর ধোয়া (এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই অন্য অঙ্গ ধোয়া)। -মারাকিল ফালাহ : ৪০

১৪. উযূর অঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে ধোয়া।
-হেদায়া : ১ম খণ্ড, আবু দাউদ, হা. ১৩৭

১৫. ডান দিক থেকে উযূর অঙ্গসমূহ ধোয়া আরম্ভ করা। -সহীহ বুখারী :১৬৮

১৬. মাথা মাসাহ কপাল থেকে এবং হাত-পা ধোয়া আঙ্গুলের দিক থেকে শুরু করা। -মারাকিল ফালাহ : ৭৪

১৭. গর্দানের পেছন অংশ হাতের আঙ্গুলের পীঠ দ্বারা মাসাহ করা (গর্দানের ডান-বাম পাশ ও গলা মাসাহ করা নিষেধ)। -মারাকিল ফালাহ

১৮. উযূর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত ও এই দু'আ পড়া-

أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

উযূর আদবসমূহ

১. ওয়াক্ত আসার আগে উযূ করা। (মাযূরদের মাসআলা ভিন্ন)
২. উঁচু স্থানে বসে উযূ করা।
৩. পবিত্র স্থানে বসে উযূ করা।
৪. কেবলামুখী হয়ে উযূ করা।
৫. বিনা ওযরে উযূর সময় অন্যের সাহায্য না নেয়া।
৬. উযূতে ব্যবহৃত পানি নাপাক জায়গায় না ফেলানো।
৭. ডান হাতে পানি নিয়ে তার সঙ্গে বাম হাত মিলিয়ে কপালের উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে ধোয়া আরম্ভ করা।
৮. মুখে পানি আস্তে লাগানো। জোরে পানি মারা মাকরূহ।
৯. দাঁড়ি পাতলা হলে চামড়াতে পানি পৌঁছাতে হবে। আর ঘন দাঁড়ি হলে মুখের বেষ্টনীর ভিতরের দাঁড়ি ধুয়ে ফেলতে হবে, চামড়াতে পানি পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই। দাঁড়ির উপর থেকে নযর করলে যদি নিচের চামড়ার রং বুঝা যায় তাহলে দাঁড়ি পাতলা, অন্যথায় ঘন বলে গণ্য হবে।
১০. চেহারার বেষ্টনীর বাইরের ঝুলন্ত দাঁড়ি মাসাহ করা সুন্নাত।
১১. হাতে আংটি থাকলে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভিতরে পানি প্রবেশ করানো। আংটি সঙ্কীর্ণ হলেও এরূপ করা আবশ্যক। মহিলাদের নাকের অলঙ্কার, চুড়ি ইত্যাদির বেলায়ও এই বিধান প্রযোজ্য।
১২. *মাথা মাসাহের জন্য নতুন পানি নেয়া উত্তম।*
১৩. উভয় হাত দ্বারা মাথা মাসাহ করা সুন্নাত। এক হাত দ্বারা মাসাহ করা সুন্নাতের খেলাফ।
১৪. উযূর প্রয়োজন মোতাবেক পানি ব্যবহার করা, কম-বেশি ব্যবহার না করা। আজকাল ট্যাপে উযূ করতে গেলে প্রচুর পানির অপচয় হয়। তাই সম্ভব হলে কোনো পাত্রে পানি নিয়ে উযূ করবে। অন্যথায় ট্যাপের পানি হালকাভাবে ছেড়ে উযূ করবে এবং মাঝে মধ্যে বন্ধ করবে।

১৫. রোযাদার না হলে উযূর অবশিষ্ট পানি বা তা থেকে কিছু পান করা মুস্তাহাব। এর মধ্যে অনেক রোগের শেফা আছে। এ পানি কেবলামুখী হয়ে এবং দাঁড়িয়ে পান করা উত্তম। তবে বসেও পান করা যায়। কোনো বর্ণনায় এটাও আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূর পর লুঙ্গিতে পানি ছিটিয়ে দিতেন।

–ফাতহুল কাদীর, তুহফাতুল আহওয়াযী, তুহফাতুল আলমায়ী

১৬. উযূর মধ্যে কালেমায়ে শাহাদাত, দুরূদ শরীফ ও এই দু'আ পড়া-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

–আসালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ লি ইবনিস সুন্নী, হাদীস নং ২৮

উযূ আমলী মশকের মাধ্যমে শিখতে হবে

হযরত উসমান (রাযি.) উযূর বর্ণনা দেয়ার পর বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠিক এমনিভাবে উযূ করতে দেখেছি।

–সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

উযূর ক্ষেত্রে তিনি বলেননি যে, تَوَضَّؤُوْا 'হে লোক সকল! যেভাবে তোমাদের মন চায় সেভাবে তোমরা উযূ করে নাও। বরং উযূর নির্দেশও দিয়েছেন এবং উযূ করেও দেখিয়েছেন। একবার তিনি উযূ করে দেখালেন, প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন,

هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً اِلَّا بِهٖ

-এই হলো উযূ। যা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবূল করেন না। অঙ্গসমূহ যদি একবার করেও না ধোয়া হয় তাহলে উযূ হবে না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার উযূ করলেন। এবার প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, এই হলো উযূ, যা نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ তথা উত্তম পদ্ধতির উযূ। এরপর তিনি তৃতীয়বার উযূ করে দেখালেন। এবার অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, هٰذَا وُضُوْئِيْ وَوُضُوْءُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ এই হলো আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী (আ.) গণের উযূ। তাঁরা এভাবেই উযূ করতেন।

সুতরাং তিনি নির্দেশ দেননি যে, উযূ কর। (অর্থাৎ শুধু নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, নমুনা উপস্থাপন করেছেন) অর্থাৎ ইলমের ক্ষেত্রে তোমাদের যেমন

ইচ্ছামতো মতামত উপস্থাপনের স্বাধীনতা নেই, আমলের ক্ষেত্রেও তোমাদের স্বাধীনতা নেই যে, যেমন ইচ্ছা নমুনা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাকের রাসূলের আনুগত্য করতে হবে।

শুধু উপরোক্ত বর্ণনা পড়ে সুন্নাত তরীকায় উযূ করা সম্ভব নয়। এজন্য কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে সব বিষয় চাক্ষুষভাবে দেখে আমলী মশ্‌ক করে নিতে হবে।

ইসলাহ: বর্তমানে প্রায় সব বাসা বাড়িতে সংযুক্ত বাথরুমে একসঙ্গে উযূ, গোসল ও পেশাব-পায়খানার ব্যবস্থা থাকে। এমন স্থানে উযূর ব্যবহৃত পানি প্রবাহিত করা এবং উযূর মাসনূন দু'আসমূহ মুখে আদায় করা আদবের খেলাফ। কারণ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'গোসলের স্থানে পেশাব করবে না। কেননা এতে করে মনের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।' এমতাবস্থায় শরীয়ত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামের সঙ্গে পরামর্শ করে এগুলো নির্মাণ করা উচিত। যেখানে মাসআলার খেলাফ সংযুক্ত বাথরুম তৈরি হয়ে গেছে সেখানে পায়খানা থেকে উযূর জায়গাটি পর্দা দিয়ে আলাদা করা এবং উযূর ব্যবহৃত পানি টয়লেটের প্যান ব্যতীত অন্য নালা দিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করে নেয়া উচিত।

উযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

১. পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া।
২. মুখ ভরে বমি হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত, পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
৪. থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।
৫. চিৎ, কাৎ বা হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া।
৬. পাগল, মাতাল বা অচেতন হওয়া।
৭. নামাযে উচ্চ আওয়াযে হাসা।

উল্লেখ্য উযূর পরিবর্তে যদি তায়াম্মুম করে থাকে, তবে উল্লিখিত বিষয়সমূহ দ্বারা তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যাবে। এতদ্ব্যতীত পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

গোসলের ফরয ৩টি

১. ভালো করে কুলি করা। –সূরা মায়িদাহ : ৬
২. নাকের নরম জায়গায় পানি পৌঁছানো। –সূরা মায়িদাহ : ৬
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা। –সূরা মায়িদাহ : ৬। তিরমিযী, ১০৩; শামী, ১/১৫১

গোসলের সুন্নাত ৫টি

১. নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার নিয়্যত করা।
২. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। –বুখারী, হাদীস নং ২৪৮
৩. ইস্তিঞ্জার জায়গা থেকে নাপাকী দূর করা। শরীরের কোথাও নাপাকী থাকলে তা ধৌত করা। –বুখারী, হাদীস নং ২৪৯
৪. সুন্নাত মোতাবেক উযূ করা। –বুখারী, হাদীস নং ২৬০
৫. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালা। –আবু দাউদ, হাদীস নং ২৪৯

গোসলের সুন্নাত তরীকা

১. গোসলের পূর্বে ইস্তিঞ্জা করা। –মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ১০২০
২. শরীর বা কাপড়ে নাপাক লেগে থাকলে তা প্রথমে পরিষ্কার করা।
৩. গোসলের পূর্বে উযূ করা। –বুখারী, হাদীস নং ২৬০
৪. প্রথমে মাথায় তারপর ডান কাঁধে ও পরে বাম কাঁধে পানি ঢালা। এরপর সমস্ত শরীর তিনবার পানি দ্বারা ধৌত করা। –বুখারী, হাদীস নং ২৫৬, ২৫৪, ২৭৪
৫. মহিলাদের নাকে, কানে অলঙ্কার থাকলে তার ছিদ্র ও আংটি, চুড়ি বা বলয় ইত্যাদি নাড়াচাড়া করে পানি পৌঁছে দেয়া।
৬. শরীরের যে সমস্ত অঙ্গে সহজে পানি পৌঁছে না, যেমন– কান, আঙ্গুলের ফাঁক, কনুই, বগলের নিচ, চোখের কিনারা, চুলের গোড়া ইত্যাদি অঙ্গসমূহে খেয়াল করে পানি পৌঁছে দেয়া। (হাত-পায়ের নখে নেইল-পালিশ থাকলে তা সম্পূর্ণ উঠানো ছাড়া উযূ-গোসল হবে না।)
৭. কাপড়ে নাপাক দেখা না গেলে যেমন কোথাও পেশাব লেগে শুকিয়ে গেছে, উক্ত কাপড় তিনবার ধুয়ে প্রত্যেকবার নিংড়ানো।

চার ক্ষেত্রে গোসল করা সুন্নাত

১. জুমাআর নামাযের জন্য।
২. দুই ঈদের নামাযের জন্য।
৩. হজ্ব ও উমরার ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য।
৪. (হজ্ব করতে গিয়ে) উকূফে আরাফার জন্য।–কুদুরী১/৭৮পৃ, বেহেশতী জেওর

গোসলের আদবসমূহ

১. গোসলের জন্য কাপড় খোলার সময় এই দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ.

-ইবনুস সুন্নি

২. বসে গোসল করা উত্তম।

৩. আড়াল স্থানে এবং ছতর ঢেকে গোসল করা মুস্তাহাব।

৪. সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কেবলামুখি হয়ে গোসল করা মাকরূহ।

৫. পানি জমা হয় এমন স্থানে গোসল করলে অন্যত্র সরে পা ধোয়া সুন্নাত।

৬. উযূর পর যে সব দু'আ পড়া মুস্তাহাব গোসলের পরও তা মুস্তাহাব।

–শামী : ১/২৯১ পৃ., আহসানুল ফাতাওয়া ৩৭ পৃ.

সতর্কতা: শরীরে আটা, আঠা, আলকাতরা, চুন, গাঢ় রং ইত্যাদি প্রলেপজাতীয় বস্তু লেগে থাকলে উযূ-গোসল সহীহ হবে না। এ-জাতীয় বস্তু শরীরে থাকলে উযূ ও গোসলের পূর্বে তা ভালোভাবে দূর করে তারপর উযূ-গোসল করতে হবে।

তায়াম্মুমের ফরয ৩টি

১. পবিত্র হওয়া বা ইবাদত সহীহ হওয়ার নিয়্যত করা। এভাবে বলা যায়– আমি (নামাযের জন্য) পবিত্রতা হাসিল করতে তায়াম্মুম করছি। –সূরা নিসা : ৪৩

২. পাক মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করা।

৩. পাক মাটিতে হাত মেরে কনুইসহ উভয় হাত মাসাহ করা।

–হিদায়া, ১/৫০-৫১

তায়াম্মুমের তরীকা

১. তায়াম্মুমের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়া।

–মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১২৬৯৪

২. হাতের আঙ্গুল ফাঁক করে দুই হাতের তালু পবিত্র মাটি অথবা মাটিজাতীয় জিনিসের উপর মারবে। যদি হাতে ধূলা বেশি লাগে, তবে দুই হাতের পিঠ পরস্পর টোকা দিয়ে ধূলা-বালি ঝেড়ে নিবে। –মুসলিম, হাদীস নং ৩৬৮

৩. দুই হাতের আঙ্গুলের মাথা একত্র করে হাতের তালু এবং আঙ্গুলের পেট দ্বারা কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত, উভয় পাশে কান পর্যন্ত একবার মুখমণ্ডল মাসাহ করবে।

৪. আবার দুই হাতের তালু মাটি অথবা মাটিজাতীয় জিনিসের উপর মারবে। ধূলা বেশি লাগলে পূর্বের তরীকায় ঝেড়ে নিবে।

৫. তারপর ডান হাতের আঙ্গুলের মাথার পিঠে বাম হাতের আঙ্গুলের পেট রাখবে। –শামী

৬. তারপর বাম হাতকে টেনে ডান হাতের কনুই পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এরপর

বাম হাতের তালু ও বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট ডান হাতের কনুইয়ের উপরের দিক থেকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে, যাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে যায়। অনুরূপভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসাহ করবে। -শরহে বেকায়া

৭. এক হাতের আঙ্গুলের পেট দ্বারা অন্য হাতের আঙ্গুলের পিঠের দিক দিয়ে খেলাল করবে। -শরহে বেকায়া

৮. তায়াম্মুম গোসল এবং উযূ উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তায়াম্মুম একজন অন্যজনকে করিয়ে দিতে পারে। শুধু যার তায়াম্মুম, নিয়্যত তারই করতে হবে।

–ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া : ১/৩১পৃ., আলবাহরুর রায়েক: ১/২৪৬পৃ.

ইসলাহ: অভিজ্ঞ আলেম থেকে চাক্ষুষভাবে তায়াম্মুম-এর পদ্ধতি শিখে নেয়া জরুরী।

মোজার উপর মাসাহ্ করার আহ্কাম

উযূ করার সময় মোজা পরিহিত থাকলে মোজা না খুলে তার উপর মাসাহ করে নিলেও চলে, তবে তার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। –শামী : ১/৪৩৬

শর্তসমূহ

১. পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করবে। চাই পূর্ণ উযূ করার পর মোজা পরিধান করুক কিংবা উযূর আগেই পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে তারপর উযূ ভাঙ্গার কোনো কারণ পাওয়া যাওয়ার পূর্বেই উযূ পূর্ণ করুক। –শামী : ১/৪৫৬

২. মোজা পায়ের টাখনুর গিরা ঢাকা থাকতে হবে।

৩. মোজা এমন হতে হবে যা পরিধান করে উপর্যুপরি অন্তত তিন মাইল হাঁটা যায়।

৪. একটি মোজায় পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি ফাঁটা-ছেঁড়া থাকতে পারবে না, চলার সময় এ পরিমাণ খুললেও তার উপর মাসাহ চলবে না। মোজা এমন হতে হবে যা বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর আঁটকে থাকে।

৫. মোজা এমন হতে হবে যার ভিতর দিয়ে পানি ভেদ করে শরীরে লাগে না।

৬. কমপক্ষে হাতের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ পায়ের অগ্রভাগ থাকতে হবে। অতএব, কোনো এক পা টাখনু-গিরার উপর থেকে কাটা গেলে আর

অপর পা ঠিক থাকলে সে অবস্থায় পরিহিত মোজায় মাসাহ করা জায়েয হবে না।

৭. গোসল ফরয হলে মোজায় মাসাহ করা জায়েয নেই; বরং তখন মোজা খুলে পা ধৌত করতে হবে। –মারাকিউল ফালাহ

কোন্ ধরনের মোজায় মাসাহ করা জায়েয

* চামড়া, পশম, কাতান প্রভৃতি এমন মোটা মোজা, যা অন্তত পায়ের টাখনু গিরা ঢাকা হবে এবং বাঁধা ছাড়াই পায়ের উপর খাড়া থাকতে পারে। এমন হবে, যা পায়ে দিলে অন্ততঃ তিন মাইল হাঁটা যাবে। তাতে ফাঁটবে না এবং যা ভেদ করে পানি ভিতরে ঢুকবে না এবং যা দিয়ে পায়ের চামড়া দেখা যাবে না এমন মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। –ইমদাদুল ফাতাওয়া

* হাত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয নয়।

মোজায় কতোদিন মাসাহ করা জায়েয

১. শরঈ সফরের অবস্থায় তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত এবং সফর না হলে এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসাহ করা যায়। যে উযূ করে মোজা পরিধান করা হবে সে উযূ ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে এই তিন দিন তিন রাত ও একদিন এক রাতের হিসাব ধরা হবে।

২. মুকীম অর্থাৎ বাড়িতে থাকা অবস্থায় যদি মাসাহ আরম্ভ হয় অতঃপর সফরে বের হয়, তাহলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি সফরে থাকা অবস্থায় মাসাহ শুরু করা হয়, তারপর একদিন একরাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বাড়িতে চলে আসে, তাহলে এক দিন এক রাত হওয়ার পর আর মাসাহ করতে পারবে না।

মোজায় মাসাহের তরীকা

উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পানিতে ভিজিয়ে উভয় পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখবে, যেন সম্পূর্ণ মোজার উপর আঙ্গুলগুলোর ছাপ পড়ে। অতঃপর হাতের তালু শূন্যে রেখে এবং আঙ্গুলগুলোর মধ্যে সামান্য ফাঁক রেখে ক্রমশঃ আঙ্গুলগুলো টেনে পায়ের টাখনুর দিকে আনবে। পুরো হাতের তালুসহ মোজার উপর রেখে টেনে আনলেও দুরস্ত আছে।

যেসব কারণে মোজায় মাসাহ ভঙ্গ হয়ে যায়

১. যে কারণে উযূ ভেঙ্গে যায় সে কারণে মাসাহও ভেঙ্গে যায়।

২. উভয় মোজা বা কোনো একটি মোজা খুলে ফেললেও মাসাহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ অবস্থায় উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে আবার মোজা পরিধান করে নিলেই চলে, পুরো উযূ দোহরানোর প্রয়োজন হয় না।

৩. মাসাহের মেয়াদ তিন দিন তিন রাত বা একদিন একরাত পূর্ণ হয়ে গেলেও মাসাহ ভেঙ্গে যায়। এরূপ ক্ষেত্রে উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।

৪. মোজার ভিতরে পানি ঢুকে সম্পূর্ণ পা বা পায়ের অর্ধেকের বেশি ভিজে গেলে। এক্ষেত্রেও উযূ থাকলে শুধু পা ধুয়ে নিবে।

৫. মা'যূর ব্যক্তি যদি মাসাহ করে, তাহলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর যেমন তার উযূ ভেঙ্গে যায় তদ্রূপ তার মাসাহও ভেঙ্গে যাবে। তবে উযূ করার সময় এবং মোজা পরিধান করার সময় ওযর না থাকলে অন্যান্য সুস্থলোকের ন্যায় সেও মাসাহ করতে পারবে। –নূরুল ইযাহ, (বেহেশতী জেওর, আলফিক আলাল মাযাহিরিল আরবায়া)

নাপাক কাপড় পাক করার পদ্ধতি

* যদি কাপড়ে এমন নাপাকি লাগে যা দেখা যায় যেমন পায়খানা, রক্ত বা এ জাতীয় অন্য কিছু, তাহলে পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করার মাধ্যমে নাপাকি দূর হয়ে গেলেই কাপড় পাক হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তিনবার ধৌত করা জরুরী নয়। তবে সুন্নাত হল, প্রত্যেক বার নিংড়িয়ে তিনবার ধুয়ে নেয়া। আর যদি তিনবার ধৌত করার পরও নাপাকি দূর না হয়, তাহলে তিন বারের বেশি ধৌত করাও জরুরী। তবে আসল নাপাকি দূর হওয়ার পর যদি নাপাকির কিছু দাগ বা চিহ্ন থেকে যায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই এবং কষ্ট ব্যতীত দূর করা সম্ভব না হয় তাহলে সাবান প্রভৃতি লাগিয়ে তা দূর করা ওয়াজিব নয়। যদি নাপাকি দেখা না যায় যেমন- পেশাব বা তরল কোনো নাপাকি তাহলে তিনবার ধৌত করে ভালোভাবে নিংড়ানো দ্বারাই এ জাতীয় নাপাকি থেকে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। তৃতীয়বার খুব জোরে নিংড়াতে হবে। ভালোমতো না নিংড়ালে কাপড় পাক হবে না।

* কাপড় বা শরীরে গাঢ় কিংবা তরল নাজাসাত লাগলে ধোয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে পাক করা যায় না। পানির দ্বারা ধুয়ে যেরূপ পাক করা যায় তদ্রূপ পানির ন্যায় তরল এবং পাক যেমন গোলাপ জল, রস, সিরকা প্রভৃতি জিনিস দ্বারাও ধুয়ে পাক করা যায়। কিন্তু যেসব জিনিস তৈলাক্ত তা দ্বারা ধৌত করলে পাক হবে না। যেমন দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি।

* ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়া হলে মেশিন যেহেতু নিয়ম মতো কাপড় নিংড়াতে পারে না এবং নাপাক কাপড়ের সঙ্গে থাকা পাক কাপড় একত্রে ভিজানোর কারণে পাক কাপড়ও নাপাক হয়ে যায়, তাই ধোয়ার পূর্বে বা পরে নাপাক কাপড়গুলিকে পৃথকভাবে নিয়ম মতো ধুয়ে পাক করে নিতে হবে। তা না করলে যদি মেশিনেই তিনবার নিয়ম মতো পানি ঢেলে নিংড়িয়ে নেয়, তাতেও চলবে।

* তুলার গদি, তোষক অথবা লেপে যদি মলমূত্র বা অন্য কোনো প্রকার নাপাক লাগে তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। যদি নিংড়ানো কঠিন হয় তাহলে ভালো করে তিনবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। প্রতিবার পানি প্রবাহিত করার পর এমনভাবে রেখে দিবে যেন সমস্ত পানি ঝরে যায়, তারপর আবার পানি প্রবাহিত করবে। এভাবে তিনবার করলেই পাক হয়ে যাবে। তুলা ইত্যাদি বের করে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। –আহসানুল ফাতাওয়া, খণ্ড ২

নারীদের পাক-পবিত্রতার মাসআলা না জানার কারণে নামায আদায়ে গাফলতি

মেয়েদের হায়েজ ও নেফাসের বিধি-বিধান ঠিকমত না জানার কারণে কিংবা বেপরোয়া মনোভাবের ফলে ভালো ভালো নামাযী দ্বীনদার মহিলা নামায আদায় করে না। হায়েয বন্ধ হওয়ার মুহূর্তে কোনো নামাযের এতটুকু ওয়াক্ত বাকি থাকে যে, সে কোনোরকম তেল মালিশ বা ঘষা-মাজা ছাড়া কোনো মতে পানি ঢেলে গোসল সেরে একবার আল্লাহু আকবার বলার সময় পায় তাহলে সে ওয়াক্তের নামায তার উপর ফরয হয়ে যায়। যদি গোসল সেরে নামায পূর্ণ পড়ার সময় না থাকে তাহলে তাকে কাযা আদায় করতে হবে। আর যদি তা পড়ার সময় থাকে তাহলে আদায় করে নেয়াই ফরয হবে। আজকাল দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞ মেয়েদের উদাসীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কখন হায়েজ বন্ধ হয় তারা সেটাও খেয়াল রাখে না। হয়তো সেটা কোনো নামাযের শেষ ওয়াক্তে এতটুকু সময় বাকি থাকতে বন্ধ হয়েছে— যে সময়ে গোসল সেরে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারতো —সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সেই ওয়াক্তের নামায তার উপর ফরয হয়েছে এবং গোসলও ফরয হয়েছে। এ কারণে শেষ দিকে স্বীয় অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। যেন কোনো নামায ফরয হওয়া সত্ত্বেও ছুটে না যায়।

আরেক শ্রেণীর মেয়েলোকের অবস্থা হলো হায়েজ বন্ধ হয়েছে জেনেও গোসল না করে কয়েক ওয়াক্ত কাটিয়ে দেয়। সর্বনাশের ব্যাপার এই যে, সময় পেয়েও

নামায না পড়ার পাপতো ঘাড়ে নিলই তারপর এসব নামাযের কাযাও আদায় করে না। এভাবে প্রতি মাসে তাদের জিম্মায় কয়েক ওয়াক্ত অনাদায়ী নামাযের বোঝা চাপতে থাকে। গোটা জিন্দেগীতে তার অঙ্ক অনেক বিরাট হয়ে দেখা দেয়। যদি মাসে তিন ওয়াক্ত নামাযও জমা হয় তো বছরে ছত্রিশ ওয়াক্ত ও ত্রিশ বছরে হাজার ওয়াক্তের বেশি নামাযের দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপে। জীবনভর তার কাযা আদায় হয় না। মরার সময়ও তার ফিদিয়া দেয়ার অসিয়্যত করে না। তাহলে পরকালে এর কি জবাব দিবে? তথাপি নিজেকে নিয়মিত নামাযী বলে মনে করে। কিয়ামতে যখন এ অনাদায়ী নামাযের হিসাব সামনে আসবে তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে।

উদাসীনতার প্রতিকার

১. নামাযের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুশিয়ারী ও কড়াকড়ি বাণীসমূহের চিন্তা-ভাবনা করা।
২. মনের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করে এমতাবস্থায় গাফলতী পরিত্যাগ করা।
৩. যে সমস্ত মাসআলা জানা নেই সেগুলো ভালোভাবে জেনে নেয়া।

পরামর্শ ঃ যখন মেয়েদের ঋতুকালীন অবস্থা দেখা দেয় তখন সংশ্লিষ্ট পুরুষদের কাজ হলো তাদের প্রয়োজনীয় বিধান জানানোর ব্যবস্থা নেয়া। যদি নিজের জানা না থাকে তাহলে ভালো কোনো আলেমের কাছে জেনে নিবে। নারীদের কর্তব্য হলো যখন কোনো সমস্যা দেখা দিবে তা স্বামীদের জানিয়ে আলেমদের থেকে তার সমাধান জেনে আসার তাকীদ দেয়া। এমনকি ঘরের পুরুষ যদি এ ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয় তাহলে সম্ভাব্য অন্য কোনো পুরুষের মাধ্যমে জানার ব্যবস্থা করবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে নিজে কোনো আলেমের কাছে গিয়ে তাদের কোনো মাহরাম মহিলা বা স্ত্রীর মাধ্যমে মাসআলা জেনে নিবে। অন্যথায় গোনাহগার হতে হবে।

মেয়েদের মধ্যে নিয়মিত নামায না পড়ার কারণ এই যে, শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিয়মিত নামাযীর সংখ্যা কম। মেয়েদের স্থায়ীভাবে প্রতিমাসে কিছুদিন সৃষ্টিগতভাবেই নামায নষ্ট হয়। ফলে নিয়মিত নামাযে উদাসীনতা দেখা দেয়। দেখা যায় মাসিক শেষ হলেও এর প্রভাব অবশিষ্ট থেকে যায়। এতে করে কয়েক দিন পর্যন্ত নামাযের খেয়াল থাকে না। এর মূল প্রতিকার হলো অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি করা ও আল্লাহ পাকের ভয়ে নামায পড়া। অবশ্যই বাহ্যিক কারণে প্রতিকারও ফলদায়ক। ফকীহগণ বলেছেন যে, নারীদের হায়েয অবস্থাও উত্তম হলো প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে উযূ করে নামাযের মুসল্লায় বসবে এবং কিছুক্ষণ তাসবীহ-তাহলীলে মগ্ন থাকবে। তাহলে অভ্যাস বহাল থাকবে। আর অভ্যাসে খলল না এলে আর নামাযে শৈথিল্য দেখা দেয়ার সম্ভবনা থাকবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

আযান-ইকামতের ফযীলত

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যতোদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায পৌঁছে, ততোদূর পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাণী ও জড় পদার্থ সকলেই তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে। এক রেওয়ায়াতে আছে, প্রত্যেক প্রাণী ও জড় পদার্থ মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব দেয়।

–মুসনাদে আহমাদ; সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৭১৬

২. হযরত আবু ছা'ছাআহ (রাযি.) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাযি.) বলেছেন, তুমি যখন ময়দানে থাকো তখন উচ্চ আওয়াযে আযান দিবে। কারণ আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, সকল গাছ, মাটির ঢিলা, পাথর, জ্বীন ও ইনসান মুয়াযযিনের আওয়ায শুনতে পায়। তারা সকলে কেয়ামতের দিন মুয়াযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

–সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৭১৫

৩. হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মুয়াযযিনগণ কেয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ আল্লাহর নাম বুলন্দ করার দরুন তাদের মাকাম বুলন্দ করা হবে।–সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৫৮০

৪. হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি লোকেরা আযান ও প্রথম কাতারে নামায আদায়ের সওয়াব সম্পর্কে অবগত হতো, তাহলে তারা এ সওয়াব অর্জন করার জন্য এমনভাবে প্রতিযোগিতা করতো, লটারী ব্যতীত এর কোনো সমাধানই পাওয়া যেতো না। –সহীহ বুখারী

৫. হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বার বছর আযান দিবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মুয়াযযিনের জন্য ঐ আযানের বিনিময়ে প্রতিদিন ৬০টি করে নেকী লেখা হয় এবং প্রতিদিন ইকামতের বদলায় ৩০টি করে নেকী লেখা হয়। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৫৮

৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) বলেন, এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুয়াযযিনগণ আজর ও সওয়াব হিসেবে আমাদের থেকে অগ্রগামী রয়েছে (এমন কোনো আমল আছে যা দিয়ে আমরাও মুয়াযযিনের ন্যায় ফযীলত হাসিল করতে পারি?)। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, "এই কালেমাগুলো বলো যেগুলো মুয়াযযিন বলে। অতঃপর আযানের জওয়াব শেষ করে দু'আ করো, তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে।"

–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৪

৭. আযানের কালেমাসমূহের উত্তর দানের পর যে কোনো দুরূদ শরীফ পাঠ করে অতঃপর দু'আয়ে ওসীলা পাঠ সর্ম্পকে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত (আযানের পর) এই দু'আ (দু'আয়ে ওসীলা) পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।' –সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫

হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এতে উক্ত ব্যক্তির ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু লাভেরও সুসংবাদ রয়েছে। কারণ কোনো কাফের বেঈমান তো হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত পাবে না। তাঁর শাফা'আত হবে একমাত্র ঈমানদারদের জন্য। দ্বীনী ইলমের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য তা'লীম চলাকালে আযানের জওয়াব দেয়ার হুকুম নেই। কিন্তু কুরআনে পাক তিলাওয়াতের সময় আযানের জওয়াব দেয়ার হুকুম রয়েছে।

আহকামে আযান ও ইকামত

মাসআলা: সকল ফরয নামাযের জন্য একবার আযান দেয়া পুরুষের উপর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। সে মুসাফির হোক অথবা মুকিম হোক, জামা'আতে নামায আদায় করা হোক অথবা একাকী নামায আদায় করা হোক। জুম'আর নামাযের জন্য দ্বিতীয়বার আযান দেয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। –শরহে তানবীর ১/৩৯৮

মাসআলা: যদি এমন কোনো কারণে নামায কাযা হয় যার মধ্যে সাধারণ লোক লিপ্ত থাকে তবে সেই কাযা নামাযের আযান উচ্চস্বরে দিবে। আর যদি বিশেষ কোনো কারণে কাযা হয়ে যায়, তবে আযান গোপনে আস্তে দিবে।

যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায় এবং সেগুলো সব একত্রে আদায় করতে হয়, তাহলে শুধু প্রথম নামাযের জন্য আযান দেয়া সুন্নাত। অবশিষ্ট নামাযের জন্য পৃথক পৃথক আযান দেয়া মুস্তাহাব। -দুররে মুখতার ১/৪০৪

মাসআলা: যে ব্যক্তি নিজ বাড়িতে একাকী অথবা জামা'আতের সঙ্গে নামায আদায় করে তার জন্য আযান এবং ইকামত উভয়টি মুস্তাহাব; যদি মহল্লা অথবা গ্রামের মসজিদে আযান ও ইকামত হয়ে থাকে। কারণ মহল্লার আযান বা ইকামত সমস্ত মহল্লাবাসীর জন্য যথেষ্ট। -ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/৩৩

মাসআলা: যে মসজিদে আযান এবং ইকামতের সঙ্গে নামায হয়ে গেছে সে মসজিদে পুনরায় নামায আদায় কালে আযান ও ইকামত দেয়া মাকরূহ। তবে হাঁ যদি উক্ত মসজিদে কোন মুয়াযযিন এবং ইমাম নিযুক্ত না থাকে তাহলে মাকরূহ হবে না। বরং সেটি উত্তম। -আলমগীরী ১/৩৩

মাসআলা: ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোনো নামাযের জন্য আযান ও ইকামত বলা সুন্নাত নয়। চাই তা ফরযে কেফায়া নামায হোক না কেন। যেমন- জানাযার নামায । অথবা ওয়াজিব নামায যেমন- বিতর ও দুই ঈদের নামায অথবা নফল নামায। -আলমগীরী -১/৩৩

মাসআলা: জুমআর নামাযে প্রথম আযান শুনামাত্র সমস্ত কাজ-কর্ম ত্যাগ করে জুম'আর নামাযের জন্য প্রস্তুতি নেয়া এবং মসজিদে গমন করা ওয়াজিব। ক্রয়-বিক্রয় অথবা অন্য কোনো কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়া হারাম। –রদ্দুল মুহতার ১/৩৯৯

মুয়াযযিন সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ

১. মুয়াযযিন পুরুষ হওয়া। মহিলাদের আযান দেয়া মাকরূহে তাহরীমী। কোনো মহিলা আযান দিলে তা দোহরানো মুস্তাহাব।

–শামী : ২/৬১, আলমগীরী : ১/৫৪

২. মুয়াযযিন বুঝমান পুরুষ হওয়া। পাগল, মাতাল বা অবুঝ ছেলের আযান মাকরূহ। এরকম কেউ আযান দিলে ওই আযান পুনরায় দিতে হবে। কিন্তু ইকামত পুনরায় দেয়ার প্রয়োজন নেই। –শামী-২/৬১

৩. মুয়াযযিনের (আযান ও নামায সম্পর্কে) জরুরী মাসায়েল এবং নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে। –বেহেশতী জেওর

৪. মুয়াযযিন দ্বীনদার, পরহেযগার, মুত্তাকী হতে হবে এবং সুন্নাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকার সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাতের অনুসারীও হতে হবে। –আলমগীরী

৫. উচ্চ ও আকর্ষণীয় আওয়াযের ব্যক্তিকে (উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে) মুয়াযযিন নিযুক্ত করা উত্তম। –আশিয়্যাতুল লুমআ'ত

৬. দাঁড়ি মুণ্ডানো বা কর্তনকারী ব্যক্তির জন্য ইমামতি করা, আযান দেয়া, ইকামাত বলা শরীয়তে নিষেধ। এরূপ ব্যক্তি যদি আযান বা ইকামাত দেয় বা নামাযে ইমামতি করে ফেলে তাহলে এগুলো অবশ্য পুনরায় পড়তে হবে না, তবে এরা গোনাহগার হবে। -শামী : ২/৬১

আযান দেয়ার সুন্নাত ও মুস্তাহাব তরীকা

১. মসজিদের বাইরে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিবে। মসজিদের ভিতরে আযান দেয়া মাকরূহে তানযীহী। কিন্তু জুম'আর সানী আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবে। সানী আযান দেয়ার জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়ানো জরুরী নয়, যে কোনো কাতার থেকেই দেয়া যাবে। তবে খতীবের বরাবর দাঁড়ানো জরুরী। –শামী : ১ম খণ্ড

২. দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে। বসে আযান দেয়া খেলাফে সুন্নাত। বসে আযান দেয়া হলে সেই আযান পুনরায় দিতে হবে। তবে মা'যূর ব্যক্তি নিজের নামাযের জন্য বসে আযান দিতে পারবে। -শামী : ২/৬১

৩. আযান যথাসম্ভব উচ্চ আওয়াযে দিতে হবে।

৪. আযান দেয়ার সময় উভয় হাতের শাহাদাত আঙ্গুল উভয় কানে (ছিদ্র বন্ধ করে) স্থাপন করা মুস্তাহাব। –বেহেশতী জেওর

৫. আযানের শব্দগুলো টেনে আদায় করবে (তবে 'আল্লাহ' শব্দের লামকে এক আলিফের বেশি টানবে না)। এবং প্রতি দুই শব্দের পর এতটুকু সময় চুপ করে থাকবে যেন শ্রোতাগণ তার জবাব দিতে পারে। এরূপ করা সুন্নাত। আর যদি জবাব দেয়ার সময় না দেয়া হয় তাহলে পুনরায় আযান দেয়া মুস্তাহাব।
–শামী : ২/৫৩, আহসানুল ফাতাওয়া : ২/২৮৬ পৃ.

৬. আযানের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার পূর্বে ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পূর্বে বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, কিন্তু সিনা ও পা ঘুরাবে না। তারপর শব্দগুলো বলবে। -শামী : ২/৬১

৮. উযূর সঙ্গে কেবলামুখী হয়ে আযান দিবে। –ইলাউস সুনান

৯. একসঙ্গে বিভিন্ন মসজিদে আযান হতে থাকলে সর্বপ্রথম যে আযান শোনা যায় তার জওয়াব দেয়াই যথেষ্ট। চাই তা নিজের মহল্লার হোক বা অন্য মহল্লার।

তবে সবগুলোর জওয়াব দিতে পারলে ভালো। –শামী : ২/৬৬

১০. হদছে আকবার (বড় নাপাকী) থেকে পবিত্র হয়ে আযান দেয়া সুন্নাত। নাপাক অবস্থায় আযান দেয়া মাকরূহে তাহরীমী। যদি গোসল না করে আযান দেয়, তবে পুনরায় আযান দেয়া উত্তম। বিনা উযূতে ইকামত দেয়া মাকরূহে তাহরীমী। –শামী : ২/৬১

১১. তরতীব ঠিক রেখে আযান ও ইকামত দেয়া সুন্নাত। যদি কেউ আযানের মধ্যে পরের শব্দ আগে বলে ফেলে তবে সম্পূর্ণ আযান দোহরাতে হবে না। শুধু যে শব্দটি ছেড়ে দিয়েছে সে শব্দটি বলে তরতীব অনুযায়ী পরের শব্দগুলো বলবে।
–বেহেশতী জেওর

আযানের শব্দসমূহ আদায় করার নিয়ম

اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ ও اَكْبَرُ শব্দের শুরুতে যে হামযাহ রয়েছে, তা শক্তভাবে আদায় করতে হবে। আল্লাহ শব্দের ل খুব মোটা করে পড়তে হবে। লামের উপর যে আলিফ তাতে মাদ্দে তবায়ী হবে। এতে শুধুমাত্র এক আলিফ পরিমাণ টানতে হবে। 'হা'-এর পেশ খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হবে। বাংলা হ্রস্বউ-কারের (ু) ন্যায়। وَاوٌ مَدَّهْ-এর আভাস দিয়ে আদায় করতে হবে। আকবার-এর রা সাকিন অথচ মোটা করে পড়তে হবে।
أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	'আশহাদু'-র শীন উচ্চারণকালে আওয়ায মুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়বে। لَا-এর মধ্যে مَدِّ فَرْعِيْ مُنْفَصِل হবে, যা তিন থেকে চার আলিফ পর্যন্ত টানা যাবে। اِلٰهَ শব্দের প্রথম আলিফের মধ্যে যে কোনো প্রকার مَدّ (লম্বা) করা থেকে বিরত থাকতে হবে। اِلَّا اللّٰهُ-এর মধ্যে আল্লাহ শব্দের

	লামের উপর যে হামযায় মদ রয়েছে তাতে مَدِّ فَرْعِيْ عَارِضِيْ হবে, এটা চার আলিফ পর্যন্ত টানা জায়েয আছে।-এর অতিরিক্ত টানা থেকে বিরত থাকতে হবে।
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ	اَنَّ শব্দের নূন এবং مُحَمَّدًا শব্দের তাশদীদযুক্ত মীমের মধ্যে এক আলিফের অতিরিক্ত গুন্নাহ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। رَسُوْلُ শব্দের শীনের মধ্যে مَدِّ طَبْعِيْ। কাজেই এক আলিফের অতিরিক্ত টানা যাবে না। رَسُوْلُ শব্দের 'রা' মোটা হবে। اَللهُ শব্দের হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (অর্থাৎ চার আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে।)
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	حَيَّ শব্দের তাশদীদ আদায় করার সময় দুই হরফ পরিমাণ সময় বিলম্ব করতে হবে। অবশ্য 'ইয়া'-র যবর তাড়াতাড়ি আদায় করতে হবে, এর উপর যেন আওয়ায আটকে না যায়। الصَّلٰوةِ-এর صاد খুব মোটা করে পড়তে হবে। صَلٰوة-এর মধ্যে مَدِّ عَارِضِيْ-এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ চার আলিফ পরিমাণ লম্বা করা যাবে।
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	حَيَّ শব্দ কীভাবে আদায় করতে হবে এবং فَلَاحُ শব্দের 'লামের' مَدِّ عَارِضِيْ-র হুকুম কী? তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	اَلصَّلٰوةُ শব্দের লামের পরে যে আলিফ আছে এতে مَدِّ طَبْعِيْ হবে। কাজেই এক আলিফের অতিরিক্ত লম্বা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। النَّوْمِ-এর মধ্যে مَدِّ لِيْن

	এতে قَصْر করা উত্তম, মদ করাও জায়েয আছে, যা সর্বোচ্চ তিন আলিফ পরিমাণ করা যায়।
اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ	এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	এর হুকুম পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ	ক্বামাত শব্দের ক্বাফ-এর পরে যে আলিফ আছে তাতে মদ্দে ত্ববয়ী হবে। অর্থাৎ এক আলিফ পরিমাণ লম্বা হবে। আর সালাত শব্দের লামে মদ্দে আরযী হবে। তবে ইকামতে জলদি করা উদ্দেশ্য, তাই অল্প টানতে হবে।

– আহকামে জিন্দেগী

আযানের জওয়াব দেয়ার সুন্নাত তরীকা

মুয়াযযিন যখন বলবে	শ্রোতাগণ জওয়াবে বলবে
اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ-اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ
أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ[১]	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

১. অনেকে এর জওয়াবে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলে থাকে, এটা সুন্নাতের খেলাফ। হাদীসের মধ্যে এসেছে, আযানের জওয়াবে মুয়াযযিন যা বলে তোমরা তাই বল।

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ	اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ[২]	اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

আযানের দু'আ

প্রথমে দুরূদ শরীফ পড়বে, তারপর নিম্নের দু'আটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَا ۨالْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا ۨالَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

ইসলাহঃ কিছু অখ্যাত বাজারী বই পুস্তকে আযানের দু'আর মধ্যে وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অতিরিক্ত আছে, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

মাসআলাঃ আট অবস্থায় আযানের জওয়াব দেয়া মাকরূহ

১. নামায অবস্থায় ।

২. খুতবা শ্রবণ করা অবস্থায়। চাই ইহা জুম'আর খুতবা হোক অথবা অন্য কোন খুতবা হোক।

৩. হায়েয অবস্থায়।

৪. নেফাস অবস্থায়।

৫. দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া অবস্থায়। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতের সময় আযান হলে তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জবাব দেয়া উত্তম বলা হয়েছে। –ফাতাওয়ায়ে মাহমুদীয়া-২

৬. সহবাস অবস্থায়।

৭. পেশাব পায়খানা অবস্থায়।

৮. খাওয়ার অবস্থায়। এ-সময় জওয়াব দেয়া আবশ্যক নয়। তবে ঐ সকল

---

২. উল্লিখিত বাক্যটি সালফে সালেহীন থেকে বর্ণিত, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। –তাকরিরাতে রাফেয়ী ২/৪৭

কর্ম থেকে অবসর হওয়ার পর যদি আযানের পর বেশি সময় অতিবাহিত না হয় তবে আযানের জওয়াব দেয়া উচিত। অন্যথায় নয়।

আযান ও ইকামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান

মুয়াযযিনের জন্য সুন্নাত হচ্ছে নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আযান ও ইকামতের মধ্যে এতোটুকু সময়ের ব্যবধান রাখা, যাতে নিয়মিতভাবে যে সব মুসল্লী জামা'আতে শরীক হয়ে থাকেন, তারা জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে পৌঁছতে পারেন। হাদীস শরীফে আছে, আযান ও ইকামতের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান রাখবে, যাতে লোকেরা খানা বা ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হতে পারে। –ফাতহুল বারী

মাগরিবের নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যে ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময়ের ব্যবধান রাখবে। -শামী : ১/২৮৭, আলমগীরী

যিনি আযান দিবেন ইকামত বলা তারই হক। অবশ্য মুয়াযযিনের অনুমতিক্রমে অন্য কেউ ইকামত বলতে পারেন। -শামী : ১/২৯১

ইকামত দেয়ার সুন্নাত তরীকা

ইকামতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, আযানে দুইশ্বাসে যে শব্দগুলো বলা হয়েছে, ইকামতে তা একশ্বাসে বলতে হবে। যেমন–

১. প্রথম চার তাকবীর একশ্বাসে বলবে এবং প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকিন করবে।

২. অতঃপর দুই বাক্য একত্রে একশ্বাসে বলবে এবং প্রত্যেক বাক্যে সাকিন করবে।

৩. সর্বশেষ দুই তাকবীরের সঙ্গে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ একত্রে একশ্বাসে বলবে এবং প্রত্যেক বাক্যে সাকিন করবে। যেমন–

১ম শ্বাসে اَللهُ اَكْبَرْ, اَللهُ اَكْبَرْ, اَللهُ اَكْبَرْ, اَللهُ اَكْبَرْ (চার তাকবীর এক শ্বাসে)।

২য় শ্বাসে أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ, أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

৩য় শ্বাসে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ, أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

৪র্থ শ্বাসে (ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ . حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

৫ম শ্বাসে (বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ , حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

৬ষ্ঠ শ্বাসে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوة

৭ম শ্বাসে اَللّٰهُ اَكْبَر اَللّٰهُ اَكْبَر لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله

আযানের ন্যায় ইকামতেরও প্রত্যেক কালেমার শেষ অক্ষর সাকিন হবে।

–শামী : ২/১৮০

- ইকামতের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। -আলমগীরী : ১/৫৭

ইকামতের জওয়াব দেয়ার সুন্নাত তরীকা

মুয়াযযিন যখন বলবে	মুসল্লীগণ জওয়াবে বলবে
اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ- اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ
أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ	اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا
اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ	اَللّٰهُ اَكْبَرُ -اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ফজরের আযানের পর সুন্নাতসমূহ

১. ফজরের আযানের সঙ্গে সঙ্গে ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায ঘরে পড়ে নেয়া সুন্নাত। –আলমগীরী : ১/১১২

২. ফজরের সুন্নাতকে অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাতের তুলনায় একটু দ্রুত পড়া সুন্নাত। –আলমগীরী : ১/১১২

৩. ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস দিয়ে পড়া সুন্নাত। তবে কখনও অন্য সূরাও পড়া উচিত। –মুসলিম শরীফ

৪. সুন্নাত ও ফরযের মাঝে সামান্য একটু শয়ন করা সুন্নাত, যাতে করে তাহাজ্জুদের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। কিন্তু তখন ঘুমানো যাবে না। –শামী : ২/৪৬১

৫. ফজরের নামাযে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে রাস্তায় এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا. وَّاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ وَمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا

-সহীহ মুসলিম, (১/২৬১) হাদীস নং ৭৬৩

আযান ও ইকামতে প্রচলিত কিছু ভুল সংশোধন

আযান ও ইকামতের মধ্যে সাধারণতঃ যে সব ভুল হতে দেখা যায় সেগুলোর সংশোধনী নিম্নে দেয়া হলো।

১. اَللّٰهُ শব্দের লামকে এক আলিফের চেয়ে লম্বা করা । শাইখ মুহাম্মাদ মক্কী (রহ.) কর্তৃক লিখিত "নিহায়াতুল কাওলিল মুফীদ" গ্রন্থে اَللّٰهُ اَكْبَرُ-এর লামকে এক আলিফের চেয়ে লম্বা মদ্দ করাকে শক্ত বিদ'আত ও মাকরূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. اِلٰهَ এবং رَسُوْلُ-শব্দদ্বয়ের মধ্যে মদ্দের হরফকে এক আলিফ থেকে বেশি টেনে পড়া।

৩. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ-এর মধ্যে শেষের 'তা' এবং 'হা' অক্ষরের হরকতকে উচ্চারণ করা।

৪. আযানের মতো ইকামতের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পূর্বে চেহারাকে যথাক্রমে ডান দিকে এবং বাম দিকে ফিরানো মুস্তাহাব। অনেকেই এ-ব্যাপারে অবহেলা করে। –শামী : ২/৫৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া

৫. ইকামতের মধ্যে শেষ কালেমা 'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার -'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' একশ্বাসে বলা। –ফতহুল বারী

অথচ অনেকেই বাক্য তিনটিকে দুইশ্বাসে পড়ে যা সুন্নাতের খেলাফ।

ইসলাহ : আযানের সময় যেখানে যিকির, তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জওয়াব দেয়া সুন্নাত, সেখানে আযানের সময় অনর্থক কথা ও গল্প-গুজব করা কত বড় দোষণীয় কাজ। মহিলা ও পরিবারের ছোট বড় সকলের মধ্যে আযানের জওয়াব দেয়ার ফযীলত শুনিয়ে এ আমলের প্রতি উৎসাহিত করা উচিত।

আযানের দু'আ পড়ার সময় মুনাজাতের মতো হাত তোলার বিষয়টি প্রমাণিত নয়, তাই হাত তোলা ছাড়াই দু'আ পড়বে।

ইসলাহ: আযানের মধ্যে সুর সৃষ্টি করা বর্তমানে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়েছে। এটা শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমোদিত নয়। কেননা আযান একটি ইবাদত। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একাগ্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন। আর সুর এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হানাফী মাযহাব অনুসারে যদিও সুর সুন্দর করা নিষিদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু-এর অর্থ এই নয়, হরফ ও হরকত বৃদ্ধি করে শব্দ বিকৃত করাকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে; বরং এরূপ করা মাকরূহে তাহরীমী বলা হয়েছে (যা হারামের নিকটবর্তী)। এরূপ আযানের জওয়াব দেয়াও সুন্নাত নয়।

-শামী : ২/৫৩

ইসলাহ: দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের মতো আযান-ইকামতকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থাৎ আমলী মশকের মাধ্যমে শেখা ও শেখানো উচিত। মাইকে আযান দেয়ার ক্ষেত্রেও 'হাইয়্যা আলাস সালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় চেহারা ডানে-বামে ঘুরাতে হবে। কিন্তু সিনা কিবলা বরাবর থাকবে।

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ পড়া। -মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ২৬৪৭৩

২. দুরূদ শরীফ পড়া। -মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ২৬৪৭২

৩. দু'আ পড়া। -সহীহ মুসলিম, হা:নং ৭১৩

এই তিনটি বিষয় একসঙ্গে এভাবে বলা যায়–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

–সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৭১

৪. মসজিদে প্রবেশ করার সময় আগে ডান পা প্রবেশ করানো। -বুখারী

৫. ইতেকাফের নিয়্যত করা। যেমন–

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ বা যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবো, ততোক্ষণের জন্য ইতেকাফের নিয়্যত করলাম। –হিসনে হাসীন, শামী, ২/৪৪৩

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ পড়া। -মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ২৬৪৭৩

২. দুরূদ শরীফ পড়া। -মুসনাদে আহমাদ, হা: নং ২৬৪৭২

৩. দু'আ পড়া। –সুনানে ইবনে মাজাহ

এই তিনটি বিষয় একসঙ্গে এভাবে বলা যায়–

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

৪. মসজিদ থেকে বাম পা দিয়ে বের হওয়া। –সহীহ বুখারী : ১/৬১

৫. ডান পায়ের জুতা আগে পরিধান করা। –সহীহ বুখারী, হা: নং- ৫৮৫৫

আদাবুল মাসাজিদ (মসজিদের আদব)

১. মসজিদে নামায পড়া, বিশেষত পাঞ্জেগানা জামা'আত কায়েম করা।

২. মসজিদে প্রবেশকালে ভক্তি ও ভয়ের সঙ্গে প্রবেশ করা।

৩. প্রবেশ করে বসার পূর্বেই দুই রাকা'আত নামায পড়া। এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলে। মসজিদে এসে যদি কেউ বসে অতঃপর উঠে উক্ত দু'রাকা'আত পড়ে তাতেও দোষ নেই। তবে বসার পূর্বে পড়াই উত্তম। হাদীস শরীফে আছে, যখন তোমরা মসজিদে যাও তখন দুই রাকা'আত নামায না পড়া পর্যন্ত বসো না। তবে ফজরে এবং মাগরিবে এই দুই রাকা'আত পড়তে নেই। কারণ তখন নফল নামায পড়া মাকরূহ।

৪. মসজিদের যথারীতি খেদমত করা। সর্বদা মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মাঝে মধ্যে তাতে খুশবূ দেয়া।

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন- আবর্জনা, কঙ্কর, পাথর ইত্যাদি) বাইরে ফেলে দেয়, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন।-ইবনে মাজাহ

৬. মসজিদের সম্মান বজায় রাখা।

৭. অবসর পেলেই মসজিদে এসে বসে থাকা (মসজিদের সঙ্গে দিলের মুহাব্বত রাখা)।

৮. মসজিদে লোবান, সুগন্ধি জ্বালানো সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর আমল ছিলো।

৯. মসজিদে বাতি জ্বালানো সুন্নাত, কিন্তু কেরোসিনের বাতি জ্বালানো ঠিক নয়। -তুহফাতুল আহওয়াযী

১০. মসজিদে বিছানা বিছানো ও বাতি জ্বালানো সুন্নাত, কিন্তু তাও যেন জরুরতের চেয়ে বেশি না হয়।

মসজিদে যে সব কাজ করা নিষেধ

১. মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা।

২. দুনিয়াবী যে সব কথা মসজিদের বাইরে বলা জায়েয আছে তাও মসজিদে বলা নাজায়েয। আর যেসব কথা মসজিদের বাইরে বলা নাজায়েয তা মসজিদে বলা তো একেবারেই হারাম।

৩. মসজিদে ঝগড়া করা নাজায়েয।

৪. মসজিদকে রাস্তা বানাবে না। যেমন- অনেকে তাড়াতাড়ি কোথাও পৌঁছার জন্য মসজিদের ভিতর দিয়ে গমন করে থাকে।

৫. মসজিদের ভিতর কেউ অস্ত্রশস্ত্র বের করবে না। যেমন- কোষ থেকে তলোয়ার, পিস্তল বের করা।

৬. মসজিদের ভিতর তীর ছড়িয়ে রাখবে না (কারণ হয়তো কারও পায়ে লাগতে পারে)।

৭. কাঁচা মাছ বা গোস্ত নিয়ে মসজিদে যাবে না। এতে মসজিদ দুর্গন্ধময় হবে।

৮. মসজিদের ভিতর কাউকে শাস্তি দিবে না।

৯. মসজিদের ভিতর ক্রয়-বিক্রয় করবে না।

১০. যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। তেমনি ঋতুমতী ও প্রসূতি মেয়েলোকেরও মসজিদে প্রবেশ করা হারাম।

–দুররে মুখতার, আল আশবাহ

১১. মসজিদে কোনো নাপাক জিনিস প্রবেশ করানো জায়েয নয়।

১২. মৃত ব্যক্তিকে মসজিদে দাখেল করা জায়েয নেই এবং মসজিদের ভিতরে জানাযা পড়া মাকরূহে তাহরীমী। -রদ্দুল মুহতার : ১/৬৫৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া : ১/৭৬৬

১৩. পোকা-মাকড় ও উকুন মেরে মসজিদে ফেলা মাকরূহ।

১৪. দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা মাকরূহ।

-তুহফাতুল আহওয়াযী

১৫. মসজিদে হারানো বস্তুর এলান করা নাজায়েয। -সুনানে নাসায়ী

১৬. মসজিদের দেয়ালে লেখা ঠিক নয়। বিশেষ করে পশ্চিম দেয়ালে লেখা আরো বেশি নিন্দনীয়। -রদ্দুল মুহতার ১/৪৮৭

১৭. মসজিদে আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ। –মেশকাত : ৬৯ পৃ, শামী : ২/৪৩৫ পৃ.

ইসলাহ: (ক) অনেকে মসজিদে পিকদানী রাখে, কিন্তু তা নিয়মিত পরিষ্কার না করার কারণে দুর্গন্ধময় হয়ে থাকে, এমনটি করা ঠিক নয়। এতে ফেরেশতা ও মুসল্লীদের কষ্ট হয়।

(খ) ছবিযুক্ত ম্যাচ, আগরবাতি, মোমবাতির প্যাকেট মসজিদে রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। যেখানে ঘরে ছবি রাখার অনুমতি নেই, সেখানে আল্লাহ তা'আলার ঘর মসজিদে ছবি রাখা কতোটা সমীচীন হবে, তা ভেবে দেখা দরকার।

(গ) মসজিদের সামনের দেয়ালে কোনো ক্যালেন্ডার, কোনো কিছু লেখা, কারুকার্য করা, নামাযরত ব্যক্তির মনযোগ সে দিকে যেতে পারে এমন কিছু লেখা আঁকা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(ঘ) মসজিদের ভিতরে জুতা, সেন্ডেল ব্যাগে ভর্তি করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। মসজিদের বাহিরেও জুতা-সেন্ডেল সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।

নামায

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ এবং তাওহীদ ও রিসালতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্বটি অর্পিত হয়— তা হলো নামায। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় ঈমান ও তাওহীদের পর প্রথম ফরয আমল হিসাবে নামাযের কথা আলোচনা করা হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে হিদায়াত অর্জনকারী দলের বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে"

–সূরা বাকারা, আয়াত-৩

সূরা কিয়ামায় যারা ঈমান গ্রহণ করে না এবং নামায পড়ে না তাদের উভয়ের অপরাধের কথা একই বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى

"তারা ঈমানও গ্রহণ করেনি এবং নামাযও আদায় করেনি"

সূরা বাইয়্যিনাতে তাওহীদের আলোচনার পর নবী (আ.) গণের দাওয়াতের দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে নামাযকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمَةُ

তাদেরকে এছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাটি মনে করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে, এটাই সঠিক ধর্ম। -সুরা বাইয়্যিনাত আয়াত -৫

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল বারীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পর সর্বপ্রথম নামাযের শর্তারোপ করতেন।

হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- বান্দা ও কুফুরের মধ্যে ব্যবধান হলো নামায ছেড়ে দেয়া।

দুররে মানসূরে আছে- যে ব্যক্তি নামায পড়ে না ইসলামে তার কোনো অংশ নাই।

হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে নামাযের হিসাব দিতে সক্ষম হবে সেই সফল হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হিসাব দিতে পারবে না সে ধ্বংস হবে। –জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪১৩; সুনানে ইবনে মাযাহ, হাদীস নং ১৪২৫

কিয়ামত দিবসে বেনামাযীর করুণ পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ﴿٤٣﴾

এ আয়াতের সারকথা হলো, কিয়ামতের দিবসের কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার একটি খাস তাজাল্লী (তাজাল্লীয়ে সাক) প্রকাশ পাবে। সবাইকে সিজদাবনত হতে বলা হবে। তখন কেবল তারাই সিজদাবনত হতে পারবে যারা দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য সিজদা করত অর্থাৎ নামায পড়ত। কিন্তু সুস্থ্য-সবল থাকা সত্বেও যারা নামায পড়ত না, যারা নামাযের জন্য আহবান করত তাদের কথা শুনত না তারা আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেদিন সিজদা করতে পারবে না। তাদের কোমর তক্তার মতো শক্ত করে দেয়া হবে। তখন তারা অপমান ও অপদস্তের শাস্তি ভোগ করবে। তাদের দৃষ্টি মাটির দিকে অবনত থাকবে।'

-সূরা আল কলম আয়াত-৪২-৪৩

জামা'আতে নামায আদায় না করার কত বড় হুশিয়ারী

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফর ও মুনাফেকী, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবান কারীর (মুয়াযিযনের) ডাক শুনেও মসজিদে হাযির হয় না। –তারগীব, মুসনাদে আহমাদ, তবারানী)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার ইচ্ছা হয় কিছু সংখ্যক যুবককে অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনতে বলি। এরপর আমি ঐ সব লোকের কাছে যাই যারা বিনা ওযরে জামা'আতে না গিয়ে ঘরে নামায পড়ে নেয় এবং তাদের বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দিই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে কোনো রকম ওযর ব্যতীত জামা'আতে হাযির হয় না, তার নামায কবূল হয় না। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) আরয করলেন- ওযর বলতে কি বুঝায়? বললেন- অসুস্থ্যতা, ভয়, ভীতি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তি সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত নফল নামায পড়ে কিন্তু জুম'আ ও জামা'আতে হাযির হয় না, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তর করলেন- লোকটি জাহান্নামী। -তারগীব, জামে তিরমিযী

নামাযের বাইরের ফরয ৭টি

১. শরীর পাক। -সুরা মায়িদাহ: ৬
২. কাপড় পাক। -সুরা মুদ্দাছছির: ৪
৩. নামাযের জায়গা পাক। -সুরা বাকারা: ১২৫
৪. সতর ঢাকা। -সুরা আরাফ: ৩১
৫. কিবলামুখী হওয়া। -সুরা বাকারা: ১৪৪
৬. ওয়াক্তমতো নামায পড়া। -সুরা নিসা:১০৩
৭. নামাযের নিয়্যত করা। -সহীহ বুখারী, হা: ১

নামাযের ভিতরের ফরয ৬টি

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা। -সূরা মুদ্দাছছির: ৩
২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া। -সূরা বাকারা: ২৩৮
৩. কিরা'আত পড়া। -সূরা মুজ্জাম্মিল: ২০
৪. রুকূ করা। -সূরা হজ্ব: ৭৭
৫. দুই সিজদা করা। -সূরা হজ্ব: ৭৭
৬. আখেরী বৈঠক। -আবু দাউদ হা:৯৭০

[নামাযের কোনো একটি ফরয ছুটে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়।]

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

১. সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করা। -সহীহ বুখারী
২. সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট ছোট তিন আয়াত মিলানো। -বুখারী, মুসলিম
৩. রুকূ, সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ দেরি করা। -বুখারী, মুসলিম
৪. রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। -আবু দাউদ
৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। -আবু দাউদ
৬. প্রথম বৈঠক। -বুখারী শরীফ
৭. উভয় বৈঠকে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া। -বুখারী, মুসলিম
৮. ইমামের জন্য যোহর, আছর এবং দিনের বেলার সুন্নাত ও নফল নামাযে কিরা'আত আস্তে এবং ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমযান মাসে বিতরের নামাযে জোরে পড়া।
৯. বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া।
১০. দুই ঈদের নামাযে ছয়টি করে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।
১১. ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতকে কিরা'আতের জন্য নির্ধারিত করা।
১২. প্রত্যেক রাকা'আতের ফরযগুলোর তারতীব ঠিক রাখা। -তিরমিযী
১৩. প্রত্যেক রাকা'আতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।
১৪. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে নামায শেষ করা।

নামাযে নিয়্যতের গুরুত্ব

নামাযের নিয়্যত ফরয ও শর্ত। কিন্তু মুখে বলা আবশ্যক নয়। তাকবীরে তাহরীমার আগে নিয়্যত করাই উত্তম তবে কেউ যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় 'আল্লাহু' বলতে বলতে নিয়্যত করে ফেলেন, তাহলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ শব্দ বলার পর নিয়্যত করলে শুদ্ধ হবে না। যেমন- আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন যে, বিলম্বিত নিয়্যত গ্রহণযোগ্য নয়। আর নিয়্যতমুক্ত অংশ ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়নি। আর যেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য নয় তার উপর বাকী অংশের ভিত্তি ও সঠিক নয়। (২/৯৪)

এমনিভাবে আল্লাহু শব্দ বলার পর আকবার বলার পূর্বে নিয়্যত করলেও সহীহ হবে না। হাঁ, নিয়্যত তাকবীরে তাহরীমার আল্লাহু শব্দ বলার পূর্বে হলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ যদি তাকবীরে তাহরীমার আল্লাহু বলার পরে নিয়্যত করে তাহলে নামায সহীহ হবে না। কেননা আল্লাহু বলার মাধ্যমেই

নামাযে অনুপ্রবেশ সহীহ হয়। কাজেই সে যেন তাকবীরে তাহরীমার পরেই নিয়্যত করেছে।

মনে মনে এতটুকু খেয়াল রাখবে, (উদাহরণস্বরূপ) আমি আজকে যোহরের ফরয নামায পড়ছি। আর সুন্নাত হলে খেয়াল রাখবে, সুন্নাত নামায পড়ছি। এতটুকু খেয়াল করে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধবে, এতেই নামাযের নিয়্যত সহীহ হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের মাঝে লম্বা-চওড়া যে আরবী নিয়্যত প্রচলিত আছে, তা বলা আবশ্যক নয়। তবে বুর্যূগানে দ্বীন আরবী নিয়্যত পসন্দ করেন, তাই অর্থ বুঝে আরবীতে নিয়্যত করতে পারলে উত্তম।

মনে রাখবে, অন্তরের সংকল্প ছাড়া শুধু মুখের উচ্চারণে নিয়্যত আদায় হয় না। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) থেকে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা প্রমাণিত নয়। তাই মুখে নিয়্যত করাকে সুন্নাত বলা ভুল। তবে অন্তরের সংকল্পের পাশাপাশি মুখের নিয়্যতের ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই। কিন্তু আরবী ভাষায় নিয়্যত করাকে সওয়াবের কাজ মনে করা নিতান্তই ভুল এবং প্রচলিত লম্বা আরবী নিয়্যত করতে গিয়ে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা জোরে জোরে উচ্চারণ করে অন্যের মনোযোগ নষ্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। –ইবনে নুজাইম, আল বাহরুর রায়েক : ১/২৭৭

তাকবীরে তাহরীমা

নামাযের ভিতরে ফরযসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাকবীরে তাহরীমা বলা। তাকবীরে তাহরীমা মুখে উচ্চারণ করা ফরয।

মাসআলাঃ তাকবীরে তাহরীমা মুখে উচ্চারণ করে বলা ফরয। মুখে উচচারণ না করে শুধু মনে মনে বললে নামায হবে না। তাকবীরে তাহরীমা মুখে এমনভাবে উচ্চারণ করে বলা ফরয, যাতে সে নিজে শুনতে পায়। কাজেই যে ব্যক্তি তা অস্পষ্ট স্বরে শুধু জিহ্বা আওরিয়ে অথবা মনে মনে বলবে তার তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হবে না। –কিতাবুল ফিকহি আলাল মাযাহিবিল আরবা ১/১৮১

তাকবীরের তিন অবস্থা

বিভিন্ন প্রকারের নামাযে যতগুলো তাকবীর আমরা বলি, সবগুলো বিশ্লেষণ করলে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. ফরয তাকবীর
২. ওয়াজিব তাকবীর
৩. সুন্নাত তাকবীর

ফরয তাকবীর: শুধু জানাযা নামায ছাড়া যে কোনো নামাযে একটি মাত্র তাকবীর ফরয। আর সেটি হলো তাকবীরে তাহরীমা। জানাযায় চার তাকবীর ও তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোনো তাকবীর ফরয হওয়ার কথা জানা যায় না।

ওয়াজিব তাকবীর: দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর ওয়াজিব।

সুন্নাত তাকবীর: আমরা নামাযে এক রুকন থেকে অন্য রুকনে পরিবর্তিত হই। যেমন- কিয়াম থেকে রুকূ, রুকূ থেকে কওমা, কওমা থেকে সিজদা ইত্যাদি। এই পরিবর্তনসমূহে আমরা যে তাকবীর বলে থাকি তাকে তাকবীরে ইন্তেকালিয়া বলে। এই তাকবীরে ইন্তেকালিয়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

ইসলাহ: কিছু মুক্তাদীকে দেখা যায় যে তারা তাকবীরে তাহরীমা ইমামের আগে শুরু করেন ইমামের সঙ্গে বা পরে শেষ করেন। আবার অনেকে ইমামের সঙ্গে শুরু করেন ইমামের আগে শেষ করেন।

মাসআলা: উল্লেখিত দু'টি সুরতই গলত। কোনো সুরতেই মুক্তাদীর নামায হবে না। কারণ ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার পরপরই মুক্তাদীর ইক্তেদা সহীহ হয়। তাই মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরের পরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরের আগে শুরু হলে অথবা ইমামের তাকবীর শুরুর পর মুক্তাদীর তাকবীর শুরু হয়ে ইমামের তাকবীর শেষ হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেলে সে তাহরীমা বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন ফাতওয়ার কিতাবে এসেছে– যদি মুক্তাদী ' আল্লাহু' বলে তাকবীর শুরু করে এবং ইমামের আল্লাহু বলার আগেই তার আল্লাহু শব্দ শেষ করে ফেলে তাহলে তার তাহরীমা সহীহ হবে না। যদি তার আকবার শব্দটি ইমামের আকবার শব্দ বলার পর সমাপ্ত হয় তবুও সহীহ হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে সে শুধু আকবার বলে তাকবীরে তাহরীমা করেছে হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আর শুধু আকবার শব্দ দিয়ে তাহরীমা সহীহ হয় না। -মুনয়াতুল মুসল্লী, ২২৮

মুক্তাদী ইমামের তাকবীরে তাহরীমার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে তাকবীর বলবে এটা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত। অবশ্য তার শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে মুক্তাদী ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। আর ২য় মতটির উপরই ফাতওয়া।

-ফাতওয়ায়ে আলমগীরী ১/৬৮

ইসলাহ: তাকবীরে তাহরীমা বলা ফরয। আর তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। সঠিক নিয়ম হলো হাত উঠানোর এই কাজটি তাকবীর বলার সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করা। কিন্তু অনেককে দেখা যায়

তাকবীরে তাহরীমার মাঝে বা পরে হাত উঠায়। আবার অনেকে তাকবীরে তাহরীমার বলার পর হাত সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তারপর বাঁধে। এরকম করা সম্পূর্ণ ভুল।

মাসআলা: এ ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো তাকবীরে তাহরীমা বলার পুর্বে হাত কান পর্যন্ত উঠানো এবং তাকবীর বলে হাত বেঁধে ফেলা।

ইসলাহ: তাকবীর বলতে গিয়ে আমরা আরো নানা ধরনের ভুলের শিকার হই। اللّٰه শব্দের হামযাকে টেনে লম্বা করে اللّٰه বলি। কখনো আকবার শব্দের হামযাকে লম্বা করি। আবার কখনো আকবার শব্দের بـاء কে লম্বা করে اكبـار উচ্চারণ করে থাকি।

মাসআলা: এগুলো সবই ভুল। ফাতওয়ার কিতাবাদিতে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ আল্লাহ্ শব্দের হামযা কে টেনে اللّٰه আর আকবার শব্দের আলিফকে টেনে اكـبر অথবা بـاء কে টেনে اكبـار পড়ে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য তাকবীরের একই হুকুম। কারণ এ-রকম ভুলের কারণে অর্থ পরিবর্তন হয়ে কুফুরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন আল্লামা শামী (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ্ শব্দের হামযাকে দীর্ঘ করলেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি আকবার শব্দের হামযাকে দীর্ঘ করলেও। কেননা এটি প্রশ্নবোধকে পরিণত হয়ে যায়। এমনটি ইচ্ছাকৃতভাবে করলে কুফুরী হবে। অতএব এটা তাকবীর না হওয়ায় এর দ্বারা নামাযের সূচনা সহীহ হবে না। বরং এতে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। আবার আকবার শব্দের بـاء কে টেনে পড়লে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা তখন তা كَبَرٌ এর বহু বচন হবে। যার অর্থ ঢোল বা তবলা অথবা হায়া কিংবা শয়তানের প্রতি শব্দ। তখন শব্দটি তাকবীরের অর্থ থেকে বের হয়ে যায়। ফলে সেটা আর তাকবীরে তাহরীমা থাকবে না। (২/১৪২)

মাসআলা: তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় মাথা সোজা রাখা সুন্নাত। কিন্তু অনেকে মাথা সোজা না রেখে সামনের দিকে ঝুকিয়ে তাকবীর বলে। এরূপ মাথা ঝুকিয়ে তাকবীর বলা আদ্দুররুল মুখতার রচয়িতার মতে বিদ'আত। যদি মুসল্লী ইমামকে রুকূর মধ্যে গিয়ে পায় এবং আল্লাহু আকবার বলে তাঁর পিছনে নামায পড়তে শুরু করে। কিন্তু তার দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহ্ শব্দ আদায় হয় আর রুকূতে আকবার শব্দ আদায় হয়, তাহলে তার তাহরীমা সহীহ হবে না।

–ফাতওয়ায়ে আলমগীরী

তাকবীরে তাহরীমা বলা যেমন ফরয তেমনি তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে বলা ফরয। কাজেই অর্ধেক রুকূতে গিয়ে বললে অথবা পুরোটাই রুকূতে গিয়ে বললে নামায হবে কী ভাবে?

নামাযের সুন্নাত ৫১টি

দাঁড়ানোর মধ্যে ১১টি, কিরা'আতে ৭টি, রুকূতে ৮টি, সিজদায় ১২টি, বৈঠকে ১৩টি।

দাঁড়ানো অবস্থার সুন্নাত ১১টি

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ মাথা না ঝুঁকানো। –শামী, ত্বাহতাবী

২. পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে রাখা, দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা মুস্তাহাব।

–মারাকিল ফালাহ : ২৬২, নাসাঈ, হাদীস নং ৮৯২, আলমগীরি ১/৭৩

৩. তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে পুরুষদের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো এবং মহিলাদের উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নাত। ওযরের অপরাগতার অবস্থায় পুরুষরাও কাঁধ পর্যন্ত উঠালে কোনো অসুবিধা নেই। –মুসলিম, হাদীস নং ৩০৪, বেহেশতী জেওর : ২/৯৪

৪. মুক্তাদির তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরক্ষণেই হওয়া।

–বুখারী, হাদীস নং ৭৩৪, মুসলিম, হাদীস নং ৪১৪-৪১৫, মারাকিল ফালাহ : ২৫৭

৫. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের তালু কেবলার দিকে রাখা। –শামী

৬. হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা। –শামী : ১/৩৫৬

৭. ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা।–ত্বাহতাবী : ১৪০

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কব্জি পেঁচিয়ে ধরা। –তাহতাবী : ১৪১

৯. মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর বিছিয়ে রাখা। –তাহতাবী

১০. নাভির নিচে হাত বাঁধা। –আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৫৬, আলমগীরি, ১/৭৩

১১. ছানা পড়া। –সহীহ মুসলিম ১/১৭২; ই'লাউস সুনান : ২/১৭৪

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

ইসলাহ: নামাযে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে থুতনিকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে যা মাকরূহ। বিনা কারণে সিনা ঝুঁকিয়ে দাঁড়ানো দুরস্ত নয়। তাকবীরে তাহরীমা বলা ফরয। আর এই তাকবীর বলার পূর্বে কান পর্যন্ত হাত উঠানো ভিন্ন একটি সুন্নাত। সঠিক নিয়ম হচ্ছে, হাত উত্তোলনের এই কাজটি তাকবীর বলার পূর্বেই সম্পন্ন করা। অর্থাৎ কানের লতি বরাবর হাত উত্তোলন ও তাকবীর উভয়টি আদায় করা সুন্নাত। কিন্তু অনেককে দেখা যায় তাকবীরে তাহরীমা বলার মাঝে বা পরে হাত উঠায়, আবার অনেকে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তারপর বাঁধে। এ-রকম করা সম্পূর্ণরূপে ভূল।

কিরা'আতের সুন্নাত ৭টি

১. তা'আওউয, অর্থাৎ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -পড়া।

–তাহতাবী: ১৪১

২. তাসমিয়া অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া। –নাসাঈ, হাদীস নং ৯০৫

৩. সূরা ফাতেহা পড়ার পর আস্তে 'আমীন' বলা। –বুখারী, হাদীস নং ৭৮০

৪. ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাসসাল অর্থাৎ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত। আসর ও ইশায় আওসাতে মুফাসসাল অর্থাৎ সূরা ত্বারিক থেকে সূরা লাম-ইয়াকুন পর্যন্ত এবং মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল অর্থাৎ সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাসমূহ থেকে কোনো সূরা পড়া। তবে যোহরের নামাযে আওসাতে মুফাসসাল পড়ারও অনুমতি আছে। -মারাকিল ফালাহ-২৬৩

৫. ফজরের প্রথম রাকা'আতকে দ্বিতীয় রাকা'আত অপেক্ষা লম্বা করা।

–ত্বাহতাবী: ১৬৪

৬. কিরা'আত অতি ধীরে অথবা অতি দ্রুত গতিতে না পড়া; বরং মধ্যম গতিতে পড়া। –মুসলিম, হাদীস নং ৭৩৩

৭. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পড়া। –ত্বাহতাবী

কিরা'আত আস্তে ও জোরে পড়ার বিধান

নামাযে কিরা'আত আস্তে পড়ার ক্ষেত্রেও এতটুকু আওয়াযে পড়া জরুরী যেন নিজ কানে শুনতে পাওয়া যায়; অন্যথায় তা কিরা'আত হিসেবে গণ্য হবে না। আর জোরে কিরা'আতের পরিমাণ হলো– কমপক্ষে এমন আওয়াযে পড়া যেন পাশে কোনো ব্যক্তি থাকলে সে শুনতে পায়। –আল-বিনায়া : ২/৩৫২

বি.দ্র.: তবে মুসল্লীদের অবস্থা বা পরিস্থিতির কারণে কোনো কোনো সময় সংক্ষিপ্ত করা বা অন্য কোনো সূরাও পড়া যেতে পারে।

রুকূর সুন্নাত ৮টি

১. রুকূতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা। –বুখারী, হাদীস নং ৭৮৯

২. রুকূতে উভয় হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরা। –বুখারী, হাদীস নং ৭৯০

৩. হাঁটু ধরতে হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ফাঁক রেখে ধরা।

–আবু দাউদ, হাদীস নং ৭৯০

৪. পায়ের গোছা সোজা রাখা। –আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৬৩

৫. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাঁকা না করা। রুকূ অবস্থায় পিঠ বিছিয়ে বরাবর করে রাখা।

৬. মাথা, পিঠ ও কোমর এক বরাবর করে রাখা। –বুখারী, হাদীস নং ৮২৮

৭. রুকূর মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়া।

–আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৮৬

৮. রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ এবং মুক্তাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে এবং একা নামায আদায়কারী উভয়টি বলবে। رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলার পর حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ বলা মুস্তাহাব। –বুখারী, হাদীস নং ৭৮৯

সিজদার সুন্নাত ১২টি

১. তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া। –বুখারী, হাদীস নং ৮০৩

২. সিজদায় যাওয়ার সময় জমিনের উপর প্রথমে দুই হাঁটু রাখা।

–নাসাঈ, হাদীস নং ১০৮৯

৩. অতঃপর উভয় হাত রাখা। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৮৮২

৪. অতঃপর নাক বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর রাখা। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৮৮০

৫. অতঃপর কপাল রাখা। –মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৮৮০

৬. দুই হাতের মাঝখানে সিজদা করা। –মুসলিম, হাদীস নং ৪০১

৭. সিজদা অবস্থায় রান থেকে পেট পৃথক রাখা।[১]

–মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩৬৬২

৮. বাজু বগল থেকে আলাদা রাখা। –বুখারী, হাদীস নং ৮০৭

---

[১]. টীকা : সিজদা অবস্থায় কপাল, নাক এই পরিমাণ দূরে রাখবে যাতে উরু সোজা থাকে, সামনে বা পিছনে হেলে না যায়।

৯. উভয় হাত কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত জমিনের উপর বিছিয়ে না রাখা।
–বুখারী, হাদীস নং ৮২২

১০. সিজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়া।
–ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৮৮৮

১১. সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলা। –বুখারী, হাদীস নং ৮২৫

১২. সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর হাঁটু উঠানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা।
–তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৮

ইসলাহ: সাতটি অঙ্গে- কপাল, নাক, উভয় হাতের পাতা, উভয় হাঁটু ও উভয় পায়ের পাতার প্রান্ত-এর উপর ভর দিয়ে সিজদা করবে। সিজদায় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে।
–বুখারী: ১/১১২, মুসতাদরাকে হাকেম : ১/২২৪

বসার সুন্নাত ১৩টি

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান পা খাড়া রাখা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে রাখা। –নাসাঈ, হাদীস নং ১১৫৮

২. উভয় হাত রানের উপর রাখা। আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
–মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৬১০৬

৩. আত্তাহিয়্যাতু-এর মধ্যে 'আশহাদু আল্লা-' বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকৃতি বানিয়ে শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা এবং ইল্লাল্লাহু বলার সময় আঙ্গুল ঝুঁকিয়ে দেয়া, ইশারা শেষ করে গোলাকৃতি নামাযের শেষ পর্যন্ত বাকি রাখা। –আবু দাউদ, হাদীস নং ৭২৬

৪. আখেরী বৈঠকে দুরূদ শরীফ পড়া। –তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৭৭

৫. দুরূদ শরীফের পর দু'আয়ে মাসূরা পড়া। –বুখারী, হাদীস নং ৮৩৪

৬. দুই দিকে সালাম ফিরানো। –তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৫

৭. প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরানো। –মুসলিম, হাদীস নং ৫৮২

৮. সালামের সময় ইমামের জন্য মুক্তাদী, ফেরেশতা এবং নেক জ্বীন্নাতের নিয়্যত করা। –মুসলিম, হাদীস নং ৪৩১

৯. সালামের সময় মুক্তাদীদের জন্য ইমাম, ফেরেশতা ও নেক জ্বীন্নাত এবং ডান ও বামের মুক্তাদীদের নিয়্যত করা।
–মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৩১৪৯ ও ৩১৫২

১০. একা নামাযীর জন্য কেবল ফেরেশতাদের নিয়্যত করা।

–মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৩১৪০

১১. মুক্তাদীদেরও ইমামের সাথেই সালাম ফিরানো। –বুখারী, হাদীস নং ৮৩৮

১২. প্রথম সালামের আওয়ায দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা বুলন্দ করা। -শামী২/২৪১

১৩. মাসবূক ব্যক্তির অবশিষ্ট নামায আদায় করার জন্য ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানো শেষ করার অপেক্ষা করা।

–নূরুল ইযাহ, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং ৩১৫৬

সালাম ফিরানোর সুন্নাত

চেহারা কিবলামুখী থাকাবস্থায় সালাম শুরু করে 'আলাইকুম' বলার সময় আস্তে আস্তে চেহারা ডানে ফিরাবে এবং দৃষ্টি কাঁধের উপর নিয়ে সালাম শেষ করবে। তারপর নীরবে চেহারা কিবলার দিকে আনবে এবং পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সালাম আদায় করবে। وَرَحْمَةُ اللهِ-এর মধ্যে اَللهُ শব্দের 'লাম'-কে এক আলিফের বেশি টানবে না। দ্বিতীয় সালামের আওয়ায প্রথম সালাম অপেক্ষা ক্ষীণ হবে এবং প্রথম সালামের ন্যায় وَرَحْمَةُ اللهِ -এর লামকে এক আলিফের বেশি টানবে না।

–তিরমিযী, মাআরিফুস সুনান

নামাযে পঠিত কতিপয় দু'আ ও দুরূদ

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ.

অর্থ- আদব ও সম্মানসূচক সকল কথা (অর্থাৎ সকল মৌখিক ইবাদত) আল্লাহর জন্য। সমস্ত শারীরিক ও মালী ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহর সকল নেক বান্দার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ- হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ও তাঁর বংশধরদের উপর আপনার খাস রহমত নাযিল করুন। যেমন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসা ও সম্মানের উপযুক্ত। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ও তাঁর বংশধরের উপর আপনার খাস বরকত নাযিল করুন। যেমন বরকত নাযিল করেছেন আপনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসা ও সম্মানের উপযুক্ত।

দু'আয়ে মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আমি বড় অপরাধী। আর তুমি কেবল গুনাহ মাফ করতে পারো। সুতরাং তুমি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর রহম করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।

দু'আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ, اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছে

মাগফিরাত কামনা করি, আপনার প্রতি ঈমান রাখি, আপনার উপর ভরসা করি এবং আপনার উত্তম প্রশংসা করি। আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করি, নাশুকরি করি না। আমরা আপনার অবাধ্য বান্দাদের সংশ্রব বর্জন করি ও তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনার জন্যই নামায পড়ি, সিজদা করি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হই। আর আপনারই দাসত্ব অবলম্বন করি। আমরা আপনার রহমতের আশা রাখি এবং আপনার আযাবের ভয় করি। আপনার শাস্তি অবশ্যই কাফেরদের জন্যই অবধারিত।

মহিলাদের নামাযের মাসাইল

মাসাইলে কিয়াম ২৭টি

দাঁড়ানোর মধ্যে ৭ কাজ

১. পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।
২. উভয় পা মিলিয়ে রাখা। -আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল
৩. উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় ও গোড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।
৪. তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হাত ছেড়ে দাঁড়ানো। (হাত বেঁধে না রাখা)
৫. সম্পূর্ণ সোজা হওয়া (এক পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে না দাঁড়ানো।)
৬. ঘাড় সোজা রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না করা।
৭. সিজদার জায়গার দিকে নযর রাখা।

[বি.দ্র. ফরয নামাযের কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই ফরয]

তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোর নিয়ম

১. হাত কাপড়ের ভিতর রেখে উঠানো। (বাইরে বের না করা) হাত উঠানোর সময় জমিনের দিকে মাথা না ঝুঁকানো।
২. হাত উঠানোর সময় (যথাসম্ভব) হাত শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা।
৩. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।
৪. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৫. হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা।
৬. তাকবীরে তাহরীমা বলার প্রাক্কালে উক্ত নামাযের খেয়াল (নিয়্যত) মনে হাযির করা (ফরয)।
৭. হাত উঠানোর পর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। তাকবীরের মদ এক আলিফ থেকে বেশি না টানা।
৮. তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সরাসরি বুকের উপর হাত রাখা। (হাত বাঁধার আগে হাত ঝুলিয়ে না দেয়া)।

হাত বাঁধার সময় ৪ কাজ

১. ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।
২. সিনার উপর হাত রাখা।
৩. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৪. উভয় বাহু বগলের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

হাত বাঁধার পর ৮ কাজ

১. ছানা পড়া
২. আ'উযুবিল্লাহ পড়া।
৩. বিসমিল্লাহ পড়া।
৪. সূরা ফাতিহা পড়া (ওয়াজিব)।
৫. সূরা ফাতিহার পর আস্তে আমীন বলা।
৬. সূরা মিলানো (ফরযের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সব রাকা'আতে) ওয়াজিব।
৭. সূরার শুরু থেকে মিলালে প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' পড়া।
৮. মাসনূন কিরা'আত পড়া।

[পরবর্তী রাকা'আতগুলোতে তাকবীরে তাহরীমা নেই এবং ওসব তাকবীরে হাত উঠানো, ছানা পড়া, আ'উযুবিল্লাহ ইত্যাদি নেই।]

মাসাইলে রুকূ

রুকূ অবস্থায় ১০ কাজ

১. রুকূতে যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।
২. উভয় পায়ের গোড়ালিদ্বয় মিলিয়ে রাখা।
৩. রুকূতে পূর্ণ বাঁকা না হয়ে মধ্যম ধরনের ঝোঁকা।
৪. চাদরের ভিতর দিয়ে হাতের আঙ্গুল হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।
৫. হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
৬. হাঁটুদ্বয় একটু বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা।
৭. সম্পূর্ণ হাত শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।
৮. পায়ের দিকে নযর রাখা।
৯. রুকূতে কমপক্ষে তিনবার রুকূর তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়া।
১০. রুকূ করা ফরয এবং রুকূতে কমপক্ষে এক তসবীহ পরিমাণ দেরি করা ওয়াজিব।

রুকূ থেকে উঠতে ৩ কাজ

১. রুকূ থেকে উঠার সময় 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা।
২. সোজা হয়ে (হাত ছেড়ে) স্থিরভাবে দাঁড়ানো [ওয়াজিব]।
৩. দাঁড়িয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা।

মাসাইলে সিজদা ৩৪টি

সিজদা অবস্থায় ১৯ কাজ

১. সিজদায় যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।
২. হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত সিনা ও মাথা সোজা রাখা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া।
৩. (প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।
৪. (তারপর) নিতম্ব স্থাপন করে বসা।
৫. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা।
৬. পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা।
৭. অতঃপর আঙ্গুল মিলিয়ে হাঁটুর কাছে মাথা রাখা।
৮. আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে রাখা।
৯. দু'হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁকা রাখা।
১০. (অতঃপর) বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা বরাবর হাঁটুর সামনে রাখা।
১১. নাকের অগ্রভাগের দিকে অর্থাৎ যমীনের দিকে নযর রাখা।
১২. (অতঃপর) কপাল রাখা।
১৩. পেট উরুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।
১৪. কনুই মাটিতে লাগিয়ে রাখা।
১৫. বাহু শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।
১৬. অত্যন্ত জড়সড় হয়ে সিজদা করা।
১৭. আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে মিলিয়ে রাখা।
১৮. কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া।
১৯. সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরি করা ওয়াজিব।

সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ

১. সিজদা থেকে উঠা অবস্থায় তাকবীর বলা।
২. প্রথমে কপাল উঠানো।

৩. অতঃপর নাক উঠানো।
৪. অতঃপর উভয় হাত উঠানো।
৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা (ওয়াজিব)।
৬. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা।
৭. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভব হলে) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
৮. নিতম্বের উপর বসা।
৯. উভয় হাত উরুর উপর, হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
১০. নযর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।
১১. বসা অবস্থায় দু'আ (আল্লাহুম্মাগফিরলী) বলা।
১২. তাকবীর বলা অবস্থায় দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়া।
১৩. পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাকা'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো।
১৪. হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো।
১৫. সিজদা থেকে সরাসরি দাঁড়ানো। (মাঝখানে না বসা) এবং উঠার মধ্যে রুকূর অবস্থা সৃষ্টি না করা।

মাসাইলে কু'ঊদ (বৈঠক) ১৬টি

বসায় ১০ কাজ

১. উভয় পা ডান দিকে বের করে বিছিয়ে বসা।
২. উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভব হলে) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
৩. উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা এবং উরুর উপর আঙ্গুলসমূহের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
৪. মাথা ও পিঠ সোজা রাখা।
৫. নযর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।
৬. আত্তাহিয়্যাতু পড়া (ওয়াজিব)।
৭. আশহাদু বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসঙ্গে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় মুড়িয়ে রেখে হালকা বাঁধা।
৮. 'লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাৎ আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় নামানো। বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত সেভাবে হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা।
৯. আখেরী বৈঠকে (আত্তাহিয়্যাতুর পর) দুরূদ শরীফ পড়া।
১০. (অতঃপর) দু'আয়ে মাসূরা পড়া।

[বি.দ্র. ১ম বৈঠক ওয়াজিব ও শেষ বৈঠক ফরয।]

সালাম ফিরানোর ৬ কাজ

১. একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়্যত করা এবং জামা'আতের সময় উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বীনদের সালাম করার নিয়্যত করা।
২. উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা।
৩. উভয় সালামে 'আসসালামু' বলা পর্যন্ত চেহারা কিবলার দিকে রাখা।
৪. প্রথমে ডান দিকে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।
৫. সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো (সিনা না ফিরানো)।
৬. আলাইকুম বলার সময় নযর কাঁধের দিকে ফিরানো।

পুরো নামাযের সময় ৮ মাসাইল

১. নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা। এর সহজ পদ্ধতি হলো, সবকিছু খেয়াল করে পড়া। মুখস্থের জোরে না পড়া। (মন অন্য কোনো দিকে চলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই নামাযের মধ্যে ফিরিয়ে আনা)
২. মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌছে শেষ করা। (কিন্তু তাকবীর এক আলিফ থেকে বেশি টানা যাবে না)
৩. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে বিনাওযরে বিলম্ব না করা।
৪. পঠিত সূরা বা দু'আসমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।
৫. কিরা'আত, তাকবীর, দু'আ ইত্যাদি চুপে চুপে পড়া।
৬. সর্বাবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা।
৭. হাই এলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করা।
৮. হাঁচি এলে সাধ্যমত দমিয়ে রাখা।

[এ পর্যন্ত মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল পূর্ণ হল।]

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

১. মহিলাদের নামায শুরু করার পূর্বে তার চেহারা ও হাত-পা ব্যতীত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো করে কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।-আলমগীরী-১/৫৮
২. মহিলারা তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে (কান পর্যন্ত নয়)। -তাবারানী : ২২/১৯ , শামী : ২/১৮২
৩. চাদর ইত্যাদির ভেতর থেকে হাত বের করবে না। -তিরমিযী-হাঃ ১১৭৩
৪. বুকের উপর হাত বাঁধবে। -আলমগীরী : ৭৩

৫. মহিলারা শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে, পুরুষের ন্যায় কব্জি ধরবে না এবং গোলাকৃতিও বানাবে না। -শামী:২/১৮৮

৭. রুকূর মধ্যে সামান্য ঝুঁকবে। -আলমগীরী : ৭৪

৮. রুকূর মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাঁটুর উপর রাখবে। -শামী ২/১৯৭

৯. রুকূ অবস্থায় কনুই পাঁজরের সঙ্গে চাপিয়ে রাখবে। -তাহতাবী-২১৫

১০. রুকূর মধ্যে উভয় পা একেবারে সোজা করে রাখবে না বরং হাঁটুকে সামনের দিকে কিছুটা বাঁকা করে দাঁড়াবে। -দুররে মুখতার

১১. যথাসম্ভব মাটির সঙ্গে চেপে সিজদা করবে। -আব্দুর রাজ্জাক হা: ৫০৬৯

১২. পেট ও রান মিলিয়ে রাখবে। -আলমগীরী

১৩. উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। -আলমগীরী

১৪. কনুই মাটির উপর বিছিয়ে দেবে।

১৫. সিজদার মধ্যে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখবে, কিন্তু পা খাড়া করবে না; বরং ডান দিকে বের করে দিবে।-ইবনে আবী শাইবা-২৭৮১

১৬. বসার সময় বামদিকে নিতম্বের উপর ভর করে বসবে। -মুসান্নিফে আ: রাজ্জাক-৩/১৩৯

১৬. উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে।

১৭. আত্তাহিয়্যাতু এবং দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। -ইবনে আবী শাইবা-২৭৮৫

বিশেষ জ্ঞাতব্য: শুধু মহিলাদের জামা'আত করা মাকরূহ। তাদের একাকী নামায পড়াই উত্তম। তবে যদি মাহরাম (যাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েয) ব্যক্তিবর্গ কোনো ওযরের কারণে ঘরের মধ্যেই জামা'আত করতে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে শরীক হওয়াতে কোনো দোষ নেই। তবে এ-অবস্থায়ও পুরুষের কাতারে না দাঁড়িয়ে পিছনে দাঁড়াতে হবে। -মাজমাউল আনহুর : ১৬৪

মহিলাদের জামা'আতে শরীক হওয়া নিষেধ

মহিলাদের জামা'আতে শরীক হওয়া নাজায়েয হওয়ার মূল কারণ হলো- 'ফিৎনার আশঙ্কা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে ফিৎনার আশঙ্কা সর্বাধিক কম হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের মসজিদে না এসে ঘরে নামায পড়ার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং মসজিদে আসার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতেন। বর্তমান যুগে শুধু ফিৎনার আশঙ্কা নয়, বরং ফিৎনার পুরোপুরি একীন বিদ্যমান। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে মহিলাদের মসজিদে আসা নাজায়েয হওয়াটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে নিম্নের হাদীসগুলো লক্ষ্যণীয়-

১. সাহাবী হযরত আবু হুমাইদ সায়েদী (রাযি.)-এর স্ত্রী উম্মে হুমাইদ (রাযি.) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে ভালোবাস, অথচ তোমার জন্য ঘরের ভিতরে নামায পড়া ঘরের বারান্দায় নামায পড়া থেকে উত্তম এবং ঘরের বারান্দায় নামায পড়া বাড়ির ভিতরের আঙ্গিনায় নামায পড়া থেকে উত্তম। আর বাড়িতে নামায পড়া তোমার এলাকার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। তোমার এলাকার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত মহিলার নির্দেশে তার ঘরের এক কোণে তার নামাযের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করে দেয়া হলো এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায পড়তেন। -আততারগীব ওয়াততারহীব : ৫৮পৃ:, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১ : ১৫৫ , ফতহুল বারী ২ : ২৯০

২. হযরত উম্মে সালামা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলাদের জন্য ঘরের বারান্দায় নামায থেকে ঘরের ভিতর নামায পড়া উত্তম এবং বাড়ির আঙ্গিনায় নামায পড়া থেকে ঘরের বারান্দায় নামায পড়া উত্তম। মসজিদে নামায পড়া থেকে বাড়িতে নামায পড়া উত্তম।

–আততারগীব ওয়াততারহীব : ৪/৫০, ইলাউসসুনান : ৪/২৩০

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

১. নামাযে কিরা'আত অশুদ্ধ পড়া।
২. নামাযের ভিতর কথা বলা।
৩. কাউকে সালাম দেয়া।
৪. সালামের উত্তর দেয়া।
৫. উহ্ আহ্ শব্দ করা।
৬. বিনা ওযরে কাশি দেয়া।
৭. আমলে কাসীর করা।
৮. বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।
৯. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতরের কোনো অঙ্গ খুলে থাকা।
১০. মুক্তাদী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির লুকমা নেয়া।
১১. সুসংবাদে 'আলহামদু লিল্লাহ' ও দুঃসংবাদে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলে উত্তর দেয়া।
১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করা।
১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া।

১৪. নামাযে কুরআন শরীফ দেখে পড়া।
১৫. নামাযে শব্দ করে হাসা।
১৬. নামাযে দুনিয়াবি কোনো কিছু প্রার্থনা করা।
১৭. 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে হাঁচির উত্তর দেয়া।
১৮. নামাযে কোনো কিছু খাওয়া বা পান করা।
১৯. ইমাম থেকে মুক্তাদীর এগিয়ে দাঁড়ানো।

নামাযের মাকরূহসমূহ

যেসব কাজ দ্বারা নামায ভঙ্গ হয় না তবে তা নামাযের জন্য দোষণীয়, সেগুলো নিম্নরূপ।

১. চাদর শরীরে না জড়িয়ে উভয় কাঁধে ঝুলিয়ে ছেড়ে দেয়া অথবা জামা কিংবা শেরওয়ানীর হাতার ভিতর হাত না ঢুকিয়ে কাঁধে ফেলে দেয়া, তেমনি রুমাল মাফলারের উভয় দিক গলায় না পেঁচিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে ছেড়ে দেয়া। -কাবীরী : ৩৪৭

২. কপালে বা হাতের তালুতে ধুলাবালি লাগার ভয়ে কাপড় টেনে ধরা অথবা মুখে ফুঁক দিয়ে ধুলাবালি সরানো। সিজদার জায়গায় পাথর কণা থাকলে হাত দিয়ে সরানো। অবশ্য অধিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দু-একবার সরিয়ে ফেলাতে কোনো দোষ নেই। –শামী-২/৪০৯

৩. নিজের শরীর, কাপড় অথবা দাঁড়ির সঙ্গে খেল-তামাশা করা। বহু লোক না বুঝে এরূপ করে থাকে, এসব থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।
–কাবীরী : ৩৪৯

৪. এমন কাপড় পরিধান করে নামায পড়া, যে কাপড় পরে লোক সমাজে অথবা সভা-সমিতিতে যাওয়া অপসন্দনীয় বোধ হয়। –কাবীরী : ৩৪৯

৫. মুখে কোনো জিনিস রেখে নামায পড়া। -আলমগীরী : ১/১০৮

৬. শৈথিল্য অথবা অমনোযোগিতার দরুন পুরুষের মাথা খালি রেখে অথবা নাভির ওপরে খোলা দেহে নামায পড়া।
–তাতারখানিয়া : ১/৪০৯, শামী : ৪০৭

৭. আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া। -তাতারখানিয়া : ১/৪১১

৮. বিনা প্রয়োজনে কোমরের কাপড়ে হাত ঢুকিয়ে দেয়া কিংবা বিনা প্রয়োজনে কোমরে হাত রাখা। -তাতারখানিয়া : ১/৪১১

৯. সিজদায় পুরুষের দু'হাত কনুই পর্যন্ত জমিনের উপর বিছিয়ে দেয়া।
-তাতারখানিয়া : ১/৪১০

১০. এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। -শামী ২/৪০৯

১১. এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায পড়া, যে লোক তার দিকে মুখ করে আছে বা এমন স্থানে নামায পড়া যেখানে কেউ হাসিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা আছে।-শামী : ২/৪২২

১২. হাত অথবা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে কারও কথার উত্তর দেয়া।-শামী : ২/৪১১

১৩. কোনো অসুবিধা ব্যতীত হামাগুড়ি দিয়ে বসা বা দুই পা খাড়া রেখে বসা বা আসন গেড়ে বসা। অবশ্য কোনো ওযর থাকলে সুবিধামতো বসার অনুমতি আছে। -শামী : ২/৪১০

১৪. ইচ্ছা করে হাই তোলা অথবা হাই বন্ধ করার চেষ্টা না করা।
-তাতারখানিয়া : ১/৪০৯, শামী : ২/৪১২

১৫. সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও একাকী পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া। -শামী : ২/৪১৬

১৬. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায পড়া। -শামী ২/৪১৬

১৭. প্রথম রাকা'আতের কিরা'আতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকা'আতের কিরা'আত তিন আয়াত বা তারচেয়ে বেশি লম্বা করা। –মারাকিল ফালাহ-৩৫১

১৮. মুক্তাদীদের চেয়ে শুধু ইমামের স্থান উঁচু হওয়া। তবে এক বিঘত পরিমাণ বা তারচেয়ে কম উঁচু হলে কোনো ক্ষতি নেই। -তাতারখানিয়া, শামী-১/৩৯৮

১৯. এমনভাবে চাদর জড়িয়ে নামায পড়া, যাতে হাত বের করতে অসুবিধা হয়। -তাতারখানিয়া : ১/৪১০

২০. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোচড়ানো। -তাতারখানিয়া : ১/৪১১

২১. টুপি, পাগড়ি অথবা রুমালের ভাঁজে সিজদা করা। এগুলো পরিধান করার পর সিজদার জন্য পূর্ণ চেহারা খোলা রাখা জরুরী। -মারাকিল ফালাহ :৩৫৫

২২. কোনো নামাযে বিশেষ সূরা নির্দিষ্ট করে সব সময় তা পড়া। -শামী : ২/২৬৫

২৩. পবিত্র কুরআনের তারতীব পরিপন্থী কিরা'আত পাঠ করা। অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকা'আতে প্রথম রাকা'আতে পঠিত সূরা বা আয়াতের আগের কোনো সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা। -মারাকিল ফালাহ : ৩৫২

২৪. পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে নামায পড়া। তবে ওয়াক্ত সংকীর্ণ হলে ভিন্ন কথা। -শামী-৪০৭

২৫. খুব ক্ষুধা অনুভব হলে এবং খাবার তৈরি থাকলে না খেয়ে নামায পড়া।
–মারাকিল ফালাহ : ৩৫৯

২৬. নামাযরত অবস্থায় ছারপোকা, মাছি ও পিঁপড়া মারা। তবে ছারপোকা

অথবা পিঁপড়া কামড় দিলে তা ধরে ছেড়ে বা সরিয়ে দেয়া যাবে। কামড় না দিলে ধরাও মাকরূহ। -শামী-২/৪২৪

২৭. কনুই পর্যন্ত জামা ইত্যাদির হাতা গুটিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। জামা যদি এমনিতেই হাতা কাটা হয়, তবে তা পরিধান করে নামায পড়া খেলাফে আওলা বা অনুত্তম। -আলমগীরী : ১/১০৬

উযূ-নামাযের আমলী মশকের অপরিহার্যতা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে রয়েছে অতি উত্তম আদর্শ। -সূরা আহযাব : ২১

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টির শুরু থেকে মানবজাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য সর্বযুগে দু'টি ধারা জারী রেখেছেন।

১. আসমানী কিতাবসমূহের ধারা।

২. আসমানী শিক্ষার আলোকে প্রশিক্ষকরূপে নবী-রাসূল প্রেরণের ধারা।

খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উপরের দু'টি ধারা সমানভাবে বলবৎ ছিলো।

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির সংশোধন ও সফলতার জন্য উভয় ধারাকে একই সঙ্গে চালু রেখে জ্ঞানের এক বিরাট দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা না হলে মানুষের সঠিক তা'লীম তরবীয়ত তথা শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শুধু কিতাব যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি শুধু উস্তাদের মাধ্যমেও একাজ সমাধা হওয়া সম্ভব ছিল না; বরং একদিকে প্রয়োজন আসমানী আহকাম অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-বিধান; অপরদিকে প্রয়োজন একজন প্রশিক্ষক ও মুরুব্বী, যিনি মানুষকে যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আসমানী হেদায়েতের সঙ্গে পরিচিত করবেন ও তা বাস্তবে রূপ দেবেন। কুরআন মাজীদের হেদায়াত এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, মানবজাতির তা'লীম ও তরবীয়াতের জন্য সর্বযুগেই দু'টি জিনিসের প্রয়োজন।

১. কুরআন ভিত্তিক হিদায়াত,

২. তা বুঝা এবং সে মোতাবেক আমল করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আল্লাহওয়ালাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো বিষয়েই পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায় না। আজ দ্বীনী তা'লীমের ক্ষেত্রে উভয়বিধ মেহনতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বর্তমানে আল্লাহ পাকের মেহেরবাণীতে দাওয়াত এবং তা'লীমের মেহনত বেশ ভালোই চলছে, কিন্তু তারপরও আমল ঠিক হচ্ছে না। জাগতিক সকল বিষয় বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হয়। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক পুঁথিগত শিক্ষাই যথেষ্ট মনে করা হয় না। ডাক্তার হতে হলে আরেকজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থেকে বাস্তব প্রশিক্ষণ নিতে হয়। ড্রাইভার হতে হলে অভিজ্ঞ ড্রাইভারের তত্ত্বাবধানে অনুশীলনের মাধ্যমে শিখতে হয়। এতেই উপলব্ধি করা যায়, ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়গুলো যেমন- উযূ, নামায ইত্যাদির বাস্তব প্রশিক্ষণ বা আমলী মশকের কতোটুকু প্রয়োজন।

কারণ অনেক ক্ষেত্রে ফাযায়েলের আলোচনা হলেও মাসায়েলের আলোচনা হয় না এবং তা আলোচনা হলেও বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। কাজেই শুধু বই পড়ে অথবা কারো নিকট থেকে মাসায়েল শুনে সঠিক নিয়ম অনুযায়ী নামায আদায় সম্ভব নয়। প্রয়োজন বাস্তব প্রশিক্ষণ বা আমলী মশকের। কারণ আমলী মশক তথা আমলী তরবীয়াতের মাধ্যমে যতোটুকু সহীহ করা সম্ভব, শুধু কিতাবের পৃষ্ঠা উলটিয়ে তা সম্ভব নয়। মরহুম কবি আকবার এলাহাবাদী কতো চমৎকারই না বলেছেন–

کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں - اور آدمی آدمی بناتے ہیں

'কোর্স শুধু শব্দই শিখায়, মানুষ বানায় মানুষে।'

মাসাইলে নামায প্রয়োগ করতে হলে দরকার নামাযের প্রশিক্ষণ। এছাড়া মাসায়িলের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ-কারণেই লাইলাতুল মিরাজের পরের দিন থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দশ ওয়াক্ত নামাযের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সেটাই ছিলো প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামাযের বাস্তব অনুশীলন। –সুনানে আবু দাউদ-৩৯৩

এরপর থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুবার সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-কে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) আবার নিজেদের শাগরেদ তাবেঈনকে এবং যার যেখানে সফর করার সুযোগ হয়েছে তিনি সে এলাকার মুসলমানদেরকে আমলী মশকের মাধ্যমে নামায, উযূ শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসের কিতাবে-এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করে শুধু বিধানাবলী উপস্থাপন করেননি। বিধানের সঙ্গে সঙ্গে তার নমূনাও উপস্থাপন করেছেন। তিনি

শুধু এতটুকু বলেই দায়িত্ব শেষ করেননি যে, صَلُّوْا 'তোমরা নামায পড়।' বলেছেন- তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়। সুতরাং তিনি আমলের নমূনা হয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এজন্যই তিনি 'নামায পড়' এভাবে না বলে 'আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়' বলেছেন।

উযূর ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ শুধু নির্দেশ দেননি বরং উযূ করে দেখিয়েছেন। একবার উযূতে প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন- هٰذَا وُضُوْءٌ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً إِلَّا بِهٖ এ হলো উযূ যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা নামায কবূল করেন না। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার উযূতে প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন এই হলো উযূ যা উত্তম পদ্ধতির উযূ। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার উযূ করে দেখালেন। এবার অঙ্গসমূহকে তিনবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, এ হলো আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উযূ।

আমলী মশকের ধারাবাহিকতা

মুহাদ্দিসীনে কিরাম যখন আমলের হাদীস পড়াতেন তখন তা বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতেন। রেওয়ায়েতের ভিত্তিতেই তাঁরা আমলের বাস্তবরূপ দেখাতেন। অর্থাৎ শুধু শব্দাবলির বিধান নয়, তার সঙ্গে আমলের ঐতিহাসিক সংযোগও রয়েছে। রেওয়ায়েতের শব্দাবলির সঙ্গে আমলের ঐতিহাসিক সংযোগ না থাকলে তা বিধানের স্বীকৃতি পায় না। এ-কারণেই হাদীসের রেওয়ায়েতের সঙ্গে সঙ্গে উম্মতের আমল বিদ্যমান রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমল করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) সে মোতাবেক আমলের অনুসরণ করেছেন। তাবেঈগণ সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর আমলের অনুসরণ করেছেন এবং বর্ণনাও পেশ করেছেন। এভাবেই মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত নামে রেওয়ায়েতগুলো মুহাদ্দিসীনগণ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমল করে দেখিয়েছেন।

সারকথা মুহাদ্দিসীনে কিরাম যখনই হাদীস বর্ণনা করেছেন তখনই তার সঙ্গে হাদীসের আখলাকও সংরক্ষণ করেছেন। তার সিফাত ও কাইফিয়াত (বৈশিষ্ট ও ধরন) সংরক্ষণ করেছেন। এ ধারাবাহিকতা আমলের নমুনা ও বর্ণনা আসলাফ, আকাবেরগণের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

হাদীস পাকে আছে, হযরত আইয়ূব (রহ.) হযরত আবু কিলাবা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি বলেছেন, একদা সাহাবী হযরত মালেক ইবনুল হুয়াইরিস

(রাযি.) আমাদের মসজিদে আগমন করলেন। তারপর বললেন, আমি এখন তোমাদেরকে নিয়ে নামায পড়বো। তবে বাস্তবে নামায পড়া এখন আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা তোমাদেরকে দেখানোর জন্যই আমি নামায পড়বো।

তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি তাঁর শাগরেদ তাবেঈনকে নামায পড়ে দেখাতেন। আর এটাই তো নামাযের আমলী মশক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ। তেমনিভাবে সাহাবী আবু হুমাইদ (রাযি.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামায কেমন ছিলো, তা অন্যদের দেখাতেন।-জামিউল মাসানিদ : ২৭/২৬১পৃ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর নামাযের নেগরানী করতেন

কারো থেকে প্রশিক্ষণ নেয়া ব্যতীত ইবাদত আদায় করলে অনেক ক্ষেত্রেই তা সঠিকভাবে আদায় করা সম্ভবপর হয় না। যেমন- এক হাদীসে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে...

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মসজিদে নববীতে বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে হযরত খাল্লাদ ইবনে রাফি (রাযি.) মসজিদে এসে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে সালাম করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন,

اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "যাও আবার নামায পড়ো! কেননা তুমি নামাযই পড়নি।" সে ব্যক্তি আবার নামায পড়ে এসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের জওয়াব দিয়ে আগের মতো আবার বললেন, যাও, তুমি নামায পড়ো। কেননা তুমি নামায পড়নি। এভাবে তিনবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন। চতুর্থবার সেই সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনি নামায শিখিয়ে দিন। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নামায কীভাবে পড়তে হবে শিখিয়ে দিলেন।-বুখারী শরীফ

ফায়দা: আজ আমাদের প্রতিটি দ্বীনী বিষয়ে আমলের ক্ষেত্রে তার আসল রূপ পাওয়া যাচ্ছে না। মাসায়েলের সঙ্গে আমলের যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তার প্রথম কারণ হলো, সুন্নাতের ইলমের অভাব। দ্বিতীয় কারণ হলো সুন্নাতের প্রতি উদাসীনতা। তৃতীয় কারণ হলো, মাসআলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ না থাকা। চতুর্থ কারণ হলো আমলের নেগরানী না করা। এই সমস্যাগুলো আমাদের দূর করতে হবে। তাহলে আমাদের পরস্পরের আযান, ইকামত এবং আরকানে সালাতের বিভিন্নতা দূর হয়ে যাবে।

উযূ ও নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় না করা আল্লাহ্ পাকের হকে কম করা

মুয়াত্তা ইমাম মালেকের এক হাদীসে এসেছে, একদা হযরত উমর (রাযি.) জনৈক নামাযরত ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাযে রুকূ-সিজদা ঠিকমতো আদায় না করে দ্রুত নামায শেষ করে দিলো। তিনি তাকে বললেন, لَقَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রাপ্যে কম দিয়েছো। এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই পূর্ণতা ও সল্পতা আছে, এমনকি নামায এবং উযূর মধ্যেও। এভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য হক ও ইবাদত এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تَطْفِيْف-এর অপরাধে অপরাধী। মজদুর কর্মচারী যতোটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং নিয়মের বরখেলাফ। কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক এমনকি আলেমদের মধ্যেও অসাবধানতা লক্ষ্য করা যায়। তারা চাকরির কর্তব্যে ত্রুটি করাকে অপরাধই মনে করে না।

–মা'আরেফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ : ৭২০ পৃষ্ঠা

যখন আমাদের নামাযের জাহেরী সূরত (কাইফিয়াত) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ন্যায় হয়ে যাবে তখন এর প্রভাবে বাতেনও ঠিক হয়ে যাবে। যেমন কবি বলেন,

یارب میں تیرے محبوب کی شباہت لیکے آیا ہوں
حقیقت تو کردے اسکو میں صورت لیکے آیا ہوں

প্রভু হে! তোমার প্রিয়তমের আমি সাদৃশ্য শুধু এনেছি সাথে
আকৃতি নিয়ে এসেছি আমি, প্রকৃতি তুমি দাওগো তাতে।

নামাযে খুশু-খুযুর গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

অর্থ- 'তারাই সফল ঈমানদার যারা খুশুর সঙ্গে নামায আদায় করে।'

-সূরা মুমিনুন, আয়াত-১-২

হুযুরে কলব ও খুশু ওয়ালা নামাযই জীবন্ত নামায। প্রকৃত ও জীবন্ত নামায কেবল সেটাই যাতে আল্লাহর সামনে হাযিরীর এবং নিজের অসহায়ত্বের অনুভূতি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও গৌরব মহিমার স্মরণ থাকে। যার জন্য মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ খুশু আবশ্যক। আল্লাহ না করুন যদি এগুলো অর্জিত না হয় এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো নামায যদি গাফলতি ও উদাসীনতার মধ্যে আদায় হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এ নামায রূহ ও প্রাণহীন লাশ। বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা কিয়াম, কুউদ, রুকূ-সিজদার দিক থেকে নামায বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে এটা নামায নয়।

খুশুহীন নামায সম্পর্কে কতিপয় ইমামের ফতওয়া

ইমাম গাযালী ও কুরতুবী এবং অন্যান্য মাযহাবের বুর্যূগরা বলেছেন নামাযে খুশু-খুযু ফরয। যদি পূর্ণ নামায খুশু-খুযু ছাড়া শেষ হয়ে যায় তাহলে নামায আদায় হবে না।

'আত্ তালীকুস সাবীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থে শায়েখ আবু তালেব মক্কী হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন , 'যার নামাযে খুশু নেই তার নামায ফাসেদ' অর্থাৎ তার নামায হয়নি।

হযরত খাজা হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, যে নামায 'হুযূরে কলব' ছাড়া আদায় করা হয়, সে নামাযে সওয়াবের আশা থেকে আযাবের আশঙ্কাই বেশি।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.) বলেছেন, খুশু-খুযু নামাযের জন্য নির্ভরশীল নয় এবং এ অর্থে তা ফরযও নয়। কিন্তু নামায কবূল হওয়ার জন্য তা জরুরী এবং এই মর্মে তা ফরযের ন্যায়।

খুশু-খুযু নামাযের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নামাযের খুশু ও হুযূরে কলব-এর গুরুত্ব কী পরিমাণ তা নিম্নের উদাহরণে স্পষ্টভাবে বুঝে আসবে।

মানুষ অনেকগুলো অংশের সমষ্টির নাম। যেমন মানুষের মধ্যে রূহ আছে। আমরা না দেখলেও এটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর উপরেই মানুষের জীবন নির্ভর

করে। এমনিভাবে যকৃত, পাকস্থলি, হৃদপিন্ড, মস্তিষ্ক এ অঙ্গগুলোর একটিও যদি না থাকে, তাহলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এছাড়া হাত, পা, চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এ অঙ্গগুলোর উপর মানুষের জীবন নির্ভর না করলেও এগুলোর গুরুত্বও অপরিসীম। এর একটিও যদি অকেজো হয়ে যায় তাহলে মানুষকে ক্ষতির সম্মুখিন হতে হয়। এতে মানব জীবনের অনেক উদ্দেশ্যই হাত ছাড়া হয়ে যায়। অবশ্য-এর জন্য জীবন থেমে থাকে না। এছাড়া এমন কিছু অঙ্গ আছে যা মানুষের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো না থাকলে কিংবা নষ্ট হলে মানুষকে অসুন্দর ও বিশ্রী লাগে। দাঁড়ি, ভ্রু, নাক ও কানের বাহ্যিক অংশ ইত্যাদি।

ঠিক এমনিভাবে নামাযেরও অনেকগুলো অংশ রয়েছে। যেগুলোর মধ্যে কিছু আছে অতিগুরুত্বপূর্ণ। যেমন- আল্লাহর একত্ববাদ, প্রভুত্ব এবং তাঁর অতি দয়াদ্রতা ও মহাপরাক্রমশালীতা গুণের কল্পনা করতঃ তাঁর হুকুম তামিলের উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদতের নিয়্যত করা এবং নামাযের মধ্যে তাঁর আযমত ও বড়ত্ব এবং নিজের হীনতা ও নীচুতার ধ্যান এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের খুশু-খুযুর অবস্থা হলো নামাযের রূহ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দৈহিক আকৃতি ও আমল দেখেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তরও দেখতে পান। সুতরাং কোনো নামায যদি এগুলো ছাড়া হয়, তাহলে সেটি হবে নিস্প্রাণ নামায। হাত-পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মানুষের প্রাণহীন শরীরের মতো। মোটকথা নামাযের নিয়্যত, আল্লাহর আযমত ও বড়ত্বের কল্পনা এবং খুশুর মান হলো মানুষের রূহের মতো। আর নামাযে দাঁড়ানো, কিরা'আত, রুকূ, সিজদা ইত্যাদি রুকনগুলো মানুষের শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে হৃদপিন্ড, মস্তিষ্ক, যকৃত, পাকস্থলির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ন্যায়। এ অঙ্গগুলোর মধ্য হতে যে কোনো একটি রুকনও যদি না পাওয়া যায় তাহলে সেটি আর নামায থাকে না।

তৃতীয় পর্যায় হলো ওয়াজিবসমূহ। সেগুলোর কোনো একটি যদি না পাওয়া যায় তাহলে নামাযের এমন ত্রুটি হবে, যেমন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গ হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ ইত্যাদি না থাকলে মানুষ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকে।

চতুর্থ পর্যায় হলো সুনান ও মুস্তাহাবের। সুন্নাত, মুস্তাহাব এমন পর্যায়ের যা না হলে মানুষের সৌন্দর্যের ঘাটতি হয়, বিশ্রী দেখায়। যেমন- ভ্রু, চোখের পাপড়ী, নাক ও ঠোঁটের কোনো অংশ কেটে গেলে বিশ্রী দেখায়।

পঞ্চম পর্যায়ে হলো আদবসমূহ। যেমন নামাযের শুরুতে অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমার সময় এবং কিয়ামের মধ্যে নামাযের যাহেরী ও বাতেনী অবস্থা কেমন হবে। কিরা'আত কিভাবে এবং কোন্ কোন্ বিষয় লক্ষ্য করে পড়তে হবে। রুকূ,

কওমা, সিজদা, দুই সিজদার মধ্যের বৈঠক, তাশাহ্হুদের বৈঠক এবং এগুলো আদায়ের মাঝে যাহেরী ও বাতেনী অবস্থা কেমন হবে— এগুলো হলো নামাযের আদব। এগুলো হলো মানুষের যাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যের মতো। যাহেরী ও বাতেনী সৌন্দর্যের কম বেশিতে মানুষের মর্যাদার যেমন কম বেশি হয়। তেমনিভাবে নামাযের আদাবসমূহ লক্ষ্য করা, না করার উপর ভিত্তি করে নামায উন্নত ও অনুন্নত হয়। এমনকি অনেক সময় একই কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুইজন নামাযীর মধ্যে আদবসমূহ লক্ষ্য করা না করার কারণে বিন্দু ও সমুদ্রের, তৃণ ও পাহাড়ের মতো ব্যবধান হয়ে যায়।

নামাযে 'হুযূরে কলব' বা একাগ্রচিত্ততার তাৎপর্য

'হুযুরে কলবে'র অর্থ হলো নামায আদায়ের সময় সারাক্ষণ এ চিন্তা থাকবে যে আমি নামায আদায় করছি। বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও ওয়াসওয়াসা বন্ধ করার নাম একাগ্রচিত্ততা নয়। এমনটি ধারণা করাই ভুল। কেননা এটা তো একান্ত স্পষ্ট যে, ওয়াসওয়াসাসমূহ বন্ধ করা নিজের এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়। একাগ্রচিত্ততার যদি এই অর্থ হয় তাহলে এর দ্বারা একটি আকীদাগত বিভ্রান্তি দেখা দেবে। মানুষ ভাববে এতো আমাদের এখতিয়ার বহির্ভূত। অথচ আমাদের উপর তা আরোপ করা হয়েছে। অতএব বিষয়টি তো এ বক্তব্যের বিরোধী হয়ে গেলো-

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

অর্থ- 'আল্লাহ কারোর উপর তার সাধ্যাতীত কিছু আরোপ করেন না।'

–সূরা বাকারা : ২৮৬

তো যদি 'হুযূরে কলবে'র এমন অর্থ হয় যা সাধ্য বহির্ভূত এবং আমাদেরকে তার আদেশ দেয়া হয়, তাহলে বিষয়টি এ আয়াতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়াবে। বরং হুযূরে কলব বা একাগ্রচিত্ততার তাৎপর্য হচ্ছে, এতটুকু মনোযোগী থাকুন যে 'আমি কী করছি'। তারপর যদি এ খেয়ালের সঙ্গে অন্যান্য খেয়ালও আসে, তাহলে আসতে দিন। (নামাযী ব্যক্তি হলেন মাঝির মতো) ব্যস তার কাজ হচ্ছে কিশতী সোজা করে রাখার জন্য হাল ধরে থাকা। তরঙ্গমালার বিক্ষোভ রোধ করা মাঝির কাজ নয়। সে যদি তরঙ্গ-বিক্ষোভ প্রতিরোধের চেষ্টায় লিপ্ত হয়, তাহলে কিশতি কুলে ভিড়ানো তো দূরের কথা কিশতির নিরাপত্তা রক্ষা করাই কঠিন হবে।

এমনি ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও ওয়াসওয়াসা হচ্ছে তরঙ্গের মতো, তা কিয়ামত পযর্ন্ত বন্ধ হবার নয়। তা আসতে চাইলে আসতে দিন। সাধারণতঃ তরঙ্গমালা

কিশতির গতি রোধ করতে পারে, তবে কিশতিকে ডুবিয়ে দিতে পারে না। এমনি ভাবে চিন্তা-ভাবনা ও ওয়াসওয়াসা আসতে চাইলে আসতে দিন। এসব হুযূরে কলবে'র পরিপন্থী নয়। ব্যস, আপনার কাজ শুধু এতটুকু যে আপনি নামাযের পুরো সময় একথা খেয়াল রাখুন 'আমি নামায আদায় করছি'। এখন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলছি। এখন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলছি। সারকথা হচ্ছে যে কাজই করুন না কেন তা নিজের ইচ্ছা থেকে করুন। এমন যেন না হয় যে, 'ঘড়িতে একবার চাবি দিয়ে দিলেন আর তা চলতে থাকলো'। নামাযের চাবি হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা। অনেকে তাকবীরে তাহরীমা বলেই চিন্তা মুক্ত হয়ে যান। এরপর তার সকল হিসাব নিকাশ ও লেন-দেন নামাযের মধ্যেই মীমাংসিত হতে থাকে।

নামাযের অঙ্গ সঞ্চালন ও ওঠা-বসার কাজগুলোতে সে অভ্যস্থ হয়ে গেছে। এজন্য যখন রুকূর সময় আসে, তখন স্বাভাবিক গতিতেই রুকূ হয়ে যায়। যখন সিজদার সময় আসে তখন এমনিতেই সিজদা হয়ে যায়। এতে আমাদের ইচ্ছার কোনো ভূমিকা থাকে না।

নামাযে খুশু-খুযূ হাসিলের উপায়

বাইরের যে সব খেয়াল ও কল্পনা নামাযের সময় মুসল্লীর মাথায় আসে, সেগুলো দূর করার একাধিক নিয়ম আছে। সেগুলোর বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো। যাঁর জন্যে যেটি সহজতর মনে হয়, সেটি গ্রহণ করে সে মতে আমল করার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ফল পাবেন।

পদ্ধতি–১ : নামায শুরু করার পর এ কল্পনা করুন, আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখছি। অন্যদিকে মন যাওয়া মাত্রই একথা কল্পনা করুন। এতে ইনশাআল্লাহ, নামাযে মনোযোগ সৃষ্টি হবে।

পদ্ধতি–২ : নামায শুরু করার পর কল্পনা করুন, আমি কীভাবে নামায পড়ছি, কীভাবে তিলাওয়াত করছি, কীভাবে কিয়াম-কুউদ ও রুকূ-সিজদা করছি, তা সবই আল্লাহ তা'আলা দেখছেন। মনে মনে ভাবতে থাকুন, দেখবেন খুশুখুযূ পয়দা হচ্ছে।

পদ্ধতি–৩ : নামাযের তিলাওয়াত, তাসবীহ, যিকির সব আরবী ভাষায়। এগুলোর অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোযোগ দিন; বোঝার চেষ্টা করুন। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তার অর্থের প্রতি মনোযোগ দিন। রুকূ-সিজদা করার সময় তাসবীহগুলোর অর্থের প্রতি মনোযোগ দিন। এতে ইনশাআল্লাহ নামাযের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

পদ্ধতি–৪ : তিলাওয়াত, তাসবীহ ও যিকিরের শব্দের প্রতি মনোযোগ দিন। সেগুলো খেয়াল করুন এবং সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবুন। সাধারণ মানুষের জন্য এ পদ্ধতিটি খুবই সহজ। একা একা নামায পড়ার সময় তিলাওয়াত ও যিকিরের বাক্যগুলো একটু জোরে উচ্চারণ করুন, যেন তার আওয়ায নিজ কানে পৌঁছে। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন আবার পাশের কোনো ব্যক্তির ইবাদত বা অন্য কোনো আমলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

পদ্ধতি–৫ : মনে মনে এ-কল্পনা করুন, আমি আল্লাহর ঘর 'বাইতুল্লাহ' দেখছি। বাইতুল্লাহ আমার চোখের সামনে। আমি বাইতুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছি। পুরো নামাযে বাইতুল্লাহর কল্পনা করুন। এতেও নামাযে মন বসবে। খুশু-খুযূ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি–৬ : নামাযের রুকনগুলো ভাবনার ভিতর দিয়ে আদায় করুন। যেমন– নামায শুরু করার পর একথা ভাবুন, এখন আমি কিয়াম করছি, আমার কিয়ামের সুন্নাতগুলো ঠিক আছে তো? রুকূতে যাওয়ার পর একথা ভাবুন, এখন আমি রুকূ আদায় করছি, আমার রুকূর সুন্নাতগুলো ঠিকমতো আদায় হচ্ছে তো? সিজদায় গিয়ে এবং তাশাহহুদে বসেও একথা ভাবুন, আমার এই রুকনটা সুন্নাত তরীকায় আদায় হচ্ছে তো?

এভাবে প্রত্যেকটা রুকন ভেবে-চিন্তে আদায় করলে মন-মস্তিষ্কে কোনো বদখেয়াল ও বাজে কল্পনা আসবে না। নামাযে অবশ্যই মনোযোগ এবং নিমগ্নতা সৃষ্টি হবে, ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি–৭ : নামাযের মধ্যে যদি এই ধ্যান করা হয়, এই নামাযই হয়তো আমার জীবনের শেষ নামায, এরপর হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাহলেও নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি–৮ : ভাবুন, দুনিয়ার রাজা-বাদশার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেউ অন্য-মনস্ক হয় না। আমি নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলছি। তাহলে আমি অন্য-মনস্ক হই কীভাবে?

এখানে স্মরণ রাখা উচিত, উপরোক্ত নিয়মগুলো অনুসরণ করতে গিয়ে খুশু-খুযূ হাসিলের জন্যে মস্তিষ্কের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি করবে না। এব্যাপারে মোটামুটিভাবে ধ্যান-খেয়ালই যথেষ্ট। নতুবা মস্তিষ্কে শুষ্কতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি মনে বিভিন্ন চিন্তা ও খেয়াল এসে ভিড় জমায় তাহলে সেগুলোকে কোনোরূপ গুরুত্ব দিবে না। কেননা এগুলো ক্ষতিকর নয়।

বস্তুত সর্ববিধ চিন্তা ও খেয়াল থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র থাকার পিছনে পড়াও এক প্রকার ধোঁকা। এভাবে শয়তান অনেক ক্ষেত্রে ইবাদতকারীকে অধিক জটিলতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। বান্দা কেবল এতটুকু বিষয়ে সাধনা করবে এবং সচেষ্ট থাকবে যে, নামায অবস্থায় বাইরের কোনো চিন্তা বা ওয়াসওয়াসা যেন সে নিজে ইচ্ছাকৃতভাবে আনয়ন না করে। এতটুকু চেষ্টাই যথেষ্ট। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি বিভিন্ন খেয়াল এসে ভিড় করে, তাহলে সেদিকে কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে নামাযে খুশু-খুযূ আনয়নকারী কোনো বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করবে– এরূপ ক্ষেত্রে এটাই উত্তম চিকিৎসা।

নামায ছাড়া অন্য সাধারণ অবস্থায় যদি এরূপ ওয়াসওয়াসার উদ্ভব হয়, তবে কোনো কাজে মগ্ন হয়ে যাবে। এমনকি যদি কোনো মুবাহ কাজেও (যে কাজে গুনাহ বা সওয়াব কোনোটাই নেই) লিপ্ত হওয়া যায়, তাহলেও এক্ষেত্রে তা যথেষ্ট উপকারী হবে। এরপর যদি মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হতে থাকে তবে নিজ অবস্থা বিস্তারিত লিখে অথবা মৌখিকভাবে নিজের পীর ও দ্বীনী মুরুব্বীর খেদমতে আরয করবে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে যার উপর আমল করা আপনি সহজ মনে করেন তা নামায শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই অবলম্বন করে সে অনুযায়ী আমল করা শুরু করে দিন। আর এর উপর আমল করার জন্যে চেষ্টা ও অনুশীলন করুন। কেননা এগুলো অনুশীলন ছাড়া আয়ত্তে আসে না। অনুশীলন শুরু করলে কয়েক দিনের মধ্যেই এর ফল পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। এরপর নামাযের ভিতর মনোযোগ ও খুশু-খুযূ সৃষ্টি হবে। ফলে আপনার নামাযের বাহ্যিক দিক অর্থাৎ রুকূ, সিজদা, কওমা ও জলসাতে স্থিরতা আসবে। তখন আর নামাযে তাড়াহুড়ো করবেন না। আর নামাযে মন বসানোর উদ্দেশ্য হলো, নামাযের যাহের ও বাতেনে স্থিরতা ও স্থিতিশীলতা আসা, নামাযরত অবস্থায় নামায ব্যতীত অন্য দিকে মনোযোগ হারিয়ে না যাওয়া, মনে অন্য কোনো খেয়াল বা কল্পনা না আসা।

নামাযের যাবতীয় হুকুম অর্থাৎ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ও আদবগুলো যথানিয়মে আদায় করলে যে নির্যাস বের হবে তাহলো খুশু-খুযূওয়ালা নামায।

সহীহভাবে নামায আদায় না করার শাস্তি

ঈমানের পর নামায হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ নামাযকে সঠিকভাবে সময়মতো আদায় করলে যেমন রয়েছে অফুরন্ত সওয়াব ও বরকতের ওয়াদা, তেমনি সময়মতো সঠিকভাবে নামায আদায় না করার শাস্তিও রয়েছে ভয়াবহ।

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সময়মতো নামায আদায় করে, উত্তমরূপে উযূ করে খুশু-খুযূর সঙ্গে ধীর-স্থিরভাবে নামাযে দাঁড়ায়, রুকূ-সিজদাও উত্তমরূপে শান্তভাবে আদায় করে, মোট কথা, যে ব্যক্তি নামাযের সব কিছু উত্তমরূপে আদায় করে তার নামায উজ্জ্বল ও নূরানী হয়ে ওপরের দিকে যায় এবং নামাযীকে এই বলে দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তোমার এরূপ হেফাযত করুন, যেরূপ তুমি আমার হেফাযত করেছো। অপর দিকে যে ব্যক্তি মন্দভাবে নামায আদায় করে, সময়ের প্রতি খেয়াল রাখে না, রুকূ-সিজদাও ঠিকমতো আদায় করে না, তার নামায বিশ্রী ও কালো হয়ে নামাযীকে বদ দু'আ করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও এরূপ ধ্বংস করুন, তুমি আমাকে যেরূপ ধ্বংস করেছো। অতঃপর সেই নামাযকে পুরানো কাপড়ের মতো করে পেঁচিয়ে নামাযীর মুখের উপর নিক্ষেপ করা হয়। –তারগীব, তাবারানী

অপর এক হাদীসে নামাযের রুকূ-সিজদা ঠিকমতো আদায় না করাকে নিকৃষ্ট চুরি বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে [চুরি কাজটিই ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট। তথাপি নামাযের মধ্যে চুরি করা হলো আরো জঘন্যতম নিকৃষ্ট]।

প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হলো সে ব্যক্তি, যে নামাযে চুরি করে। সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযের মধ্যে কীভাবে চুরি করবে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, নামাযের মধ্যে চুরি হলো, নামাযের রুকূ-সিজদা ঠিক মতো আদায় না করা। –তাবারানী, তারগীব, মুসনাদে আহমাদ

সাহাবী হযরত আবু হুযাইফা (রাযি.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাযে রুকূ-সিজদার মধ্যে ভুল করছে। তখন সাহাবী হযরত আবু হুযাইফা (রাযি.) বললেন, তুমিতো নামাযই পড়নি, এভাবে নামায পড়তে পড়তে যদি তুমি মৃত্যুবরণও কর, তাহলেও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকার উপর তোমার মৃত্যু হবে না। –সহীহ বুখারী, ১/১১২

নামাযে ঘটে যাওয়া কতিপয় ভুলের সংশোধন

কাতারের ভুলসমূহ

১. দাগের ওপরে বা দাগে আঙ্গুল রেখে দাগের পিছনে দাঁড়ানো। নিয়ম হলো দাগের আগে গোড়ালী রেখে উভয় পা কিবলামুখী সোজা করে দাঁড়ানো।

২. কাতার ইমামের ডানে বাড়িয়ে ফেলা। অথচ নিয়ম হলো, ইমামের বরাবর পিছনে একজন দাঁড়িয়ে তাঁর দু'দিকে সমানভাবে লোক দাঁড়ানো। কোনো একদিকে কাতার লম্বা করা উচিত নয়। -আলমগীরী : ১/৮৭

৩. সামনের কাতারে খালি জায়গা রেখে পিছনের কাতারে বসে থাকা বা পিছনের কাতারে দাঁড়ানো। নিয়ম হলো সবচেয়ে আগের যে কাতারে খালি জায়গা পাওয়া যায় সেখানে চলে যাওয়া। –শামী : ১/৫৭০

৪. কাতারে মিলে মিলে না দাঁড়িয়ে দু'জনের মাঝে ফাঁক রাখা। অথচ নিয়ম এর উল্টো অর্থাৎ গায়ে গায়ে মিলে দাঁড়ানো। –মাসায়েলে নামায : ৮৭ পৃ.

৫. শেষ কাতারে শুধু একজন দাঁড়ানো। নিয়ম হলো কেউ পিছনের কাতারে একা হলে সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানেন এমন একজন মুসল্লীকে হাত ধরে পিছনে নিয়ে আসবে। তিনিও সীনা ঠিক রেখে দু'এক কদম হটে পিছনের কাতারে আসবেন। মাসআলা জানেন এমন লোক না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে একাই পিছনে দাঁড়াবে। –শামী : ১/৫৬৮

৬. জামা'আত শুরু হওয়ার পর কাতারে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়া। নিয়ম হলো ইকামাত শুরু হয়ে গেলে একমাত্র ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো সুন্নাত শুরু না করা। আর ফজরের সুন্নাতও জামা'আত পাওয়ার শর্তে কাতারের পিছনে বা বারান্দায় পড়া। –আলমগীরী : ১/১০৮

৭. নিচ তলায় জায়গা থাকা সত্ত্বেও উপর তলায় দাঁড়ানো। অথচ নিয়ম হলো, নিচ তলার সর্বশেষ কাতার পূর্ণ করে উপর তলায় দাঁড়ানো।

নামাযে কাতার দুরস্ত করা ও খালি জায়গা পূরণ করার গুরুত্ব

নামাযের কাতার সোজা করা ওয়াজিব। কাতার সোজা না করলে ওয়াজিব তরকের গোনাহ হবে। আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে- ইমাম সাহেব নামায শুরুর পূর্ব মুহূর্তে তাদের (মুক্তাদিদের) কাতার সোজা করার কথা বলবেন। ইমাম সাম্মানী (রহ.) বলেছেন, ইমামের কর্তব্য হলো মুক্তাদিদের কাতার সোজা করতে বলবে। একজনের কাঁধের সঙ্গে অন্যজনের কাঁধ মিলিয়ে কাতারের মাঝের ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করতে বলবে।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের এক কিনারা থেকে অপর কিনারা পর্যন্ত যেতেন। আমাদের সীনা ও কাঁধের উপর হাত রেখে কাতারগুলোকে সোজা করতেন এবং বলতেন, কাতারে আগ-পিছ হয়ো না। যদি এমন হয় তবে তোমাদের অন্তরে একের সঙ্গে অন্যের বিভেদভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। আরো বলতেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথম কাতারওয়ালাদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন। –আবু দাউদ ১/ ৯৭

হাদীস শরীফের অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা নামাযের কাতার ঠিক করো এবং সোজা করো। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দিবেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, এ-কারণে তোমাদের অন্তরে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ সৃষ্টি হবে। –সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম

* হাদীস শরীফে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে ডানে বামে দেখতেন, লোকদেরকে তাদের কাঁধ সোজা করা আর তা মিলিয়ে নেয়ার তাগিদ করতেন। বলতেন, 'দূরে থেকো না, তোমাদের দিল দূরে চলে যাবে। –আবু দাউদ : ১/৯৭

* বর্ণিত আছে, একদিন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পূর্বে এদিক সেদিক তাকালেন, দেখলেন এক ব্যক্তির বুক কাতারের সামনে বের হয়ে আছে। তিনি হুকুম করলেন, তোমাদের কাঁধ সোজা করে নাও। অন্যথায় তোমাদের পরস্পরের দিলের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। -আবু দাউদঃ ১/৭৯

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাতারের খালি জায়গা পূরণকারীদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন।–মুসতাদরাকে হাকেম

যে ব্যক্তি নামাযের কাতারের মধ্যবর্তী খালি জায়গা পূরণ করে অর্থাৎ (কাতার মিলিয়ে) দাঁড়াবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের রহমতের সঙ্গে মিলিত করবেন। দু'জনের মাঝখানে ফাঁক রেখে দাঁড়ালে কাতার ছিন্ন করা হয়। –আবু দাউদ ১/৯৭

* কাতার সোজা না হলে কাঁধে-কাঁধ না মিলালে নামায সম্পূর্ণরূপে আদায় হয় না। দু'জনের মধ্যে খালি জায়গায় শয়তান এসে নামাযকে খারাপ করে দেয়।
–আবু দাউদ ১/৯৭

* নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কাতার সোজা করো, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাখো আর খালি জায়গা পূরণ করে নাও। যেন তোমাদের মধ্যখানে শয়তান ঢুকতে না পারে। –আবু দাউদ ১/৯৭

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কাতার ঠিক করবে। কেননা কাতার ঠিক করা নামায পরিপূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। -আবু দাউদ-১/৯৮

তাকবীরে তাহ্‌রীমা বাঁধার পর যদি সামনের কাতারে খালি জায়গা থাকে

কোনো ব্যক্তি যদি নামাযের কাতার খালি করে চলে যায়, কিংবা অন্য কোনো কারণে সামনের কাতারে খালি থাকে তাহলে পিছনের কাতারের মুসল্লীদের দায়িত্ব হলো সামনে অগ্রসর হয়ে কাতার পূর্ণ করা। আর যদি পিছনের মুসল্লী তা পূর্ণ না করে তাহলে পরে যে সকল মুসল্লী আসবে তারা সে জায়গা পূরণ করবে। এতে যদি নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

–আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯৭, রদ্দুল মুহতার ১/৫৯৫

কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলত

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানো লোকদের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতাগণ তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন। –আবু দাউদ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে কাতারের বাম দিকে এজন্য দাঁড়ায়, সেখানে লোক কম দাঁড়িয়েছে, তবে সে দুইটি সওয়াব পাবে।

–তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ

কাতার ঠিক হলে ইমাম তাকবীর বলবেন

হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাযি.) বলেন, যখন আমরা নামাযের জন্য দাঁড়াতাম হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছফ (কাতার) ঠিক করে দিতেন। যখন আমরা ঠিক হয়ে যেতাম তখন তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন। –আবু দাউদ

* হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্বন্ধে বর্ণিত রয়েছে, তিনি ইমামের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। ততক্ষণ তাকবীর বলতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর নির্ধারিত লোকটি এসে খবর দিতো, সকল কাতার সোজা হয়ে গেছে। এ খবর পেয়ে তিনি তাকবীর বলতেন। পঞ্চম খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

জামা'আতে প্রথম কাতারের গুরুত্ব

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষের জানা থাকত, তবে যুদ্ধ করে হলেও তা লাভ করত।

১. আযান দেওয়া ।
২. দুপুরের সময় জামা'আতে নামায পড়ার জন্য যাওয়া।
৩. প্রথম কাতারে নামায পড়া। (জামে সগীর)

প্রথম তাকবীর

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামায জামা'আতের সঙ্গে এমনভাবে পড়ে যে, প্রথম তাকবীর ফওত হয় না, তার জন্যে দুটি মুক্তির সনদ লিখে দেয়া হয়। দোযখের আগুন থেকে মুক্তি ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি। –তিরমিযী

ইচ্ছাকৃত পিছনের কাতারে থাকা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকেরা সর্বদা প্রথম ছফ হতে পিছনে থাকতে চায়। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে পিছাতে পিছাতে দোযখ পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন। –সুনানে আবু দাউদ

চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরঈ বিধান

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিষয়ে ইদানিংকালে বেশ মতপার্থক্য আবার কোন স্থানে বাক-বিতণ্ডাও হতে দেখা যায়। আসলে বিষয়টি একটি সমস্যা হেতু এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কিরামের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টির যথাযথ সমাধান করা দরকার। আমরা এখানে অভিজ্ঞ মুফতীগণের রায়ের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে নামায পড়ার শরঈ বিধান তুলে ধরছি।

মাযূর বা অপারগ ব্যক্তির অবস্থা যেহেতু বিভিন্নরকম তাই তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধানও কিছুটা ভিন্ন হবে যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

(ক) যদি কোন মুসল্লী কিয়াম ও রুকু করতে অক্ষম হয়, কিন্তু নীচে বসে সিজদা করতে সক্ষম হয়। তাহলে সে নীচে বসে ইশারায় রুকু ও স্বাভাবিকভাবে সিজদা করে নামায পড়বে। এরূপ ব্যক্তির জন্য চেয়ারে নামায পড়া জায়েয নয়।

(খ) যে মুসল্লী কিয়াম করতে সক্ষম কিন্তু স্বাভাবিক রুকু-সিজদা করতে সক্ষম নয়, সেও নীচে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করবে। তবে এরূপ ব্যক্তি যদি কিয়াম করে এবং রুকু-সিজদা নীচে বসে ইশারায় আদায় করতে চায় তবে তা করতে পারে। আবার কিয়াম করে পরে চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করলে তাও তার জন্য জায়েয আছে।

(গ) কোন মুসল্লী যদি কিয়াম করতে পারে কিন্তু রুকু-সিজদা করতে না পারে। তার নামাযের সঠিক তরীকা হচ্ছে, সে চেয়ার ছাড়া নীচে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করবে। তবে নীচে বসতে কষ্ট হলে সে চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করতে পারবে।

(ঘ) যে মুসল্লী স্বাভাবিক সিজদা করতে অপরাগ তবে কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম। এরূপ ব্যক্তির জন্য নীচে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করা উত্তম। এক্ষেত্রে যদি সে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে চায় অথবা নীচে বা চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করে তবে তাও জায়েয।

(ঙ) যে মুসল্লী রুকু-সিজদা করতে পারে তবে পূর্ণ সময় কিয়াম করতে পারে না এবং কিছু সময় কিয়াম করলে পরে দুর্বল হয়ে যায়। তাহলে সে যেটুকু সময় কিয়াম করতে পারে করবে এরপর দুর্বলতা অনুভব করলে নীচে কিংবা চেয়ারে বসে যাবে এবং স্বাভাবিকভাবে রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করবে।

(চ) কেউ যদি কিয়াম করতে সক্ষম না হয় কিন্তু রুকু-সিজদা করতে সক্ষম হয় তাহলে সে নীচে বসে ইশারায় রুকু ও স্বাভাবিক সিজদা করে নামায পড়বে। এক্ষেত্রে চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করলে তার নামায হবে না।

(ছ) যে রুকু করতে পারে কিন্তু সিজদা করতে পারে না–এরূপ ব্যক্তি চেয়ারে বসে ইশরায় রুকু-সিজদা করে নামায পড়বে। চেয়ারে বসে রুকু-সিজদা করার সময় সামনে কোন টেবিল, তেপায়া বা বালিশ ইত্যাদি রাখবে না। শুধু রুকুর জন্য যতটুকু ঝুকবে সে তুলনায় সিজদায় একটু বেশি ঝুকবে।

(জ) যে মুসল্লী কিয়াম, রুকু, সিজদা সবই করতে সক্ষম, তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া কোনক্রমেই জায়েয নয়।

অনেকে শুধু শরীর মোটা হওয়ার কারণে কিংবা সবসময় চেয়ারে বসে থাকার অভ্যাস হেতু চেয়ারে বসে নামায পড়ে থাকে, এমনটি কষ্মিনকালেও জায়েয নয়। নামাযের ব্যাপারে এহেন অবহেলা ও অলসতা নিতান্তই দুখঃজনক।

মনে রাখতে হবে মসজিদ ও নামায বিনয়ের ক্ষেত্র। এখানে একান্ত প্রয়োজনে চেয়ারে বসতে হলে বসবে কিন্তু একটা বিনয়ীভাব তখনো বিদ্যমান থাকতে হবে। কষ্মিনকালেও যেন অহংকার বোধ কাজ না করে তাহলে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাবে।

কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি

চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে, কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো, চেয়ার এমনভাবে রাখবে যেন তার পিছনের পায়া কাতারের কিনারায় থাকে, তাহলে বসা অবস্থায় মা'যূর ব্যক্তিদের কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর হয়ে যাবে। তবে যদি এমন ব্যক্তিগণ কিয়াম আবশ্যক না থাকা সত্ত্বেও কিয়াম করে নামায পড়ে আর রুকূ-সিজদা চেয়ারে বসে আদায় করে তাহলে এ অবস্থায় চেয়ার কাতারে এমনভাবে রাখবে যেন সামনের পায়া কাতারের শুরুভাগে থাকে আর অবশিষ্ট অংশ কাতারের পিছনে থাকে। এ-সকল মা'যুর ব্যক্তিগণ পিছনের কাতারে বা কাতারের এক পার্শ্বে দাঁড়াবে যাতে মাঝের কাতারের মুসল্লীদের কোনো সমস্যা না হয়। –চেয়ারে নামায পড়ার শরঈ আহকাম-১১৪

ইকামাতের সময় ভুলসমূহ

১. ইকামাতের সময় বা তাকবীরে তাহরীমার আগেই অনেকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। অথচ এমনটি করা মাকরূহ। নিয়ম হলো এ সময় হাত ছেড়ে রাখা। –ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া : ৩/১৪

২. অনেকে ইকামাতের জওয়াব দেয় না। অথচ ইকামাতের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। –আবু দাউদ, হাদীস নং-৫২৮

তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ভুলসমূহ

১. অনেকে তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠানোর সময় মাথা ঝুঁকায়, এরকম মাথা ঝুঁকানো জায়েয নয়। সুন্নাত হলো মাথা সোজা রেখে সিজদার জায়গায় নযর রাখা। –শামী

২. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষদের অনেকে চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে না। অথচ ওই সময় চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে কান পর্যন্ত উঠানো পুরুষের জন্য মুস্তাহাব। তবে মহিলারা কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বের করবে না। –শামী

৩. তাকবীরে তাহরীমার সময় অনেকে হাতের তালু কিবলামুখী করে উঠায় না; বরং হাতের তালু কানমুখী করে বা তালু আসমানের দিকে উঠিয়ে হাতের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে বাঁকা করে হাত উত্তোলন করে; এরূপ করা ভুল। -ত্বহতাবী-২৭৮

৪. তাকবীরে তাহরীমার সময় নিয়ম হলো হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতি পর্যন্ত উঠানো। অথচ অনেকে তড়িঘড়ি করে হাত সামান্য একটু উঠিয়েই তাহরীমার কাজ শেষ করে। -ত্বহতাবী-২৭৮

৫. আরবী নিয়্যত বলতে গিয়ে অনেকে তাকবীরে উলা, আবার অনেকে রুকূ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। অথচ আরবীতে নিয়্যত বলা জরুরী নয়; বরং আরবীতে নিয়্যত বলা জরুরী মনে করলে তা হবে বিদ'আত। বাংলায় নির্দিষ্ট নামাযের ও ইমামের ইকতিদার নিয়্যত করাই ফরয আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

-ইমদাদুল মুফতীন-৩১৬

৬. অনেকে তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য তাকবীরে 'আল্লাহ' শব্দের লামকে এক আলিফের চেয়ে বেশি লম্বা করে থাকে–এটা ভুল। এক আলিফকে এক আলিফই রাখতে হবে। বেশি লম্বা করা মাকরূহ। –ত্বাহতাবী-২৭৯

৭. অনেক সময় ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বেই অনেকে তাকবীরে তাহরীমা বলে ফেলে। সেক্ষেত্রে ইমামের আগে যদি মুক্তাদীর তাকবীর শেষ হয়ে যায়, তাহলে তার ইকতিদা ও নামায সহীহ হবে না। পুনরায় তাকবীর বলে নামাযে প্রবেশ করতে হবে।

৮. অনেকে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধার আগে হাত দু'দিকে ছেড়ে দিয়ে ঝুলিয়ে তারপর বাঁধে। এরূপ না করে হাত উঠিয়ে সরাসরি বাঁধাই সুন্নাত।

৯. অনেকে ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরে খামাখা তাকবীর বলতে দেরি করে। অথচ ইমামের তাকবীরের পর সঙ্গে সঙ্গেই তাকবীর বলা সুন্নাত।

কিয়াম অবস্থায় ভুলসমূহ

১. উভয় পায়ের মাঝে গোড়ালি ও আঙ্গুলের দিকে সমান করে রাখা সুন্নাত, কিন্তু অনেকেই তা এভাবে রাখে না; বরং পায়ের আঙ্গুলসমূহ ডানে বাঁয়ে ছড়িয়ে রাখে। এতে পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী থাকে না, যা সুন্নাত পরিপন্থী।

২. অনেকে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে চেহারা জমিনের দিক করে রাখে। অথচ দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা সোজা ও চেহারা কিবলার দিকে রেখে সিজদার স্থানে নযর রাখা সুন্নাত।

৩. অনেক মুসল্লীগণ নামাযের মধ্যে এক পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। যা নামাযের প্রতি গাফলতী প্রমাণ করে। অথচ মাসআলা হলো বিনা ওযরে এক পায়ের উপর ভর করে কোনো এক দিকে ঝোঁক দিয়ে দাঁড়ানো সুন্নাতের পরিপন্থী তথা মাকরূহে তাহরীমী। এ বিষয়ে আল্লামা শামী (রহ.) এর বক্তব্য– বিনা ওযরে নামাযের মধ্যে এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো মাকরূহ।

-শামী (২/১৩১)

৪. অনেকে নাভি বরাবর বা নাভির ওপরে হাত বাঁধে। অথচ হানাফী মাযহাবে নিয়ম হলো নাভির নিচে হাত বাঁধা।

৫. অনেকের ধারণা ইমামের সঙ্গে নামায পড়লে সানা পড়তে হয় না; বরং কেরাতের সঙ্গে সানা পড়ার দায়িত্বও ইমামের। অথচ মাসআলা হলো একা, জামা'আতে, সর্বাবস্থায় মুক্তাদীর জন্য সানা পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হচ্ছে- নামাযী ইমাম হোক অথবা মুক্তাদী কিংবা একাকী তাকবীর বলার পর সানা পড়বে। -ফতোয়ায়ে আলমগীরি (১/১৬)

তবে সবসময় এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। জেহরী কিরা'আতের নামাযে ইমাম কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিলে সে সময়ে ইকতিদা করে আর সানা পড়বে না। যেমন আল্লামা শামী রহ. বলেছেন, নিম্নস্বরে কিরা'আত পড়লে মুক্তাদী নামাযে শরীক হয়েই সানা পড়ে নিবে। -শামী (২/১৯০)

তাছাড়া মুক্তাদী আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহও পড়বে না।

কিরা'আত অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অনেকে ইমামের পিছনে বিড়বিড় করে সূরা ফাতিহা বা অন্য কিছু পড়তে থাকে। অথচ হানাফী মাযহাব অনুসারে মুক্তাদীর জন্য সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পড়া নিষেধ। -শামী-১:৪৯৭

আল্লামা শামী (রহ.)-এর মতে মুক্তাদী ইমামের কিরা'আত পড়া অবস্থায় চুপ থাকবে। চুপ না থেকে কিরা'আত পড়লে মাকরূহে তাহরীমি হবে। -শামী (২/১৬৫)

ইসলাহ: অনেকে মনে করেন নামাযের কিরা'আত মনে মনে পড়লে কিরা'আত আদায় হয়ে যায়। অথচ নামায সহীহ হওয়ার জন্য কিরা'আত মুখে উচ্চারণ করা জরুরী।

মাসআলা : নামাযে সূরা কিরা'আত কিংবা তাকবীরে তাহরীমা মনে মনে পড়লে নামায আদায় হবে না। শরহুল মুনিয়্যাহ কিতাবে আছে- নামাযের তৃতীয় ফরয হলো হরফসমূহকে মুখে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে কিরা'আত পড়া।

-শরহুল মুনিয়া : ২৪০

ফাতওয়ার প্রশিদ্ধ গ্রন্থ তাতারখানিয়াতে আছে- ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে নিজে শুনতে না পাড়লেও বিশুদ্ধ উচ্চারণ (অর্থাৎ হরফগুলো নিজ নিজ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হলে) নামায হয়ে যাবে।-তাতারখানিয়া, ১/২৭৪

২. অনেকের ধারণা, অনুচ্চস্বরে কিরা'আত পড়লে মদ, গুন্নাহ, ইযহার, ইখফা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন নেই। এরকম ধারণা ঠিক নয়; বরং

সব কিরা'আতেই তাজবীদ জরুরী। তাই সিররী নামাযেও জাহরী নামাযের মতো সময় ব্যয় করে তাজবীদসহ কিরা'আত পড়া জরুরী, যাতে নিজের কান পর্যন্ত আওয়ায পৌঁছে।

৩. যোহরের নামাযে 'তিওয়ালে মুফাসসাল' বা কমপক্ষে 'আওসাতে মুফাসসাল' পড়া সুন্নাত। অথচ অনেক ইমাম যোহরের নামাযে 'কিসারে মুফাসসাল' পড়ে থাকেন, যা সুন্নাত পরিপন্থী।

মাসআলা : ফজরের দ্বিতীয় রাকা'আতের কিরা'আত প্রথম রাকা'আতের অর্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ হওয়া উত্তম।

৪. অনেকে কিরা'আত এতো বেশি ধীরে পড়েন, সে কারণে সুন্নাত পরিমাণ কিরা'আত পড়া সম্ভব হয়ে উঠে না। অথচ নিয়ম হলো, বেশি ধীরে বা তাড়াতাড়ি না পড়ে মধ্যম গতিতে তারতীলের সঙ্গে সুন্নাত পরিমাণ কিরা'আত পড়া।

৫. তারাবীহ নামাযে অনেক হাফেয এতো দ্রুত কিরা'আত পড়ে থাকেন, তাদের পড়া বুঝাই যায় না। এমন দ্রুত গতিতে কুরআন পড়া হলে কখনও অর্থবিকৃতি ঘটতে পারে। আর তখন নামাযের সওয়াব হাসিল তো দূরের কথা, নামায সহীহ হওয়ার ব্যাপারেই সন্দেহ থাকবে। তবে তাজবীদ ঠিক রেখে ফরয নামাযের তুলনায় তারাবীহ-এর নামাযে কিছুটা দ্রুত কিরা'আত পড়বে।

৬. অনেক ইমাম প্রথম রাকা'আতকে দ্বিতীয় রাকা'আত থেকে তিন আয়াত বা তারচেয়ে বেশি লম্বা করে থাকেন; অথচ সুন্নাত হলো, ফজরের নামায ছাড়া অন্য চার ওয়াক্তে উভয় রাকা'আতের কিরা'আত সমান রাখা এবং প্রথম রাকআতের কিরা'আত এক-দুই আয়াতের বেশি না বাড়ানো।

মাসআলা: ফরয নামাজের শুধু প্রথম দুই রাকা'আতে সূরায়ে ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানো ওয়াজিব। আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে এসেছে- নামাযের ওয়াজিবসমূহের একটি হলো, ফরয নামাজের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা ফাতেহা এবং সঙ্গে অন্য একটি সূরা বা আয়াত মিলানো।-আদ্দুররুল মুখতার, ২/১৪৯

আল্লামা শামী (রহ.) লিখেছেন, ফরয নামাযের শেষ দুই রাকা'আতে সূরা মিলানো মাকরূহে তানযীহী। -শামী, ২/১৫০

ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা বা আয়াত মিলানো ওয়াজিব।

ইসলাহ: অনেকে ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে ভুলে সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা না মিলিয়ে অজ্ঞতাবশত শেষ দুই রাকা'আতেও সূরা মিলায় না। এভাবেই নামায শেষ করে, এটা ঠিক নয়।

মাসআলা হলো- ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতের এক রাকা'আতে অথবা উভয় রাকা'আতে ভুলবশতঃ সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো না হলে শেষের রাকা'আতগুলোতে তা মিলাতে হবে। যেমন চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম এক রাকা'আতে বা শুরুর দুই রাকা'আতে সূরা ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা না মিলিয়ে থাকলে শেষের দুই রাকা'আতে বা এক রাকা'আতে ফাতেহার সঙ্গে মিলিয়ে নিবে। আর এ ধরনের ভূলের জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

ইসলাহ : মাসবুক যার ইমামের সঙ্গে এক বা একাধিক রাকা'আত ছুটে গেল। সে তার ছুটে যাওয়া রাকা'আতগুলোতে সূরায়ে ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব কি না?

মাসআলা হলো : মাসবুক তার ছুটে যাওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরায়ে ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। অনেকে এ ব্যাপারে ভুল করে থাকেন। শুধু সূরায়ে ফাতেহা পড়ে নামায শেষ করে দেন।

রুকূ অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অনেকে রুকূতে গিয়ে মাথা, পিঠ, কোমর বরাবর করে না এবং পিঠ বিছিয়ে রাখে না; বরং কেউ মাথা উঁচু করে রাখে, কেউ মাথা নিচু করে রাখে, আবার কেউ পিঠ ধনুকের মতো গোল করে রাখে, এসবই মাকরূহ। রুকূর মধ্যে মাথা, পিঠ, কোমর বরাবর রাখা এবং পিঠ বিছিয়ে রাখা সুন্নাত।

২. অনেকে মহিলাদের মতো হাঁটু বাঁকা করে সামনের দিকে বাড়িয়ে রাখে। কেউ আবার এমনভাবে দাঁড়ায়, নিতম্ব পিছনের দিকে বাঁকা হয়ে থাকে। এ উভয় কাজই ভুল। রুকূর ভিতর পূর্ণ পা সোজা রাখা সুন্নাত। দাঁড়ানো অবস্থায় কোমরের নিচের অংশ যেমন সোজা ছিলো তেমনি রুকূ অবস্থায়ও সোজা থাকবে। শরীরের ভার পায়ের আঙ্গুলের দিকে নিয়ে এলেই পা সোজা হয়ে যায়।

৩. অনেকে রুকূ অবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখে এবং হাতকে হাঁটুর উপর একেবারে হালকাভাবে রেখে দেয়। অথচ পুরুষের জন্য নিয়ম হলো, আঙ্গুলসমূহ ফাঁক ফাঁক করে রাখা এবং উভয় হাত দ্বারা হাঁটু শক্তভাবে ধরা।

৪. অনেকে কনুই বাঁকা করে রাখে, এমনটি করাও ভুল। রুকূ অবস্থায় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখতে হয়।

৫. অনেকে কোনোরকম রুকূতে গিয়েই তাড়াতাড়ি করে আবার দাঁড়িয়ে যায়। অথচ নিয়ম হলো, রুকূতে গিয়ে স্থির হয়ে কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পড়ে তারপর দাঁড়ানো।

মাসআলা : রুকূতে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে মুসান্নিফ (রহ.) লিখেছেন- নামাযের রুকনসমূহ ধীরস্থিরে আদায় করা ওয়াজিব। অর্থাৎ রুকূ, সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা ওয়াজিব। রুকূতে তিন তাসবীহ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

রুকূতে যাওয়ার সময় ও রুকূ থেকে উঠার সময় তাকবীর বলা সুন্নাত এবং তিন তাসবীহ পড়াও সুন্নাত। -আদ্দুররুল মুখতার-(২/১৭৩)

মাসআলা : কেউ যদি রুকূ সিজদায় ইমামকে ফরয পরিমাণ পায় তাহলে সে উক্ত রুকূ-সিজদায় পেয়েছে বলে ধরা হবে। -ফাতাওয়ায়ে খাজীখান- (১/১২১)

মাসআলা : ইমাম রুকূতে থাকতেই যদি মুক্তাদী এসে তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমামের সঙ্গে শরীক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম রুকূ থেকে উঠে যায় অথবা রুকূ থেকে উঠার জন্য তাকবীর বলে এবং ইমাম রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে কিয়ামের কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদী রুকূতে যায়, তাহলে মুক্তাদী উক্ত রাকা'আত পায় না। সে মাসবুক সাব্যস্ত হবে এবং তাকে পরে এই রাকা'আত একাকী আদায় করে নিতে হবে। -শরহুল মুনিয়্যাহ -২৪৫

৬. অনেকে রুকূ থেকে সোজা হয়ে হাত ছেড়ে স্থিরভাবে দাঁড়ায় না, বরং সামান্য মাথা তুলেই সিজদায় চলে যায়। এতে ইচ্ছাকৃতভাবে দু'টি ওয়াজিব (রুকূ থেকে সম্পূর্ণ সোজা হওয়া এবং কওমার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ানো) তরক করায় নামায নষ্ট হয়ে যাবে। এমন নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। -শামী-২/২০২

উল্লেখ্য, রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এই দু'আটি পড়লে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত তিনটি স্তরই আদায় হয়ে যায়। দু'আটি হলো– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

সিজদা অবস্থায় ভুলসমূহ

১. অধিকাংশ লোকই দাঁড়ানো থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় অযথা বুক ও মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে সিজদায় যায়, এটা মারাত্মক ভুল। এতে এক রাকা'আতে দুই রুকূ হয়ে নামায খেলাফে সুন্নাত হয়ে যায়। সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু জমিনে লাগার পূর্ব পর্যন্ত বুক ও মাথা সম্পূর্ণ সোজা রাখা উচিত। অনুরূপভাবে দাঁড়ানোর সময় মাথা সম্পূর্ণ সোজা রেখে উঠতে হবে, যাতে অন্য আরেকটি রুকূর সাদৃশ্য না হয়।

২. সিজদায় যাওয়ার সময় বা সিজদা থেকে উঠার সময় অনেকে তাকবীরের আল্লাহ শব্দের লামটিকে এক আলিফ থেকে বেশি লম্বা করে থাকে, এটা ভুল।

তারতীলের সঙ্গে এক আলিফ পরিমাণই লম্বা করা উচিত। এর জন্য একা ১০/২০ বার মশক করা চাই।

৩. অনেকে সিজদায় গিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ ছড়িয়ে রাখে। অথচ সিজদায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা সুন্নাত। এরূপ অনেকে হাতের আঙ্গুলসমূহ কান বরাবর না রেখে আগ-পাছ করে রাখে, এটাও সুন্নাতের খেলাফ।

৪. অনেকে সিজদায় উভয় পায়ের মাঝে দাঁড়ানো অবস্থার মতো চার আঙ্গুল ফাঁক রাখে না এবং আঙ্গুলসমূহ মুড়িয়ে কিবলামুখী করে উভয় পা খাড়া করে রাখে না; বরং উভয় গোড়ালি মিলিয়ে রাখে অথবা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খাড়া রাখে, এমন করা ভুল। আবার অনেকে আঙ্গুলগুলোর মাথা পূর্ব দিক করে রাখে, যা সুন্নাতের খেলাফ।

৫. দুই সিজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা ওয়াজিব। অনেকে তাড়াহুড়ো করে একবারে দুই সিজদা করে বসে, এটা মারাত্মক ভুল। এর দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে এই দু'আ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

অথবা رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ.

-নাসাঈ, হাদীস : ১১৪৫

এই দু'আ পড়লে জলসার (দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠক) ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতের স্তর আদায় হয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুকূ-সিজদা, কওমা ও জলসা প্রায় একই রকম হতো। সে হিসেবে যতোটুকু সময় রুকূ ও সিজদার মধ্যে ব্যয় হতো, ততোটুকু সময় কওমা ও জলসার মধ্যেও ব্যয় হতো। অবশ্য কিয়াম ও তাশাহ্হুদের বৈঠক লম্বা হতো। -জীবন্ত নামায

৬. অনেকে সিজদা করার সময় পা জমিন থেকে উঠিয়ে রাখে। অথচ সিজদা আদায় হওয়ার জন্য পা জমিনে লাগিয়ে রাখা জরুরী। তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় উভয় পা উঠিয়ে রাখলে সিজদা বাতিল হওয়ার দরুন নামায নষ্ট হয়ে যায়।

-শামী-২/২০৪

৭. সিজদার সময় অনেকে উভয় উরু সোজা করে খাড়া রাখে না; বরং হাঁটু থেকে উপরের অংশ সামনে বা পিছনের দিকে হেলিয়ে রাখে, যা ভুল। এই ভুল

থেকে বাঁচার উপায় হলো, সিজদার সময় হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত চার আঙ্গুল পরিমাণ দূরে হাত রেখে উভয় হাতের মাঝে চেহারা এবং উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা বরাবর নাক রেখে সিজদা করা।

৮. সিজদায় অনেক সময় পুরুষরা কনুই বিনা ওযরে মাটির উপর বিছিয়ে রাখে অথবা কনুই হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। আবার অনেকে বাহু বা হাত পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখে। অথচ এসব অঙ্গ পৃথক রাখা জরুরী। তবে মহিলারা জড়সড় ও সঙ্কুচিত হয়ে এক অঙ্গের সঙ্গে আরেক অঙ্গ মিলিয়ে সিজদা করবে।

৯. মহিলারা অনেক সময় পুরুষদের মতো পা খাড়া করে সিজদা করে। অথচ মহিলাদের সিজদা করার সময় উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে কিবলামুখী করে বিছিয়ে রাখতে হয়। -শামী-২/২১১

বসা অবস্থার ভুলসমূহ

১. অনেকে দুই সিজদার মাঝে সোজা হয়ে না বসেই আরেক সিজদায় চলে যায়। অথচ এতে ইচ্ছাকৃতভাবে দুটি ওয়াজিব (সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা এবং স্থির হওয়া) তরক করায় নামায নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। –শামী : ২/১৪৭, মারাকিল ফালাহ : ২৪৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া : ১/২২৫

২. অনেকে দুই সিজদার মাঝে এবং তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখে না; বরং বাঁকা করে রাখে অথচ এরকম করা সুন্নাতের খেলাফ।

৩. দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠার সময় বা মধ্যবর্তী বৈঠক থেকে দাঁড়ানোর সময় অনেকে বিনাওযরে হাত দিয়ে জমিনে ভর দেয়। অথচ তা মাকরূহ। অনেক সময় তাতে আরেকটি রুকূর সাদৃশ্য হয়ে যায়।

মাসবুকের ব্যাপারে জরুরী কয়েকটি মাসআলা

মাসআলা : মাসবুক তার ছুটে যাওয়া রাকা'আতসমূহ পড়ার পদ্ধতি হলো: ইমাম যখন উভয় দিকে সালাম ফিরাবে তখন মসবুক তার ছুটে যাওয়া রাকা'আতের জন্য দাঁড়াবে এবং ১ম ও ২য় রাকা'আতে সূরায়ে ফাতেহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলাবে। অনেক মুসল্লীগণ মাসআলা না জানার কারণে শুধু সূরায়ে ফাতেহা পড়ে থাকেন। বিষয়টি সংশোধন হওয়া উচিত।

মাসআলা : মাসবুক তিনবার তাসবীহ পড়া শেষ হওয়ার আগেই যদি ইমাম রুকূ অথবা সিজদা থেকে মাথা তুলে নিলেন তা হলে মুক্তাদীও মাথা তুলে ফেলবেন। -আদ্দুররুল মুখতার-১/১৯৯-২০০

মাসআলা : মাসবুকের তাশাহহুদ শেষ হওয়ার আগেই যদি ইমাম সালাম ফিরান অথবা তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যান তাহলে মাসবুক বা মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ না করে তাশাহহুদ পূর্ণ করবে। কারণ তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব। তাশাহহুদ পূর্ণ না করলে নামায মাকরূহে তাহরীমির সঙ্গে আদায় হবে।
-আদ্দুররুল মুখতার-১/১৯৯-২০০

মাসআলা : মাসবুক শেষ বৈঠকে তাকবীরে তাহরীমা বলে ইমামের সঙ্গে শরীক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু অংশ পড়ার পর ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলেন, তাহলে মাসবুকের জন্য তাশাহহুদ পূর্ণ করে দাঁড়ানো উত্তম। তবে না পড়ে দাঁড়ালেও কোন অসুবিধা নেই । -খুলাসাতুল ফাতওয়া-১/১৫৯

মাসআলা : ইমামের সঙ্গে মাসবুকের তাশাহহুদ শেষ হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তিনি চুপ করে বসে থাকতে পারেন, বা তাশাহহুদ এমন ধীর গতিতে পড়তে পারেন, যাতে ইমামের সালাম পযর্ন্ত সময় বেশ চালিয়ে নেওয়া যায় অথবা তাশাহহুদই বার বার পড়তে পারেন। তবে ধীরগতিতে তাশাহহুদ পড়ে যাওয়াই উত্তম। -ফাতওয়ায়ে আলমগীরি-১/৯১

মাসআলা : কোনো কারণবশতঃ যদি ইমামের উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়, তাহলে মাসবুক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সঙ্গে শুধু সিজদায়ে সাহু করবে। কিন্তু সালাম ফিরাবে না। মাসবুক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদায়ে সাহুর সালাম ফিরায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভুলে ইমাম সাহেবের আগে বা সঙ্গে সালাম ফিরালে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে ইমামের আস্-সালাম শব্দ বলার পর মাসবুক সালাম ফিরালে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কারণ তখনতো সে মুনফারিদ। -আদ্দুররুল মুখতার-২/৫৪৬-৫৪৭

নামাযের সালামের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ

১. অনেকে সালাম ফিরানোর সময় কোনো নিয়্যত করে না। অথচ উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় মুসল্লী, ফেরেশতা, নামাযী জ্বীন ও ইমামের প্রতি সালাম করার নিয়্যত করা সুন্নাত।

২. অনেকে 'আসসালামু' বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা ডানে বা বামে ঘুরিয়ে ফেলে, অথচ 'আসসালামু' বলা পর্যন্ত উভয় সালামে চেহারা কিবলার দিকে রাখতে হবে। তারপর 'আলাইকুম' বলার সময় চেহারা ঘুরাতে হবে। অনেকেই দ্বিতীয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু না করে ডান দিকে চেহারা থাকা

অবস্থাতেই আরম্ভ করে দেয়, এটা সুন্নাতের খেলাফ। এমনিভাবে সালামের সময় বুক ফিরানো ভুল; বরং শুধু চেহারা এতটুকু ঘুরাবে যেন পিছনের কাতার থেকে চোয়াল দেখা যায়।

৩. ইমামের জন্য দ্বিতীয় সালামের আওয়ায প্রথম সালামের আওয়াযের তুলনায় ক্ষীণ স্বরে বলা সুন্নাত, কিন্তু অনেকেই তা পালন করে না এবং উভয় সালামে এক সমান আওয়ায করে, যা ভুল।

৪. অনেক মাসবূক ইমামের দ্বিতীয় সালাম ফিরানো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই অবশিষ্ট নামায পড়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে যায়। অথচ ইমামের দ্বিতীয় সালাম সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর মাসবূকের দাঁড়ানো উত্তম।

ইসলাহ : অনেক নামাযীকে দেখা যায় নামাযরত অবস্থায় মাথার রুমাল নিয়ে নাড়াচাড়া করে, একপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, এদিক সেদিক তাকাতে থাকে, নামাযের মধ্যে দাঁড়িতে হাত বুলাতে থাকে। এগুলো সবকিছুই খুশুর পরিপন্থী। অনেক সাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণিত আছে, নামাযে স্থির থাকার নামই খুশু। অর্থাৎ অত্যন্ত শান্ত ও স্থিরভাবে নামায পড়া চাই। বিভিন্ন হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে, তোমরা এভাবে নামায আদায় করো যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ নামায। তার মতো নামায পড়ো, যে মনে করে, এই নামাযের পর আমার আর নামায পড়ার সুযোগই হবে না। –জামে সগীর

নামাযে নড়াচড়া করা নিষেধ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর মাতা উম্মে রূমান (রাযি.) বলেন, আমি একবার নামায পড়ছিলাম এবং নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক ঝুঁকছিলাম। এটা দেখে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) আমাকে এমন ধমক দিলেন যে, ভয়ে আমার নামায ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায়, সে যেন সমস্ত শরীরকে স্থির রাখে; ইহুদীদের মতো হেলে-দুলে নামায না পড়ে। কেননা শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা নামায পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ। -দুররে মানসূর, হাকিম তিরমিযী

নামাযের সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা

নামাযের সময় বিশেষ করে মসজিদে নামায চলাকালীন সময়ে মোবাইল বন্ধ রাখা কিংবা সাইলেন্ট করে রাখা একান্ত জরুরী। অনেক সময় দেখা যায়, অসতর্কতাবশতঃ মোবাইল বেজে উঠে এবং পুরো মসজিদের মুসল্লীদের মনোযোগ নষ্ট করে ফেলে, যা অত্যন্ত আপত্তিকর। এজন্য নামাযের পূর্বেই মোবাইল বন্ধ করার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত। অসতর্কতাবশতঃ মোবাইল ফোন বন্ধ না করা হলে এবং নামাযের মধ্যে তা বেজে উঠলে এক হাত ব্যবহার করে বন্ধ বা সাইলেন্ট করে দেয়া উচিত।

নামাযে মোবাইল ফোন বন্ধ করার বিধান

- যদি নামাযের মধ্যে মোবাইল বেজে উঠে তাহলে আমলে কালীলের মাধ্যমে (পকেটে রেখেই এক হাতে) মোবাইল বন্ধ করে দিবে। এতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। মোবাইল বন্ধ করার জন্য নামায ভাঙ্গার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি মোবাইল বন্ধ না করে এবং ধারাবাহিকভাবে বাজতেই থাকে তাহলে নামায তো হয়ে যাবে, কিন্তু ধারাবাহিক ঘণ্টা বাজার কারণে নিজের ও অন্যান্য নামাযীদের খুশু-খুযূ নষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

- এক রুকুনে যদি একবার বন্ধ করার পর দ্বিতীয় বার আবার বাজতে আরম্ভ করে, তাহলে আমলে কালীলের দ্বারা দুই বার তিন বার বন্ধ করতে পারবে। তবে যদি উক্ত তিন বার ধারাবাহিক হয় এবং তিন তাসবীহ বলার সমপরিমাণ হয় তাহলে এক বর্ণনা অনুযায়ী তা আমলে কাসীরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী। তাই নামাযের মধ্যে মোবাইল বন্ধের শর্ত হলো আমলে কাসীর হতে পারবে না।-মাজমাউল আনহুর ১/১২০

সতর্কতা : নামাযে মোবাইল ফোন বন্ধ করার সময় যদি দুই হাত ব্যবহৃত হয়, কিংবা মোবাইল হাতে নিয়ে স্কীনের দিকে তাকিয়ে দেখে তাহলে তা আমলে কাসীর বলে গণ্য হবে এবং নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। –আলবাহরুর রায়েক ২/১১

ইমামের আগে রুকূ-সিজদা করার পরিণাম

* রুকু-সিজদায় ইমামের আগে মাথা উঠানো মারাত্মক গুনাহ। এক হাদীসে এসেছে, তোমাদের কেউ কি এ বিষয়ে ভয় করে না, যখন সে রুকূ-সিজদায় ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মাথা গাধার মাথায় পরিবর্তন করে দেয়া হবে। কিংবা তার আকৃতি গাধার আকৃতিতে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। –বুখারী, মুসলিম

নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচল করা গুনাহ

নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন- এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করায় যে কতো মারাত্মক গুনাহ হয় তা যদি অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানতো, তাহলে সে চল্লিশ বছর (অপর বর্ণনায় এক শ বছর) অপেক্ষা করতে হলেও নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতো। তবুও নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করত না।

–জামে তিরমিযী ১/৩৩৪

ইসলাহ : নামাযী ব্যক্তিকেও এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নামাযে দাঁড়াতে এমন জায়গা নির্বাচন করে নিতে হবে, যেখান দিয়ে কোনো ব্যক্তির অতিক্রম করতে হবে না। অনেক সময় দেখা যায় কেউ সামনের কোনো ব্যক্তিকে আটকে রেখে সুন্নাত-নফল নামায পড়তে থাকে, এটা মোটেও উচিত নয়।

দু'আর ফায়দা ও আদব

আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশপূর্বক নিজের জীবনের প্রয়োজনসমূহ প্রার্থনা করাকে দু'আ বলা হয়। একমাত্র দু'আর মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ ও অনুকম্পা দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার কুদরতী খাজানার তালা খোলার অদ্বিতীয় চাবি হলো দু'আ। বান্দা আপন জীবন-যাপনে মুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আপন কাজ-কর্মে গুনাহগার ও অপরাধী। তাই বান্দার প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং গোনাহ খাতাকে ক্ষমা করে পূতঃপবিত্র করার জন্য বান্দাকে হাতিয়ার স্বরূপ দু'আ দেয়া হয়েছে। বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা অব্যশই তার দু'আ কবূল করে থাকেন। এ প্রতিশ্রুতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বান্দাকে প্রদান করেছেন। তিনি ইরশাদ ফরমান, اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করে নিব।" -সূরা মুমিন : ৬০

মানবজীবনে দুটি বিষয় কামনার যোগ্য। একটি হলো ভালো, কল্যাণ ও উপকারী বস্তু অর্জন করা। আর দ্বিতীয়টি হলো বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিহত করা। আর উভয়টিই দু'আর মধ্যে নিহিত আছে। দু'আর মাধ্যমে যেমন আল্লাহ তা'আলার নিকট উপকারী বস্তুর প্রত্যাশা করা যায়, ঠিক তেমনি বিপদ-আপদের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। যে কোনো জিনিসের দরকার হোক না কেন, তা দুনিয়ার কাজেই হোক আর দ্বীনী কাজেই হোক, তা নিজের চেষ্টা বা আয়ত্তের মধ্যেই হোক বা নিজের চেষ্টা ও শক্তির বাইরে হোক সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার

নিকট দু'আ করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, দু'আ নাজায়েয বিষয়ের জন্য যেন না হয়। সে দু'আ যত ক্ষুদ্র জিনিসের জন্য হোক কিংবা বিরাট কোনো জিনিসের জন্য হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সকলেরই নিজ নিজ প্রয়োজন আল্লাহর নিকট চাও। এমনকি যদি লবনের প্রয়োজন পড়ে, জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় তার জন্যও আল্লাহর নিকট দু'আ করা চাই। যত ইবাদত আছে যদি তা দুনিয়ার জন্য করা হয়, তবে সেটি ইবাদত থাকে না, কিন্তু দু'আ এমন একটি ইবাদত যে, এটি দুনিয়ার জন্য হলেও ইবাদত হয়, বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

সাধারণ বস্তুও আল্লাহ পাকের নিকট চাইবে। এরূপ মনে করা সমীচীন নয় যে, ক্ষুদ্র ও সাধারণ বস্তু আল্লাহ পাকের নিকট চাইলে তিনি নারায হবেন। কেননা আল্লাহ পাকের নিকট যাবতীয় বড় বস্তুও ছোট। তার নিকট আরশ এবং একটি লবণের দানা একই সমান। সুতরাং সমস্ত কাজ-কর্মে, বিপদে-আপদে যা কিছু চেষ্টা তদবীর হতে পারে তাও যথাযথভাবে প্রয়োগ করবে আবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নিকট কায়মনো বাক্যে দু'আ করবে। ফলকথা, এ তদবীরের কাজে তদবীরও করবে এবং বেশি বেশি দু'আও করতে হবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার দু'আ কবূল হয়, যদি গুনাহের বা আত্মীয়তা ছেদনের দু'আ না করা হয় এবং সে তাড়াহুড়া না করে। আরয করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াহুড়া করার অর্থ কী? রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাড়াহুড়ার অর্থ এই যে, দু'আ করার পর দু'আকারী বলে যে, কতোবার দু'আ করলাম, কিন্তু দু'আ কবূল হতে দেখলাম না। এরূপ বিরক্ত হয়ে দু'আ হতে বিরত থাকা। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একমাত্র দু'আয় তক্‌দীরের ফয়সালা পরিবর্তন হতে পারে, অন্য কোনো উপায়ে নয়।

হাদীসে পাকে আছে, আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা অধিক কদরের জিনিস আর কিছুই নাই। অন্য এক হাদীসে আছে, দু'আ সর্বাবস্থায়ই উপকারে আসে, যে বালা-মুসীবত নাযিল হয়েছে তাতেও এবং এ পর্যন্ত যা নাযিল হয় নাই তাতেও। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু'আ না করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন।

হাদীসে পাকে আছে, মুমিনের প্রতিটি দু'আ কবূল করা হয়, কোনো সময় সে ঐ জিনিস পায় যা সে চেয়েছিল, আবার কখনও তদপেক্ষা উত্তম জিনিস তাকে দান করা হয়, আবার কোনো সময় দুনিয়াতে কিছুই দেয়া হয় না। বরং-এর সওয়াব জমা করে আখেরাতে তাকে দেওয়া হবে। তখন বান্দা আখেরাতের আমলনামায় সওয়াব দেখে আফসোস করবে, আহা! দুনিয়াতে যদি আমার একটি

দু'আও কবূল না হতো। আখেরাতের জন্য জমা থাকত। এজন্য একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, আমাদের সমস্ত দু'আই কবূল হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর নিকট কবূল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখে দু'আ কর। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ তা'আলা গাফেল দিলের দু'আ কবূল করেন না। -তিরমিযী

নির্ভরযোগ্য হাদীসে দু'আর জন্য নিম্নে বর্ণিত আদবসমূহ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে দু'আ করলে নিশ্চিতভাবে কবূল হওয়ার আশা করা যায়।

মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা

১. মুনাজাতের শুরুতে-শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ পাঠ করা।-তিরমিযী হা:৩৪৭৬

২. উভয় হাত সীনা বরাবর উঠানো। -মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা : ৩২৩৪

৩. হাতের তালু আসমানের দিকে প্রশস্ত করে রাখা।
-রদ্দুল মুহতার: ১/৪৭৭, তাবারানী কাবীর হা : ৩৮৪২

৪. হাতের আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক রাখা। -হিসনে হাসীন : ২৭

৫. দু'হাতের মাঝে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রাখা। -ত্বাহত্বাবী : ২০৫

৬. একাগ্রচিত্তে কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করা। -সূরা আ'রাফ : ৫৫

৭. আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে বারবার চাওয়া। -সহীহ বুখারী, হা : ৬৩৩৮

৮. নিঃশব্দে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে দু'আ সম্মিলিতভাবে হলে এবং করো নামাযে বা ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকলে স্বশব্দে দু'আ করাও জায়েয আছে। -সূরা আরাফ : ২০৫, সহীহ বুখারী, হা : ২৯৯২

৯. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতি শেষ পর্যন্ত পড়া, দুরূদ শরীফ ও আমীন বলে দু'আ শেষ করা।
-তাবারানী কাবীর হা: ৫১২৪, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক হা: ১১৭, আবু দাউদ হা: নং ৯৮৩

১০. মুনাজাতের পর দু'হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে নেয়া।-আবু দাউদ হা: নং ১৪৮৫

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের শরঈ বিধান

ফরয নামাযের জামা'আতের পর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি ছাড়া সম্মিলিতভাবে দু'আ করা মুস্তাহাব আমল। তাই যারা মুনাজাতকে জরুরী মনে করে এ-ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং কেউ না করলে তাকে কটাক্ষ করে, গালি দেয় তারা ভুলের মধ্যে আছে। আবার যারা মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করে তারাও ভুলের মধ্যে রয়েছে। যারা ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাতকে সর্বাবস্থায় বিদ'আত বলে, তাদের দাবিও ভিত্তিহীন।

হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের শেষে দু'আ করতেন। -তারীখে কাবীর ৬/৮০

জুমু'আ

জুমু'আর দিনের সুন্নাত ও আদবসমূহ

জুমু'আর দিনে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর আমল করলে প্রতি কদমে এক বছর নফল নামায ও এক বছর নফল রোযার সওয়াব হাসিল হয়। এই হাদীসটি মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে। বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইবনে মাজাহ রাহিমাহুমুল্লাহ। যে আমল সম্পর্কে হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) মিরকাত কিতাবে লিখেছেন, সহীহ হাদীস দ্বারা এতো বেশি ফযীলত অন্য কোনো নফল আমল সম্পর্কে পাওয়া যায় না।

আমলগুলো এই–

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে উত্তমরূপে গোসল করা।
২. জুমু'আর দিনে জলদি মসজিদে উপস্থিত হওয়া।
৩. মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া।
৪. ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা।
৫. মনোযোগ সহকারে খুৎবা শোনা।
৬. অহেতুক কথাবার্তা ও বেফায়দা কাজ না করা।

উপরোক্ত আমল ছাড়া আরও কিছু আমল রয়েছে, যেগুলো জুমু'আর দিনে বিশেষভাবে করা চাই।

১. সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।
২. সালাতুত তাসবীহ্ নামায পড়া।
৩. অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়া।
৪. উত্তম লেবাস পরিধান করা।
৫. আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৬. মিসওয়াক করা।
৭. বেশি বেশি দু'আ করা বিশেষ করে ইমাম যখন দুই খুৎবার মাঝখানে মিম্বরে বসেন, তখন দু'আ কবূল হওয়ার সময়। কাজেই সে সময় জিহ্বা

নাড়াচাড়া না করে মনে মনে দু'আ করা (অর্থ্যাৎ, দিলে দু'আর বিষয়টি হাযির রাখা)।

৮. সূর্যাস্তের পূর্বের সময়টি দু'আ কবূল হওয়ার সময়। সুতরাং তখন দু'আ ও ইবাদতে মগ্ন থাকা।

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন আসরের নামাযের পর নিজের স্থান ত্যাগ করার পূর্বে নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফটি ৮০বার পাঠ করবে, তার আমলনামায় ৮০ বছরের সগীরা গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। ৮০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব তার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে।

দুরূদ শরীফটি হলো এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

–আদ দুররুল মানসুদ ফিস সালাতি ওয়াস সালামি আলা সাহিবিল মাকামিল মাহমুদ, পৃষ্ঠা ১৬০

জুমু'আর খুতবার সুন্নাত তরীকা

যখন সমস্ত মুসল্লী উপস্থিত হবে তখন ইমাম মিম্বারে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করে বসবেন এবং মুয়াযযিন তার সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। আযান শেষ হলে তৎক্ষণাৎ ইমাম দাঁড়িয়ে খুৎবা শুরু করবেন। –বেহেশতী জেওর ২/২০০

খুতবার সুন্নাত

১. খতীবের উযূ-গোসলের প্রয়োজন থাকলে তা আগেই সেরে নেয়া।

২. দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়া।

৩. (পর পর) দুইটি খুৎবা দেয়া।

৪. দুই খুৎবার মাঝে তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় পরিমাণ সময় বসা।

৫. খুৎবার সময় চেহারা উপস্থিত মুসল্লীদের দিকে রাখা।

৬. খুৎবা শুরুর আগে আস্তে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়া।[১]

৭. মুসল্লীগণ শুনতে পারে এই পরিমাণ আওয়াযে খুৎবা দেয়া।

৮. খুৎবার মধ্যে নিম্নলিখিত আটটি বিষয় বর্ণনা করা। যথা–

(ক) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

---

১. নোট : অনেকে খুতবার জন্য মিম্বারে দাঁড়িয়ে প্রথমে মুসল্লিগণকে সালাম দেন, এটা হানাফী মাযহাব মতে মাকরূহ।

(খ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা।

(গ) তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া।

(ঘ) দুরূদ শরীফ পড়া।

(ঙ) কিছু নসীহত করা।

(চ) কুরআন শরীফ থেকে কয়েকখানা আয়াত বা সূরা তিলাওয়াত করা।

(ছ) দ্বিতীয় খুৎবায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা।

(জ) প্রথম খুৎবার যে স্থানে নসীহত ছিলো দ্বিতীয় খুৎবায় সেখানে সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ ও ইস্তেগফার করা। -বেহেশতী জেওর ২/২০০

৯. খুৎবা অত্যন্ত লম্বা না করা; বরং দুই রাকা'আত নামাযের সমান বা তার চেয়ে সময় কম লাগানো। -বেহেশতী জেওর ২/২০০

১০. মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়া। মিম্বার না থাকলে লাঠি, ধনুক বা তলোয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও খুৎবা দেয়ার অনুমতি আছে। তাছাড়া প্রয়োজন বোধে আরবী গদ্যে প্রদান করা। আরবী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় খুৎবা দেয়া বা খুৎবায় পদ্য ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমী।

১১. উভয় খুৎবায় মনোযোগী হয়ে আত্তাহিয়্যাতুর সূরতে ইমামের দিকে খেয়াল করে বসা (মুক্তাদীদের জন্য)।

১২. দ্বিতীয় খুৎবায় হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আওলাদ, আসহাব এবং উম্মুল মুমিনীনের প্রতি বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশিদীন, হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব। মুসলমান ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ'র জন্য দু'আ করা জায়েয; কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরূহে তাহরীমী। -বেহেশতী জেওর ২/২০০

মাসআলা : যখন খতীব খুৎবার জন্য দাঁড়াবেন তখন থেকে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে কোনো ধরনের নামায পড়া বা কথাবার্তা বলা মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য ছাহেবে তারতীবের[১] কাযা নামায পড়া জায়েয বরং ওয়াজিব।-বেহেশতী জেওর ২/২০১

মাসআলা : খুৎবা শুরু হলে দূরে বা নিকটে উপস্থিত মুসল্লীগণের তা মনোযোগের সঙ্গে শুনা ওয়াজিব এবং কোনো কাজ বা কথা এবং ইশারা-ইঙ্গিত, যার দ্বারা খুৎবা শুনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে, তা মাকরূহে তাহরীমী। যেভাবে

---

[১]. নোট : ছাহেবে তারতীব-যার পাঁচ ওয়াক্তের বেশি নামায কাযা নেই।

নামাযের মধ্যে পানাহার করা, কথা বলা, সালাম দেয়া নেয়া হারাম, খুৎবার মধ্যেও হারাম। তবে খতীব সাহেব নেক কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের নিষেধ করতে বা মাসাআলা বলতে পারবেন। -বেহেশতী জেওর ২/২০১

মাসআলা : সুন্নাত বা নফল নামায পড়াকালীন যদি খুৎবা শুরু হয়ে যায় তবে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হলে ছোট সূরা দ্বারা পুরা করে নিবে আর দুই রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। -বেহেশতী জেওর ২/২০১

জুমু'আর নামাযে সুন্নাত কিরা'আত

* জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে প্রথম রাকা'আতে সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরায়ে দাহর পড়া সুন্নাত। তবে সবসময় এরূপ করা মাকরূহ। এজন্য কখনও অন্য সূরাও পড়া চাই।

-শামী : ২/২৬৫

* জুমু'আর প্রথম রাকা'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা মুনাফিকূন পড়া সুন্নাত।

অন্য এক বর্ণনায় প্রথম রাকা'আতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ পড়ার কথা উল্লেখ আছে।

-তিরমিযী : ১১৭

ইসলাহ : অনেকে বা'দাল জুমু'আ চার রাকা'আত সুন্নাত নামায না পড়ে শুধু ফরয নামায পড়ে বের হয়ে যায়। অথচ এটা সুন্নাতে মুআক্কাদা। চার রাকা'আত বা'দাল জুমু'আ পড়ার পরে আরো দুই রাকা'আত সুন্নাত পড়া উচিত। অনেকে কাবলাল জুমু'আ সুন্নাত নামায আদায়ের জন্য আযানের অপেক্ষায় থাকে অথচ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে গেলেই সুন্নাত আদায় করা যায়।

জুমু'আর প্রথম খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَكْرَمِ , اَلَّذِىْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَكَرَّمَ – وَعَلَّمَهٗ مِنَ الْبَيَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ – فَسُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يُحْصِىْ اِمْتِنَانُهٗ بِاللِّسَانِ وَلَا بِالْقَلَمِ – وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلَّذِىْ اُوْتِىَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ – وَكَرَائِمَ الْحِكَمِ – وَمَكَارِمَ الشِّيَمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ نُجُوْمِ طَرِيْقِ الْاُمَمِ – اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ عِلْمَ الشَّرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ – هُوَ اَعْظَمُ فَرَآئِضِ الْاِسْلَامِ – وَمِنْ ثَمَّ اُمِرَ بِهٖ وَحُضَّ عَلَيْهِ تَعْلِيْمًا وَّتَعَلُّمًا – فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً – وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَّلَا دِرْهَمًا، وَاِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اَخَذَهٗ اَخَذَ بِحَظٍّ وَّافِرٍ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ ثُمَّ كَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗٓ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِىْ رِيْحَهَا - وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْاٰنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَاِنِّىْ مَقْبُوْضٌ – اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ – قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ . اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَه وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ .لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ – اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهٗ لَايَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهٗ – وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًاأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَآئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ – يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا – اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ – وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّأَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْحَمُ اُمَّتِيْ بِاُمَّتِيْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَشَدُّهُمْ فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَآءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُمَا. وَحَمْزَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَسَدُ اللّٰهِ وَ أَسَدُ رَسُوْلِهٖ– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهٖ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً لَّا تُغَادِرُ ذَنْبًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، اَللّٰهَ! اَللّٰهَ!! فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ – فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ, وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ – وَخَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ – وَالسُّلْطَانُ ظِلُّ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللّٰهُ –اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ – يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ,فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ-

ঈদ

ঈদের দিনের সুন্নাতসমূহ

১. প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা।

২. মিসওয়াক করা।

৩. গোসল করা।

৪. সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা।

৫. খুশবু ব্যবহার করা।

৬. শরীয়তের সীমার ভিতর থেকে যথাসম্ভব সজ্জিত হওয়া।

৭. ফজরের নামাযের পর জলদি ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া।

৮. ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খোরমা অথবা অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য খাওয়া। ঈদুল আযহার দিনে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া।

৯. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করা।

১০. ঈদের নামায ঈদগাহে পড়া।

১১. ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

১২. ঈদগাহে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা।

১৩. ঈদুল ফিতরে অনুচ্চস্বরে এবং ঈদুল আযহায় উচ্চঃস্বরে তাকবীরে তাশরীক বলতে বলতে ঈদগাহে যাওয়া। তাকবীরে তাশরীক হলো–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

–হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

উভয় ঈদের নামায ওয়াজিব। সুন্নাতের দৃষ্টিতে ঈদের নামায শহর বা লোকালয়ের বাইরে ময়দানে আদায় করাই উত্তম। শহরে আদায় করা অপেক্ষা বাইরে আদায় করার মধ্যে ফযীলত বেশি। –ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৫/২০৮

ঈদের নামাযের নিয়্যতের পর প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমা পড়ে যথারীতি হাত বাঁধবে এবং 'সম্পূর্ণ ছানা' (সুবহানাকা) পড়বে। ছানার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে না। অতঃপর–

* কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পড়া যায় এই পরিমাণ সময় দেরি করে–

* পূর্বের মতো কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ সময় দেরি করে-

* আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। কিন্তু এবার কান থেকে হাত নামিয়ে ছেড়ে দিবে না, বরং বেঁধে নিবে।

(এ-পর্যন্ত অতিরিক্ত তিন তাকবীর হয়ে গেলো)

এভাবে হাত বাঁধার পর মুক্তাদীগণ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ না পড়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আর ইমাম সাহেব আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা-কিরা'আত পড়ে যথারীতি প্রথম রাকা'আত শেষ করবেন।

দ্বিতীয় রাকা'আত -

যথারীতি সূরা ফাতেহা ও কিরা'আত শেষ করার পর, রুকূতে না গিয়ে

* কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পরিমাণ সময় দেরি করে-

* পূর্বের মতো কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে এবং তিনবার 'সুবহানাল্লাহ' পরিমাণ দেরি করা।

* অতঃপর আবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দিবে। (এখানে অতিরিক্ত আরোও তিন তাকবীর হয়ে মোট অতিরিক্ত ছয় তাকবীর হলো)। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যাবে এবং যথারীতি দ্বিতীয় রাকা'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।–হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃ ১৭৩

সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন জায়েয নয়

মক্কা শরীফে ঈদের চাঁদ উদয় হলে সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ পালন করা জায়েয নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَا تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ

অর্থ- তোমরা রোযা রেখো না, যতক্ষণ চাঁদ না দেখ। এবং রোযা ভঙ্গ করো না, যতক্ষণ চাঁদ না দেখ। সুতরাং যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে তার পরিমাণ নির্ধারণ করো। –সহীহ বুখারী ১/২৫৬

এখন প্রশ্ন হলো প্রত্যেক দেশ বা শহরের জন্য কি চাঁদ দেখা জরুরী? না পৃথিবীর কোনো এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে সারা বিশ্বের মানুষ তার উপর ভিত্তি করে রোযা রাখবে অথবা ঈদ পালন করবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর তিরমিযী এবং মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে। প্রসিদ্ধ তাবেঈ কুরাইব (রহ.) বর্ণনা করেন, উম্মুল ফযল বিনতে হারেস তাঁকে (কুরাইবকে) সিরিয়ায় হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (কুরাইব) বলেন, তারপর আমি সিরিয়ায় এলাম এবং উম্মুল ফযলের প্রয়োজন মেটালাম। আমি তখনও সিরিয়ায়, এমন সময় রমযানের চাঁদ দেখা গেলো। সুতরাং আমি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখলাম, তারপর সে মাসের শেষেই মদীনায় এসেছিলাম। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ডেকে পাঠালেন এবং চাঁদের আলোচনা তুললেন। তিনি বললেন, তোমরা কোন্‌দিন চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, আমরা বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখেছিলাম। তিনি বললেন, তুমিই দেখেছিলে? জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ! আমার সাথে অন্যান্য মানুষও দেখেছিলো এবং তারা রোযাও রেখেছিলো, হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)ও রোযা রেখেছিলেন। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমরা চাঁদ দেখেছিলাম শুক্রবার দিবাগত রাতে। সুতরাং আমরা রোযা রাখতে থাকবো ত্রিশ পূর্ণ করা পর্যন্ত অথবা চাঁদ দেখা পর্যন্ত। আমি বললাম, আপনি কি হযরত মু'আবিয়া (রাযি.)-এর দেখার উপর এবং তাঁর রোযা রাখার উপর আস্থা রাখবেন না। জবাবে তিনি বললেন, না– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন।

–মুসলিম শরীফ ১/৩৪৮ পৃষ্ঠা, তিরমিযী শরীফ ১/১৪৮

এই দুই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, চাঁদ না দেখে রোযা রাখা যাবে না এবং চাঁদ না দেখে রোযা ভেঙে ঈদ করাও যাবে না।

কোনো এলাকায় চাঁদ দেখা গেলে তা কতদূর পর্যন্ত কার্যকর?

কোনো এলাকার জন্যে ততো দূরের চাঁদ দেখা গ্রহণীয় হবে যত দূরের চাঁদ দেখা গ্রহণ করলে এলাকার আরবী তারিখের মাস কখানো ২৮ (আটাশ) অথবা ৩১শে (একত্রিশ) না হয়। যেমন ভারত বা বাংলাদেশীরা সৌদী আরবের চাঁদ-দেখা গ্রহণ করলে ভারত বা বাংলাদেশে আরবী মাস আটাশে অথবা একত্রিশে

হয়ে যায়। সুতরাং ভারত বা বাংলাদেশের জন্যে সৌদি আরবের চাঁদ-দেখা গ্রহণ করা যাবে না। আর ভারতের জন্যে পাকিস্তানের চাঁদ-দেখা, অনুরূপভাবে বাংলাদেশের জন্যে ভারতের চাঁদ দেখা গ্রহণ করলে যদি ভারত এবং বাংলাদেশের আরবী মাস আটাশ অথবা একত্রিশে না হয়; তাহলে ভারতের জন্যে পাকিস্তানের এবং বাংলাদেশের জন্যে ভারতের চাঁদ দেখা কার্যকর হবে।

–ফতাওয়া মাহমূদিয়া ৩/ ১২১, ১২২

মুসাফিরের নামায

মুসাফির চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায কসর অর্থাৎ দু'রাকা'আত পড়বে। দু'রাকা'আত ও তিন রাকা'আত নামাযে কসর নেই।

–হেদায়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৫

মুসাফিরের সময় সুযোগ থাকলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ে নেয়া উত্তম।

সফরে কেবলার হুকুম

* ট্রেন, বাস, জাহাজ ও প্লেনের সফরে নামাযের মধ্যে কেবলার দিকে মুখ করা জরুরী। অন্যথায় নামায হবে না। কোনো কোনো লোক এটিকে জরুরী মনে করেন না; যেদিকে ইচ্ছা ফিরে নামায পড়ে নেয়। এটা একেবারে ভুল। যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে কেবলার দিক ঠিক করে নেয়া চাই। সাধারণতঃ সহজেই কেবলার দিক জানা যায়। তবুও যদি কেবলার দিক বুঝা না যায় এবং কোনো সন্ধানদাতাও না থাকে, তাহলে আন্দাজ-অনুমান করে কেবলার দিক ঠিক করে নিবে। পরে উক্ত দিক ভুল সাব্যস্ত হলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে; পুনরায় পড়তে হবে না।

–রাফীকে সফর, রাফীকে হজ্ব

বাস ও ট্রেনে বসে নামায পড়ার বিধান

* ট্রেন, বাস এবং কার ইত্যাদিতে বিনা উযরেও বসে নামায পড়া জায়েয নাই। কেননা নামাযে কিয়াম ফরয। শরীয়সম্মত উযর ব্যতীত বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। অবশ্য নফল নামায বিনা উযরেও বসে পড়া জায়েয।

–রাফীকে সফর

* যদি কোনো ব্যক্তি রোগ অথবা দুর্বলতার কারণে ট্রেন অথবা বাসে নড়া-চড়া অবস্থায় দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তাহলে এই ব্যক্তির জন্য বসে নামায পড়া জায়েয আছে। তবে অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণতঃ লোকেরা চলন্ত ট্রেন ইত্যাদিতেও দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে;

এতদসত্ত্বেও অনেক না-ওয়াকিফ লোক বিনা কারণে বসে নামায আদায় করে থাকে। এরূপ লোকদের নামায হয় না; পুনরায় সঠিকভাবে নামায পড়তে হবে।

–রাফীকে সফর

* আর যদি এমন হয় যে, দাঁড়ানোর শক্তি আছে কিন্তু ট্রেনে বা বাসে এতটুকু জায়গা নাই যে, দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে, তাহলে উচিত হলো যে, তখন বসেই নামায আদায় করে নিবে কিন্তু পরে এই নামায কাযা করে নিতে হবে। কেননা জায়গার সঙ্কীর্ণতার কারণে ফরয কিয়াম মাফ হয় না।

বিমানে নামায

- বিমান মাটিতে থাকা অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে এতে নামায ঠিক আছে। আর আকাশে উড্ডয়মান অবস্থায় যদি আশা করা যায় যে, মাটিতে নামা পর্যন্ত নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকবে, তবে উড়ন্ত বিমানে নামায না পড়ে মাটিতে নেমে পড়বে। আর ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নামায উড়ন্ত বিমানেই পড়ে নিতে হবে। –ইমদাদুল ফাতাওয়া

- বিমানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হলে দাঁড়িয়েই নামায পড়বে। তা নাহলে বসে পড়বে। –রাফীকে সফর

- বিমানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার শক্তি-সামর্থ্য তো আছে। কিন্তু জায়গার সঙ্কীর্ণতার কারণে সম্ভব নয়, তাহলে বসে পড়ে নিবে কিন্তু এই নামায পুনরায় পড়তে হবে। কেননা জায়গার সঙ্কীর্ণতার কারণে কিয়ামের ফরয মাফ হয় না। –রাফীকে সফর

নফল নামায

নফল ও মুস্তাহাবসমূহের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি অংশই জরুরী। এমনকি যে সকল আয়াতে কোনো ওয়াজিব অথবা ফরযের উল্লেখ নেই; বরং শুধু মুস্তাহাব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, তাও অত্যন্ত জরুরী। আজকাল মুস্তাহাবসমূহকে জরুরী মনে করা হয় না। যদিও আমলের ক্ষেত্রে মুস্তাহাব ওয়াজিব ও ফরযের ন্যায় জরুরী নয়; কিন্তু-এর তা'লীম-তরবীয়্যত নিঃসন্দেহে জরুরী এবং তা দুই কারণে–

প্রথমত : মানুষ যখন এসব কাজের মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে অবহিত হবে তখন তাকে নাজায়েয মনে করবে না এবং তা ফরয-ওয়াজিবের সমপর্যায়ের বলে মনে করবে না। আকীদা সংশোধনের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অত্যন্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত : মুস্তাহাব আমলে এমন অগণিত বরকত এবং উপকারিতা বিদ্যমান রয়েছে যা অবগত না থাকার কারণে লোকজন তার প্রতি আগ্রহী হয় না। যদি ওই সকল বরকত ও উপকারিতা সম্পর্কে তারা অবগত হতো, তাহলে সকলেই বলতে বাধ্য হতো যে, আফসোস! আমরা এতদিন এ সকল মূল্যবান বিষয় সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম।

আমাদের ভ্রান্ত ধারণার ফলে আল্লাহপাকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু আইনগতই হয়ে গিয়েছে। এ কারণে আমরা ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত মুস্তাহাবসমূহকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে থাকি। যদি আল্লাহপাকের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গের হতো, তাহলে আমরা শুধু ফরয ওয়াজিব আমলকেই যথেষ্ট মনে করতাম না; বরং মুস্তাহাব আমলসমূহের সন্ধানে ব্রতী হতাম। মুস্তাহাব আমলের বরকত অনেক ক্ষেত্রে গুনাহের কাজে প্রতিবন্ধক হয়। কেননা যিনি তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন এ সমস্ত নামাযের পাবন্দী করেন, তিনি সেই ব্যক্তির তুলনায় গুনাহের কাজ থেকে অধিক বিরত থাকবেন, যে শুধু পাঞ্জেগানা ফরয নামাযের পাবন্দ।

এ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মুস্তাহাবের পাবন্দ ব্যক্তি নেককার ও দ্বীনদার বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। যদ্দরুন পাপকর্ম করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন বিধায় তিনি গুনাহ'র কাজ থেকে বিরত থাকেন।

দ্বিতীয় বরকত এই যে, কখনো কোনো মুস্তাহাব আমল আল্লাহ্ পাকের এমন পসন্দনীয় হয়ে যায় যে, তা আমলকারীর নাজাতের ওসীলা হয়ে যায়। কাজেই ছাত্রজীবন থেকেই নফলের পাবন্দ হতে হবে। অনেকে মনে করেন, ইলমী শোগলের সঙ্গে নফলের পাবন্দী ঠিক নয়। এটা অনেক বড় ধোঁকা। এর দ্বারা শয়তান ইলমী হালকায় অধিকাংশ লোকদেরকে আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত রাখে। দুনিয়ার কোনো বস্তুর সঙ্গে দুর্বল সম্পর্ক থাকা আমাদের পসন্দ নয়, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্ক দুর্বল হলে আমাদের মনে দুঃখ অনুভব হয় না। যদিও আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক বজায় থাকাও একটি নিয়ামত বটে, কিন্তু দুর্বল সম্পর্কের উপর সন্তুষ্ট থাকা অতীব অন্যায়। আমরা এই দুর্বল সম্পর্কের উপর সন্তুষ্ট রয়েছি। এর কারণে আজকাল মুস্তাহাবের মর্যাদা ও গুরুত্ব আমাদের অন্তরে নেই।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেছেন, বাল্য বয়সে আমি অনেক নফল আমলে অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু 'মুনইয়াতুল মুসল্লী' নামক গ্রন্থখানা পাঠ করে যখন জানতে পারলাম, ঐগুলো মুস্তাহাব কাজ যা না করলেও কোনো পাপ হয় না, তখন থেকে নফল আমলসমূহ ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওই সময় তো উপলব্ধি করতে পারিনি যে, আমি কি করছি, কিন্তু এখন উপলব্ধি হচ্ছে যে, তা ছিল অত্যন্ত ভুল সিদ্ধান্ত। (মাজালিসে আবরার)

নফল নামাযের ফযীলত

* হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুসলমান বান্দার যে আমলটির হিসাব নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে ফরয নামায। অতএব, সে যদি ঠিকমতো তা আদায় করে থাকে, তাহলে তো ভালো কথা। অন্যথায় ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, দেখো তো! তার কোনো নফল নামায আছে কি না? যদি তার (আমলনামায়) নফল নামায থাকে, তাহলে তার এই নফল দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া হবে। –ইবনে মাজাহ

* নফল নামাযের আরেকটি বিরাট লাভ এই যে, এর দ্বারা আখিরাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে জান্নাতে উঁচু মর্তবা লাভ হবে। যেমন হযরত রবী'আ ইবনে কা'ব (রাযি.) থেকে মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন– আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। একদিন আমি রাতের বেলা তাঁর খেদমতে উযূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস (মিসওয়াক, জায়নামায ইত্যাদি)

পেশ করলাম। তিনি (খুশি হয়ে) আমাকে বললেন, তোমার কি কিছু চাওয়ার আছে? আমি আরয করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথী হয়ে থাকতে চাই। তিনি বললেন, এটাই না অন্য কিছু? আমি বললাম– আমার আকাঙ্ক্ষা কেবল এটাই। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে বেশি বেশি সিজদা করে (অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় করে) তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাকে সহায়তা করো। –সহীহ মুসলিম

১. তাহাজ্জুদ

* নফল নামাযসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ নামায হচ্ছে তাহাজ্জুদ। হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তাহাজ্জুদ নামায পড়ো। কেননা এটা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক্‌কার লোকদের রীতি, তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের বিরাট মাধ্যম ও গুনাহমাফির কারণ। আর এটা মানুষকে পাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। –জামে তিরমিযী

* হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রহমত হোক ওই পুরুষের উপর, যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ল এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগ্রত করল, ফলে সেও তাহাজ্জুদ আদায় করে নিল। স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো (এবং ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকেও তাহাজ্জুদে শরীক করলো)। মহান আল্লাহ্‌র রহমত হোক ওই স্ত্রীর উপর, যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়লো এবং নিজের স্বামীকেও জাগিয়ে দিলো, ফলে সেও তাহাজ্জুদ আদায় করে নিলো। স্বামী উঠতে না চাইলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিলো (এবং ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকেও তাহাজ্জুদে শরীক করলো)। –আবু দাউদ

তাহাজ্জুদ নামাযের সহজ পন্থা

ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) হাদীস উপস্থাপন করেন-

مَا صَلَّى بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ قَبْلَ النَّوْمِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ

অর্থ- ইশার নামাযের পর শোয়ার আগে নফল পড়লে তাহাজ্জুদের মধ্যে পরিগণিত হবে।

সুতরাং বিতরের নামাযের পূর্বে ২ রাকা'আত নফল আদায়কারী 'আসহাবুল লাইলের' অন্তর্ভূক্ত হবেন। এ হাদীসের আলোকে আল্লামা শামী (রহ.) উল্লেখ

করেন "যে ব্যক্তি বিতরের আগে ২ রাকা'আত নফল পড়লো, সে যেন তাহাজ্জুদের সুন্নাত আদায় করে নিলো। যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় বিতরের নামায শেষে আদায় করতেন। সুতরাং এটাই উত্তম, তবে উলামায়ে কিরামের মতে বিতরের নামাযের পরও নফল জায়েয আছে।

কেউ শেষ রাতে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে ইশার নামাযের পর এই নামায আদায় করে নিতে পারে। এভাবেও তাহাজ্জুদের ফযীলত লাভ করা যায়। তবে এতে শেষ রাতের তাহাজ্জুদের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে না।

২. আসরের পূর্বে ৪ রাকা'আত

উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পূর্বে ৪ রাকা'আত নফল নামাযের পাবন্দি করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। –তারগীব : ১/২২৬

উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে ৪ রাকা'আত নফল নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার দেহকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন।

–তারগীব : ১/২২৭

হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে ৪ রাকা'আত নফল নামায পড়বে, সে যমীনে চলবে এমন অবস্থায় যেন তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

–তারগীব : ১/২২৭ পৃ.

উল্লেখ্য সময় কম থাকলে বা অন্য কোনো অপারগতা থাকলে উক্ত নামায ২ রাকা'আত পড়া যায়।[১]

৩ ইশরাকের নামায

ফজরের নামাযের পর জায়নামাযে বসে আল্লাহ্ পাকের যিকির, তাসবীহ

---

১. নোট : আজকাল অনেকে আরবাঞ্চল বা হজ্ব থেকে এসে মাগরিবের পূর্বে দুই রাকাআত নামায পড়া শুরু করে দেয়। অথচ এটা হানাফী মাযহাব মতে মাকরূহ। তবে ইমাম শাফিয়ী রহ. এর মতে সুন্নাত।

-তাবঈনুল হাকায়েক

যেহেতু মক্কা-মদীনায় বিভিন্ন মাযহাবের লোকজনের সমাবেশ হয়ে থাকে, তাই আরবদেরকে দেখেই কোনো আমল শুরু করা যাবে না। বরং নিজ নিজ মাযহাবের উলামাগণের নিকট থেকে তাহকীক করে স্ব স্ব মাযহাব অনুযায়ী আমল করতে হবে।

অথবা তিলাওয়াতে মশগুল থেকে সূর্য একটু ওপরে উঠে গেলে ২ অথবা ৪ রাকা'আত নামায আদায় করবে, এটাই ইশরাকের নামায।

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জামা'আতের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র যিকিরে বসে থাকে এবং তারপর দুই রাকা'আত নামায আদায় করে নেয়, তার আমলনামায় একটি পূর্ণ হজ্ব ও একটি পূর্ণ উমরার সওয়াব লিখে দেওয়া হয়। –জামে তিরমিযী

হযরত আবু যর (রাযি.) ও আবুদ দারদা (রাযি.) থেকে হাদীসে কুদসী বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রথমাংশে আমার জন্য ৪ রাকা'আত নামায আদায় করে নাও, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কিছু সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিয়ে দিব। –জামে তিরমিযী

৪. চাশতের নামায

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকা'আত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে সোনার অট্টালিকা তৈরি করে দিবেন।

–জামে তিরমিযী

আবু দাউদ শরীফে হযরত বুরাইদা (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীসে চাশতের সময়ের দুই রাকা'আত নামাযকেই যথেষ্ট বলা হয়েছে।

৫. আওয়াবীনের নামায

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকা'আত নামায আদায় করবে এবং এর মাঝে কোনো খারাপ কথা বলবে না, তার এই নামাযকে বার বছরের ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে। – জামে তিরমিযী

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকা'আত নফল পড়বে তার পাপরাশি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও আল্লাহ পাক তা মাফ করে দিবেন। -জমউল ফাওয়ায়েদ ১/৩১১

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকা'আত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি মহল তৈরি করে দিবেন। –জামে তিরমিযী

আওয়াবীন পড়ার অতি সহজ নিয়ম

মাগরিবের তিন রাকা'আত ফরয, দুই রাকা'আত সুন্নাত ও দুই রাকা'আত নফল তো প্রায় সকল নামাযীই পড়ে থাকে। সেই সঙ্গে মাত্র ২ রাকা'আত পড়ে নিলে আওয়াবীনের ফযীলত হাসিল হয়ে যাবে। কারণ মাগরিবের ২ রাকা'আত সুন্নাতও আওয়াবীনের অন্তর্ভূক্ত। তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ডের ৯৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসে আছে- مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকা'আত পড়বে।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) মিরকাত শরহে মিশকাত কিতাবে লিখেছেন, মাগরিবের পরবর্তী ২ রাকা'আত সুন্নাতও আওয়াবীনের ৬ রাকা'আতের শামিল।

-মেরকাত ৩/১১৪ , আহসানুল ফাতওয়া

৬. সালাতুত তাসবীহ

আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা হযরত আব্বাস (রাযি.)-কে সালাতুত তাসবীহের নামায অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এই নামায আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা আপনার আগের, পরের, নতুন, পুরান, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, ছোট, বড়, প্রকাশ্য ও গোপন সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

ঐ হাদীসেই এই নামায আদায় করার নিয়ম বলা হয়েছে। চার রাকা'আত নামায এভাবে পড়তে হয় যে, সূরা ফাতিহা ও অন্য যে কোনো সূরা পাঠ করার পর রুকূতে যাওয়ার আগেই ১৫ বার

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

তাসবীহটি পাঠ করবে। রুকূতে গিয়ে রুকূর তাসবীহ আদায় করার পর উল্লিখিত তাসবীহ ১০ বার, রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার, প্রথম সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহ আদায় করার পর ১০ বার, প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর বসে ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে সিজদার তাসবীহের পর ১০ বার, দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠার পর বসা অবস্থায় ১০ বার উল্লিখিত তাসবীহ পাঠ করবে। এখানে এক রাকা'আত পূর্ণ হল এবং ৭৫ বার তসবীহ পাঠ করা হয়ে গেল। এইবার আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে

এবং আগের রাকা'আতের মতোই এই রাকা'আত শেষ করবে। এখানেও ৭৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রাকা'আত শেষে যখন তাশাহহুদ পড়ার জন্য বসবে তখন আগে ১০ বার এ-তাসবীহ পাঠ করে নিবে। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ রাকা'আত শেষ করে নিবে। এখানে প্রতি রাকা'আতে ৭৫ হিসেবে চার রাকা'আতে মোট ৩০০ বার এই তাসবীহ পাঠ করা হবে। এই নামায সম্ভব হলে দৈনিক একবার, তা না হলে সপ্তাহে একবার, এও সম্ভব না হলে মাসে একবার, এটাও না পারলে বছরে একবার, আর কেউ এতটুকুও করতে না পারলে অন্তত জীবনে একবার পড়ে নিবে।

৭. তাওবার নামায

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে বসে এবং সঙ্গে সঙ্গে উযূ করে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। –জামে তিরমিযী

তাই কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তাওবার নামায আদায় ও ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। বুর্যূগানে দ্বীন এমনিতেও দৈনিক দুই রাকা'আত তাওবার নামায আদায় করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কারণ প্রতিনিয়্যত আমাদের দ্বারা অনেক গুনাহই হয়ে থাকে। ছোট গুনাহও বার বার হতে থাকলে, এর প্রভাব ও ক্ষতি কবীরা গুনাহ'র মতো হয়ে যায়। তাই দৈনিক অন্তত একবার এই নামায পড়ে তাওবা করা ভালো।

৮. সালাতুল হাজাত

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দুনিয়া বা আখেরাতের কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে সুন্দরভাবে উযূ করে দুই রাকা'আত নামায আদায় করবে এবং নিবিষ্ট মনে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের হাজাত পূরণের জন্য বিশেষভাবে দু'আ করবে। এই নামাযকেই সালাতুল হাজাত বলা হয়। এ-প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো যদি আল্লাহ তা'আলার দরবারে অথবা কোনো আদম সন্তানের কাছে কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে যেন খুব সুন্দরভাবে উযূ করে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে নেয়। তারপর সে মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দুরূদ এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে :

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ
لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ
الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًى اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

(সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, বিশাল আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র। প্রশংসা সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক, তোমার কাছে তোমার রহমতের মাধ্যম, ক্ষমার ওসিলা, সমস্ত সৎকাজের সুযোগ এবং সমস্ত গুনাহ থেকে নিরাপত্তা বা নিস্কৃতি কামনা করছি, হে মেহেরবান খোদা, তুমি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা কর, আমার সকল চিন্তা দূর কর, আমার সকল ঋণ পরিশোধ কর এবং আমার দুনিয়া ও আখেরাতের এমন প্রয়োজন যাতে তোমার সন্তুষ্টি রয়েছে তা পূর্ণ কর।)

৯. তাহিয়্যাতুল উযূ

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো মুসলমান বান্দা উযূ করে এবং সুন্দরভাবে উযূ করার পর একাগ্রচিত্তে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। –মুসলিম শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকেও বর্ণিত আছে, মি'রাজ থেকে ফেরার পর ফজরের নামাযের সময় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল (রাযি.)-কে বললেন, হে বিলাল! বলো তো, ইসলাম গ্রহণের পর তুমি সবচেয়ে আশাপ্রদ কী আমলটি করেছ? কেননা আমি বেহেশতে আমার আগে আগে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি। বিলাল উত্তরে বললেন, আমি তেমন আশাপ্রদ কোনো আমল তো করিনি, তবে দিনে অথবা রাতের বেলায় আমি যখনই উযূ করেছি, তখনই এই উযূ দিয়ে আমার ভাগ্যে যতোটুকু ছিল কিছু নামায আদায় করে নিয়েছি। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটাই তোমার ওই মর্যাদার কারণ। –বুখারী, মুসলিম

১০. তাহিয়্যাতুল মসজিদ

মসজিদে প্রবেশ করার সময়টি যদি নিষিদ্ধ অথবা মাকরূহ ওয়াক্ত না হয়, তাহলে এই দুই রাকা'আত নামায আদায় করে নিবে। হাদীসে বর্ণিত এই

নামাযকেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ অথবা দুখূলুল মসজিদ নামায বলা হয়। মসজিদ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের স্থান এবং এ উদ্দেশ্যেই এটা তৈরি করা হয়ে থাকে, তাই সেখানে পৌঁছেই এ উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও নিজের দাসত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে, এটাই হচ্ছে এই নামাযের তাৎপর্য। তাই কেউ যদি মসজিদে এসেই সুন্নাত নামায শুরু করে দেয় এবং তার মধ্যে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাযেরও নিয়্যত করে নেয়, তাহলেও এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে এবং এই নামাযই 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ'-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

১১. সালাতুল কুসূফ

এই মহাবিশ্বে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের দুইটি নিদর্শন। এদের আবর্তন-বিবর্তন তাঁরই নির্ধারিত নিয়মের অধীন। আবর্তনকালে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন একই সরল রেখায় উপনীত হয় এবং চন্দ্র মধ্যখানে থাকে, তখন সূর্যগ্রহণ আর যখন পৃথিবী মধ্যখানে থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ পৃথিবীতে এক অস্বাভাবিক ও ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। গ্রহণকালে পশুপক্ষীদের মধ্যেও একটা ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। পশুচরিত বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণের সময় প্রাণীদের বিশেষ করে পাখিদের মধ্যে এক ধরনের ভীতির আচার-আচরণ চোখে পড়ে।'

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে, বিশেষ করে সূর্যগ্রহণের সময় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং যতক্ষণ না গ্রহণ ছাড়তো, সাহাবী (রাযি.) গণকে নিয়ে তিনি নামায ও দু'আয় মশগুল থাকতেন।

সাধারণতঃ সূর্যগ্রহণের নামাযকে 'কুসূফ' এবং চন্দ্রগ্রহণের নামাযকে 'খুসূফ' বলে। তবে কখনও একে অন্যের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হাদীসে এরূপই ব্যবহৃত হয়েছে।

১. সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাত।

২. সূর্যগ্রহণের নামায জামা'আতের সঙ্গে পড়তে হয়। এ নামাযে ইমামতের হকদার সমকালীন মুসলমান বাদশাহ্ বা তাঁর নিযুক্ত ব্যক্তি। এক বর্ণনা অনুসারে প্রত্যেক মসজিদের ইমাম লোকদের নিজ নিজ মসজিদে জমা করে সূর্যগ্রহণের নামায পড়াবেন (যদি ইমাম না পাওয়া যায়, তবে প্রত্যেকে একা একা পড়বে এবং মহিলাগণ নিজ গৃহে পৃথকভাবে পড়বে)।

৩. কুসূফের নামাযের জন্য আযান-ইকামত নেই। পাড়ার লোকগণকে জমা করার জন্য اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ ('নামাযে চলো' 'নামাযে চলো') বলে একজন লোক উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে।

৪. সালাতুল কুসূফের নিয়্যত এভাবে করবে– দুই রাকা'আত কুসূফের নামায পড়ছি।

৫. সালাতুল কুসূফের মধ্যে সূরা বাকারার ন্যায় অনেক লম্বা কিরা'আত পড়া এবং রুকূ, সিজদা অনেক দীর্ঘ করা সুন্নাত।

৬. কিরা'আত চুপে চুপে পড়বে।

৭. নামায শেষে ইমাম কেবলা রোখ হয়ে বসে বা লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের গ্রহণ সম্পূর্ণ না ছুটে, ততক্ষণ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে দু'আ (এবং নিজেদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকবেন। মুক্তাদীগণ 'আমীন' বলতে থাকবে। ফলকথা, গ্রহণ না ছুটা পর্যন্ত (দুনিয়ার কাজকর্ম বন্ধ রেখে) নামায, দু'আ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগী এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটিতে রত থাকা উচিত। অবশ্য যদি গ্রহণ ছুটার পূর্বে সূর্য অস্ত যেতে থাকে বা কোনো ফরয নামাযের ওয়াক্ত হয়, তবে দু'আ ছেড়ে নামায পড়ে নিবে।

–বেহেশতী জেওর

৮. সূর্য গ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

১২. সালাতুল খুসূফ

* চন্দ্রগ্রহণের সময়ও দুই রাকা'আত নামায পড়া সুন্নাত। তবে এই নামাযে জামা'আত সুন্নাত নয়, বরং প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে নামায পড়বে এবং নিজ ঘরে পড়বে, মসজিদে যাওয়া সুন্নাত নয়।
* চন্দ্রগ্রহণের নামাযের জন্যও গোসল করা মুস্তাহাব।
* দুই রাকা'আত সালাতুল খুসূফের নিয়্যত এভাবে করবে–আমি দুই রাকা'আত খুসূফের নামায পড়ছি।

১৩. সালাতুল ইস্তিখারা

ইস্তিখারা শব্দের অর্থ কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করা। নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রকাশ করে কোনো কাজের আগে যেন আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইস্তিখারা করে কাজ করে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয় না। ইস্তিখারার নিয়ম প্রসঙ্গে বুখারী শরীফে হযরত জাবির

(রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইস্তিখারা করার বিষয়টি এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআন পাকের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করে নেয় এবং এই দু'আ পাঠ করে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ

(এখানে هٰذَا الْاَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে।)

خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ. وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ—

(এখানে هٰذَا الْاَمْرَ বলার সময় নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে।)

شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ.

উচ্চারণ ঃ আলাহুম্মা ইন্নী আসতা'খীরুকা বি ইলমিকা ওয়া আসতাক্ দিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আযীম। ফা ইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা আক্দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ূব।

আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (এখানে এসে কাজের প্রতি খেয়াল করতে হবে) খাইরুললী ফী দ্বীনী ওয়া মাআশী ওয়া আক্বিবাতি আমরী। ফাক্দিরহু লী ওয়াইয়াসস্সিরহু লী ছুম্মা বারিক লী ফী হি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা (এখানে এসে কাজের প্রতি খেয়াল করতে হবে) শাররুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া 'আক্বিবাতি আমরী। ফাসরিফহু আন্নী ওয়াসরিফনী আনহু ওয়াক্দির লিয়াল খাইরা হাইছু কানা ছুম্মারযিনী বিহ।

(হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের সাহায্যে তোমারই কাছে কল্যাণ কামনা করছি, তোমার ক্ষমতায় তোমারই কাছে সক্ষমতা কামনা করছি এবং তোমার মহান কৃপায় তোমারই কাছে অনুগ্রহের আবেদন করছি, তুমি সক্ষম আমি অক্ষম, তুমি জ্ঞাত, আমি অজ্ঞাত তুমিতো অদৃশ্যের সবকিছু জান, হে আল্লাহ! এ বিষয়টাকে যদি আমার ধর্ম জীবন ও শেষ পরিণতির কল্যাণ জান তাহলে আমাকে

তা অর্জন করার সামর্থ্য দাও এবং এটাকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং এতে বরকত দান কর। পক্ষান্তরে তুমি যদি এ বিষয়টাকে আমার ধর্ম, জীবন ও শেষ পরিণতির অকল্যাণ জান তাহলে আমার কাছ থেকে তা সরিয়ে দাও এবং আমাকে তার থেকে সরিয়ে নাও এবং আমাকে কল্যাণের সক্ষমতা দান কর যেখানেই হোক, অতঃপর তাতে আমার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট থেকো

* ইস্তিখারার এই লম্বা দু'আ মুখস্ত না থাকলে সংক্ষিপ্ত এই দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা খির লী ওয়াখতার লী।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমার মঙ্গল করুন এবং আমার জন্য কল্যাণের ফায়সালা করুন।

এই পদ্ধতিতে ইস্তিখারা করার পর মন যে দিকে টানে সে অনুযায়ী কাজ করবে। এতেই কল্যাণ ও বরকত লাভ হবে। ইস্তিখারার পর স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় স্পষ্ট কোনো কিছু দেখা জরুরী নয়।

বি: দ্র: ইস্তিখারার উত্তম সুন্নাত হলো রাত্রে শুয়ার পূর্বে ২ রাকা'আত নফল নামায আদায় করে প্রথমোক্ত দু'আটি পড়ে কারো সঙ্গে কথা না বলে শুয়ে পড়বে। এমনি ভাবে ৩দিন-৭দিন করবে। যদি স্বপ্নে কিছু ইশারা ইঙ্গিত না পাওয়া যায় তাহলে মনের গতি যে দিকে যায় তার উপর আমল করবে। ইনশাআল্লাহ এতে বরকত পাবে।

১৪. ইস্তিস্কার নামায

* যখন অনাবৃষ্টিতে লোকের কষ্ট হতে থাকে, তখন দুই রাকা'আত নামায আদায়পূর্বক আল্লাহর নিকট পানির জন্য দরখাস্ত করা এবং দু'আ করা সুন্নাত। এই নাময কে 'ইস্তিস্কার নামায' বলে।

* ইস্তিস্কার মুস্তাহাব তরীকা হলো এই যে, দেশের সমস্ত মুসলমান পুরুষ, বালক, বৃদ্ধসহ সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে গরীবানা লেবাস-পোশাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মাথা নীচু করে ময়দানে হাযির হবে। ময়দানে গমনের পূর্বেই খাঁটি অন্তরে আল্লাহর নিকট তওবা-ইস্তিগফার করবে। কেননা পাপের দরুনই প্রায়শঃ বৃষ্টি বন্ধ হয় এবং অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কারও হক নষ্ট করে থাকলেও তা আদায় করে যাবে। ময়দানে সঙ্গে কোনো কাফেরকে নিবে না। জীব-জানোয়ার সঙ্গে নেয়া যায়, তাতে আল্লাহর রহমত আকর্ষিত হয়। ময়দানে আযান ইকামত

ব্যতীত দুই রাকা'আত নামায জামা'আতের সঙ্গে আদায় করবে। এই নামাযে কিরা'আত উচ্চস্বরে পাঠ করা হয়। নামাযের পর ঈদের খুতবার ন্যায় দুইটা খুতবা পাঠ করতে হয়। তবে এই খুতবা পড়তে হয় মাটিতে দাঁড়িয়ে এবং হাতে লাঠি বা তলোয়ার নিয়ে। খুতবার পর ইমাম কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত উঠিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে পানির জন্য দু'আ করবে। উপস্থিত সকলেও দু'আ করবে। পরপর তিন দিন এরূপ করা মুস্তাহাব। এই তিন দিন রোযা রাখাও মুস্তাহাব। যদি ময়দানে পৌঁছার পূর্বেই কিংবা তিন দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বৃষ্টি হয়ে যায় তবুও তিন দিন এরূপে পূর্ণ করা মুস্তাহাব। ময়দানে যাওয়ার পূর্বে সদকা–খয়রাত করাও মুস্তাহাব।

* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদর মোবারক উল্টিয়েছেন, দু'আর মধ্যে হাতের পিঠ আসমানের দিকে করেছেন এবং হাত এতটুকু উচুঁ করেছেন যে, বগল দৃষ্টি গোচরে এসেছে। হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে এগুলো করা জরুরী নয় তবে অবস্থা পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত ও শুভ লক্ষণ হিসাবে করা যেতে পারে।

* ইস্তিস্কার নামাযের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব।

(বেহেশ্‌তী গাওহার, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবা'আহ)

জানাযা

মৃত্যুকালীন সুন্নাতসমূহ

১. মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির চেহারা কিবলামুখী করে দেয়া এবং তার সামনে বসে সে শুনতে পায় এতটুকু আওয়াযে কালেমা শরীফ পড়তে থাকা। তবে তাকে কালেমা পড়ার হুকুম দেয়া যাবে না। বরং তাকে শুনিয়ে পড়তে থাকবে এবং তার পাশে বসে সূরা ইয়াসীন পড়া। উল্লেখ্য, শয্যাশায়ী ব্যক্তি কালেমা শরীফ একবার পড়ে নিলে তারপর যদি দুনিয়াবী কোনো কথা না বলে তাহলে দ্বিতীয়বার কালেমার তালকীন করা উচিত নয়। –মুস্তাদরাক, হাদীস নং ১৩০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১২১

২. নিজের মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে এই দু'আ পড়তে থাকা–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

(হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো এবং তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করো) –বুখারী ও মুসলিম

৩. যখন রূহ বের হচ্ছে বলে অনুভব হতে থাকে, তখন এই দু'আ পড়া–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

(হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে রক্ষা করো)

–তিরমিযী, হাদীস: ৯৭৮

৪. কোনো মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে এই দু'আ পড়া–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

(নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা কর এবং কল্যাণ দান করো।)

–মুসলিম- হাদীস: ৯১৮

৫. মৃতব্যক্তির উভয় চোখ ও মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেয়া। প্রয়োজন বোধে মাথার উপর ও থুতনির নিচ দিয়ে কাপড় বেঁধে দেয়া। চেহারা দেখা, আত্মীয়-স্বজনদের আসা, জানাযায় লোক কম হবে ইত্যাদি কারণে দাফনে বিলম্ব করা নিষেধ। –মুসলিম- হাদীস: ৯২০

৬. মৃতব্যক্তিকে খাটে রাখার সময় বা মৃতব্যক্তির লাশবাহী খাট কাঁধে উঠানোর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা। –মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস: ১২০৬২

৭. যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মৃতব্যক্তিকে গোসল, কাফন ও জানাযার নামায সম্পন্ন করে নিকটস্থ গোরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করা। দাফনের জন্য একান্ত শরীয়তসম্মত প্রয়োজন না হলে দূরের গোরস্থানে বা এক শহর থেকে অন্য শহরে লাশ স্থানান্তর করা মাকরূহ। –আবু দাউদ, ৩১৮১, ৩১৬৫

৮. মৃতব্যক্তির লাশ কবরে রাখার সময় এই দু'আ পড়া–

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

৯. আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে মৃতব্যক্তির পরিবার-পরিজনের জন্য প্রথম দিন খানার ব্যবস্থা করা উচিত। –বুখারী হাদীস : ৫৪১৭, আহমাদ-৯০৫

রেওয়ায হিসেবে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনোরূপ খানার আয়োজন না করা। তেমনি ৩দিন ৪দিন, ৭ কিংবা ১০ দিন, ত্রিশা, চল্লিশা, কুলখানী ইত্যাদি বিধর্মীদের রসম। এগুলো থেকে কঠোরভাবে পরহেয করবে।

১০. কবর খুব উঁচু না করা এবং পাকা না করা। -মুসলিম

১১. কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়া। –মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক

কাফনের কাপড়ের সুন্নাতসমূহ

<u>পুরুষের জন্য তিনটি কাপড় সুন্নাত :</u>

১. লেফাফা

২. ইযার

৩. কামিস

লেফাফা ও ইযার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং কামিস কাঁধ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত হওয়া সুন্নাত এবং কামিসের কোনো আস্তিন থাকবে না।

মহিলার জন্য পাঁচটি কাপড় সুন্নাত :

১. লেফাফা

২. ইযার

৩. কামিস

৪. সিনাবন্দ

৫. সারবন্দ

লেফাফা ও ইযার মাথা থেকে পা পর্যন্ত, কামিস কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত, সারবন্দ তিন হাত লম্বা এবং সিনাবন্দ বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হওয়া সুন্নাত।

কাফন পরানোর সুন্নাত তরীকা

পুরুষের কাফন

কাফনের কাপড়ে প্রথমতঃ ১, ৩, ৫ বার আগরবাতির ধোঁয়া দিবে, অতঃপর লেফাফার উপর ইযার ও কামিসের পিঠের অংশ বিছাবে এবং সামনের অংশ মাথার নিকট রাখবে। মৃতকে তার উপর শুইয়ে কামিস পরিধান করাবে। এরপর সুগন্ধি লাগাবে। কপাল, নাক, উভয় হাত, উভয় ঊরু এবং উভয় পায়ে কর্পূর লাগাবে। এরপর ইযার মাইয়্যেতের বাম দিক থেকে, অতঃপর ডানদিক থেকে গুছাবে। তেমনি চাদরকে প্রথমে বাম দিক থেকে, পরে ডানদিক থেকে উঠাবে। পরিশেষে কাফনের মাথা ও পায়ের কাছে এবং মাঝখানে সুতা দিয়ে বেঁধে দিবে।

মহিলার কাফন

মহিলা মাইয়্যেতের জন্য প্রথমে চাদর, অতঃপর যথাক্রমে ইযার ও কামিস বিছাবে। এরপর তার উপর লাশ রেখে কামিস পরিধান করাবে। মাথার চুল দুই ভাগে ভাগ করে দুই পাশে কামিসের উপর রেখে দিবে। এরপর মাথায় সারবন্দ পেঁচিয়ে দুই কিনারা দ্বারা দুই পাশের চুল আবৃত করে দিবে। অতঃপর তার উপর ইযার, লেফাফা, অতঃপর সিনাবন্দ বুকের উপর ও বগলের নিচ দিয়ে বের করে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত জড়াবে। প্রথমে বাম দিক ও পরে ডান দিক জড়াবে। এরপর সামনে পিছনে সুতা দিয়ে বেঁধে দিবে। কোমরের কাছেও সুতা দিয়ে বেঁধে দিবে।

–ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

ইসলাহ : কাফনে বা কবরে কোনো দু'আ, দুরূদ বা আহাদনামা কিংবা পীরের শাজরানামা রাখা জায়েয নয়। এমনিভাবে লাশের বুকের উপর কর্পূর বা অন্যকিছু দিয়ে কলেমা বা অন্য কিছু লেখাও জায়েয নয়। –আদ্দুররুল মুখতার

জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় হাযির হয় এবং জানাযার নামাযের শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকে তার এক কীরাত সওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি জানাযায় হাযির হয় এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে তার দুই কীরাত সওয়াব লাভ হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুই কীরাত কী? ইরশাদ করলেন, (দুই কীরাত) দুইটি বড় পাহাড়ের সমান। আরেক রেওয়ায়াতে আছে, তন্মধ্যে ছোট পাহাড়টি ওহুদ পাহাড়ের মতো।–সহীহ মুসলিম

হযরত আবু রাফে (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়, অতঃপর যদি তার কোনো দোষ-ত্রুটি পায়, তবে তা গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার ৪০টি বড় বড় গুনাহ মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি আপন ভাই (মাইয়্যেত)-এর জন্য কবর খনন করে এবং তাকে কবরে দাফন করে, সে যেন (কিয়ামতের দিন) পুনরায় যিন্দা হওয়া পর্যন্ত তাকে একটি ঘরে স্থান করে দিলো। অর্থাৎ তার এই পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়, যে পরিমাণ সে ব্যক্তিকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি ঘর দান করলে লাভ হতো। –তাবারানী

জানাযার নামাযের ফরয ৩টি

১. জানাযার নামাযে এভাবে নিয়্যত করা, আমি এই ইমামের পিছনে জানাযার নামায পড়ছি।
২. চারবার আল্লাহু আকবার বলা।
৩. দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া।

জানাযার নামাযের সুন্নাত ৩টি

১. প্রথম তাকবীরের পর নিম্ন বর্ণিত ছানা পড়া :

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

(হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, প্রশংসা করছি, আপনার নাম অত্যন্ত বরকতময়। এবং আপনি সুমহান মর্যাদার অধিকারী, আপনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

২. দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়া। দুরূদটি দুরূদে ইবরাহীমী হওয়া উত্তম।

৩. তৃতীয় তাকবীরের পর জানাযার দু'আ পড়া।

মাইয়্যেত বালেগ পুরুষ বা মহিলা হলে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

(হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবন-মরণ, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ-মহিলাদেরকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের থেকে যাকে জীবিত রাখ তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দাও তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দাও)

মাইয়্যেত নাবালেগ ছেলে হলে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

(হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য ওসীলাস্বরূপ বানাও! এবং এমন প্রতিদানস্বরূপ বানাও যাতে আমরা গর্ব করতে পারি। এবং এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবূল হয়।)

মাইয়্যেত নাবালেগ মেয়ে হলে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّ ذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

তৃতীয় তাকবীরের পর নিম্নোবর্ত্তি দু'আটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهٖ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِمَآءٍ وَّثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهٖ مِنَ الذُّنُوْبِ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَقِهٖ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

অর্থ : হে আল্লাহ তাকে ক্ষমা কর, তার প্রতি করুণা কর, তার প্রশান্তি দান কর, তার পাপসমূহ মার্জনা কর, তার সাদর আতিথ্য দান কর, তার প্রবেশ স্থল (কবর) প্রশস্ত কর, তাকে পানি, শিলা ও শিশির কণা দ্বারা ধৌত কর। অর্থাৎ

তাকে নির্মল ও নিষ্কলুষ কর, তাকে সকল গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র কর যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে এমন মহল দান কর যা তার পার্থিব মহল থেকে উৎকৃষ্ট। তাকে পার্থিব জীবন সঙ্গী/সঙ্গীনী থেকে উৎকৃষ্ট সঙ্গী/সঙ্গীনী দান কর। তাকে প্রবিষ্ট কর বেহেশতের কাননে ও মুক্তি দাও কবরের আযাব ও দোযখের শাস্তি থেকে। –মুসলিম শরীফ : ১/৩১১

জানাযা পড়ার সুন্নাত তরীকা

১. মাইয়্যেতকে সামনে রেখে ইমাম মাইয়্যেতের সীনা বরাবর দাঁড়াবে।

২. জানাযার নামাযে মুক্তাদীদের কাতার কমপক্ষে তিনটি হওয়া মুস্তাহাব। এমনকি মুসল্লী মাত্র সাতজন হলেও একজনকে ইমাম বানিয়ে বাকী ছয়জন এইরূপে দাঁড়াবে, প্রথম কাতারে তিনজন, দ্বিতীয় কাতারে দুইজন এবং তৃতীয় কাতারে একজন। –বেহেশতী জেওর

৩. জানাযার নামায সহীহ হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, জানাযার নামাযে মাইয়্যেতকে ইমামের সামনে অবশ্যই উপস্থিত রাখতে হবে। অনুপস্থিত মাইয়্যেতের জানাযা এবং প্রচলিত গায়েবানা জানাযা হানাফী মাযহাবে জায়েয নেই। –ফাতাওয়ায়ে শামী, আলবাহরুর রায়েক

৪. জানাযার নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করা মাকরূহে তাহরীমী ও বিদ'আত। –আহসানুল ফাতাওয়া, খোলাসাতুল ফাতাওয়া : ১

৫. কোনো কোনো স্থানে লাশ সামনে রেখে 'লোকটা কেমন ছিলো?' প্রশ্ন করা হয়। আর উপস্থিত লোকেরা বলে, 'ভালো ছিলো'। শরীয়তে এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই এবং এতে কোনো ফায়দাও নেই।

৬. যদি অলীর অনুমতি বা উপস্থিতিতে জানাযার জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়া মাকরূহ ও শরীয়ত বহির্ভূত। ওলীর অনুমতি ও অংশগ্রহণ ব্যতীত প্রথম জানাযা হয়ে থাকলে পুনরায় অলী জানাযা পড়তে পারবে। তবে প্রথমবার জানাযায় যারা শরীক হয়েছিলো দ্বিতীয়বার তারা শরীক হতে পারবে না। –কাফন দাফনের মাসআলা মাসায়েল

কবর খনন করার সুন্নাত তরীকা

কবর দুই প্রকার :

১. সিন্দুকী কবর।

২. বুগলী কবর।

আমাদের দেশের অধিকাংশ এলাকার মাটি সাধারণতঃ নরম হওয়ায় বুগলী কবর দেয়া সম্ভব হয় না। এজন্য সিন্দুকী কবর খনন করা হয়।

সিন্দুকী কবর খনন করার তরীকা

কবরকে মাইয়্যেতের দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে সামান্য পরিমাণ লম্বা করবে। এর চেয়ে বেশি লম্বা করা উচিত নয়। মাইয়্যেতের দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক পরিমাণ চওড়া করবে। গভীরতায় দেড়হাত পরিমাণ খনন করার পর কবরের মধ্যে মাইয়্যেতের জন্য আর একটি ছোট গর্ত খনন করবে। এ গর্তটি দৈর্ঘ্যে মাইয়্যেতের দেহের সমপরিমাণ এবং প্রস্থে সোয়া হাত এবং গভীরতায় এক/দেড়হাত পরিমাণ হবে। এ স্থানে বাঁশ, কাঠ বা স্লিপার দিয়ে তার উপর মাটি দেয়া হবে। এতে লাশের হিফাযত বেশি হবে। এভাবেই সিন্দুকী কবর খনন করা সুন্নাত। তবে বুগলী কবর সিন্দুকী কবর থেকে উত্তম। -ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/১৩৯, আল বাহরুররায়েক ২/১৯৩ বাদায়েউস সানায়ে ১/৬০, আলমগীরী ১/১৬৬

বুগলী কবর খনন করার তরীকা

প্রথমে দিক সোজা করে উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৪ হাত, প্রস্থে পৌনে দুই বা দুই হাত এবং আড়াই হাত গভীর করে একটি গর্ত খুঁড়বে। তারপর পশ্চিম দিকে দেয়ালের নিচে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা করে গর্ত করবে এবং সেখানে মাইয়্যেতকে রাখবে।

দাফনের সুন্নাত তরীকা

১. কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে মাইয়্যেতের খাটকে উত্তর শিয়র করে কবরের পশ্চিম পার্শ্বে রাখবে। অতঃপর তিন বা চারজন ব্যক্তি কবরে নেমে কিবলামুখী হয়ে খাট থেকে মৃতব্যক্তিকে হাতে করে মাইয়্যেতের বুক এবং চেহারা কেবলামুখী করে ডান কাতে কবরে শোয়াবে। সাবধান! মাইয়্যেতকে কবরে চিৎ করে শুইয়ে শুধু চেহারা কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেয়া দুরস্ত নয়; বরং মাইয়্যেতের সীনা এবং চেহারা উভয়টিই কিবলামুখী করে রাখতে হবে।

মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সহীহ্ তরীকা

লাশকে কিবলামুখী করে ডান কাতে শোয়ানো সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এ-জন্যই ভিতরের ছোট গর্তটিতে ডান কাতে কিবলামুখী করে মাইয়্যেতকে শোয়াবে। লাশের পিঠকে গর্তের পূর্ব পাশের মাটির দেয়ালে টেক লাগিয়ে ডান কাতে

কিবলামুখী করে শোয়াবে। অতঃপর কবরের উপরিভাগে বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ করে সম্পূর্ণ কবর মাটি দ্বারা ভরে দিবে। সিন্দুকী কবরে এভাবেই মাইয়্যেতকে রাখা সুন্নাত। -দুররুল মুখতার, শামী ৩/১৪১ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/১৬৬, মুহীতে বুরহানী ২/৩২২, ওয়ালওয়ালেজিয়া ১/১৬৭

২. মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় বলবে–

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

(আমি আল্লাহর নামে রাখলাম এবং রাসূলের উম্মত হিসেবে সমর্পণ করলাম)

৩. মাইয়্যেতকে কবরে ডান কাতে সুন্নাত মোতাবেক শোয়াতে কোনো অসুবিধা হলে বাইরে থেকে শক্ত মাটি কিংবা কাঁচা ইট এনে মাথা ও পিঠের নিচে দিবে।

৪. মাইয়্যেতকে কবরে রাখার পর কাফনের বাঁধনগুলো খুলে দিবে।

৫. দাফনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই উভয় হাতে তিন তিন মুষ্টি মাটি নিয়ে মাথার দিক থেকে দেয়া মুস্তাহাব।

প্রথম মুষ্টি দেয়ার সময় বলবে– مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ

(আল্লাহ পাক বলেছেন) তোমাদেরকে এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি।

দ্বিতীয় মুষ্টি দেয়ার সময় বলবে– وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ

(আল্লাহ পাক বলছেন) এ মাটির ভিতরেই পুনরায় আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনবো।

তৃতীয় মুষ্টি দেয়ার সময় বলবে–وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

(আল্লাহ পাক বলেছেন) এ মাটির ভিতর থেকে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো।

৬. মাইয়্যেতের আপনজনদের জন্য দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের কাছে অপেক্ষা করা। মৃতব্যক্তির জন্য মাগফেরাতের দু'আ করা এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে সওয়াব রেসানী করা মুস্তাহাব।

৭. মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম তিন আয়াত– الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

দাফন-কাফনে দেরি করা

মৃত্যুর পর বিভিন্ন উযূহাতে আমাদের দেশে দাফনে যে দেরী করা হয় তা শরীয়তসম্মত নয়। কারণ শরীয়তে মুর্দাকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং বেশি দেরী করার অবকাশ নেই। কাজেই মাইয়্যেতের ছেলেমেয়েদের উপস্থিতির জন্য কাফন-দাফনে দেরী করা ঠিক নয়; বরং তারা যদি জানাযায় শরীক হতে না পারে তবে পরে কবর যিয়ারাত করবে, সওয়াব রেসানী করবে, দু'আ করবে। কিন্তু তাদের জন্য দাফন-কাফনে বিলম্ব করা যাবে না। অনেকে ছেলে-মেয়ে বিদেশে থাকার কারণে লাশ হিমাগারে রেখে দেয়। বিদেশে মারা গেলে দেশে নিয়ে আসে। এতে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে যায় যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। শরীয়তের ফয়সালা হলো, যে ব্যক্তি যে এলাকায় মারা যাবে, তাকে সেই এলাকার গোরস্থানে দাফন করে দেয়া। দূরবর্তী কোনো স্থানে লাশ স্থানান্তর না করা।

জানাযা নামাযের আগে মৃত ব্যক্তি 'ভালো ছিল' এ-কথার স্বীকৃতি নেয়া

কোনো কোনো এলাকায় মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের আগে তার অভিভাবক বা ইমাম সাহেব উপস্থিত মুসল্লিদের জিজ্ঞাস করেনঃ 'এ লোকটি কেমন ছিল'? তখন ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই উত্তরে বলে থাকে, 'ভালো ছিল'। এভাবে তিন বার জিজ্ঞাস করা হয় এবং তিন বার জবাব নেয়া হয়। এটি করা হয় রেওয়ায হিসাবে। এ রেওয়ায ও প্রচলনটি ভুল। শরীয়তের কোনো দলীলে এ-ধরনের কোনো আমলের অস্তিত্ব নেই। সাধারণতঃ মনে করা হয়, এভাবে সম্মিলিতভাবে তার ব্যাপারে ভালো ছিল বললে মৃত ব্যক্তি ভালো হিসাবে স্বীকৃতি পাবে, আর আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দিবেন। কিন্তু বুঝার বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বাস্তবে ভালো না হয়, তাহলে এরূপ বলার দ্বারা সে ভালো সাব্যস্ত হবে না এবং মানুষের মনেও এমন বিশ্বাস জন্মাবে না যে, সত্যিই লোকটি ভালো ছিল। আর যদি বাস্তবে সে ভালো থেকে থাকে তাহলে এ রেওয়াজী স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। তাই এ ভুল প্রচলনটি পরিহার করা জরুরী।

জানাযার পর মাইয়্যেতের চেহারা দেখানো

জানাযার পর মাইয়্যেতের চেহারা দেখানোর উদ্দেশ্যে দাফনে বিলম্ব করা উচিত নয়। একান্ত প্রয়োজনে জানাযার পূর্বেই এ কাজ সেরে নিতে হবে। চেহারা দেখার ব্যাপারে আরো লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, মুর্দাকে জীবিত অবস্থায় যাদের জন্য

দেখা জায়েয ছিলো, মৃত্যুর পর শুধুমাত্র তারাই দেখতে পারবে। অন্যদের জন্য দেখা জায়েয নয়। সুতরাং পুরুষ লাশ বেগানা মহিলাদের জন্য দেখা নিষেধ। তেমনি মহিলার লাশ বেগানা পুরুষদের দেখা নিষেধ। তবে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর পর একে অপরের চেহারা দেখতে পারবে। –ফাতাওয়ায়ে শামী ৩/৯০, কিফায়াতুল মুফতী ৪/৩১

জানাযায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে দ্বীনী বিষয় ছাড়া অন্য কিছু আলোচনা করা

ইদানিং কোন কোন স্থানে জানাযায় সমবেত মুসল্লীগণের সামনে মাইয়্যেতের স্মৃতিচারণের নামে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করে দেয়। মৃত ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচয় তুলে রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি ফলাও করে প্রচার করা হয় এবং তাদেরকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করা হয়। জানাযা-কবর যিয়ারত এগুলো একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এ মুহূর্তে মাইয়্যেতের লাশ সামনে নিয়ে প্রত্যেকেরই আখেরাতের ফিকির করা উচিত। ঐ লাশের স্থানে নিজের লাশ হওয়াকে স্মরণ করে মৃত্যু চিন্তার মোরাকাবা করাও যথেষ্ট। যদি সময় থাকে তাহলে এমনকিছু আমল করা যা নিজের ও মাইয়্যেতের উপকারে আসে। অথবা কোন দ্বীনী বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যদি মাইয়্যেতের পক্ষ থেকে তার প্রকৃত ওলী কিছু বলতে চায় তা সে বলতে পারে।

জানাযার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিলম্ব করা

জানাযায় লোকসংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দাফনে বিলম্ব করা শরীয়তসম্মত নয়। মৃত্যুর এলানের পর কারো জানাযায় যদি বেশি লোক উপস্থিত হয় তাহলে এটা সৌভাগ্যের বিষয় এবং ফযীলতের জিনিস। কিন্তু তাই বলে বেশি লোক হাযির করার জন্য জানাযার নামাযে দেরী করার অনুমতি নেই, এমনটি করা গুনাহ'র কাজ।

দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন

এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা বিদ'আত ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। এটা বিধর্মীদের তরীকা। সুতরাং মুসলমানদের এ রীতি অবশ্যই বর্জন করা উচিত।

পারিবারিক গোরস্থান

পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করার চেয়ে সাধারণ গোরস্থানে দাফন করার ফযীলত বেশি। পারিবারিক গোরস্থান কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়, হেফাযতে থাকে

না। কিন্তু সাধারণ গোরস্থান সে রকম নয়। তাই প্রতিটি এলাকায় আম গোরস্থান থাকা উচিত। যা সকল মৃত মুসলমান নারী পুরুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

দাফনের পূর্বে সশস্ত্র সালাম ও বিউগল বাজানো

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুর পর তাদের লাশকে যে সামরিক কায়দায় সশস্ত্র সালামের মাধমে সম্মান জানানো হয় ও বিউগল বাজানো হয় তা বিজাতীয়দের রীতি, বিদ'আত। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই দলভুক্ত গণ্য হবে। কাজেই এ ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উচিত, মৃত্যুর পর তার লাশ নিয়ে যেন উত্তরসূরীগণ এ ধরনের অনৈসলামিক কার্যকলাপ না করে সে জন্য সুস্পষ্টভাবে অসিয়্যত করে যাওয়া।

ঈসালে সওয়াবের তরীকা

মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য সওয়াব রেসানী করা তাদের হক এবং এটা জীবিতদের কর্তব্য। জীবিতগণ মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের ব্যাপারে যতোটুকু করবে, মৃত্যুর পর তারা জীবিত আত্মীয়-স্বজন থেকে তদ্রূপ আচরণই পাবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, 'মানুষকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন তার অবস্থা ডুবন্ত মানুষের ন্যায় হয়ে যায়। নদীতে বা সাগরে যদি জাহাজ তলিয়ে যায়, তখন মানুষ যেমন দিশেহারা হয়ে চতুর্দিকে এই আশায় হাত মারতে থাকে যে, কোনো কিছু পাওয়া যায় কি-না, যা আঁকড়ে ধরে জীবন বাঁচানো যায়। মাইয়্যেতেরও সেই অবস্থা হয় এবং সে জীবিতদের সওয়াবরেসানীর অপেক্ষা করতে থাকে। তখন তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যদি কিছু সওয়াবরেসানী করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সেটাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে তাদের খেদমতে জীবিতদের পক্ষ থেকে হাদিয়া হিসেবে পৌঁছে দেন।' –বাইহাকী, শুআবল ঈমান-হাদীস : ৭৫২৭

তবে সওয়াবরেসানীর পদ্ধতি শরীয়তসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুবা অনেক ক্ষেত্রে সওয়াবরেসানী বাতিল বলে গণ্য হয় এবং মাইয়্যেতের কোনো ফায়দা হয় না।

* মাইয়্যেতের আপন লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্ণ কুরআন শরীফ বা-এর অংশবিশেষ তিলাওয়াত করে দু'আ করবে।

* আত্মীয়-স্বজন কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে ও সত্তর হাজার বার কালেমায়ে তায়্যিবা পড়ে সওয়াবরেসানী করবে।

* নিজেদের পয়সা থেকে সওয়াব পৌছানোর নিয়্যতে কিছু দান-খয়রাত করবে। অনুরূপ মৃত ব্যক্তির তরফ থেকে নফল নামায, দান-খয়রাত করে সওয়াব পৌছাতে থাকবে।

* সুবিধামতো যে কোনো দিন গরীব-মিসকীনকে খানা খাওয়াবে এবং সারা বছর বরং সারা জীবন, যখন যেভাবে যতোটুকু সম্ভব সওয়াবরেসানী করবে।

* তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন শরীফ পড়ার সওয়াব হয়। তাই তিনবার সূরায়ে ইখলাস পড়ে সওয়াবরেসানী করবে।

* পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর তাদের জন্য দু'আ করবে। এগুলোই সওয়াবরেসানীর সহীহ তরীকা।

কবর যিয়ারত

হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের নির্দেশ ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে সন্তানের জন্য প্রতি শুক্রবার পিতা-মাতার কবর যিয়ারতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত নুমান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার তার পিতা-মাতা অথবা তাদের যে কোনো একজনের কবর যিয়ারত করবে, তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তখন থেকে আল্লাহর নিকট তার নাম পিতা-মাতার অনুগত সন্তানের তালিকায় উঠানো হবে।

সুতরাং সম্ভব হলে এটা করা উচিত। প্রতি শুক্রবার সম্ভব না হলে যখনই সুযোগ হয় তখনই পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের কবর যিয়ারত করবে। এতে আখেরাতের কথা স্মরণ হয় এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। কবরে মাইয়্যেতকে দাফন করার পরও কবর যিয়ারত করা যায় এবং একাকী ও সম্মিলিতভাবে দু'আ করা যায়। যিয়ারতের সময় সম্ভব হলে কবরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাইয়্যেতের চেহারামুখী হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে কবরবাসীদের এই বলে সালাম করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ, يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ, اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

(হে কবরবাসী! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ তোমাদেরকে ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তোমরা আমাদের থেকে অগ্রগামী এবং আমরা কিছু পরেই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবো ইনশাআল্লাহ।)

এরপর সম্ভব হলে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে বা কমপক্ষে সূরা ফাতেহা একবার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং দুরূদ শরীফ ১১ বার পড়ে মাইয়্যেতের জন্য সওয়াব রেসানী করবে। যদি ওই অবস্থায় পূর্বমুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলবে না। আর যদি কিবলামুখী হয়ে দু'আ করে, তাহলে হাত তুলতে পারে।

সওয়াবরেসানীর ভুল পদ্ধতি

* সওয়াবরেসানীর নামে বর্তমানে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার যে প্রথা চালু হয়েছে শরীয়তে-এর কোনো ভিত্তি নেই।

* জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী এসব ইয়াহুদী, খৃস্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। মূর্খতার দরুন এসব বিদ'আত ও বদ-রসম মুসলমান জনসাধারণ ভালো কাজ মনে করে চালু করে নিয়েছে, অথচ এগুলো মারাত্মক গুনাহ।

* সওয়াব রেসানীর জন্য অনেকে চেহলাম, চল্লিশা বা মৃত্যুর তিন দিন, সাত দিন, নয় দিন পর অনুষ্ঠান করে, কুলখানী করে, মিলাদ পড়ায়, খানা খাওয়ায়, এটা ভুল ও হিন্দুয়ানী তরীকা।

* অনেকে তিলাওয়াতকারীদেরকে টাকা-পয়সা দিয়ে, উত্তম খানা খাইয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিয়ে সওয়াব রেসানী করে। মনে রাখা দরকার, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা বা খানা খাওয়া এবং তিলাওয়াত করিয়ে টাকা-পয়সা প্রদান করা বা খানা খাওয়ানো, সবই হারাম ও নাজায়েয। এতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই গুনাহগার হবে এবং গ্রহীতা হারাম অর্থ-খাদ্য গ্রহণকারী সাব্যস্ত হবে। আর মাইয়্যেতের আমলনামায় কিছুই পৌঁছবে না। এর জন্য উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে, যারা সওয়াব রেসানীর বিনিময় গ্রহণ করেন না এমন আলেম-উলামার সঙ্গে মুহাব্বতের সম্পর্ক কায়েম করবেন এবং সর্বদা তাঁদের কাছে যাতায়াত করবেন। মাদরাসা মসজিদের খেদমত করবেন তাহলে নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর সেই আলেমদের দু'আ এবং তিলাওয়াতের সওয়াব অবশ্যই পৌঁছবে, ইনশাআল্লাহ।

* অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মাইয়্যেতের ইজমালী সম্পত্তি থেকে সওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে মিসকীনদের খানা খাওয়ানো হয়। এক্ষেত্রে সকল ওয়ারিস যদি বালেগ হয় এবং সকলের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কোনো একজন ওয়ারিসও যদি নাবালেগ বা পাগল থাকে, তাহলে ইজমালী সম্পত্তি থেকে এরূপ খরচ করা নাজায়েয হবে এবং জেনে বুঝে এই খানা খাওয়াও নাজায়েয হবে।-এর দ্বারা এতীমের মাল খাওয়ার গুনাহ হবে।

যদি ওই নাবালেগ অনুমতি দেয়, তবুও জায়েয হবে না। কারণ নাবালেগের অনুমতি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

মাসআলাঃ কেউ যদি দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়ায়, যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ ইত্যাদি, তাহলে সেক্ষেত্রে বিনিময় দেয়া-নেয়া উভয়টাই জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই।

কবর স্থানান্তর

শরীয়তসম্মত কারণ যেমন- নদী ভাঙ্গনের কারণে লাশ বের হয়ে পড়লে কিংবা অন্যের জমিতে জোর পূর্বক দাফন করা হলে ইত্যাদি ছাড়া লাশ বা কবর স্থানান্তরিত করা জায়েয নেই। -আদ্দুররুল মুখতার

বর্তমানে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করার জন্য লাশ স্থানান্তর করার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। দাফনের বিশ–ত্রিশ বছর পর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কবর স্থানান্তর করা হয়, কিন্তু এটা শরীয়তসম্মত কি না সে বিষয়টি মোটেও খেয়াল করা হয় না।

মাইকে শবীনা পড়ানো

মাইকে শবীনা বা খতম পড়ানো সওয়াবরেসানীর একটি বদ-রসম। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর মধ্যে অনেকগুলো হারাম কাজ পাওয়া যায়।

* সারারাত মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে মহাসমস্যায় ফেলা হয়। আশপাশের লোকজন অস্থির হয়ে যায়। অথচ শরীয়তে অন্যায় ভাবে কাউকে সমস্যায় ফেলার অনুমতি নেই।

* যারা নিয়মিত যিকির-আযকার ও তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে মনোযোগ বিঘ্নিত হয়।

* পেশাব-পায়খানা ও স্ত্রীগমনের মতো নিষিদ্ধ সময়গুলোতেও পবিত্র কুরআন শুনতে বাধ্য করা হয়।

* কোনো জায়গায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত হতে থাকলে পাশের লোকদের তা মনোযোগ দিয়ে শোনা ওয়াজিব। অথচ মাইকে পঠিত শবীনার তিলাওয়াত আশপাশের লোকদের মনোযোগ দিয়ে শোনা সম্ভব হয় না। এতে ওয়াজিব তরক হয়।

* অনেক দানবীর বিত্তবান ব্যক্তি মারা গেলে আশপাশের মাদ্‌রাসা-হেফযখানা থেকে ছাত্র এনে বাড়ি-ঘরে কুরআন খতম পড়ানো হয়। কোনো কোনো জায়গায় লাশকে ঘিরে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় পুরুষ ও মহিলারা আলেম-

উলামা তালেবে ইলমদের সামনেই চলাফেরা করে লাশ দেখে। সবচেয়ে পবিত্র জায়গা মসজিদ-মাদরাসা। ওই নেক পরিবেশে দু'আ কবূল হওয়ার বেশি আশা করা হয়। তা না করে ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলাকে নারায করে নিজেদের পরিবেশে আলেম-হাফেযকে উপস্থিত হতে বাধ্য করে নিজেরা তুষ্টিতে ভোগে। এভাবে গোনাহের পরিবেশে কুরআন তিলাওয়াত করত তাদের ঈমান-আমলের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না।

এভাবে অনেকগুলো হারামের সমষ্টি হচ্ছে প্রচলিত শবীনা। আবার যদি-এর ব্যবস্থাপনা অর্থের বিনিময়ে হয়, তাহলে তো গুনাহের মাত্রা কয়েকগুণ বেশি হয়ে যায়। এসব হারাম ও গুনাহের সমষ্টিকে সওয়াব মনে করা আরেকটি অন্যায়, যা ঈমানের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। আর এতসব হারামকে সওয়াব মনে করে বাপ-মায়ের রূহে বখশে দেয়া যে কত বড় অপরাধ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এসব রসম বন্ধ করা একান্ত জরুরী।

মীলাদ পড়ানো

সওয়াব রেসানীর আরেকটি গলদ প্রথা হলো মীলাদ পড়ানো। যার মধ্যে সূরা-কিরা'আত তেমন কিছু পড়া হয় না, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের কোনো আলোচনাও হয় না; বরং (ক) কিছু আরবী-ফার্সী বাংলা কবিতা গাওয়া হয়। (খ) তাওয়াল্লুদ-এর নামে এক উদ্ভট জিনিস পড়া হয়, যার প্রমাণ শরীয়তে নেই। (গ) এরপর দুরূদের নামে 'ইয়া নবী সালামালাইকা' ইত্যাদি পড়া হয়, অথচ এটা কোনো দুরূদ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য অনেক দুরূদ রেখে গেছেন, যা সহীহ হাদীসে বিদ্যমান আছে। তার মধ্যে এ-ধরনের কোনো দুরূদ নেই। যেভাবে পড়া হয় এবং যা পড়া হয়, এর শব্দগুলোও সহীহ নয়। আর এগুলো আরবী ব্যাকরণেরও পরিপন্থী এবং এর অর্থও সহীহ নয়। এগুলোর ব্যাখ্যা কোনো মুহাক্কিক আলেম থেকে জেনে নেয়া উচিত। ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উল্লিখিত তিনটি গলদের সমষ্টির নাম হচ্ছে মীলাদ বা মৌলুদ শরীফ। এতে সওয়াব হওয়ার মতো কিছুই নেই। এরপরও সেটাকে মহা-সওয়াবের কাজ মনে করে মৃত আত্মীয়-স্বজনের রূহের উদ্দেশ্যে বখশে দেয়া হচ্ছে। উম্মত দ্বীনী ইলম থেকে চরম ভাবে বঞ্চিত হওয়ার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। -ইসলামী জিন্দেগী

অসিয়্যত লেখার ফযীলত ও গুরুত্ব

অসিয়্যত হচ্ছে ইন্তিকালের পূর্বে বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে নিজ ওয়ারিসদেরকে নসীহত করা। এ অসিয়্যত বা ইন্তিকালপূর্ব নসীহত শুধু বড় মানুষদের কাজ নয়;

বরং সকল সাধারণ মুসলমানের জন্যই এটি একটি জরুরী বিষয়। কারণ জীবনের বাঁকে বাঁকে মানুষ মাত্রই বিভিন্ন লেন-দেন, কাজ-কারবার, আচার-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কিন্তু সবকিছু ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করে সমাপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই ইন্তিকাল হয়ে যেতে পারে। কাজেই মৃত্যুর পরও অসমাপ্ত দায়গুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অসিয়্যতনামা লিখে রাখা জরুরী।

ইসলাম অসিয়্যতনামা লিখে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর মধ্যে এর যথার্থ ও পরিপূর্ণ আমল ছিলো। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অসিয়্যতনামা লিখে নিজের কাছে যেমন রাখতেন তেমনি নিজের আপনজনের কাছেও তার কপি দিয়ে রাখতেন। কিন্তু আমরা বর্তমানে বিষয়টি মনে হয় একেবারেই ভুলে গেছি। অতি জরুরী এ বিষয়টির বাস্তবায়ন আমাদের অধিকাংশের মধ্যেই নেই। অথচ বিষয়টির প্রতি হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস নিম্নরূপ-

'কোনো মুসলমানের এ অধিকার নেই, কোনো অসিয়্যত লেখা আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও সে দুটি রাত এমনভাবে কাটাবে যখন তার অসিয়্যতনামা তার কাছে লিপিবদ্ধ নেই।'

এখানে অসিয়্যত লেখা ছাড়া দু'টি রাত কাটাতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর 'দু'টি রাত' বলতে অতিঅল্প সময় বুঝানো উদ্দেশ্য।

এ-ব্যাপারে অপর একটি হাদীসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি অসিয়্যত করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো, সে সঠিক পথে এবং সুন্নাত তরীকার উপর দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো। আর সে তাকওয়া ও শাহাদাতের উপর ইন্তিকাল করলো এবং সে মাগফিরাতপ্রাপ্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলো।' –মিশকাতুল মাসাবীহ

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত হাদীস শরীফে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসিয়্যতের ব্যাপারে কত তাকীদ ও গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অবশ্যই অসিয়্যতনামা লিখে রাখা উচিত। বিশেষ করে যদি কারো যিম্মায় নামায ক্বাযা থাকে, ফরয/ওয়াজিব হজ্ব থাকে, ফরয/ওয়াজিব কোনো সদকা থাকে অথবা তার হাতে যদি কোনো বান্দার হক থেকে থাকে যা আদায় করা হয়নি অথবা কোনো আমানত গচ্ছিত থাকে, এ-জাতীয় আরো কিছু যদি দায়িত্বে থাকে, তবে তার অসিয়্যত লেখা খুবই জরুরী। এ অবস্থায় অসিয়্যতনামা না লেখাটাও একটা স্বতন্ত্র গুনাহ। যতক্ষণ পর্যন্ত অসিয়্যতনামা না লিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ গুনাহ হতেই থাকবে। এ-জন্য আজ থেকেই আমাদের নিজ নিজ অসিয়্যতনামা লিখে রাখা উচিত।

প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আমাদের পরামর্শ, অসিয়্যত লিখে ঘরে রাখুন এবং নিজের স্ত্রী/স্বামী, ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে কপি দিয়ে রাখুন।

যদি কারো কোনো হক তার যিম্মায় নাও থাকে সেক্ষেত্রেও অসিয়্যত লেখা মাগফেরাত লাভের কারণ এবং বড় সওয়াব ও পুরস্কার লাভের ওসীলা হবে।

ওই সকল দুর্ভাগা সন্তান, যারা পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের হকসমূহ এবং তাদের হুকুম নির্দেশের কোনো পরওয়াই করতো না, তারাও পিতা-মাতার ইন্তিকালের পর তাঁদের অসিয়্যতকে পালন করা নিজেদের জন্য জরুরী মনে করে। এজন্য প্রত্যেক মুসলমানেরই অসিয়্যত লিখে রাখা অবশ্য কর্তব্য, তার ওয়ারিসগণ (সন্তান-সন্ততি) যাতে-এর উপর আমল করতে পারে এবং অন্যদেরও আমল করাতে পারে।

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর অসিয়্যতের গুরুত্ব

জীবদ্দশায় জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে অসিয়্যত করে যাওয়ার ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের মাধ্যমে যে তাকীদ ও গুরুত্বের কথা আমরা বুঝতে পারলাম, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)ও এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমল করেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) তো আল্লাহ পাকের প্রতিটি হুকুম, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি সুন্নাত এবং আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে প্রাণ উৎসর্গকারী ছিলেন। মউত সর্বদাই তাঁদের চোখের সামনে থাকতো। তাঁরা সদা-সর্বদা এ-বিষয়ে চিন্তা করতেন, এমন যেন না হয়, আমার মউত এসে যাবে অথচ কোনো হক আমার উপর থেকে যাবে এবং তা আদায় না করা বা তার ব্যাপারে অসিয়্যত না করার কারণে আল্লাহর কাছে আমি ধৃত হবো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) অসিয়্যত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন,

فَمَا بِتُّ مِنْ لَّيْلَةٍ إِلَّا وَصِيَّتِيْ عِنْدِيْ مَوْضُوْعَةٌ

অর্থ- আমি কোনো একটি রাতও এভাবে কাটাইনি, যখন আমার কাছে আমার অসিয়্যতনামা লিখা থাকতো না।

ইসলাহ : অসিয়্যতের বিষয়, লিখার পদ্ধতি, যার যার বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করে অভিজ্ঞ মুফতী উলামায়ে কিরামের নিকট থেকে জেনে নিয়ে আজ থেকেই অসিয়্যত লিখা শুরু করুন।

যাকাতের গুরুত্ব ও আহকাম

নামায যেমন ইসলামের একটি রুকন, যাকাতও তেমন একটি রুকন। কুরআন মাজীদে অনেক স্থানে নামাযের সঙ্গে যাকাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। বহু আয়াতে যাকাত দানের আদেশ ও তার সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে।

- হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যাকাত ইসলামের পুল, অর্থাৎ পুল না হলে যেমন নদীর উপর দিয়ে চলা যায় না, যাকাত আদায় না করলে তেমনি ইসলামের উপর চলা যায় না।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যে মালের যাকাত দেয় তার মালের খারাবী চলে যায়। অর্থাৎ মালের যাকাত না দিলে মাল অপবিত্র হয়ে যায় এবং মালের বরকত চলে যায়।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যাকে আল্লাহ পাক মাল দিয়েছেন, সে যদি তার মালের যাকাত না দেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন ওই মালকে অতিবিষাক্ত সাপের আকৃতি দেয়া হবে এবং সাপকে ওই মালদারের গলায় হাঁসূলির মতো জড়িয়ে দেয়া হবে। আর ওই সাপ তার দুই চোয়াল চেপে ধরে বসবে এবং বলবে– আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। -বুখারী, মুসলিম

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যে যাকাত দেবে না সে দোযখে যাবে। -তাবারানী

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যে জাতি যাকাত দেয় না, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের মধ্যে লিপ্ত করেন। -তাবারানী

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মালের সঙ্গে যাকাত মিশ্রিত হয় অর্থাৎ যাকাত ফরয হয়েছিলো, কিন্তু যাকাত আদায় না করায় যাকাতের অংশ অন্য টাকার সঙ্গে মিশে যায়, তাহলে যাকাতের সে অংশ সমস্ত মালকে ধ্বংস করে ফেলে। -বায্যায

- ধ্বংস করা দুই প্রকার- কোনো সময় টাকা পয়সা সব নষ্ট হয়ে যায় আর কোনো সময় টাকা পয়সা থাকে, কিন্তু বরকত উঠে যায় এবং বিভিন্ন অপকর্মে খরচ হতে থাকে। কোনো ভালো কাজে আসে না।
- যাকাত আদায় করা ফরয এবং যাকাত প্রদানে অনেক প্রকার সওয়াব ও ফযীলত রয়েছে।
- যাকাত না দিলে দুনিয়াতেও আযাব হয়, অর্থাৎ সম্পদ বিনষ্ট হয় বা সম্পদের বরকত নষ্ট হয়ে যায় আর আখেরাতে আযাব তো আছেই।
- যাকাত না দিলে মুনাফিকের শ্রেণীভুক্ত হতে হয়।
- যাকাত না দিলে শুধু আল্লাহর হক নষ্ট হয় এমনটি নয়, বরং বান্দার হকও নষ্ট করা হয়।
- যে যাকাত দেয় না তার নামায, রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতও কবূল হয় না।

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও যাকাতের নিসাব

ঋণ ও মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা (এটা শুধু সোনা থাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা, অথবা সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসার মালের মালিক হলে (এটা শুধু সোনা ছাড়া অন্য যে কোনো সূরত হোক না কেন সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য) চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হয়।

– আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ২৫৫, আলমগীরী ১ : ১৮৭-১৯২

যাকাত যার উপর ওয়াজিব

সাবালক, সজ্ঞান মুসলমান নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর আরবী মাস হিসেবে এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব। একই পরিবারে একাধিক ব্যক্তি যেমন স্বামী, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে নেসাবের মালিক হলে প্রত্যেকের উপর স্বতন্ত্রভাবে যাকাত আদায় করা ফরয। স্ত্রীর যাকাত স্বামীর উপর বর্তায় না, তেমনি সন্তানদের যাকাত পিতার উপর বর্তায় না। তবে কেউ যদি অন্যের অনুমতিক্রমে তার পক্ষ থেকে যাকাত দিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত কাকে দিবেন-কাকে দিবেন না?

যাদের সঙ্গে দাতার জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রমুখ এবং দাতার সঙ্গে যাদের জন্মগত সম্পর্ক আছে যেমন ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ইত্যাদি তাদেরকে যাকাত, ফিতরা দেয়া যায় না। অনুরূপ স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত ফিতরা দিতে পারবে না। অমুসলিম ও ধনী ব্যক্তি (নেসাব পরিমাণ মালের মালিক)-কে দান করলেও যাকাত ফিতরা আদায় হবে না। বরং যাকাত ফিতরা দিতে হবে এমন গরীব, ফকীর ও মিসকীনকে যাদের নিকট নিসাব পরিমাণ মাল নেই।

ধর্মীয় খিদমতরত নিঃস্ব, দরিদ্র ব্যক্তিকে যাকাত ফিতরা দান করলে ধর্মীয় খেদমতের সহযোগিতা হিসেবে অধিক সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

-সূরা বাকারা : ২৭৩

শুধু সোনা বা রূপার যাকাত আদায়ের পদ্ধতি

কোনো ব্যক্তি যদি সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মালিক হয় (চাই তা ব্যবহার করুক বা না করুক) ঋণমুক্ত অবস্থায় তার নিকট ১ বছরকাল থাকলে তার যাকাত দেয়া ফরয। যদি তার নিকট অন্য কোনো মাল না থাকে তাহলে উক্ত মালের ৪০ ভাগের ১ ভাগ কিংবা তার সমপরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে উক্ত সোনা বা রূপা থেকে কিছু অংশ বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করা জরুরী। -আদ দুররুল মুখতার ২ : ১৯২

দোকান/বাড়ি ভাড়ার জন্য প্রদত্ত জামানতকৃত টাকার যাকাত

যদি কোনো ধনীব্যক্তি দোকান কিংবা বাড়ি ভাড়া নেয় আর মালিকের নিকট জামানত হিসেবে অগ্রিম টাকা জমা রাখে তাহলে উক্ত টাকারও যাকাত দেয়া তার উপর ফরয। কেননা উক্ত টাকা তার মালিকানাতেই রয়ে গেছে। সুতরাং অন্যান্য মালের সঙ্গে হিসেব করে এ টাকার যাকাতও আদায় করতে হবে।

-আদ দুররুল মুখতার ২ : ৩০৫, দারুল উলূম ৬: ৭৭ আহসানুল ফাতাওয়া ৪: ২৫১

করয দেয়া টাকার উপর যাকাত

করয দেয়া টাকা উসূল হওয়ার পর উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে এবং বিগত বছরসমূহে উক্ত টাকার যাকাত না দিয়ে থাকলে সেই যাকাতও দিতে হবে। তবে যে করযের টাকা পাওয়ার কোনো আশা নেই সে টাকার যাকাত দিতে হবে না। আর যদি কখনো উসূল হয় তাহলে সে বছর থেকে যাকাত দিবে।

-আদ দুররুল মুখতার ২ : ২৬৬, দারুল উলূম ৬ : ৪৫, ৭৭

ইসলাহ: আজকাল সরকারিভাবে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে যাকাত উসূল করে হাসপাতাল ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। এ সূরতে যাকাত আদায় হবে না।

নফল সদকা খয়রাত

নামায রোযায় যেমন ফরয ওয়াজিব আছে, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব আছে তদ্রূপ যাকাতেও ফরয, ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব আছে, কিন্তু যাকাত বলতে আমরা শুধু ফরয যাকাতকেই বুঝে থাকি। অন্যান্য দানকে আমরা সাধারণতঃ যাকাত না বলে খয়রাত বা সদকায়ে নাফেলা বলে থাকি।

● রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই জেনে রেখো, মালের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও অনেকগুলো হক ওয়াজিব আছে।

অর্থাৎ ফরয যাকাত আদায় করার পর কিছু কিছু অতিরিক্ত দান-খয়রাত করতে হবে। আর কিছু দিতে না পারলে অন্তত প্রতিদিন এক মুষ্টি চাউল হলেও ফকীর-মিসকীনকে দান করবে, যাতে তোমার নাম বখিলদের মধ্যে লিখা না হয়। আর যদি তুমি নিজে নেহায়েত গরীব হয়ে থাক এবং তোমার নিকট দেয়ার মতো কিছু না থাকে, তবে তুমি যে কোনোভাবে পরের উপকার করো। তথা মুসলমান মৃতব্যক্তির জানাযার সহযাত্রী হইও। এমনিভাবে কারো বিপদের সময় সাহায্য করা, কারো বোঝা মাথায় তুলে দেয়া, সুপারিশ করে কারো কাজ (সৎকাজ) সমাধা করে দেয়া, মানুষের মন খুশি হয় এমন ভালো কথা বলা ইত্যাদি। এ সমস্ত কাজে টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় না; অথচ এই কাজগুলোতে সদকা-খয়রাত করার সওয়াব পাওয়া যায়। -তাবলীগে দ্বীন : পৃষ্ঠ ৮-৯

দান-সদকার বরকত

● হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সদকা আল্লাহ তা'আলার গযবকে প্রশমিত করে এবং অপমৃত্যু রহিত করে।" -তিরমিযী, মা'আরেফ

● হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "সদকা-খয়রাত করার কাজে (যথাসম্ভব) দ্রুততা অবলম্বন কর। কেননা বালা-মুসীবত সদকা-খয়রাতকে পেছনে ফেলে অগ্রসর হতে পারে না।"

● হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সাতটি কাজের সওয়াব বান্দার

মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। কাজগুলো হলো, ধর্মীয় জ্ঞান দান করা, দ্বীনী পুস্তক রচনা করা। খাল খনন করা, কূপ খনন করা, বৃক্ষ রোপণ করা, মসজিদ নির্মাণ করা, ত্যাজ্য সম্পত্তিরূপে পবিত্র কুরআন রেখে যাওয়া, এমন সন্তান রেখে যাওয়া যে সন্তান তার মৃত্যুর পর মাগফেরাতের দু'আ করে।"

-তারগীব, বাযযার, আবু নুআইম, উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম

● রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "জীবিত অবস্থায় এক টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করা মৃত্যুর সময় শত টাকা দান করার চেয়েও অনেক উত্তম।"

● রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "জেনে রেখো, দানে ধন কখনও কমে না (হয়তো দানের কারণে আয় বেড়ে যাবে, না হয় খরচ কম হবে। এক উপায়ে না এক উপায়ে বরকত হবেই) এবং দানের কারণে সম্পদ কম হবে না। কমলে অন্য কারণে কমতে পারে।"

দরিদ্র ও অসহায়দের প্রতি সদয় হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য

● হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.) বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ভিক্ষুকের হক রয়েছে। যদিও সে ঘোড়ার উপর চড়েও আসে। -আবু দাউদ পৃ-২৩৪

● হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযি.)-এর নিকট যখন কোনো ভিক্ষুক আসতো তখন তিনি তাকে মারহাবা ও স্বাগতম জানাতেন এবং বলতেন, এরা আমার সম্পদ ইহকাল থেকে পরকালে স্থানান্তরিত করে দিয়েছে।-কিতাবুল বির-২১৬

আল্লাহর ওয়াস্তে যদি কেউ কিছু চায়

● হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করবে তাকে আশ্রয় দান করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য তলব করবে তাকে সাহায্য করবে। যে ব্যক্তি তোমাকে উপকার করবে তাকে প্রতিদান দিবে, যদি প্রতিদান দিতে না পার তাহলে তার জন্যে দু'আ করতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার বিশ্বাস জন্মাবে যে, তুমি তার প্রতিদান পূর্ণ করে দিয়েছ।

-আবু দাউদ : ২৩৫

ফায়দা : আল্লাহ তা'আলার নামের দোহাই দিয়ে যদি কেউ কিছু চায় তাহলে মহান আল্লাহর নামের সম্মান-মর্যাদা ও বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে ফিরিয়ে দিও না।

কারণ তখন না দিলে আল্লাহ তা'আলার নামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। এজন্যেই আল্লাহ পাকের নামের ওসীলা দিয়ে চাওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার নামের ওসীলা দিয়ে প্রার্থনাকারী ও প্রত্যাখানকারী উভয়ে অভিশপ্ত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে, বলব কি? আমরা বললাম, জি হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে চায় এবং তাকে দেয়া হয় না।

অনুরূপ হযরত রাফে (রাযি.) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে, অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহ পাকের ওসীলা দিয়ে সওয়াল করে এবং অভিশপ্ত ওই ব্যক্তি, যার নিকট আল্লাহ পাকের দোহাই দিয়ে চাওয়া হয় তথাপি সে দেয় না।

-মাজমাউয যাওয়ায়েদ খ.৩ পৃ. ১০৬

ভিক্ষুক বেশে পরীক্ষার জন্য ফেরেশ্‌তাগণও আসেন

● হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষের নিকট কখনো কখনো এমন ভিক্ষুকও আসে, যারা মানবও নয়, জ্বীন ও নয়। বরং তারা আল্লাহর ফেরেশতা, তাকে দিয়ে মহান আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের উপর পরীক্ষা চালানো হয় যে, তারা কোন্ ধরনের আচরণ করে। -কিতাবুল বির-২১৬

আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত অন্যকিছু চাইবে না

হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর নামের দোহাই দিয়ে জান্নাত ব্যতীত (পার্থিব কোনো জিনিস) চাইবে না। -আবু দাউদ ২৩৫

● হযরত সালমান ইবনে আমের (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, গরীব, মিসকিন আত্মীয়দের প্রতি ব্যয় করলে দ্বিগুণ সওয়াব। প্রথমটি হচ্ছে দানের সওয়াব, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আত্মীয়তা রক্ষার সওয়াব। -জামে তিরমিযী খ. ১ পৃ. ১৪২

রমযানের রোযা

ফাযায়েলে রমযান

রমযান মাসের রোযা রাখা ইসলামের তৃতীয় ফরয। যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে সে মুসলমান থাকে না। আর যে রোযার ফরযকে স্বীকার করে কিন্তু রোযা রাখে না সে মারাত্মক গুনাহগার-ফাসেক।

বস্তুত রমযান মাস হচ্ছে, আল্লাহ পাকের রহমত, দয়া ও অনুগ্রহের মাস। রমযান মাস হচ্ছে, বান্দার গুনাহ মাফ পাওয়ার মাস। রমযান মাস হচ্ছে দোযখের আগুন থেকে মুক্তির মাস। রমযান মাস হচ্ছে অধিক নেকী কামাই করার মাস। রমযান মাস হচ্ছে আল্লাহওয়ালা হওয়ার মাস। রমযান হচ্ছে আত্মশুদ্ধির মাস। বুযুর্গানেদ্বীন বলেন, রমযানের ইবাদতের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এগার মাস পর্যন্ত বজায় থাকে। যে ব্যক্তি তবীয়তের উপর চাপ সৃষ্টি করে রমযানে নেকীর কাজ করে, পরবর্তী সময়ে সে নেকীর কাজ সহজভাবে করতে সক্ষম হয় এবং যে ব্যক্তি রমযানে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে সে সারা বছর সহজভাবেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

অর্থ- হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর (রমযানের) রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী (পরহেযগার) হতে পার। –সূরা বাকারা, ১৮৩

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে, আল্লাহপাক তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।" –সহীহ বুখারী

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "রমযান মাস এলে বেহেশতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়, দোযখের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং অবাধ্য শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়।"

–সহীহ বুখারী

- হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "(আমলনামায়) নেক কাজের সওয়াব দশগুণ থেকে সাত শ গুণ পর্যন্ত লেখা হয়; কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম; তা বিশেষভাবে আমারই জন্য, আমি নিজেই তার বদলা দান করবো।"

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৬১

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক জিনিসেরই দরজা আছে, আর ইবাদতের দরজা হলো রোযা।" -কানযুল উম্মাল ২৩৫৯১;আবুশ শায়েখ, আবু দারদা রা. থেকে; ইতহাফুল খিয়ারাহ, হাদীস নং ২১৯০

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত রমযানের একটি রোযা ছেড়ে দিলো, সে যদি সারা জীবনও রোযা রাখে, তবুও তার দ্বারা ওই রোযাটির স্থান যথাযথভাবে পূর্ণ হবে না (অর্থাৎ, ফযীলতের দিক থেকে ওই রোযার বরাবর হতে পারবে না।)" -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৯৮; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৭২৩; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ১৯৮৭; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী হাদীস নং ৩৬৫৪

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তি রোযাদারের সমতুল্য সওয়াব পাবে। আর এতে রোযাদারের সওয়াব একটুও কমবে না।"

–জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৭

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "রমযানের প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য।"

–সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ১৮৮৭; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৩৬০৮

- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখেও গুনাহের কথাবার্তা ও কাজ-কর্ম ত্যাগ করলো না সে শুধু খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উপবাসই থাকলো। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে-এর কোনো মূল্য নেই।"

আল্লাহওয়ালা হওয়ার মাস

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.) বলেন, আল্লাহওয়ালা হওয়ার তিনটি কোর্স আছে–

১. দীর্ঘ সময়ের কোর্স।
২. সংক্ষিপ্ত সময়ের কোর্স।
৩. অতিসংক্ষিপ্ত সময়ের কোর্স।

যেমন মনে করুন, কোনো জায়গায় যাওয়ার তিনটি পথ আছে। একটি দীর্ঘ, একটি সংক্ষিপ্ত, তৃতীয়টি একেবারেই সংক্ষিপ্ত।

ওলী হওয়ার দীর্ঘ কোর্স হলো ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাবসহ সকল প্রকার নেক আমল করা ও সর্বপ্রকার গুনাহ বর্জন করা। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের জন্য অব্যাহতভাবে মুজাহাদা করতে থাকা।

আরেকটি কোর্স যা-এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত। তা হলো রমযান শরীফের রোযা। কেউ যদি সঠিকভাবে রমযানের রোযাসমূহ রাখে এবং তার আদব রক্ষা করে, তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে। রমযানের এক একটি রোযা মুত্তাকী হওয়ার এক একটি পাওয়ারফুল ট্যাবলেটের মতো। আর সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স হলো হজ্ব। যথার্থভাবে হজ্ব আদায়ের মাধ্যমে মানুষ সহজেই অতিসংক্ষিপ্ত সময়ে আল্লাহ পাকের ওলী হয়ে যেতে পারে।

মর্যাদার বিবেচনায় রোযা ৩ প্রকার

নিম্ন শ্রেণী : সর্বসাধারণ যে রোযা রাখে, তাকে আমরা সাধারণ বা নিম্ন শ্রেণীর রোযা বলি। যাতে পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম প্রভৃতি রোযা ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য গুনাহের কাজ দস্তুরমতো হতে থাকে। এ-ধরনের রোযাকে নামে মাত্র রোযা বলা যায়। রোযার প্রকৃত মহাত্ব, উদ্দেশ্য এর দ্বারা হাসিল হয় না।

মধ্যম শ্রেণী : পানাহার প্রভৃতি থেকে বেঁচে থাকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে রক্ষা করে যে রোযা রাখা হয়, তা এই মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মুখ ও জিহ্বাকে মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে সংযত রাখা। চক্ষুকে কু-দৃষ্টি ইত্যাদি থেকে বিরত রাখা। নিম্ন শ্রেণীর রোযার চেয়ে এই শ্রেণী শতগুণে উত্তম।

প্রথম শ্রেণী : মধ্যম শ্রেণীর উল্লিখিত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি সব ধরনের মন্দ ভাবনা থেকেও পরহেয করে যে রোযা রাখা হয়, তা হলো প্রথম শ্রেণীর রোযা। এ-শ্রেণীর রোযা কেবল বিশিষ্ট বুর্যূগ শ্রেণীর মনীষীরাই

পালন করে থাকেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ্‌খাতা থেকে পবিত্র থাকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিল সব ধরনের কু-ভাবনা এবং কু-মন্ত্রণা থেকেও পবিত্র থাকে। রোযার সময় বিভিন্ন ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার যিকির ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁদের অন্তরে স্থান পায় না। এঁদের রোযা পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর মর্যাদা লাভ করতে আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। অন্তত এ-কথার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের রোযা যেন কোনোক্রমেই মধ্যম শ্রেণীর নিচে যেতে না পারে। সন্দেহমুক্ত হালাল খাবার দ্বারা সাহরী ইফতার করা চাই। তাও এতো অধিক পরিমাণে না খাওয়া চাই, যাতে পাকস্থলী ভারী হয়ে শরীরে অলসতা জমতে পারে। মনে রাখতে হবে রমযান মাস ইবাদত-বন্দেগীর মাস। রাতে অধিক ভোজন করে যদি দিনের উপবাসের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয়, তাহলে রোযার উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে।

ইসলামের ভিত্তিসমূহের অন্যতম হলো রমযানের রোযা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক মুমিন, বালেগ, সুস্থ, মুকিমের উপর রোযাকে ফরয করেছেন। নামাযের মতোই রোযা সম্পর্কে কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে যেগুলোর ইসলাহ করা প্রয়োজন।

চাঁদ দেখা

মাসআলাঃ শরীয়তের বিধান মতে চাঁদের উদয়স্থল মেঘলা থাকলে রমযানের এবং অন্যান্য মাসের জন্য মাত্র ১জন আর ঈদুল ফিতরের জন্য মাত্র দুই জন বালেগ মুসলমানের স্বচক্ষে চাঁদ দেখার বিশ্বাসযোগ্য স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর চাঁদের উদয়স্থল সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকলে সব মাসে জম্মেগাফীর তথা এমন সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা জরুরী যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তদাতা আশ্বস্ত হতে পারেন যে, এতগুলো লোক মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না।

অনেকে প্রশ্ন করেন জাম্মেগাফীর বড় দল হতে হলে ৫০ জন লোক হতে হবে এবং তাদের সকলেরই একই এলাকা থেকে হতে হবে। এর সমাধান হলো- নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কোনো সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং এক এলাকার হতে হবে এরও কোনো দলীল নেই বরং জাম্মেগাফীর এর মূল কথা হলো যে, বিভিন্ন এলাকা হতে এ পরিমাণ লোক বর্ণনা দিতে হবে যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে সিদ্ধান্তদাতা পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়ে যায়।

মাসআলাঃ রমযানুল মুবারকের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষী জরুরী নয়, শুধু সংবাদই যথেষ্ট। সুতরাং সংবাদ যদি রেডিও এবং ফোনের মাধ্যমে হয় এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা থাকে যে, যে ব্যক্তি চাঁদ দেখেছে সে নিজেই বলছে এবং

সে সংবাদদাতাদের সত্যবাদিতার (ব্যাপারে) প্রবল ধারণা হয়, তখন তাদেরকে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে মেনে নেয়া হবে। যদি উদয়স্থল পরিষ্কার থাকে তাহলে রেডিও এবং ফোনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং সে ক্ষেত্রে ব্যাপক সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা আবশ্যকীয়।–শামী: ২/১৯

সন্দেহের দিনে রোযা

২৯ শাবান সন্ধ্যায় রমযানের চাঁদ দেখা না গেলে পরদিন তথা ৩০ শাবান ফকিহদের পরিভাষায় 'ইয়ামুস সক' 'সন্দেহের দিন'। হানাফী ফকীহদের মত হলো সর্বসাধারণের জন্য এদিনে রোযা রাখা জায়েয নয়। শুধু আহলে ইলম যাদের অন্তরে এইদিন রমযানের রোযা হওয়ার সামান্য নিয়্যত থাকবে না তাদের জন্য নফলের নিয়্যতে রোযা রাখার অনুমতি আছে।

রোযার নিয়্যত

ইসলামী দিনপঞ্জী হিসেবে সূর্যাস্তের পর থেকে নতুন দিন আরম্ভ হয়। কাজেই রাতে অথবা রাতশেষে দিনের বেলা ১১ টার মধ্যে এরকম নিয়্যত করবে, আমি আজ রোযা রাখলাম। রোযার নিয়্যতও মুখে উচ্চারণ করে বলা জরুরী নয়।

রোযাদারের করণীয় আমলসমূহ

* অধিক পরিমাণে কালেমায়ে তায়্যিবাহ পাঠ করা।
* অধিক পরিমাণে তাওবা-ইস্তিগফার করা।
* আল্লাহ পাকের দরবারে বেহেশত পাওয়াএবং দোযখ থেকে মুক্তির জন্য এই দু'আ বেশি বেশি পড়া-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

* যতো অধিক সম্ভব কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
* ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে তিন শ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করা। এর ঊর্ধ্বে যতো বেশি পাঠ করা যায়, ততোই ভালো।
* জামা'আতের সঙ্গে এবং তাকবীরে উলার সঙ্গে নামায আদায়ের ব্যাপারে পুরুষদের খুব বেশি যত্নশীল হওয়া।
* তারাবীহের জন্য ইশার জামা'আতের পূর্বেই উপস্থিত থাকা।
* ই'তিকাফের নিয়্যতে অবসর সময়ে মসজিদে অবস্থান করা।
* সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করা।
* খুব বেশি দু'আ করা। কেননা এই মাসে রোযাদারের দু'আ ব্যর্থ হয় না।

নিজের ঈমান আমলের দৃঢ়তা ও নিজ ইসলাহ্ এবং উম্মতের ইসলাহের জন্য দু'আ করা।

রমযানে বর্জনীয় বিষয়

* অহেতুক কথা বলা থেকে যত্নের সঙ্গে বিরত থাকবে। কঠিন প্রয়োজন ব্যতীত দুনিয়াবী কথা বলবে না।
* সর্বপ্রকার গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা, বিশেষত সুদ-ঘুষ আদান-প্রদান, টেলিভিশন-সিনেমা দেখা, কু-দৃষ্টি, গীবত, চোগলখোরী, জুয়া, লটারী, বান্দার হক নষ্ট করা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকবে।
* সরাসরি বা রেডিও, মোবাইল অথবা অন্য কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি শোনা ও দেখা থেকে অত্যন্ত মুজাহাদার সঙ্গে পরহেয করবে।
* কোনোভাবেই পর্দার হুকুম লঙ্ঘন করবে না।
* কাউকে গালি-গালাজ করবে না এবং কোনো প্রকার ঝগড়া-বিবাদে জড়াবে না।
* দাঁড়ি মুণ্ডাবে না বা একমুঠের চেয়ে ছোট করে ছাঁটবেও না।

উপরোক্ত গুনাহসমূহ থেকে খুবই গুরুত্ব ও যত্নের সঙ্গে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। অন্যথায় রোযার ফায়দা ও পুরস্কার লাভ হবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রোযা জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল স্বরূপ, যতক্ষণ না তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঢাল ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হলো, গুনাহে লিপ্ত হওয়া।

–মিশকাত শরীফ

হাদীসে আছে, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক যে রমযান মাস পেয়েও নিজের গুনাহ মাফ করাতে পারলো না।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নিচের কাজগুলো করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়।

১. কোনো কিছু খেলে।
২. কোনো কিছু পান করলে। এমন কি ধূমপান করলেও।
৩. স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে।
৪. গুহ্যদ্বারে যৌন চাহিদা পুরা করলে। (না'উযুবিল্লাহ্)

নিচের কাজগুলো পাওয়া গেলে রোযা ভঙ্গ হয় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়; কাফফারা ওয়াজিব হয় না।

১. ভুলে বা চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে কোনোকিছু খেলে, পান করলে বা স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে।
২. নস্যি গ্রহণ করলে।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে।
৪. অল্প পরিমাণ বমি আসার পর তা গিলে ফেললে।
৫. কুলি করার সময় পানি গলার ভিতরে ঢুকে পড়লে।
৬. দাঁতে আটকে থাকা ছোলাবুটের সমপরিমাণ বা তারচেয়ে বড় ধরনের খাদ্যকণা গিলে ফেললে।
৭. মুখে পান বা যে কোনো খাবার রেখে ঘুমিয়ে পড়ার পর সুবহে সাদেকের পর জাগ্রত হলে।
৮. ইচ্ছাকৃতভাবে আগরবাতি কিংবা অন্য কোনো সুগন্ধদ্রব্যের ধোঁয়া গলাধঃকরণ করলে বা নাকের মধ্যে টেনে নিলে।
৯. রাত মনে করে সুবহে সাদেকের পর সাহরী খেলে।
১০. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে ভেবে ইফতার করলে।

[যে কোনো কারণে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার পরও দিনের অবশিষ্ট সময় রোযাদারের মতো (পানাহার ইত্যাদি বর্জন) থাকা ওয়াজিব।]

তারাবীহ্

* সম্পূর্ণ রমযান মাসে প্রত্যেক রাতে ইশার ফরয ও সুন্নাতের পর বিশ রাকা'আত করে তারাবীহ্ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।
* তারাবীহ'র নামাযের মধ্যে পুরা কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।
* যদি বিনাপারিশ্রমিকে তারাবীহ্ নামাযের ইমামতী করার মতো হাফেযে কুরআন না পাওয়া যায়, কিংবা হাফেয যদি দাঁড়ি মুণ্ডায় বা এক মুষ্টির কম রাখে, তাহলে এ ধরনের হাফেযের পিছনে খতমে তারাবীহ্ না পড়ে ছোট ছোট সূরা দিয়ে তারাবীহ্ নামায আদায় করবে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অথবা ফাসেক হাফেযের পিছনে তারাবীহ্ পড়বে না। কেননা তারাবীহতে কুরআন শুনানোর উপর পারিশ্রমিক নেয়া এবং দেয়া উভয়টাই হারাম।
* তারাবীহর নামাযে কুরআন শরীফ তারতীলের সঙ্গে তিলাওয়াত করা উচিত। খুব দ্রুত তিলাওয়াত করলে হরফের মাখরাজ ও সিফাত অনেক সময় আদায় হয় না। ফলে কখনও অর্থ বিকৃতি ঘটতে পারে। তবে ফরয নামাযের চেয়ে একটু দ্রুত পড়ার অনুমতি আছে।

তরাবীহ সংক্রান্ত ইসলাহযোগ্য আরও কয়েকটি জরুরী বিষয়

* অনেক ইমাম সাহেব তারাবীহ নামাযে সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ না পড়েই সূরায়ে ফাতেহা শুরু করে দেয়। অথচ এগুলো পাঠ করা সুন্নাত। আর রমযানে একটি আমলের নেকী সত্তর গুণ বেড়ে যায়। তাই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা দরকার।

* অধিকাংশ সময় মুক্তাদীর ছানা, তাসবীহ, রুকূ, সিজদা ও তাশাহহুদ পুরা না হতেই ইমাম সাহেবের শেষ হয়ে যায়। তাই মধ্যম পন্থায় তাসবীহাতগুলো পাঠ করা উচিত। তাড়াহুড়া না করা।

* কিছু লোক এমন বাচ্চা ইমাম নিযুক্ত করে যার পবিত্রতা ও নামাযের মাসআলা-মাসায়েল সর্ম্পকে কোনো জ্ঞান রাখে না। এমন কি তার কাপড় পাক কিনা এবং ওযু আছে কিনা সে ব্যাপারেও নিশ্চয়তা নেই। এ ধরনের নাবালেগের পিছনে তারাবীহ নামাযের ইক্তিদা সঠিক নয়।

* তারাবীহ নামাযে প্রতি চার রাকা'আতের পর বিশ্রামের সময় চুপ করে বসে থাকা, তাসবীহ-তাহলীল, তিলাওয়াত, দুরূদ পড়া বা নফল নামায পড়া সবই জায়েয। আমাদের দেশে যে 'সোবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি ...' তিনবার পড়ার প্রচলন আছে তাও জায়েয, তবে তা-ই পড়তে হবে বিষয়টি এমন নয় আর এই দু'আ কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিতও নয়। এর চেয়ে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ বারবার পড়তে থাকা উত্তম। এবং এসব দু'আ চিৎকার করে নয় বরং নীরবে পড়াই মোনাসেব। –ফতওয়ায়ে দারুল উলূম, খণ্ড ৪

তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত, ৮ রাকা'আত নয়

তারাবীহ নামাযের রাকা'আতের সংখ্যা নিয়ে গায়রে মুকাল্লিদ নামের একটি জামা'আত মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানা থেকে নিয়ে যুগে যুগে বিষয়টি অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, তারাবীহ ২০ রাকা'আত, ৮ রাকা'আত নয়। নিম্নে তার কিছু প্রমাণাদী উল্লেখ করা হলো।

* হযরত ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর উস্তাদ আবু বকর ইবনে শাইবা (রহ.)-এর কিতাব আল মুসান্নাফ (২/১৬৬), বাইহাকী (২/৬৯৮), তাবারানী (১১/২৬১) ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল দ্বারা ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামায প্রমাণিত।

* দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাযি.) তাঁর খেলাফত কালে মসজিদে নববীর মধ্যে তারাবীহ নামাযের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামা'আতকে একত্র করে হযরত উবাই বিন কাআব (রাযি.)-এর ইমামতীতে ২০ রাকা'আত তারাবীহ নামাযের হুকুম দিয়েছিলেন। সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) তাঁ সমর্থন করেছিলেন। তারাবীহ নামায যদি নবী আলাইহিস সালাম থেকে ২০ রাকা'আত প্রমাণিত না হতো তাহলে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) অবশ্যই আপত্তি তুলতেন।

–বাইহাকী ২/৪৯৭, মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৪/২৬১, বাদায়েউস সানায়ে-১/৬৪৪

* তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী (রাযি.) চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাযি.)সহ সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) ঐক্যমতে, উম্মতে মুসলিমার ১৪ শ বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক আমল তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত চলে আসছে। যা আজ পর্যন্ত বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে চালু আছে।

–সুনানে কুবরা,বাইহাকী ২/৪৯৬

* ইমাম আযম আবু হানীফা (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ.) তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ যামানার সবচেয়ে বড় কুরআন ও হাদীস বিশারদ ও ফকীহ ছিলেন তাদের সকলের মতে তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত, ৮ রাকা'আত নয়।

–আল মাবসূত ২/১৯৬, ই'লাউস সূনান ৭/৬৯৭১

* ৮ রাকা'আত তারাবীহ নামায পড়া রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর ইজমা পরিপন্থী এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের বিপরীত, অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের জন্য তাকীদ করে গেছেন।

–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬০৭; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৭৬

ভ্রান্তি নিরসন

৮ রাকা'আত তারাবীহর পক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীরা যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে তা মূলতঃ তারাবীহ সর্ম্পকে নয়। বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে । এজন্য ইমাম বুখারী রহ. উক্ত হাদীসটিকে বাবু কিয়ামুল লাইল অর্থাৎ তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে এনেছেন। সুতরাং হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী লোকদের কথায় কর্ণপাত না করে উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে তারাবীহ নামায ২০ রাকা'আত হওয়ার উপর আমল করা উচিত।

তাহাজ্জুদ

* রমযান মাসের দ্বিতীয় খাছ ইবাদত হলো কিয়ামুল লাইল বা রাত্রিতে

দণ্ডায়মান থাকা। (অর্থাৎ রাতে নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দাঁড়িয়ে থাকা।) আর এতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে বান্দা রমযানের রাত্রিগুলোতে ঈমান ও ইহতিসাবের সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হয়, তার পিছনের সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

মিশকাত শরীফে ইমাম বায়হাকী (রহ.) 'শু'আবুল ঈমান' অধ্যায়ের সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দিনের রোযা এবং রাতে দাঁড়িয়ে নফল নামাযসমূহে কুরআন তেলাওয়াত করা অথবা শোনা এ উভয় ইবাদতই কিয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।

কাজেই সাধারণ দিনগুলোতে রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু রমযানুল মুবারকে যেহেতু মানুষ সাহরীর জন্য উঠে থাকে, তাই সামান্য আগে উঠে যাবেন এবং সাহরীর পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়্যতে কয়েক রাকা'আত নামায পড়ে এ-নেয়ামত হাসিল করুন।

সাহরী ও ইফতার

রোযাদারের জন্য সাহরী খাওয়া ও ইফতার করা সুন্নাত। তেমন কিছু না থাকলে সামান্য খাদ্য খেলে বা কেবল পানি পান করলেও সাহরী-ইফতারের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

সাহরী ও ইফতার সংক্রান্ত কিছু ইসলাহযোগ্য বিষয়

উম্মতের সর্বসম্মত মত হলো সাহরী বরকত ও ফযীলতপূর্ণ আমল। অভিধানে সাহরী বলে সুবহে সাদিকের সামান্য পূর্বে খানা খাওয়াকে। কিন্তু অলসতার দরুন অনেকে এ ফযীলত থেকে মাহরূম থাকে। কেহ কেহ তারাবীহ নামাযের পর খানা খেয়ে ঘুমিয়ে যায়। আবার একদল মাঝ রাতেই সাহরী খেয়ে ফেলে। এতে সে নিজেই রোযার সময়সীমা বাড়িয়ে নিল।

অনুরূপভাবে ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা মুস্তাহাব। কিন্তু অনেকেই ওয়াক্ত হওয়ার পরও বিলম্ব করে।

সময়ের ব্যাপারে অবহেলা

রমযান মাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সময়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। বিশেষ করে সাহরী ও ইফতারের সময়। যেন নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ইফতার না

হয়ে যায়, আবার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পরও সাহরী খেয়ে যাতে রোযা নষ্ট না হয়। এ-ব্যাপারে অনেককেই উদাসীন দেখা যায়। তাদেরকে শুধু মিডিয়ার উপর অথবা মহল্লার মসজিদের আযান বা সাইরেনের উপর নির্ভর করতে দেখা যায়। অথচ কোনো কোনো সময় এক্ষেত্রে ভুলও হয়ে যায়। সময় হওয়ার আগেই আযান দিয়ে দেয়। আবার কেউ কেউ মোবাইল ফোনের আযানের উপর ভিত্তি করে ইফতার করে থাকে। অথচ মোবাইল ফোনের আযান অনেকে রিংটোন হিসাবেও ব্যবহার করে থাকে। যা সময়ের সঙ্গে কোনো সর্ম্পক নাই। জরুরী হলো প্রত্যেক ব্যক্তি সময়ের ব্যাপারে নিজে যত্নবান হওয়া। অন্যথায় অনেক ক্ষেত্রে রোযা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইফতারে অধিক সময় নেয়া প্রসঙ্গ

আজকাল আমাদের ইফতারিতে এতো বেশি পরিমাণ খাদ্য-উপকরণ থাকে যা খেতে খেতে মাগরিবের নামায অনেক বিলম্বে আদায় করা হয়। দ্বীনী মাসআলা জানা না থাকার কারণে অধিকাংশ মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীগণের নির্দেশে ইমাম সাহেবগণ প্রায় ২০-২৫ মিনিট সময় দেরী করে জামা'আত শুরু করেন। ইফতার পার্টির ব্যাপক প্রচলন ঘটায় মানুষের কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে চাঁদাও আদায় করা হয়। রাজনৈতিক ও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। সারাদিন রোযা রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বলপূর্বক চাঁদা আদায় করে হারাম খাদ্যের দ্বারা ইফতার করানো হচ্ছে। এদিকে পর্দা-পুশিদার প্রতি কোন লক্ষ্য না রেখে নারী-পুরুষ একসঙ্গে বসে ইফতার করে। অবিরতভাবে ছবি উঠানো হয় এবং তা আবার পত্র-পত্রিকা, টিভি-স্যাটেলাইটে প্রদর্শনী করা হয়। ইফতারের পূর্বের দু'আ কবূলের মুবারক সময়ে এমন হৈ চৈ হতে থাকে, যেন বাজারের পরিবেশ। এ বিষয়গুলো সংশোধন করা জরুরী।

তাছাড়া মাগরিবের নামায সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা মুস্তাহাব। বিনা ওযরে বিলম্ব করা মাকরূহ। সুতরাং নামায বিলম্ব করে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে ইফতার করা উচিত নয়। বরং ৫/১০ মিনিটের মধ্যে ইফতারের প্রয়োজন সেরে নেবে আবার একেবারে কম খেয়ে ক্ষুধার তাড়না নিয়েও নামাযে দাঁড়াবে না। কারণ বেশি ক্ষুধা নিয়ে নামায পড়া নিষেধ।

শবে ক্বদরের ফযীলত ও আমল

আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে সূরা ক্বদর নামে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন। এতে শবে ক্বদরের গুরুত্ব ও ফযীলত বয়ান করেছেন। ক্বদরের একটি রাত্রি এক হাজার মাস হতে শ্রেষ্ঠ।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশায় শবে ক্বদরে ইবাদত করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০১

এ উম্মতের আয়ূ (হায়াত) পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় কম। আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাছভাবে দয়া ও মেহেরবাণী করে এক হাজার মাসের তুলনায় ক্বদরের এক রাত্রির ফযীলত বেশি করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ রাত্রটিকে গোপন রেখেছেন যাতে বান্দাগণ-এর তালাশে শুধু সুনির্দিষ্ট এক রাত্রিই ঘটা করে ইবাদত বন্দেগীতে না কাটায় বরং শবে কদরকে পাওয়ার মানসে পুরো মাসটাই ইবাদতে কাটিয়ে দেয়। তাহলে মাহে রমযানের সকল আয়োজনটাই সে পেয়ে গেল। শবে ক্বদরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা আপনি পসন্দ করেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৩৫৪৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫১৩; সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৮৫০

খুব বেশি দু'আর ইহতিমাম করা

মাহে রমযানুল মুবারকের প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে দু'আ কবূল হওয়ার ওয়াদা আছে। হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির দু'আ ব্যর্থ হয় না। ১. রোযাদারের দু'আ ২. ন্যায় পরায়ণ শাসকের দু'আ ৩. মযলূমের দু'আ।

তাছাড়া অন্য রেওয়ায়াতে ইফতারের সময় দু'আ কবূল হওয়ার ওয়াদা আছে। কাজেই রমযানের দিনের শেষ মুহূর্তটা আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে নফল ইতিকাফে থেকে দু'আ-ইস্তিগফারে কাটানো সবচেয়ে উত্তম। দু'আ ইবাদতের সারবস্তু। দু'আর মাধ্যমে মাওলা পাকের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে এ-সম্পর্ক মানুষকে নেকীর কাজে অভ্যস্থ করে ও মন্দ কাজের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

ই'তিকাফের ফযীলত ও গুরুত্ব

* হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রমযান মাসের (শেষ) দশ দিন ই'তিকাফ করবে, তার দুইটি হজ্ব এবং দুইটি উমরার সমতুল্য সওয়াব হবে।

–বায়হাকী

* যে ব্যক্তি খালেস নিয়্যতে এবং ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় ই'তিকাফ করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

–দায়লামী

* ২০ শে রমযান সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্ব থেকে আখিরী রমযান সূর্যাস্ত পর্যন্ত পুরুষদের জন্য মসজিদে এবং মহিলাদের জন্য নিজ গৃহে নামাযের নির্ধারিত স্থানে পাবন্দির সঙ্গে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। এই ই'তিকাফ সুন্নাতে মু'য়াক্কাদায়ে কেফায়া। মহল্লার একজন হলেও এই ই'তিকাফ অবশ্যই করতে হবে। অন্ততপক্ষে এক ব্যক্তি এই ই'তিকাফ করলেও সকল মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হবে। অন্যথায় মহল্লাবাসী সবাই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা তরক করার কারণে গুনাহগার হবে।

* কাউকে পারিশ্রমিক দিয়ে ই'তিকাফ করানো জায়েয নয়। –শামী

ইসলাহ: সহীহভাবে আমল করার জন্য মুহাক্কিক আলেমগণের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরী।

পরিশেষে শুধু রোযা রাখা এবং তারাবীহ নামায আদায় করার দ্বারাই রোযার প্রকৃত চাহিদা শেষ হয়ে যায় না। বরং এ মাসের চাহিদা হলো প্রত্যেকে যেন এ মাসে নিজকে অন্য সকল কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত করে নেয়। বিগত এগার মাস দুনিয়ার ধান্দায় ব্যস্ততায় সময় কাটিয়ে নিজের মধ্যে দ্বীনী দুর্বলতা, গাফলতি সৃষ্টি হয়েছে। তা দূর করণার্থে এ-মাসে বেশি থেকে বেশি সময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি তার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ভেবে-চিন্তে দেখুন, কোন্ কোন্ ব্যস্ততা কমাতে পারবো, সেগুলোকে কমিয়ে দিন। আর যে কাজগুলো রমযানের পরবর্তী সময়ে করতে পারবেন, সেগুলোর জন্য তাই করুন। রোযার আসল উদ্দেশ্য হলো রোযার দ্বারা তাক্ওয়ার সিঁড়ি অতিক্রম করা। তাকওয়ার অর্থ হলো, অন্তরে আল্লাহ তা'আলার আযমত, মুহাব্বত, অনুভূতি জাগ্রত করত গুনাহ-খাতা থেকে বেঁচে থাকা। যিন্দেগীর পরিশুদ্ধতার জন্য আরো সহজ উদাহারণ হলো, নিজকে অন্যান্য কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে পুরো মাসটাই এমন এক নেক পরিবেশে কাটানোর চেষ্টা করা, যে পরিবেশটি হবে আল্লাহর যিকির এবং আখেরাতের ফিকিরের পরিবেশ। গুনাহমুক্ত এমন এক পরিবেশ যেখানে তা'লীম, তরবীয়ত, মুজাহাদা ও সাধনার সবরকম আনুকূল্য বিরাজ করবে ।

ইসলাহ: রমযানে ও রমযানের বাইরে ফজরের মাসনূন ওয়াক্ত

ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত থাকে। এই সময়টুকুকে দুই ভাগে ভাগ করে শরীয়তের পরিভাষায় প্রথম ভাগকে 'গালাস' (যখন কিছুটা অন্ধকার থাকে) এবং দ্বিতীয় ভাগকে 'ইসফার' (যখন কিছুটা আলোকিত হয়ে যায়) বলা হয়। জীবনের শেষ দিকে অধিকাংশ সময়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইসফারে' নামায পড়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমরা 'ইসফারে' ফজর পড়ো, তাতে সওয়াব বেশি।

এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে হানাফী আলেমগণ রমযানের বাইরে ফজরের মুস্তাহাব সময় 'ইসফার'কে নির্ধারণ করেছেন। তবে 'গালাসে' ফজর পড়ার কথাও যেহেতু হাদীসে আছে, সেহেতু রমযান মাসে ফজরের মুস্তাহাব সময় 'গালাস' নির্ধারিত করা হয়েছে। কাজেই সাহরী খাওয়ার পর না ঘুমিয়ে গালাসের মধ্যেই ফজরের নামায আদায়ের চেষ্টা করা উচিত।

নফল রোযা

নফল রোযার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুসলমান বান্দার যে আমলটির হিসাব নেয়া হবে, সেটি হচ্ছে ফরয নামায। অতএব ফরয আমল যদি ঠিকমতো পাওয়া যায় তাহলে তো ভালো কথা। অন্যথায় ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, দেখো তো! তার আমলনামায় কোনো নফল নামায আছে কি না? যদি তার আমলনামায় নফল নামায থাকে তাহলে তার এই নফল নামায দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ করে দেয়া হবে।

–সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৬৪; সুনানে ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ১৪২৫; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪১৩

এমনিভাবে ফরয রোযায় ঘাটতি পাওয়া গেলেও তা আল্লাহর মেহেরবানীতে তার আমলনামার নফল রোযা দিয়ে পুরা করার আশা করা যায়।

তাছাড়া রোযার আরও অনেক ফায়দা আছে। রোযা যেমন গুনাহ হতে অর্থাৎ বাতিনী ও আত্মিক রোগ থেকে রক্ষা করে থাকে, অনুরূপভাবে রোযা শারীরিক রোগ হতেও রক্ষা করে থাকে। কেননা অধিকাংশ শারীরিক রোগ পানাহারের দোষেই জন্মে থাকে। রোযার কারণে পানাহারের দোষ দূর হয়ে যায় এবং বহু প্রকার রোগ ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ হয়।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান:

لِكُلِّ شَيْئٍ زَكٰوةٌ وَزَكٰوةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ

অর্থ- প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত আছে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের যাকাত (পবিত্রতা) আদায়ও সাধিত হয় বিভিন্নরূপে। আর শরীরের যাকাত (পবিত্রতা) সাধিত হয় রোযার দ্বারা।

-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭৪৫; শুআবুল ঈমান বায়হাকী, হাদীস নং ৩৩০০

নেক কাজের আগ্রহ পয়দা হয়। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। ঈমানী শক্তি বাড়ে, দ্বীনী কাজে হিম্মত ও শক্তি পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়।

অতএব, আমাদের সকলেরই ফরয আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে নফলের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

আইয়্যামে বীযের রোযা

চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখকে 'আইয়্যামে বীয' বলে। যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে এই তিনটি তারিখে রোযা রাখলো, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো। অবশ্য এই তিনটি রোযা মাসের শুরুতে বা শেষেও রাখা যায়।

সপ্তাহে ২ দিন রোযা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার ২ দিন রোযা রাখতেন।

মুহাররমের রোযা

মুহাররম মাসের ১০ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মুহাররম মাসের ১০ তারিখে একটি রোযা রাখবে, তার বিগত এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে; কিন্তু শুধু ১০ তারিখে একটি রোযা রাখা মাকরূহ। কাজেই তার সঙ্গে ৯ তারিখ অথবা ১১ তারিখ মিলিয়ে দু'টি রোযা রাখবে।

আরাফার দিনের রোযা

যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে রোযা রাখাও বড় সওয়াবের কাজ। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি হজ্বের চাঁদের ৯ তারিখে রোযা রাখবে তার বিগত এবং আগামী বছরের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, যিলহজ্ব মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন রোযা রাখা এবং প্রতি রাতে ইবাদত-বন্দেগী করারও অনেক ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

শাওয়ালের রোযা

যে ব্যক্তি রমযান শরীফের রোযা রেখে অতঃপর শাওয়ালের চাঁদে ছয়টি রোযা রাখবে, সে সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাবে এবং বরকত পাবে।

মাসআলা : বছরে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম– দুই ঈদের ২ দিন এবং ঈদুল আযহার পরের ৩ দিন।

শাবানের রোযা

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ব্যতীত অন্য কোনো মাসেই পূর্ণ একমাস রোযা রাখতে দেখিনি। কিন্তু শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতে দেখেছি।

উম্মতের জন্য হুকুম হলো, শাবান মাস অর্ধেক হয়ে গেলে আর রোযা রাখবে না। –ইবনে মাজা

হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ১৪ শাবানের রাতে যারা খালেস নিয়্যতে নামায ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কাটাবে এবং ১৫ শাবান রোযা রাখবে, তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। এই রোযাটি তো রাখবেই, সঙ্গে-এর আগে ১৩, ১৪ শাবান রোযা রেখে আইয়্যামে বীযের রোযাও পুরা করবে। কেননা এটাই উত্তম।

হজ্ব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

অর্থ- 'মানুষের উপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর হজ্ব ফরয করা হয়েছে, যারা সেখান পর্যন্ত যাওয়ার সামর্থ্য রাখে।' –আ-লি ইমরানঃ ৯৭

হযরত রাসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যদি সামর্থ্যবান মুসলমান হজ্ব না করে মারা যায়, তবে তার ইচ্ছা চাই সে ইয়াহুদী হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক। তাতে আমার কোনো পরওয়া নেই।'

বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্ব, কালেমা, নামায, রোযা ও যাকাতের মতো ইসলামের একটি অন্যতম রুকন। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে সে হজ্ব আদায় না করে শুধু নামায, রোযা এবং যাকাত আদায় করলে তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে না।"

খালেস নিয়্যতে হজ্ব করা

হজ্বের প্রথম আমল হলো নিয়্যতকে খাঁটি করা। আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনার্থে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্ব করছি, এমন নিয়্যত করবে। লোকে হাজী সাহেব বলবে, সম্মান দেখাবে, প্রসিদ্ধি অর্জন হবে, ব্যবসা ভালো জমবে, কামাই রোজগারের একটা হাতিয়ার হবে, ইলেকশনে আলহাজ্ব পরিচয় দেয়া যাবে ইত্যাদি বদ নিয়্যতে হজ্ব করলে সওয়াব তো হবেই না বরং রিয়ার কারণে গোনাহ হবে। রিয়া বা লোক দেখানো এমন ভয়ানক গোনাহ যে, এই একটি গোনাহের কারণেই বড় বড় শহীদ ও দানবীরগণ জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হবে। রিয়া থেকে বাঁচার জন্য হজ্বকে গোপন রাখা। অর্থাৎ হজ্বের পূর্বে যে ইখলাস দরকার হজ্ব সমাপনের পরও ইখলাস দরকার।

এখানে মাসায়েলের বিস্তারিত আলোচনা উদ্দেশ্য নয়, শুধু হজ্বের কিছু সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং বিশেষ কিছু আদবের বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত

জানার জন্য মুয়াল্লিমুল হুজ্জাজ (হজ্ব ও উমরার মাসায়েল) এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাব দেখা যেতে পারে অথবা আলেমদের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে।

মক্কা ও হারামে প্রবেশের সুন্নাত ও আদবসমূহ

জিদ্দা থেকে মক্কা শরীফ আসার পথে মক্কা শরীফের প্রায় দশ মাইল আগে হুদাইবিয়া (বর্তমান নাম শুমাইসিয়া) অবস্থিত। হজ্ব যাত্রীর পক্ষে সম্ভব হলে এখানে দুই রাকা'আত নামায পড়ে দু'আ করবেন। আর এখান থেকে তিনি আল্লাহর দরবারের বিশেষ সীমানায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তাই অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সঙ্গে তাওবা-ইস্তিগফার এবং তালবিয়া পড়তে পড়তে প্রবেশ করবেন।

তালবিয়া পড়া সুন্নাত

তালবিয়া নিম্নরূপ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ , لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيْكَ لَكَ

অর্থঃ আমি হাযির! হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই, আর সকল রাজত্বও তোমারই, তোমার কোনো শরীক নেই।

হজ্বের ফরয ৩টি

১. ইহরাম বাঁধা।
২. উকূফে আরাফাহ।
৩. তাওয়াফে যিয়ারাত।

হজ্বের ওয়াজিব ৬টি

১. উকূফে মুযদালিফা।
২. কঙ্কর মারা।
৩. সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা।
৪. কুরবানী করা।
৫. মাথা মুণ্ডিয়ে বা চুল খাটো করে হালাল হওয়া।
৬. তাওয়াফে বিদা।

হজ্বের সুন্নাতসমূহ

হজ্বের অনেকগুলো সুন্নাত রয়েছে, নিম্নে কয়েকটি বর্ণনা করা হলো–

১. মক্কার বাইরের লোকদের মধ্যে যারা হজ্বে ইফরাদ ও হজ্বে ক্বিরান আদায় করেন তাদের জন্য তাওয়াফে কুদূম করা।

২. তাওয়াফে কুদূমের ক্ষেত্রে রমল করা (অর্থাৎ ছোট ছোট কদমে দ্রুতবেগে হেঁটে তেজোস্বিতা প্রকাশ করা এবং পাহলোয়ানের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ দুলিয়ে বাহাদুরী প্রদর্শন করে তাওয়াফ করা)। যদি এই তাওয়াফে রমল না করা হয়, তবে তাওয়াফে যিয়ারত অথবা তাওয়াফে বিদার ভিতর রমল করতে হবে।

৩. ইমামের জন্য তিন জায়গায় খুৎবা প্রদান করা।

৪. ক) ৭ যিলহজ্ব মক্কা মুকাররামায়, খ) ৯ যিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে। যোহর ও আসরের নামাযকে যোহরের ওয়াক্তে একত্রে আদায় করার পূর্বে; আরাফায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নয়। গ) ১১ যিলহজ্ব মিনায়।

৫. ৮ যিলহজ্ব যোহরসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মিনায় আদায় করা।

৬. ৯ যিলহজ্ব তারিখে (অর্থাৎ ৮ যিলহজ্ব দিবাগত রাতে) মিনায় রাত্রি যাপন করা।

৭. ৯ যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফার ময়দানে গমন করা।

৮. আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর ইমামের রওয়ানা হওয়ার পরে রওয়ানা করা।

৯. আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা।

১০. আরাফায় গোসল করা।

১১. মিনার কাজ-কর্ম সম্পাদনকালে মিনায় রাত্রি যাপন করা।

১২. মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'মুহাসসাব' নামক উপত্যকায় অতিঅল্প সময়ের জন্য হলেও যাত্রাবিরতি করা।

১৩. ১০ তারিখে শুধু জামরায়ে আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করা। ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্ব তিনটি জামারাতে কঙ্কর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে জামরায়ে উলা, তারপর জামরায়ে উসতা এবং সর্বশেষে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা। -আলমগীরী-১/২৩৪

ইহ্‌রামের সুন্নাত ৯টি

১. হজ্বের মাসসমূহের কোনো একদিনে ইহ্‌রাম বাঁধা।
২. নিজ দেশের মীকাত ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় অতিক্রম করা।
৩. ইহ্‌রামের পূর্বে গোসল অথবা উযূ করা।
৪. চাদর এবং লুঙ্গি ব্যবহার করা।
৫. দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করা।
৬. চার শ্বাসে তালবিয়া পাঠ করা।
৭. তিনবার তালবিয়া পাঠ করা।
৮. উচ্চঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।
৯. ইহ্‌রামের নিয়্যত করার পূর্বে শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহ্‌রামের মুস্তাহাব ১০টি

১. ইহ্‌রামের পূর্বে দেহের ময়লা পরিষ্কার করা।
২. নখ কাটা।
৩. বগল পরিষ্কার করা।
৪. নাভীর নিম্নদেশের পশম দূরীভূত করা।
৫. ইহ্‌রামের নিয়্যতে গোসল করা।
৬. নতুন অথবা ধৌত করা সেলাই বিহীন সাদা লুঙ্গি অথবা চাদর পরিধান করা।
৭. চপ্পল পায়ে দেয়া।
৮. মুখে ইহ্‌রামের নিয়্যত করা।
৯. নামাযের পরে বসা অবস্থায় নিয়্যত করা।
১০. মীকাতের পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা।

তাওয়াফের সুন্নাত ১০টি

১. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা; চাই তা ইশারার মাধ্যমে হোক।
২. ইজতিবা করা। (চাদরের ডান অংশকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখাকে 'ইজতিবা' বলে।)
৩. প্রথম তিন চক্করে রমল করা।
৪. অবশিষ্ট চক্করগুলোতে রমল না করা বরং ধীরস্থিরে তাওয়াফ করা।
৫. সাঈ এবং তাওয়াফের মাঝে ইস্তিলাম (হাজরে আসওয়াদ চুম্বন) করা।

৬. হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময় উভয় হাত তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় কান বরাবর ওঠানো।

৬. হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করা। (অধিকাংশের মতে সুন্নাত এবং কেউ কেউ একে ওয়াজিব বলেছেন।)

৮. তাওয়াফ শুরু করার সময় হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করা।

৯. সকল চক্কর ক্রমাগত বিরতিহীনভাবে সম্পন্ন করা।

১০. শরীর এবং কাপড়-চোপড় নাজাসাতে হাকীকী হতে পাক রাখা।

তাওয়াফের মুস্তাহাব ১২টি

১. হাজরে আসওয়াদের ডান দিক থেকে তাওয়াফ এমনভাবে শুরু করবে যেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় তার দেহ পুরোপুরি হাজরে আসওয়াদ বরাবর হয়ে যায়।

ইসলাহ:

১. হাজরে আসওয়াদের ডান দিক বলে তার উত্তর দিক তথা বাইতুল্লাহ শরীফের দরজার দিক বুঝানো হয়েছে; হাজরে আসওয়াদের দক্ষিণ দিক নয়।

২. হাজরে আসওয়াদকে তিনবার চুম্বন করা।

৩. তাওয়াফ করার সময় কুরআন-হাদীসে বর্ণিত দু'আয়ে মাসূরাসমূহ পাঠ করা। উল্লেখ্য, অনেক বাজারী বইয়ে প্রত্যেক তাওয়াফের ভিন্ন ভিন্ন যেসব দু'আ লেখা থাকে সেগুলো অধিকাংশই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৪. ভিড় না থাকলে এবং কারও কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে পুরুষের জন্য বাইতুল্লাহ্‌র যথাসম্ভব নিকটবর্তী হয়ে তাওয়াফ করা।

৫. মহিলাদের জন্য রাতে পুরুষদের ভিড়ের বাইরে থেকে তাওয়াফ করার চেষ্টা করা।

৬. তাওয়াফের মধ্যে হাতীমে কা'বাকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া।

৭. যদি কেউ মাঝপথে তাওয়াফ পরিত্যাগ করে থাকে অথবা মাকরূহ পন্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে থাকে, তাহলে পুনরায় প্রথম থেকে সম্পন্ন করা।

৮. মুবাহ কথা-বার্তাও বর্জন করা।

৯. যে সমস্ত কাজ একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা পরিহার করা।

১০. দু'আ এবং যিকির-আযকার আস্তে আস্তে পাঠ করা।

১১. রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে সম্ভব হলে উভয় হাতে নতুবা শুধু ডান হাতে তাকে (চুম্বন ব্যতীত) স্পর্শ করা।

১২. আকর্ষণীয় বিভিন্ন বস্তু দেখা থেকে নযরকে হেফাযত করা।

সাঈ-এর সুন্নাত ৯টি

১. হাজরে আসওয়াদের ইস্তিলাম করে বা দূর থেকে ইশারার মাধ্যমে চুম্বন করে সাঈ-এর উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হওয়া।
২. তাওয়াফের পরপরই সাঈ করা।
৩. সাফা ও মারওয়ার উপর আরোহণ করা।
৪. সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আরোহণ করে কিবলামুখী হওয়া।
৫. সাঈ-এর চক্করসমূহ পর পর সম্পন্ন করা।
৬. জানাবাত এবং হায়েয নেফাস থেকে পবিত্র হয়ে সাঈ করা।
৭. এমন তাওয়াফের পরে সাঈ করা, যা পবিত্র অবস্থায় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাপড়, শরীর ও তাওয়াফের জায়গাও নাপাকী থেকে পবিত্র ছিলো, আর উযূও বহাল ছিলো।
৮. সবুজ বাতিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটু দ্রুত চলা।
৯. সতর ঢাকা। যদিও সর্বাবস্থায়ই সতর ঢাকা ফরয কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরো বেশি গুরুত্ব প্রদান করা।

ইসলাহঃ সবুজ বাতিদ্বয় অনেকে দৌড়ে অতিক্রম করে থাকে, এটা ঠিক নয়।

সাঈ-তে মুস্তাহাব ৫টি

১. নিয়্যত করা।
২. সাফা মারওয়ার উপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।
৩. বিনয় নম্রতার সঙ্গে তিন তিন বার করে যিকির ও দু'আ পাঠ করা।
৪. সাঈ-এর চক্করসমূহের অধিকাংশ বাকি থাকতে বিনাওযরে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি হলে নতুন করে সাঈ আরম্ভ করা।
৫. সাঈ সমাপ্ত করার পরে মসজিদে হারামে গিয়ে দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করা। মারওয়ার ওপরে এই নফল নামায আদায় করা মাকরূহ। মাতাফের কাছে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। -আহমাদ-৬/৩৯৯

উকূফে আরাফার সুন্নাতসমূহ

১. উকূফের জন্য গোসল করা।
২. দ্বিপ্রহরে সূর্য হেলে পড়লে ইমাম কর্তৃক যোহর ও আসর মসজিদে নামীরাতে আদায় করার পর দুইটি খুৎবা প্রদান করা।

৩. ইমামের নেতৃত্বে উক্ত নামাযদ্বয় যোহরের শুরু ওয়াক্তে একত্রে আদায় করা।
৪. নামাযের পর সঙ্গে সঙ্গে উকূফ (অবস্থান) করা।
৫. আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিব না পড়ে ইমামের সঙ্গে রওয়ানা হওয়া।

যদি কেউ ভিড়ের ভয়ে সূর্যাস্তের পরে ইমামের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে যায়, তাহলে কোনো দোষ হবে না। এমনিভাবে যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই রওয়ানা হয়ে আরাফার সীমানার মধ্যে থাকে এবং সূর্যাস্তের পর আরাফার সীমানা থেকে বের হয়, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই।

উকূফের মুস্তাহাবসমূহ

১. বেশি বেশি করে তালবিয়া, তাকবীর, তাহলীল, দু'আ, ইস্তিগফার, কুরআন
মাজীদ ও দুরূদ প্রভৃতি পাঠ করা।
২. (জাবালে রহমতের পাদদেশে) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়ানোর জায়গায় দাঁড়ানো।
৩. একাগ্রতা এবং বিনয় নম্রতা বজায় রাখা।
৪. ইমামের নিকটবর্তী পিছনে দাঁড়ানো।
৫. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো।
৬. সওয়ার হয়ে উকূফ করা।
৭. সূর্য হেলে পড়ার পূর্ব থেকে উকূফের জন্য প্রস্তুত হতে থাকা।
৮. উকূফের নিয়্যত করা।
৯. দু'আর জন্য হাত উঠানো।
১০. তিন-তিনবার করে দু'আ পাঠ করা।
১১. হামদ ও দুরূদের সঙ্গে দু'আ শুরু করা।
১২. হামদ ও দুরূদের সঙ্গে দু'আ সমাপ্ত করা।
১৩. পবিত্র অবস্থায় থাকা।
১৪. যিনি রোযা রাখতে সক্ষম তার রোযা রাখা এবং যিনি অপারগ তার রোযা না রাখা। কেউ কেউ রোযা থাকা মাকরূহ বলেছেন। কেননা রোযার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং হজ্বের আহকাম ঠিকমতো আদায় করতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য রোযা না রাখাই উত্তম।

১৫. রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকা। তবে যদি ওযর থাকে তাহলে ছায়ায় দাঁড়াতে অসুবিধা নেই।

১৬. ঝগড়া-বিবাদ না করা।

১৭. ভালো কাজ করা। যেমন যিকির-আযকার, সদকা ইত্যাদি প্রদান করা।

হজ্বের আদবসমূহ

১. হজ্বে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হালাল পাথেয় ও নেককার সঙ্গী তালাশ করে নিবে। হালাল পাথেয় দ্বারা অন্তরে নূর পয়দা হয়, আর নেককার সঙ্গী পদে পদে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নেক কাজের সহায়ক হয়।

২. হজ্বের সফরে কখনো ব্যবসার উদ্দেশ্য মনে স্থান দিবে না। কারণ মন ব্যবসার দিকে আকৃষ্ট থাকলে পবিত্র যিয়ারতের আসল উদ্দেশ্য আত্মার উন্নতি, আল্লাহর সঙ্গে আত্মার যোগাযোগ কমে যাবে।

৩. যাতায়াতকালে পানাহারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বন করবে। সাথী-সঙ্গী, চাকর-নকরদের সঙ্গে সদা প্রফুল্ল থাকতে চেষ্টা করবে। কারো সঙ্গে কঠোর ভাষায় কথা বলবে না। নম্রতা, ভদ্রতা ও মিষ্টিভাষা দিয়ে সফর অতিবাহিত করবে।

৪. কু-কথা, বিবাদ-বিসম্বাদ, অশ্লীল গল্প-গুজব এবং দুনিয়াদারীর কথাবার্তা সম্পূর্ণ বর্জন করবে। নিজের প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম হতে অবসর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিলাওয়াত, দু'আ-দুরূদ এবং আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হয়ে যাবে।

৫. হজ্বের মধ্যে নিজের মর্যাদা দেখানোর জন্য আড়ম্বরপূর্ণ যানবাহনে আরোহণ করবে না। সাধারণ মানুষ যে রকম গাড়ি বা উটে ভ্রমণ করে সে রকম যানবাহনই ব্যবহার করবে। প্রভুর দরবারে দ্বীন-দুঃখীর বেশে উপস্থিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ-কারণে হজ্বের সফরে জাঁকজমক পরিহার করা উচিত।

৬. হজ্বের সফরে যতোই কষ্ট হোক না কেন এবং যত বড় আর্থিক ক্ষতিই হোক না কেন, সন্তুষ্ট থাকবে এবং একে হজ্ব কবূল হওয়ার আলামত মনে করবে। রাস্তায় যত প্রকার কষ্ট ভোগ করতে হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সওয়াব পাওয়া যাবে। সুতরাং এ কষ্টের কথা অন্যের নিকট বলা থেকে বিরত থাকবে।

এক নযরে হজ্বের ধারাবাহিক নক্শা

৮ জিলহজ্ব - হজ্বের প্রথম দিন

- এহরাম অবস্থায় মক্কা থেকে মিনায় রওয়ানা করা। (এহরাম বাঁধা ফরয)
- এই দিন মিনায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাঁবুতে আদায় করা সুন্নাত।
- মিনায় রাত্রি যাপন সুন্নাত।

৯ জিলহজ্ব - হজ্বের দ্বিতীয় দিন

- ফজরের নামায মিনায় আদায় করে আরাফার ময়দানে রওয়ানা।
- আরাফায় সূর্য্য ঢলা থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত পুরো সময় অবস্থান করা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। কিছু সময় অবস্থান ফরয।
- যোহরের নামায যোহরের ওয়াক্তে এবং আসরের নামায আসরের ওয়াক্তে আরাফায় নিজ নিজ তাঁবুতে আদায় করা। (পুরো সময় দু'আ ও রোনা জারিতে মশগুল থাকা উত্তম।)
- সূর্য্যাস্থের পর মাগরিবের নামায আদায় না করে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা।
- মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশার নামায এক আযানে ও এক ইকামতে আদায় করা ওয়াজিব। মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা সুন্নাত।
- ইবাদতে ও দু'আয় মশগুল থাকা উত্তম।

১০ জিলহজ্ব - হজ্বের তৃতীয় দিন

- মুযদালিফায় সুবহে সাদিকের পর ফজরের নামায আদায়। সুবহে সাদিকের পর কিছুক্ষণ সময় অবস্থান করা ওয়াজিব। (দু'আ ও রোনাজারি করা উত্তম।)
- সূর্য্যদয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মিনায় রওয়ানা করা। মিনায় পৌঁছে প্রথমে শুধু জমরায়ে উখরায় (বড় শয়তানকে) সাতটি কঙ্কর মারা ওয়াজিব। ছোট ও মাধ্যম শয়তানকে নয়।

- বড় শয়তানকে কঙ্কর মারার পর দমে শোকর (কুরবানী করা) ওয়াজিব। এফরাদ হজ্জকারীদের ওয়াজিব নয়, বরং নফল।
- কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডানো বা ভালো করে চুল ছাঁটা ওয়াজিব। (কুরবানীর পূর্বে নয়) এখন ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত। সবকিছু হালাল। তবে স্ত্রী সহবাস জায়েয নয়। তারপর মক্কায় গিয়ে তাওয়াফে যিয়ারত করা ফরয। (এখন স্ত্রী সহবাস জায়েয।)
- তাওয়াফ শেষে মিনায় এসে রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।

১১ জিলহজ্ব - হজ্বের চতুর্থ দিন

- কোনো কারণে কুরবানী, চুল মুণ্ডানো বা ছাটানো ও ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ এগুলো যথাক্রমে করে ফেলা।
- সূর্য্য ঢলা থেকে সুবহে সাদিক পযর্ন্ত সময়ে মিনায় তিন শয়তানকে ৭টি করে মোট ২১টি কঙ্কর মারা ওয়াজিব। প্রথমে ছোট শয়তানকে (৭টি), তারপর মধ্যম শয়তানকে (৭টি), সর্বশেষে বড় শয়তানকে (৭টি) মোট ২১টি কঙ্কর মারবে।
- মিনায় রাত্রি যাপন করা সুন্নাত।

১২ জিলহজ্ব - হজ্বের পঞ্চম দিন

- কোন কারণে কুরবানী ও তাওয়াফে যিয়ারত না করে থাকলে আজ সূর্য্যাস্তর পূর্বে অবশ্যই করতে হবে। পরে করলে দম ওয়াজিব হবে।
- সূর্য্য ঢলা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়ে তিন শয়তানকে কঙ্কর মারা ওয়াজিব। প্রথমে ছোট শয়তানকে (৭টি), তারপর মধ্যম শয়তানকে (৭টি), সর্বশেষে বড় শয়তানকে (৭টি) মোট ২১ টি কঙ্কর মারবে।
- সূর্য্যাস্তের পূর্বে মক্কায় রওয়ানা জায়েয।

১৩ জিলহজ্ব - হজ্বের ষষ্ট দিন

- মিনায় যথাক্রমে তিন শয়তানকে কঙ্কর মেরে মক্কায় আসা উত্তম। সুন্নাত সময় হলো সূর্য্য ঢলা থেকে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত। দুপুরের পূর্বেও কঙ্কর মারা জায়েয, তবে মাকরূহ। কোনো কারণে ১৩ তারিখে মিনায় থাকা অবস্থায় সুবহে সাদেক হয়ে গেলে তখন কঙ্কর মারা ঐচ্ছিক থাকে না, বরং ওয়াজিব হয়ে যায়।

- হজ্ব শেষ হওয়ার পর মক্কা থেকে মদীনা গমনের অথবা দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বিদায় তাওয়াফ করা সর্বশেষ ওয়াজিব।

ইসলাহ: বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে হজ্ব এজেন্সি ও ব্যবস্থাপনার কারণে সময় ও স্থানের সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলের ক্ষেত্রে তারতম্য হয়ে যায়।

মযবুরী তথা অপারগতার কারণে ফরয, ওয়াজিব সুন্নাতের ব্যত্যয় না ঘটলে তাদের ব্যবস্থাপনায় কাজ করা উচিত। অন্যথায় এককভাবে করতে গেলে অনেক সমস্যা।

হজ্বের পরিপূর্ণ বরকত লাভের জন্য জরুরী হিদায়াত

হজ্ব যেহেতু মর্যাদা লাভের উপায় এবং উপকার ও বরকতের কারণ তাই এই বরকত লাভের আশায় হজ্বব্রত পালন করা চাই। তবে এর জন্য প্রয়োজন দু'টি জিনিসের। ১. হজ্ব কামেল হওয়া। ২. স্থায়ী হওয়া।

১. হজ্ব কামেল হওয়া

হজ্ব কামেল এবং পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য আরকানে হজ্ব নিয়মানুসারে আদায় করা প্রয়োজন। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং মুস্তাহাবসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করলে হজ্ব কামেল ও পরিপূর্ণ হয়। আরকানে হজ্ব আদায়ের ক্ষেত্রে যেন নিয়ম-কানুনের খেলাফ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কোনো মাসআলা অজানা থাকলে তা অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। নিজের মন মতো ও অন্যের দেখা-দেখি আমল করা যাবে না। এতো টাকা-পয়সা ব্যয় করে নিজের মন মতো আরকানে হজ্ব পালন করলে তা হবে বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাই না জানা বিষয় ভালো করে অবগত হয়ে নিয়ম মোতাবিক সঠিক-সুন্দরভাবে আদায় করতে হবে। যাতে কোনো প্রকার অসম্পূর্ণতা না থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের ইখলাস রাখতে হবে। যে হজ্ব ইখলাসের সঙ্গে পালন করা হয়, কেবল সেই হজ্বই বরকতময় এবং ফযীলতপূর্ণ হয়। লোক দেখানো অথবা প্রসিদ্ধি অর্জনের মতো হীন উদ্দেশ্যগুলো যেন কোনোক্রমেই হজ্ব বাতিল না করতে পারে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, এমন এক যামানা আসবে যখন মুসলিম উম্মাহ্র বিত্তশালীরা শুধু ভ্রমণ এবং বিনোদনের জন্য, মধ্যবিত্তরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, গরীব-দুঃখীরা ভিক্ষাবৃত্তির জন্য এবং উলামা-মাশাইখগণ প্রসিদ্ধি অর্জন ও দুনিয়াবী ফায়দা হাসিলের জন্য হজ্ব করবে। অপর পক্ষে কিয়ামত পর্যন্ত এক

শ্রেণীর লোক এমনও থাকবেন, যাঁরা হবেন অত্যন্ত মুখলিস, যাঁরা কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইখলাসের সঙ্গে হজ্ব করবেন।

কাজেই যে কোনো আমল বিশেষত হজ্বে বাইতুল্লাহ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করা উচিত। ইখলাস ছাড়া কোনো আমলই কবূল হয় না। নিয়্যত খালেস করার পাশাপাশি খুব বেশি বেশি দু'আ করা চাই যেন আল্লাহ তা'আলা এই শেষ যামানায় আমাদেরকে ইখলাসওয়ালা হজ্ব নসীব করেন এবং রিয়াকার শ্রেণীর হজ্ব থেকে হেফাযত করেন।

২. হজ্ব গোপন রাখা

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে হজ্বের স্থায়িত্ব লাভ হওয়া। এর জন্য প্রথমতো প্রয়োজন হলো যথাসম্ভব হজ্ব গোপন রাখা। কথা-বার্তায়, কাজে-কর্মে এবং ইশারা-ইঙ্গিতে হজ্বের কথা মানুষের সম্মুখে প্রকাশ না করা। হজ্বের পূর্বে এবং হজ্ব পালনের সময় যেমন ইখলাসের প্রয়োজন, তেমনি হজ্ব পালনের পরও ইখলাসের প্রয়োজন। এমন যেন না হয়, আল্লাহ পাক আমাদেরকে মেহেরবানী করে নেয়ামত প্রদান করেছেন আর আমরা এই নেয়ামতের কথা এমনভাবে বলে বেড়াই, যাতে অজানা মানুষজন অবগত হয়, আমরা হাজী। এরূপ আচরণ থেকে সম্পূর্ণ সতর্ক এবং বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় আমাদের হজ্ব করার অর্থ হবে নাম-ধাম এবং প্রসিদ্ধি লাভ করা। এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো, অনেক সময় লোকেরা এ-ধরনের কর্মকাণ্ড করে থাকে। অনেক সময় হজ্বের ঘটনাবলী বর্ণনা করা শুরু করে। কখনো সফরের খরচ ইত্যাদিও আলোচনা শুরু করে। কোনো সময় মক্কা-মদীনার বরকতময় স্থান ও বস্তুসমূহের কথা বলাবলি করে। উদ্দেশ্য হলো, যাতে তার হজ্ব পালনের বিষয়টি সকলের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং জানাজানি হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন এক ধনাঢ্য হাজীর বাড়িতে এক বুর্যূগ গরমের মৌসুমে তাশরীফ আনেন। বুর্যূগ লোকটি অত্যন্ত পিপাসার কারণে পানি চাইলে ধনাঢ্য ব্যক্তি মশক থেকে পানি আনতে বলেন। মদীনা শরীফে এক ধরনের পানি রাখার মশক আছে; যাতে পানি ঠাণ্ডা থাকে। হাজী সাহেব তাবাররুক স্বরূপ ওই মশক ভরে পানি এনে সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি তার খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, দ্বিতীয় হজ্বের সময় যে মশক ভরে পানি এনেছি, সেই মশক থেকে বুযুর্গের জন্য পানি নিয়ে এসো। যাই হোক, ধনাঢ্য ব্যক্তির আদেশ মোতাবেক পানি দেয়া হলো। পানিও ঠাণ্ডা ছিলো। বুর্যূগ ব্যক্তি পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে বললেন, 'আপনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানি পান করিয়েছেন, আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি। তাই

আপনার কল্যাণের উদ্দেশ্যে বলি, আপনি বলেছেন, দ্বিতীয় হজ্বের সময়ে আনা মশক থেকে পানি নিয়ে এসো! এতে আপনি প্রকাশ করেছেন, আপনি দুইবার হজ্ব করেছেন। এরূপ বলা ইখলাস পরিপন্থী। এতে আপনার উভয় হজ্বের সওয়াব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই আপনি তৃতীয়বার আরেকটি হজ্ব আদায় করুন! এভাবে না বলে বলা যেত, ডান অথবা বাম দিকে রাখা মশক থেকে পানি নিয়ে এসো! এভাবে বললেও উদ্দেশ্য সফল হতো। ঠাণ্ডা পানি আনা হতো এবং হজ্বের বিষয়টিও গোপন থাকতো। অনুরূপভাবে অনেক সময় এরূপ প্রশ্ন করা হয়, আপনি কতোবার হজ্ব পালন করেছেন? এ ধরনের প্রশ্নের কী প্রয়োজন এবং কী লাভ? কেবল আমল করলেই হবে না, তা আল্লাহর কাছে কবূলও হতে হবে। কবূল হলো কি না তা জানার কোনো উপায় কারো কাছে নেই। এ অবস্থায় এ-ধরনের প্রশ্নের উপকারিতা কোথায় এবং প্রকাশের দ্বারা লাভ কী? কোনো লাভ তো নেই। তাই, গোপন রাখাই ভালো।

উমরা

উমরার ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা হজ্ব ও উমরা একই সঙ্গে সম্পন্ন করো। কারণ এগুলো দারিদ্র্য ও গুনাহকে এমনভাবে দূর করে, যেভাবে কামার ও স্বর্ণকারের হাপর লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা দূরীভূত করে।' –জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৮১০ ; সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ২৬৩০; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ২৫১২

আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হজ্ব ও উমরার কারণে শুধু গুনাহ্ই মাফ হয় না; বরং এতোদুভয়ের বরকতে মানুষের দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনও দূরীভূত হয়ে যায়। আর হজ্ব ও উমরা পালনকারী ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনেক ফায়দা নিহিত থাকে যদি নিয়্যতের মধ্যে ইখলাস থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "রমযান মাসে উমরা পালন করা সওয়াবের দিক দিয়ে এক হজ্বের সমান। অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে, তার সওয়াব ওই হজ্বের সমান, যা আমার সঙ্গে পালন করা হয়েছে।" - জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৯৩৯

হজ্ব ও উমরা পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। তারা যদি আল্লাহর নিকট কোনো প্রার্থনা করেন, তিনি তা কবূল করে থাকেন এবং যদি পাপ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তবে তাঁদের গুনাহ ক্ষমা করেন। –ইবনে মাজাহ্

হজ্ব বা উমরার সফরে নামাযের বিধান

সফর অবস্থায় চার রাকা'আত ফরয নামাযগুলো অর্থাৎ যোহর, আছর, ইশা দুই রাকা'আত পড়ুন। সুন্নাত ও নফলের বিধান হলো, স্বাভাবিক ও স্বস্তি অবস্থায় সুন্নাত পড়া উত্তম। তাড়াহুড়া ও কষ্ট ক্লান্তি কিংবা কোনো কঠিন অবস্থায় একেবারে না পড়লে কোনো গোনাহ নাই।

* যদি কোনো স্থানে বা হজ্ব ক্যাম্পে পনের দিন কিংবা-এর চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করা হয়, তবে পূর্ণ অর্থাৎ চার রাকা'আতই পড়বে।

* জাহাজ এবং বাসের সফরে যতদিনই এই সফর চলতে থাকে কসর অর্থাৎ চার রাকা'আত ফরযের স্থলে দুই রাকা'আতই পড়বে।

* মক্কা শরীফ পৌঁছার পর মিনা যাওয়ার পূর্বে যদি মক্কা শরীফে পনের দিন কিংবা পনের দিনের বেশি অবস্থানের বিষয় মনস্থ হয়, তবে নামায পুরা পড়বে। তা না হলে কসর পড়তে হবে।

* এমনিভাবে মিনা থেকে ফেরার পর মক্কা শরীফে পনের দিন কিংবা বেশি অবস্থানের এরাদা হলে নামায পূরা পড়বে। তা না হলে কসর পড়তে হবে।

হারামাইন শরীফাইন ও মহিলাদের নামায প্রসঙ্গ

● হারামাইন শরীফাইন বা অন্য কোথাও নামাযের জামা'আতে যদি পুরুষ ও মহিলা শরীক হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষদের থেকে মহিলাদের ভিন্ন দাঁড়ানো জরুরী। এই পুরুষ সেই মহিলার পিতা, পুত্র বা স্বামী হলেও একই মাসআলা অর্থাৎ নামাযের জামা'আতে ভিন্ন দাঁড়াতে হবে। –আলমগীরী

● কিন্তু বর্তমানে হারামাইন শরীফাইনে মহিলাদের জন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড ভীর ইত্যাদির কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত মাসআলার বিপরীত হয়ে থাকে অর্থাৎ মহিলারা পুরুষদের মাঝে দাঁড়িয়ে জামা'আতে শরীক হয়ে যান। এরূপ করা জায়েয নয়।

● এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, মহিলাদের জন্য দেশে-বাড়িতে ঘরে নামায পড়া যেমন উত্তম তেমনি মক্কা-মদীনায়ও তাদের জন্য জামা'আতে নামায না পড়ে ঘরে বিনা জামা'আতে নামায পড়া উত্তম। আর মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে নামায পড়ার দ্বারা যে সওয়াব পুরুষদের লাভ হয়, তার চেয়ে বেশি সওয়াব ঘরে নামায পড়ার দ্বারা মহিলাদের লাভ হবে। অতএব, সেখানে অবস্থানকালে মহিলাদের নিজ নিজ অবস্থান স্থলেই নামায পড়া চাই। অবশ্য যখন বাইতুল্লাহর যিয়ারত বা তাওয়াফের জন্য মসজিদে হারামে কিংবা সালাত ও সালামের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে যাবেন তখন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তাদের নির্ধারিত স্থানে জামা'আতে নামায পড়ে নিবেন। –রাফীকে হজ্ব

● এ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক থাকতে হবে যে, যদি কোনো মহিলা ঘটনাক্রমে পুরুষদের কাতারের মধ্যে এসে যান এবং বের হওয়া মুশকিল হয়, তখন যেন নামাযের নিয়্যত না করে সেখানেই নীরবে বসে যান; জামা'আতে

শরীক না হোন। কেননা কোনো মহিলা পুরুষদের বরাবরে জামা'আতে শরীক হলে তার ডান বামে এক একজন পুরুষের এবং পিছনে একজন পুরুষের নামায নষ্ট হয়ে যায়। জামা'আত শেষ হওয়ার পর একা মুনাসিব কোনো জায়গায় নিজ নামায পড়ে নিবেন। –রাফীকে হজ্ব: মাওলানা রাফী উসমানী

ইসলাহ : ইদানিং মক্কা, মদীনার হোটেলে, বাসা-বাড়িতে বাধ্যতামূলক টেলিভিশন, ভি,সি,আর রাখা হয়, যা হজ্বের সময় বিনা দ্বিধায় উপভোগ করে এবং অজ্ঞতার কারণে হারাম শরীফের নামাযের ইমামের সঙ্গে টেলিভিশনের মাধ্যমে ওই ইমামের ইক্তিদা করে। এমতাবস্থায় টেলিভিশনের মাধ্যমে ইমামের সঙ্গে ইকতিদা কোনক্রমেই সহীহ হবে না বরং এটা এক ধরনের পাগলামী ছাড়া কিছু নয়।

যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজূদাত, তাজেদারে মদীনা সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত সর্বসম্মতভাবে সর্বাধিক সওয়াবের কাজ এবং যাবতীয় মান-মর্যাদা ও উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। কোনো কোনো আলেম সঙ্গতিসম্পন্ন লোকদের জন্য একে ওয়াজিব গণ্য করেছেন। স্বয়ং ফখরে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যিয়ারতের প্রতি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করেছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিয়ারত না করবে তাদের অভদ্র এবং জালেম বলে অভিহিত করেছেন। সেই ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান যাকে এই দৌলত দ্বারা পুরস্কৃত করা হয় এবং অত্যন্ত দুর্ভাগা সেই লোক যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই সর্বোত্তম নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশপাশে থাকবে।'

'যে ব্যক্তি হজ্ব সম্পন্ন করলো এবং আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করলো, সে যেন জীবদ্দশায়ই আমার যিয়ারত করলো।'

'যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করলো অথচ আমার কবর যিয়ারত করলো না, সে আমার উপর জুলুম করলো।'

'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করলো, তার জন্য শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে গেলো।'

উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে আকায়ে নামদার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর যিয়ারতের প্রতি যারপরনাই উৎসাহ প্রদান করেছেন। এজন্য প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের এই পরম সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত।

মদীনা মুনাওয়ারা সফরের আদব

মদীনার পানে রওয়ানার শুরু থেকেই দুরূদ শরীফ ও ইস্তেগফার পড়া আরম্ভ করে দিবে। সম্পূর্ণ পথে দুরূদ ও ইস্তেগফার অব্যাহত রাখবে। যখন মদীনা শহর দৃষ্টিগোচর হয় তখন খুব বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়বে। মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা যতো বেশি অন্তরে স্থান পাবে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নৈকট্যও ততো বেশি হাসিল হবে।

মদীনা মুনাওয়ারা সফরের পূর্বে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করে নিলে অনেক ফায়দা হাসিল হবে।

সফরের নিয়্যত

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের নিয়্যতেই এই মোবারক সফর করুন। মসজিদে নববীর যিয়ারতও সে সঙ্গে হয়ে যাবে।

মসজিদে নববীতে প্রবেশ

মদীনা শরীফে পৌঁছে থাকার জায়গা ঠিক করে উযূ-গোসল সেরে মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে বের হোন। মসজিদের সব দিকেই অনেক দরজা রয়েছে, যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। তবে বাবে জিব্রীল দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা উত্তম। রওযা শরীফের পূর্ব দিকে এ দরজা রয়েছে। দু'আ ও দুরূদ পড়তে পড়তে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করুন। অতঃপর হুজরা শরীফ ও মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থান রিয়াযুল জান্নাতে (বেহেশতের বাগান) পৌঁছে (মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে) দুই রাকা'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ুন। অতঃপর যিয়ারত কবূল হওয়ার জন্য পূর্বেই দু'আ করে নিন।

রওযা-পাকে সালাম পেশ করার নিয়ম

নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর অত্যন্ত আদবের সঙ্গে রওযা শরীফের দিকে যান। রওযা শরীফে পৌঁছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারকের বরাবর (যা পিতলের গোল বৃত্ত দ্বারা চিহ্নিত আছে) একটু পিছন দিকে দাঁড়িয়ে যান। জালির একদম কাছে যাবেন না এবং একেবারে বেশি দূরেও সরে যাবেন না। কেবলার দিক পিছন করে একটু বাম দিকে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও আবেগের সঙ্গে মধ্যম আওয়াযে এভাবে দুরূদ ও সালাম পেশ করুন–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلْدِ اٰدَمَ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

উচ্চারণ: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া খইরা খালকিল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া সায়্যিদা উলদি আদামা আসসালামু আলাইকা ইয়া আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকা'আতুহু।

এরপর এক হাত ডান দিকে গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়ান এবং এভাবে সালাম পেশ করুন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ وَثَانِيَهِ فِي الْغَارِ وَ رَفِيْقَهُ فِي الْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى الْاَسْرَارِ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا

"আসসালামু আলাইকা ইয়া খলীফাতা রাসূলিল্লাহি, ওয়া ছানিয়াহু ফিল গারি, ওয়া রাফীকাহু ফিল আসফারি, ওয়া আমীনাহু আলাল আসরারি, আবা বাকরিনিস সিদ্দীক, জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইরান।" এরপর এক হাত ডান দিকে গিয়ে হযরত উমর (রাযি.)--এর চেহারা মোবারকের বরাবর দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম পেশ করুন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ الْفَارُوْقَ الَّذِيْ اَعَزَّهُ اللهُ بِهِ الْاِسْلَامَ اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ مَرْضِيًّا حَيًّا وَمَيِّتًا جَزَاكَ اللهُ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا

উচ্চারণ: "আসসালামু আলাইকা ইয়া আমীরাল মু'মিনীন, উমারাল ফারুকাল্লাযী আআয্যাহুল্লাহু বিহিল ইসলামা ইমামাল মুসলিমীনা মারযিয়্যান হাইয়্যান ওয়া মায়্যিতান জাযাকাল্লাহু আন উম্মাতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইরান। এবার রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

রওযা মোবারকে এসে সালাত ও সালাম পেশ করে তাঁর ওসীলা দিয়ে শাফায়াতের জন্য এভাবে দু'আ করুন :

يَارَسُوْلَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللهِ فِى اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ

উচ্চারণ: ইয়া রাসূলাল্লাহি আসআলুকাশ শাফা'আতা ওয়া আতাওয়াসসালু বিকা ইলাল্লাহি ফী আন আমূতা মুসলিমান আলা মিল্লাতিকা ওয়া সুন্নাতিকা।

সবশেষে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রাণভরে মোনাজাত করুন। মদীনা শরীফে যতদিন অবস্থান করবেন, এই নিয়মে সময়-সুযোগ পেলেই যিয়ারত করুন।

রিয়াযুল জান্নাত

হুজরা মোবারাক ও মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী একটি চিহ্নিত স্থান 'রওযায়ে-জান্নাত' বা বেহেশতের বাগান নামে পরিচিত। এই স্থানটির বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এখানে নামায পড়ারও বিশেষ ফযীলত আছে। কিন্তু নামাযের জামা'আতে প্রথম কাতারের ফযীলত অগ্রগণ্যতা রাখে।

রওযা শরীফ ও রিয়াযুল জান্নাত যিয়ারতে সতর্কতা

সরকারে দুআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা আকদাসে হাজিরী সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা নিজের জিন্দেগীর সকল অর্জিত নেকি সর্বস্ব হারাতে হবে এবং সৌভাগ্যের পরিবর্তে বয়ে আনতে পারে দূর্ভাগ্য। বর্তমানে যিয়ারতকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এক সাথে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পরে এজন্য কর্তৃপক্ষ ভিতরে গমনকালে লোকজনকে আটকিয়ে পরিমাণমতো করে পর্যায়ক্রমে ঢুকতে দেয়, এতে লোকজন বাধাগ্রস্থ হয়। যখন ছাড়া পায় তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে, শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি, স্থান দখলের প্রতিযোগিতা। এতে করে হট্টগোল সৃষ্টি হয়। ইবাদতের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। রওযা শরীফের শানে এ ধরনের বেয়াদবিমূলক কাজ ঠিক নয়।

অনেকে মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়তে থাকে, নামাযের সম্মুখ দিয়ে অবাধে যাতায়াত করে থাকে, অনেকে যিয়ারতের সময় ক্যামেরা দিয়ে নির্দিধায় ছবি উঠাতে থাকে। রওযা শরীফের জালির ভিতরে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে। এখানে দুরূদ-সালামের প্রতি কোনো খেয়াল নেই শুধু তামাশা দেখাই যেন উদ্দেশ্য। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে।

মসজিদে নববীতে জামা'আতে নামায

মনে রাখবেন, কোনো অবস্থাতেই যেন মসজিদে নববীতে আপনার জামা'আতের নামায ফওত না হয়। মসজিদে নববীতে এক নামাযের সওয়াব বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এক হাজার নামায অপেক্ষাও বেশি। ইবনে মাজাহ শরীফের এক রেওয়ায়েতে পঞ্চাশ হাজার নামাযের সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ধারাবাহিকভঅবে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং মাঝে এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দিবে না, তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লিখে দেওয়া হবে।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৬০৫ (৩/১৫৫); মুজামে আওসাত, তাবারানী, হাদীস নং ৫৪৪৪

এই জন্য মসজিদে নববীতে জামা'আতে নামায পড়ার বিশেষ চেষ্টা রাখতে হবে। সম্ভব হলে, মসজিদে নববীতে স্বতন্ত্রভাবে এতেকাফও করুন এবং কুরআন শরীফ খতম, অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন, মদীনার মিসকীন, প্রতিবেশী এবং স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন। সাধ্যানুযায়ী হাদিয়া-তোহফা ও দান-খয়রাত করুন। সেখান থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ও তাদের সাহায্যের নিয়্যত করুন; এতে সওয়াবও পাবেন।

হজ্ব ও উমরা পালনে সংশোধনযোগ্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

হজ্ব ও উমরা পালনে প্রচলিত ভূলসমূহ ও তার ইসলাহ

ইহরাম বিষয়ক ভ্রান্তিসমূহ

ইহরামের দুই রাকা'আত নামায

ইহরাম বাঁধার আগে দুই রাকা'আত নামায পড়ার নিয়ম আছে। তাই অনেককে দেখা যায়, এই দুই রাকা'আত নামাযের সুযোগ না পাওয়ার কারণে ইহরাম বিলম্বিত করতে থাকে। এমনকি এ নামায পড়তে না পারার কারণে কেউ কেউ ইহরাম ছাড়াই মীকাতের ভেতরে পর্যন্ত চলে যায় অথচ ইহরাম ছাড়া মীকাতের ভেতরে চলে যাওয়া জায়েয নয়। তারা যেহেতু ইহরামের আগে দুই রাকা'আত নামায আদায়কে জরুরী মনে করে তাই তারা এমনটি করে থাকে। অথচ ইহরামের আগে নামায পড়া সকল মাযহাবেই মুস্তাহাব; জরুরী কিছু নয়। পক্ষান্তরে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা নাজায়েয। সুতরাং ইহরামের আগে নামাযের সুযোগ পেলে তো তা আদায় করা চাই, কিন্তু সুযোগ না পেলে সে কারণে ইহরাম বাঁধাকে বিলম্বিত করবে না।

–সহীহ মুসলিম:১/৩৭৬, রদ্দুল মুহতার ২/৪৮১-৪৮২

অকারণে ইহরাম বাঁধায় বিলম্ব করা

কেউ কেউ আগে থেকেই ইহরাম বাঁধা ঝামেলা মনে করে এবং ভাবে যে, ইহরাম বেঁধে নিলেই তো ইহরামের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে যাবে। বিমান যেহেতু জিদ্দায় অবতরণ করবে তাই জিদ্দায় ইহরাম বাঁধার ইচ্ছায় ইহরামকে বিলম্বিত করে। অথচ মীকাতের বাইরের হাজ্বীদের জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। উপমহাদেশ থেকে গমনকারী হাজ্বীদের জন্য মীকাত হলো কারনুল-মানাযিল ও যাতু ইরক যা অতিক্রম করেই জিদ্দায় যেতে হয়। যদি কেউ বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করে তবে ওই ব্যক্তির জন্য পুনরায় মীকাতে

ফিরে এসে ইহরাম বেঁধে যাওয়া জরুরী। যদি তা না করে তবে দম ওয়াজিব হবে। যেহেতু বিমানে থাকা অবস্থায় মীকাতের জায়গা নির্ধারণ করা কঠিন বা ঐ সময় ঘুমিয়ে পড়া, অন্যমনস্ক থাকা ইত্যাদি হতেই পারে। তাই বিমানে চড়ার আগে কিংবা বিমানে উঠেই ইহরাম বেঁধে নেওয়ার কথা বলা হয়।

–মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস ১৫৭০২

ইহরামের কাপড় পরিবর্তন

কেউ কেউ মনে করেন, যে কাপড়ে ইহরাম বাঁধা হয়েছে সে কাপড় হালাল (ইহরাম শেষ) হওয়ার আগ পযর্ন্ত বদলানো যাবে না। এটা একটা ভুল ধারণা। ওই কাপড় না পাক না হলেও বদলানো যাবে। –গুনিয়াতুন নাসিক পৃ:৭১

ইহরামের পুরো সময় ইযতিবা করা

অনেককে দেখা যায়, ইহরামের প্রথম থেকেই ইযতিবা (বাম কাঁধের উপর চাদর রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে পরিধান করা) করে থাকে এবং হালাল হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকাকে করণীয় মনে করে। এটি সম্পূর্ণ ভুল। এভাবে নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে। আবার কেউ কেউ তওয়াফের সময় ইযতিবা করে এবং এ অবস্থায় সায়ীও করে থাকে এবং তওয়াফের মতো মনে করে। অথচ সাঈতে ইযতিবার বিধান নেই।

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের পর্দা

ইহরাম অবস্থায়ও মহিলাদের চেহারার পর্দা করা জরুরী। যেহেতু নারী-পুরুষ সকলের জন্যই এ অবস্থায় চেহারায় কাপড় লাগানো নিষেধ, তাই অনেক মহিলা মনে করে যে, ইহরাম বাঁধার পর চেহারার পর্দা করা যাবে না। ফলে পর্দানশীন মা-বোনদের অনেককেই পুরো হজ্বের সফরে ইহরাম অবস্থায় চেহারায় কাপড়ের স্পর্শ ছাড়াও চেহারার পর্দা সম্ভব। এজন্য আজকাল ক্যাপ পাওয়া যায়, যা পরিধান করলে মুখের পর্দাও হয়ে যায়, আবার মুখে কাপড় না লাগানোর উপরও আমল হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, ক্যাপের উপর দিয়ে নেকাব পরিধান করলে বাতাসে কিংবা চলাফেরার সময় অনেক ক্ষেত্রে নেকাবের কাপড় চেহারায় লেগে যায়। এতে অনেকে বিব্রত হন যে, না জানি ইহরাম পরিপন্থী কিছু হয়ে গেল কি না। কিন্তু মাসআলা হলো, এত অল্প সময়ের জন্য লাগলে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই এই পন্থা অবলম্বন করে হলেও চেহারার পর্দা করা জরুরী।

–সুনানে আবু দাউদ ১/২৫৪, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৩৮

মাহরাম পুরুষ ব্যতীত হজ্বের সফর

পর্দা সবসময় ফরয; কিন্তু হজ্বের মুবারক আমল করতে এসেও যে পরিমাণ বেপর্দা ও বেহায়াপনা পরিলক্ষ্যিত হয়, তার উপর যতোই আফসোস করা হোক, তা কমই হবে। মাহরাম না পাওয়া গেলে বা তার খরচ বহন করতে না পারলে নারীর সারা জীবন অপেক্ষা করতে হলেও করতে হবে; তবুও মাহরাম ছাড়া হজ্বের সফরে আসার অনুমতি নেই। অথচ কাফেলা-বন্দী হয়ে অনেক নারীই বর্তমানে মাহরাম ছাড়া হজ্বের সফরে আসছে। এরকম মাহরাম ছাড়া নারী হজ্ব করতে গেলে অবশ্যই গুনাহগার হবে।

বাইতুল্লাহর প্রথম দর্শন

মুমিন বান্দা যখন বিরাট ত্যাগ-তিতিক্ষার পর অনেক কষ্ট-ত্যাগ বরদাশত করে বাইতুল্লাহ শরীফের একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় তখন আবেগের বশবর্তী হয়ে ইহরামের কথা ভুলে গিয়ে বাইতুল্লাতে হাত লাগায়, আলিঙ্গন করে। যেহেতু বাইতুল্লাহর দেয়ালে ও গিলাপে নিচ থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট পরিমাণ চর্তুদিকেই সুগন্ধি লাগানো থাকে, তাই যে কোনো অংশে হাত লাগানো দ্বারাই হাতে সুগন্ধি লেগে যেতে পারে, যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। সুতরাং এ সময় আবেগের বশবর্তী না হয়ে হুঁশকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। একটু সতর্ক হলেই এ বড় ভুল থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। –সহীহ মুসলিম ১/৩৭৩, ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১২৪

বাইতুল্লাহর স্পর্শ ও আলিঙ্গন

অনেককে বাইতুল্লাহর কোনো স্থান ফাঁকা পেলেই গিলাফ ধরতে, দেয়ালে চুমু দিতে, সীনা লাগাতে ও স্পর্শ করতে দেখা যায় অথচ বাইতুল্লাহর তিন স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়ার কোনো বিধান নেই। না এতে কোনো সওয়াব আছে। স্থান তিনটি হলো: ১. হজরে আসওয়াদ ২. রুকনে ইয়ামানী। (বাইতুল্লাহর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হলো রুকনে ইয়ামানী) এই কোণে উভয় হাত দ্বারা শুধু স্পর্শ করা সুন্নাত, চুমু নয়। ৩. মুলতাযাম। এটি হাজরে আসওয়াদ থেকে বাইতুল্লাহর দরজা পর্যন্ত স্থান। এখানে সীনা, গাল উভয় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

–জামে তিরমিজী ১/১৭৪, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া

তাওয়াফের দু'আ

অনেকেই তাওয়াফের প্রতি চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট দু'আ পড়াকে জরুরী মনে করে। ফলে নির্ধারিত দু'আ শেষ হয়ে গেলে অন্য দু'আ পড়ে না।

নির্দিষ্ট দু'আটি নিজের মুখস্থ না থাকলে অন্যের সাহায্য নেয়। এটা ভুল। যদিও রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মাঝে "রাব্বানা আতিনা... এই দু'আ পড়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু এ স্থানেও নির্দিষ্ট এই দু'আটি পড়াও সুন্নাত নয়; বরং উত্তম বলা যেতে পারে। অতএব, তাওয়াফের কোনো নির্দিষ্ট দু'আ পড়া জরুরী নয়, এমনকি সুন্নাতও নয়; বরং এ সময় মাসুরা তথা কুরআন-হাদীসে বা সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে কোনো দু'আই পড়া যেতে পারে। এমনিভাবে অন্য যে কোনো ভালো দু'আও পড়া যেতে পারে। দু'আ আরবীতে করাও জরুরী নয়। নিজের ভাষায় করা যেতে পারে। তাওয়াফে কোনো নির্দিষ্ট দু'আ পড়া জরুরী মনে করার কারণে এখানে আরো কিছু ভুল হয়। যেমন অনেকে জামা'আতবদ্ধ হয়ে তাওয়াফ করে এবং জামা'আতের মধ্যে একজন মুখস্থ বা কিতাব দেখে দেখে উঁচু আওয়াযে দু'আ পড়ে আর তার সঙ্গে পুরো জামা'আত সমস্বরে দু'আ পড়তে থাকে। এ নিয়মে একাধিক আপত্তিকর বিষয় রয়েছে-

ক. সমস্বরে দলবদ্ধভাবে দু'আ পড়ার কারণে অন্যদের একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়।

খ. এভাবে দু'আ পড়া-পড়ানোর রেওয়াজ সালাফ থেকে প্রমাণিত নেই। এজন্যও তা ত্যাগ করা দরকার।

গ. আরো একটি বড় ক্ষতি হলো, দলবদ্ধভাবে চলার কারণে মাতাফে ভিড় সৃষ্টি হয়। অন্যদের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। এতে অন্যদের ভীষণ কষ্ট হয়। অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা খারাপ।

যদি সকলেই নিজে নিজে চলত এবং দেখে দু'আ না পড়ত, যা মুখস্থ আছে তা-ই পড়ত তাহলে মাতাফে হঠাৎ যে চাপ সৃষ্টি তা নিঃসন্দেহে অনেক কমে যেত এবং সকলেই একাগ্রতার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন থেকে দু'আ ও তাওয়াফ করতে পারত। -ইলাউস সুনান ১০/৮২, বাদায়েউস সানায়ে ২/৩৪০

তাওয়াফে রমল করা

অনেককে দেখা যায়, তাওয়াফের ৭ চক্করেই রমল করে থাকে। আবার কেউ কেউ নফল তাওয়াফেও রমল করে। মনে করে, রমল সকল তাওয়াফে এবং তাওয়াফের সব চক্করই করতে হয়। অথচ এটি ভুল। রমল শুধু ওই তাওয়াফেই করতে হয়, যে তাওয়াফের পর সাঈ আছে। আর এই তাওয়াফেরও সব চক্করে নয় শুধু প্রথম তিন চক্করে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রমল করা সুন্নাত। মাতাফে কোনো কোনো সময় অস্বাভিক ভিড় হয়। বিশেষ করে হজ্বের আগে দু'একদিন এবং জিলহজ্বের ১০-১১ তারিখে। তখন মাতাফে চলা মুশকিল হয়। সামান্য

নড়া-চড়ার প্রভাব পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু আশ্চর্য হল, ওই কঠিন ভিড়েও কোন কোন হাজী সাহেবকে রমল করতে দেখা যায়। এতে নিজেরও প্রচুর কসরত করতে হয় আর বিশাল জনসমুদ্রের যে কী কষ্ট তা তো বলাই বাহুল্য তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, রমলটা তাওয়াফের ফরয অংশ। এজন্যই বুর্যূগানেদ্বীন বলেন, "যথাযথ হজ্ব করতে হলে সামান্য ইলম যথেষ্ট নয়; বরং প্রচুর ইলম এবং তার সঙ্গে অনেক বেশি আকল প্রয়োজন।"

সুতরাং রমল ছাড়াও যেহেতু তাওয়াফ আদায় হয়ে যায় তাই প্রচণ্ড ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে রমল করা যাবে না। বরং তখন স্বাভাবিকভাবে চলবে। চলতে চলতে কখনো সামান্য ফাঁকা পেলে এবং অন্যের কষ্ট না হলে স্বাভাবিক গতিতেই সামান্য লাফিয়ে লাফিয়ে রমলের ভান করবে। আর রমল শুধু পুরুষের জন্য। মহিলার জন্য রমল নিষিদ্ধ। কিন্তু কখনো কখনো মহিলাদেরকেও তা করতে দেখা যায় যা নিতান্তই হাস্যকর। -সহীহ মুসলিম১/৪১০; মানাসিক মোল্লা আলী কারী পৃ.১৩৩-১৩৪

তাওয়াফ পরবর্তী দুই রাকা'আত নামায পড়ার স্থান

তাওয়াফের পর দুই রাকা'আত নামায মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়া সুন্নাত। কিন্তু অনেককে দেখা যায়, মাকামে ইবরাহীমকে পেছনে রেখে মাকামে ইবরাহীম ও বাইতুল্লাহর মাঝে ফাঁকা জায়গায় পড়ে। একেতো এই স্থানে নামায পড়লে তাওয়াফকারীদের চলাচলে খুব সঙ্কীর্ণতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত দুই রাকা'আত যে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে পড়া সুন্নাত সে সুন্নাতটিও আদায় হয় না।

-সুনানে নাসাঈ ২/৩১

কুরবানীর ভুলসমূহ

১০ই যিলহজ্ব তারিখে জামরায়ে আকাবায়ে উলা-এ কঙ্কর নিক্ষেপ তারপর পশু কুরবানী এবং তারপর মাথা মুণ্ডানো– এ তিনটি কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এখানে ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করলে দম ওয়াজিব হবে। অনেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কুরবানীর বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ যেহেতু ওয়াদাকৃত সময় রক্ষা করতে সক্ষম হয় না; তাই দম থেকে বাঁচার জন্য নিজে কোনো পশুর বাজারে গিয়ে অথবা নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধির মাধ্যমে কুরবানী করবে। কোনো অবস্থায় অন্যের প্ররোচনায় ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করবে না। কুরবানীর বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মাথা মুণ্ডাবে অথবা চুল ছাঁটবে।

হজ্বের সফরে গুনাহ'র কাজ থেকে বেঁচে থাকা

আজকাল গুনাহ'র উপকরণ অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে পবিত্র এ সফরে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা থাকতে হয়। নযরের হেফাযত করা খুব

জরুরী। বদ-নযরী এমনিতেই গুনাহে কবীরা এবং তাতে আরো অনেক ক্ষতি আছে। ঈমান কমজোর হয়ে যায়, ঈমানের স্বাদ খতম হয়ে যায়। এক গুনাহ অন্য গুনাহ'র কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নেক আমলের দ্বারা দিলের মধ্যে যে নূর জমা হয় গুনাহ'র দ্বারা তা খতম হয়ে যায়। আসল কথা হলো, হজ্জে মকবূল ওই হজ্বকে বলে, যে হজ্বের সকল আহকাম ঠিক রেখে গুনাহমুক্ত অবস্থায় আদায় করা হয়। কিন্তু যদি এমন হয়, হজ্বের আমল করা হলো, সঙ্গে সঙ্গে গুনাহও করা হলো, তাহলে এ ধরনের হজ্বের কী ফায়দা হবে? অনেকে হজ্ব মিনার ময়দানেই দাফন করে আসে। যখন কুরবানী করে হালাল হয়, তখন মাথা মুণ্ডানোর সঙ্গে দাঁড়িও মুণ্ডায়। প্রতি বছর হজ্ব উমরার তাওফীক হয় অথচ হিম্মত করে যিন্দেগীকে শরীয়ত ও সুন্নাতের ছাঁচে তৈরী না করা কতো বড় না শুকরী ও বোকামী।

হারাম শরীফের জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য সামনে বিস্তর জায়গা ফাঁকা রেখে যথা-তথায় দাঁড়িয়ে ইক্তেদা করা

হারাম শরীফে এক নামাযে ১ লাখ নামাযের সওয়াবের আশায় ভুল পন্থায় ইক্তিদা সহীহ হবে না। মনে রাখবে মসজিদের বাইরে ইক্তিদা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কাতারে মিলিত হতে হবে। কাতারের মাঝে কোনো রাস্তা, নদী, খালী ময়দান থাকলে ইক্তিদা সহীহ হবে না, নামাযও সহীহ হবে না।

নামাযের স্থান পাক, নাপাকের কোনো ধার ধারে না, দুনিয়ার সকল স্থানে নামাযের ক্ষেত্রে নামাযের জায়গা পাক মাসআলা প্রযোজ্য। হজ্জে সময় দেখা যায় অনেক নামাযী রাস্তায় দাঁড়িয়ে যায়। মলমূত্রের নাপাকি জায়গায় নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে না।

পবিত্র স্থানে ফটো উঠানোর হিড়িক

আজকাল সাধারণ ক্যামেরা এবং মোবাইল ফোনের ক্যামেরা অতিসহজপ্রাপ্য। ক্যামরাযুক্ত মোবাইল তো প্রায় সকলের নিকট আছে। তাই অপব্যবহার মারাত্মকভাবে বেড়ে চলছে। তাছাড়া বর্তমানে ছবি উঠানোকে কোনো গুনাহ মনে না করার ব্যাধি তো আছেই। ফলে দুনিয়ার রহমত বরকতের মারকায, যেখানে অবিরতভাবে রহমত বর্ষিত হয়, সেখানে প্রতি মুহূর্তে ছবি উঠানোর মাধ্যমে অপ্রতিরোধ্য গতিতে কবীরা গুনাহ চলছে। তাওয়াফ, সাঈ, মাতাফ, মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, রওযা শরীফসহ সব জায়গায় সবসময় ছবি উঠানো হচ্ছে। তাছাড়া তাওয়াফ ও সাঈ-র সময় সমানে মোবাইল ফোনে কথা বলা হচ্ছে। অথচ এগুলো ইবাদতের পরিপন্থী কাজ। এমন মোবারক মুহূর্তে গাফেল থাকা কতো বড় বোকামী। আহ্! একটু বোধ যদি আমাদের থাকতো!

মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা

আজকাল হজ্ব-উমরা আদায়কারীর সংখ্যা মাশাআল্লাহ্ অনেক বেড়ে গেছে। মসজিদে প্রবেশের সময়, বের হওয়ার সময় সব জায়গায় ভিড় লেগেই থাকে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফযীলতপূর্ণ স্থান মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীর আদব রক্ষা করা অতি জরুরী। মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত, বের হওয়ার সুন্নাতের প্রতি কতজন লক্ষ্য রাখছেন? অথচ এখানে আসার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলার মাহবূবিয়্যাত অর্জন অর্থাৎ প্রিয়ভাজন হওয়া। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত মোতাবেক আমল করবে, সে অতি সহজে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। সুতরাং হজ্বের সফরে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় সুন্নাত ও আদবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী।

সালামের প্রতি উদাসীনতা

সাধারণভাবে দেশে অবস্থানকালে পরস্পরে সাক্ষাতে যে হারে সালামের প্রচলন থাকে হজ্বের সময়ে তা দারুণভাবে উপেক্ষিত হয়। এ সুন্নাতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া উচিত।

ইসলাহ্

- ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর টুপি পরিধান করা জরুরী। কিন্তু অন্যের দেখাদেখি মাথায় টুপি রাখার ব্যাপারে অনেকে বেশ খামখেয়ালী করে। অন্য মাযহাবের লোকদের দেখাদেখি ইবাদত-বন্দেগীতেও গোলমেলে অবস্থা সৃষ্টি করে। অথচ নিজ মাযহাব অনুসারে আমল করা ওয়াজিব।

- আযান ও ইকামাতের জবাব প্রদানের প্রতি গাফলতি লক্ষ্য করা যায়। অথচ যে কোনো দেশে থাকা অবস্থায়ই আযান-ইকামাতের জওয়াব দেয়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

- অনেকে তাওয়াফ ও সাঈ-এর সঠিক নিয়ম পদ্ধতি অভিজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম থেকে না শিখে ছোট ছোট চটি কিতাব দেখে আমল শুরু করে। তাওয়াফের সময় জোরে চিৎকার দিয়ে স্লোগানের মতো দু'আ দুরূদ পড়তে থাকে। অথচ তাওয়াফ হলো দু'আ কবূলের উত্তম সময়। আর দু'আর আদব হলো ক্ষীণ স্বরে দু'আ করা। ইলম না থাকার কারণে তারা জোর আওয়াযে আদবের খেলাফ তরীকায় দু'আ করে অন্যের একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

কুরবানী

কুরবানীর ফযীলত

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরবানীর দিনসমূহে কুরবানী ছাড়া অন্য কোনো জিনিস আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় নয়।

কুরবানীর দিনসমূহে ফরয আমলের পর কুরবানী অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় অধিক উত্তম। কুরবানীর পশু জবাহ্ করার সময় যে রক্ত ঝরে, তা জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহর দরবারে কবূল হয়ে যায়। তাই অত্যন্ত আনন্দ এবং মন খুলে কুরবানী করা উচিত। –মিশকাত : ১২৯

কুরবানী খালেস নিয়্যতে করা উচিত। শুধু নাম বা গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্য না হওয়া বাঞ্চনীয়। শরীকী কুরবানী করতে হলে শরীকগণের নিয়্যত এবং উপার্জন হালাল কিনা– বুঝে-শুনে শরীকানা কুরবানী করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

কুরবানী সম্পর্কে জরুরী কিছু মাসাইল

যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

মাসআলা : প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজন সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

নেসাবের পরিমাণ

মাসআলা : স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হলো, এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।

- আল মুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫

কুরবানীর সময়

মাসআলা : মোট তিনদিন কুরবানী করা যায়। যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে সম্ভব হলে যিলহজ্বের ১০ তারিখেই করা উত্তম।

- ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫/২৯৫

কোন্ কোন্ পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয

মাসআলা : উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। -কাযীখান ৩/৩৪৮

কুরবানীর পশুর বয়স-সীমা

মাসআলা : উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। তবে এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতেই হবে। উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। - কাযীখান ৩/৩৪৮

এক পশুতে শরীকের সংখ্যা

মাসআলা : একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। এমন একটি পশু কয়েকজন মিলে কুরবানী করলে কারোটাই সহীহ হবে না। আর উট, গরু, মহিষ ইত্যাদিতে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৮, কাযীখান ৩/৩৪৯

সাত শরীকের কুরবানী

মাসআলা : সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না। যেমন কারো আধা ভাগ, কারো দেড় ভাগ। এমন হলে কোনো শরীকের কুরবানীই সহীহ হবে না।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭

মাসআলা : উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যে কোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩১৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭

কোনো অংশীদারের গলত নিয়্যত হলে

মাসআলা : যদি কেউ আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়্যতে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না। তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানী সহীহ হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শরীক নির্বাচন করতে হবে।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯

কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ

মাসআলা : কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়্যতেও কেউ শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে।

-তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৬৬

মাসআলা : শরীকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।

মাসআলা : যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়্যতে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে ইচ্ছা করলে অন্যকে শরীক করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে একা কুরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে সে টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে সে অন্যকে শরীক করতে পারবে না। এমন গরীব ব্যক্তি যদি কাউকে শরীক করতে চায় তাহলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়্যত করে নিবে।

-কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১

কুরবানীর উত্তম পশু

মাসআলা : কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম। -আলমগীরী ৫/৩০০

যে সমস্ত পশু দ্বারা কুরবানী করা যায় না

মাসআলা : যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না, যে পশু শুকনো দুর্বল যা যবেহের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না, যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না, যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা, যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট, এমন পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। -জামে তিরমিযী ১/২৭৫ বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪, ২১৫, ২১৬

নিজের কুরবানীর পশু নিজেই যবাই করা

মাসআলা : কুরবানীর পশু নিজে যবাই করা উত্তম। নিজে না পারলে অন্যকে দিয়েও যবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে যবাই করার সময় তার উপস্থিত থাকা ভালো।

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২২৬৫৭ বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২

যবাইতে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে

মাসআলা : অনেক সময় যবাইকারীর যবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ যবাই সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কে নিজ নিজ যবাইয়ের আগে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং যবাইকৃত পশুও হালাল হবে না।

-রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪

কুরবানীর পশু থেকে যবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া

মাসআলা: কুরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া বা কোন ফায়দা অর্জন করা জায়েয নয়। যেমন হাল-চাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দিবে।

-মুসনাদে আহমাদ ২/১৪৬

কুরবানীর পশুর দুধ পান করা

মাসআলা: কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি যবেহের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দিবে। -মুসনাদে আহমাদ ২/১৪৬

কুরবানীর গোশত বণ্টন

মাসআলা: শরীকে কুরবানী করলে ওযন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নয়। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭

মাসআলা: কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে এবং এক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪

যবাইকারীকে চামড়া, গোশত দেওয়া

মাসআলা: যবাইকারীকে-কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া, গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য পূর্ণ পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসেবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে।

পশু নিস্তেজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা

মাসআলা: যবেহের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

অন্য পশুর সামনে যবাই করা

মাসআলা : এক পশুকে অন্য পশুর সামনে যবেহ করবে না। যবাইয়ের সময় প্রাণীকে অধিক কষ্ট না দেওয়া।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কুরবানী

মাসআলা : সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযি.) কে তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করার অসিয়্যত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন। -সুনানে আবু দাউদ ২/২৯

কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ সদকা করা

মাসআলা : কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিলব্ধ মূল্য পুরোটা সদকা করা জরুরী। -আদ্দুররুল মুখতার, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা

মাসআলা : ঈদুল আযহার দিন সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাত শুধু ১০ যিলহজ্বের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখে গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত নয়। -আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬

যবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া

মাসআলা : কুরবানীর পশু যবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না।

- কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫

তাকবীরে তাশরীক

যিলহজ্ব মাসের নয় তারিখে ফজরের নামায থেকে শুরু করে তের তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই তাকবীরটি একবার পড়া ওয়াজিব।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এবং আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা তারই।)

নামাযের সালামের পর সঙ্গে সঙ্গে এই তাকবীর পড়তে হয়। যদি ইমাম সাহেব ভুলে যান তাহলে মুক্তাদীরা স্মরণ করিয়ে দিবেন। ঈদুল আযহার নামায আদায়ের পরও এই তাকবীর পড়বে। মুসাফির অবস্থায়ও ফরয নামায আদায়ের পর এই তাকবীর পড়া উচিত। পুরুষরা শব্দ করে এবং মহিলারা নিচুস্বরে পড়বে। অনেকে অবগতি না থাকার কারণে উচ্চ আওয়াযে এ তাকবীর তিনবার পাঠ করে। ফলে যারা মাসবূক হয় তাদের নামাযে দারুন বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। এমনটি করবে না বরং একবার পড়বে।

এসলাহ : অনেক ক্ষেত্রে মহিলাগণ তাকবীরে তাশরীফের মাসআলা না জানার কারণে এর উপর আমল করেন না। বাড়ীর দায়িত্বশীল ব্যক্তির উচিত বাড়ীর সকল সদস্যগণকে বিষয়টি অবগত করানো।

মাসাআলা : হাজী সাহেবান ৯ যিলহজ্বের আগ পর্যন্ত ফরয নামাযের সালামের পরে উচ্চস্বরে একবার তালবিয়া পাঠ করবে। তারপর অন্যান্য যিকির-আযকার করবে। তবে ৯ যিলহজ্ব ফজর থেকে সালামের পরে প্রথমে একবার তাকবীরে তাশরীক পড়ে নিবে, তারপর তালবিয়া পড়ে অন্যান্য যিকির-আযকার করবে। উল্লেখ্য, তালবিয়া ১০ যিলহজ্ব বড় শয়তানের নিকট কঙ্কর মারার জন্য উপস্থিত হলে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তারপর আর তালবিয়া পড়া যায় না; কিন্তু তাকবীরে তাশরীক ১৩ যিলহজ্ব আসর পর্যন্ত চলতে থাকবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মু'আমালাত

ইসলামে মু'আমালাতের গুরুত্ব

দ্বীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মু'আমালাত তথা পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেন-দেন। যেমন বিয়ে-শাদী, তালাক, দণ্ডবিধি, কাফফারা, বেচা-কেনা, শ্রম ও কৃষিকর্ম ইত্যাদি বিষয়ের আহকাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেয়া পর্যন্ত কোনো মানুষ এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তম্মধ্যে দুইটি প্রশ্নই থাকবে মু'আমালাত সম্পর্কে।

১. মাল উপার্জন করেছিলে হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে?

২. কোন্ পথে ব্যয় করেছিলে? সৎ পথে না অসৎ পথে?

কারণ মানুষ আল্লাহর অধীনস্ত গোলাম। লাগামহীন, স্বেচ্ছাচারী বা সম্পূর্ণ সক্ষম ও স্বাধীন নয়। তার প্রত্যেক কাজের হিসাব তার মনিবের কাছে দিতে হবে। আয়ের হিসেবের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে আয় রোযগারের যে বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার খেলাফ যেন না হয়। হারাম পন্থায় যেমন সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, ধোঁকাবাজী, হারাম চাকুরি, হারাম ব্যবসা, পরের সম্পত্তি গায়ের জোরে দখল করা, মাল বাকি নিয়ে বা ধার নিয়ে আদায় না করা, পৈত্রিক সম্পত্তিতে বোনদেরকে অংশ না দেয়া, এতীমদের অংশ বুঝিয়ে না দিয়ে যথেচ্ছা খরচ করা, ওজনে কম দেয়া, ভালো জিনিসের মধ্যে খারাপ জিনিস মিশিয়ে চালিয়ে দেয়া, অধুনা খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ফরমালিন নামক বিষ মিশ্রিত করে দুটি পয়সার জন্য মানুষের জীবন বিধ্বংসী কাজ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়ে জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করা, জুয়া-লটারীর মাধ্যমে আয়

উপার্জন করা, ধর্মের নামে দুনিয়াদারী অর্থাৎ চুক্তিভিত্তিক ওয়ায-নসীহত ও পীর মুরিদী তথা অন্যান্য দ্বীনী কাজকে টাকা আমদানীর একমাত্র মাকসাদ বানানো হারাম। পক্ষান্তরে খালেস নিয়্যতে দ্বীনী খেদমত সবচেয়ে বেশি নেকীর কাজ।

অনুরূপ উপার্জিত অর্থ খরচ করার সময়ও খুব চিন্তা করে খরচ করতে হবে। যাতে শরীয়ত বিরোধী গুনাহ'র কাজে ব্যয় না হয়। যেমন গান-বাদ্য, খেলতামাশা, ধুমধামের সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান, বিবাহবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, আকীকা, খৎনার অনুষ্ঠান, আতশবাজী, পটকাবাজী, নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য বেহুদা প্রচার প্রচারণায়, ফূর্তির জন্য ভোজ পার্টি, ইফতার পার্টি, কনসার্ট ইত্যকার বেহুদা কাজে অপব্যয় ও অর্থ অপচয় করা যাবে না। জীবন, স্বাস্থ্য, সন্তান, ঈমান বাঁচানোর জন্য যতোটুকু আবশ্যক ততোটুকু খরচ করা যাবে। অতিরিক্ত বেহুদা খরচ করার অনুমতি শরীয়তে নেই। আয় অনুপাতে ব্যয় করতে হবে। তবে কৃপণতা করা যাবে না এবং অপচয়ও করা যাবে না। সকল ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি সেই খোদার কসম করে বলছি যাঁর হাতে আমার জান, যদি কেউ শহীদ হয়ে পুনঃজীবিত হয়ে দ্বিতীয়বার শহীদ হয় এবং আবার যিন্দা হয়ে তৃতীয় বারও পুনরায় শহীদ হয় আর তার যিম্মায় কারো হক অনাদায়ী থাকে তবে সে হক আদায় না করা পর্যন্ত সে বেহেশ্‌তে যেতে পারবে না।

প্রাপ্য হক আদায়ে যারা কম করে তারা অপরাধী

কুরআন ও হাদীসে মাপে বা ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবার, লেন-দেন এই দুই পন্থায় সম্পন্ন হয় বিধায় এ-দু'টি বিষয়কেই ওজনে কম করার খাদ হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে তার পরিধি আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে কোনো পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা তাতফীফ (মাপে কম দেয়ার) অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে। যেমন মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত উমর (রাযি.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাযের রুকূ-সিজদা ইত্যাদি ঠিকমতো করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : لَقَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে কম করেছো। এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামায ও উযূর মধ্যেও। অর্থাৎ যে ব্যক্তি উযূ ও নামাযে সুন্নাতের অনুসরণ করলো না, সে হক আদায়ে কম করলো, অনুরূপভাবে যে মাদরাসায় শুধু

তা'লীমের ব্যবস্থা করলো কিন্তু তরবীয়্যতের কোনো এন্তেযাম করলো না, দ্বীনের অন্যান্য তাকাযা (চাহিদা) পুরা করলো না, সে-ও কম করলো। কেননা মাদরাসা হলো দ্বীনী ইলম ও আমলের হেফাযতের দূর্গ। প্রতিটি তালেবে ইলমকে তা'লীম ও তরবীয়তের মাধ্যমে দ্বীনের খাঁটি মুবাল্লিগ হিসেবে প্রস্তুত না করা তার হকে কম করার নামান্তর। সেও প্রাপ্য আদায়ে কম করে গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হলো। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্ধারিত হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও প্রাপ্য কম আদায়ের অপরাধে অপরাধী। মযদুর, কর্মচারী যতোটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ। কাজে অলসতা করাও নাজায়েয। যেমন কেউ বৈধ পন্থায় চাকুরি নিয়েছে। কিন্তু চাকরিতে তার জন্য যে সময় ধার্য করা হয়েছে, তাতে পুরোপুরি সময় দেয় না অথবা কোনো ব্যক্তি আট ঘণ্টা শ্রম দেয়ার শর্তে চাকুরি নিয়েছে, কিন্তু সে সাত ঘণ্টা শ্রম দেয়। এক ঘণ্টা কাজে ফাঁকি দেয়, কিংবা ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করে এ ব্যক্তি মাসের শেষে যে বেতন পাবে তার আট ভাগের একভাগ হারাম গণ্য হবে। এ-ধরনের হারাম উপার্জন আমাদের অনেকের জীবিকায় সংযুক্ত হচ্ছে। যা আমরা অনুভবও করি না। ওলামাগণ বলেছেন, হালাল মালের সঙ্গে হারাম মাল মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে হালাল মালের বরকত ও কল্যাণ খতম হয়ে যায়। অর্থাৎ হারাম মাল হালাল মালকে ধ্বংস করে দেয়।

হাদীস শরীফে আছে, যখন কোনো সম্প্রদায় মাপে কম দেয়া আরম্ভ করবে তখন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। তারা হাকিম-মহাজনের অত্যাচারে নিপতিত হবে। যাকাত আদায় না করলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে যা বৃষ্টি হয় তা পশু-পাখির কল্যাণে হয়ে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেড়ে যায়। যে জাতি আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে মনগড়া আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে তাদের মধ্যে দারিদ্র অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ করে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থ কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয়, বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ হলো পর মুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ কারবারে অপরের প্রতি যত বেশি মুখাপেক্ষী, সে ততোবেশি দরিদ্র। বর্তমানে বিষয়টি বুঝতে তেমন বেশি কষ্ট করতে হয় না। দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে। অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায় মানুষ তার বসবাস, ধর্মকর্ম, চলাফেরা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন

বাধ্য-বাধকতা ও আইন-কানূনের বেড়াজালে আবদ্ধ, তার লোকমা-গ্রাস ও হক কথা বলা পর্যন্ত বিধি নিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে ক্রয় করতে পারে না। দুনিয়া যেন আমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এতো বেশি যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে দারোয়ানদের পর্যন্ত তোশামোদ-খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পরমুখাপেক্ষিতার অপর নাম দারিদ্র। –তাফসীরে মারেফুল কুরআন

আজ উম্মতের মু'আমালাত ও মু'আশারাতে চরম অবক্ষয়ের পরিণামের ফল জাতির ঘাড়ে চেপে বসেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মু'আমালাত, মু'আশারাতের পরিশুদ্ধি জরুরী হয়ে পড়েছে।

নেককাজ ও পাপকর্মের সংমিশ্রণ

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ

অর্থ- তবে কি তোমরা কুরআনের কিয়দাংশ বিশ্বাস এবং কিয়দাংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনোই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে।

-সূরা বাকারা আয়াত নং-৮৫

হযরত মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের উপর এমন সময় আসবে যখন পবিত্র কুরআন তাদের অন্তরে পুরাতন বলে অনুভূত হবে, যেরূপ শরীরে কাপড় পুরাতন অনুভূত হয়। সে সময় লোকদের প্রত্যেকটি কাজ লোভ ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হবে। আল্লাহর ভয় কিছুমাত্রও থাকবে না। তাদের মধ্যে যদি কেউ নেক আমল করে তবে সে নিজেই বলে যে, আল্লাহ কবূল করে নিবেন। আর কোনো গুনাহের কাজ করলে বলে যে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

বস্তুতঃ কুরআনুল কারীমের ভীতিপ্রদ ও সতর্ককারী আয়াতসমূহ সম্পর্কে এসব লোকের কোনোই জ্ঞান নাই। এ জন্যেই তারা ভয় ও শাস্তির চিন্তা না করে লোভ ও স্বার্থের বশিভূত হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

অর্থ- প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামীকালের জন্য সে কি প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। -সূরা হাশর : ১৮

উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা প্রথমবার وَاتَّقُوا اللَّهَ মুমিনদেরকে হুশিয়ারী ও সৎকর্ম পরায়ণের নির্দেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার وَاتَّقُوا اللَّهَ বাক্যটি বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর অর্থাৎ (নেক আমল) তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না? (অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত কি না)। পরকালে অচল নকল আমল তাই, যা দৃশ্যত নেক কাজ কিন্তু তা খাঁটিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না। তাতে না আছে ইখলাস না আছে সুন্নাতের অনুসরণ। সুতরাং দৃশ্যতঃ ইবাদত হলেও ইবাদতের মানদণ্ডে তা গ্রহণযোগ্য কিনা তা যাচাই করে নাও। দ্বিতীয় وَاتَّقُوا اللَّهَ বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্য কেবল দৃশ্যত সম্বল যথেষ্ট নয় বরং তা অচল কি না তা দেখে প্রেরণ কর।

–তাফসীরে মা'রিফুল কুরআন

একথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে কিয়ামতের দিন জবাবদিহী করার জন্য তুমি কি আমল করছো?

কুরআনুল কারীমের শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত সবই সতর্কীকরণ ও ভয় প্রদর্শন। যে কেউ মনোযোগ ও চিন্তা সহকারে কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করবে, অবশ্যই তার জীবনে এর প্রভাব পড়বে এবং আখারাতের ফিকির ও আল্লাহ তা'আলার ভয় তার অন্তরে সৃষ্টি হবে, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে। কিন্তু আজকালকার অবস্থা অধিকাংশ মানুষ কেবল পবিত্র কুরআনের বাহ্যিকতার জন্য পরস্পর বির্তক ও বাহাস, মুনাজারার পর্যন্ত মগ্ন হচ্ছে। আর তিলাওয়াতের প্রশ্নে যে ভাব ও সূর অবলম্বন করা হয়, তাতে মনে হয় যেন আরবী কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছে। মোটকথা তাদের কুরআনের আসল মর্ম ও উদ্দেশ্য এবং সে অনুযায়ী বাস্তব আমলের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ নাই। আফসোস! এরচেয়ে বঞ্চনা ও ধোকাগ্রস্থতা দুনিয়াতে আর কি হতে পারে? এরচেয়ে আরো মারাত্মক অবস্থা হলো অধিকাংশদের আমল কিছু ভালো আর কিছু মন্দ। এতদসত্বেও তারা তওবা ব্যতীতই আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখে। তারা এই আশা করে বসে আছে যে, তাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে। বস্তুতঃ উভয়বিধ অবস্থা মস্ত বড় ধোকা ও মুর্খতা ছাড়া কিছুই নয়।

যেখানে সহীহ ঈমান আকীদাতে ত্রুটি, ইবাদত বন্দেগীতে ইখলাস ও সুন্নাত শূন্য, লেন-দেন, আচার-আচরণ দ্বীন বর্হিভূত, লৌকিকতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, জুলুম-অত্যাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অথচ নিজেকে পাক্কা দ্বীনদার মনে করে বসে আছে।

হালাল হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ সম্পদ থেকে যৎ সামান্য দান-খয়রাত করে মুক্তি ও সওয়াবের আশা করে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, হারাম উপায়ে অর্জিত হোক কিংবা হালাল উপায়ে হোক ১০ টাকা দান করে দিলে হারামের হাজার টাকা তাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে। সুদ, ঘুষ, ধোকাবাজি, প্রতারণার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ থেকে কিছু দান-খয়রাত করে দিলে সব শেষ হয়ে যাবে।

অনেকে নিজের নেক আমলের পরিমাণ মন্দ আমলের পরিমাণ থেকে বেশি মনে করে। যার কারণে নফস ও প্রবৃত্তির হিসাব (মুহাসাবা) ও নিয়ন্ত্রণের প্রতি মোটেও গুরুত্ব নাই। বরং সামান্য কিছু নেক আমল করে ফেললে সেটা খুব যথেষ্ট মনে করে থাকে। মুখে কিছু যিকির-আযকার করে নিলো, অথচ অধিকাংশ সময় অযথা কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি অসংখ্য গুনাহে লিপ্ত। এ-সমস্ত পাপে দুনিয়াতে অশান্তি এবং আখেরাতে যে কি মর্মান্তিক শাস্তি রয়েছে এ বিষয়ে কোনো চিন্তা-ফিকির নাই।

সামান্য কিছু নেক আমলের দ্বারা যা কিছু অর্জিত হয়েছিল তা সংঘটিত গুনাহের দ্বারা সব শেষ হয়ে গেছে। অতীব আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় দুনিয়ার সামান্যতম আনন্দের জন্য কড়ায়-গন্ডায় হিসাব-নিকাশে কোনো ত্রুটি ও অবহেলা করে না, সর্বদা সর্তক ও শঙ্কিত থাকে, সামান্যতম অংশও বরবাদ না হয়। অথচ আখেরাতের চিরস্থায়ী নাজ-নেয়ামত, সুখ-শান্তি, জান্নাতের নিয়ামতরাজীর বরবাদী ও বঞ্চিত হওয়াটাকে কোনো গুরুত্ব দেয় না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

অর্থ- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়, যারা তা করবে, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। -সূরা মুনাফিকুন আয়াত : ৯

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

অর্থ- তোমাদের সম্পদ ও আওলাদ হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষা এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে পুরুস্কার। -সূরা তাগাবুন আয়াত : ১৫

অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে গিয়ে পুরস্কার লাভের উপর সন্তান ও জাগতিক ধনসম্পদ প্রাধান্য দিবে সে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি হিংস্র বাঘকে কোনো বকরীর পালের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হলে তা ঐ বকরীর পালের জন্য এতবেশি ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর সম্পদ ও সম্মানের মোহ যে কোনো মুসলমানের দ্বীনের জন্য।

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, মানুষতো বলে থাকে, আমার মাল! আমার মাল! অথচ তোমার মাল তো শুধু এতটুকু যা তুমি খেয়ে শেষ করেছো, কিংবা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছো, অথবা দান-সদকা করে আখেরাতের জন্য জমা করেছো।

আমার মুসলমান ভাইগণ!

দুনিয়াতে প্রকৃত সুখ-শান্তি ও আখেরাতে নেক আমলের পূর্ণ পারিতোষিক অর্থাৎ বদলার মাধ্যমে আযাব-গযব থেকে মুক্তি, চিরসুখের স্থান জান্নাত পেতে হলে আমাদের এখনি সচেষ্ট হতে হবে। আল্লাহর ভয়, তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে গোনাহ থেকে পরহেয করা এবং নেকআমল-সমূহ সুন্নতের অনুসরণে করতে হবে।

সুতরাং ইখলাস ও সুন্নাত হলো আমলের মানদণ্ড। এ কষ্টি পাথরে আমাদের আমল যাচাই করতে হবে। পবিত্র কুরআনে যা কিছু ইলমরূপে বিদ্যমান রয়েছে তার সবকিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে আমলরূপে বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, এটা করো এবং এটা করো না, সেখানে তিনি তা বাস্তব নমূনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন যে, করণীয়গুলো এভাবে করতে হয়। আর বর্জনীয়গুলো বর্জন করার পদ্ধতি হলো এই। এভাবে তিনি উযূ, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ অর্থাৎ দ্বীনের সকল বিষয়ে তাঁর আদর্শ নমূনা বিদ্যমান। এমনিভাবে বিবাহ-শাদী, লেন-দেন, রোগ-শোক, আনন্দ-ফুর্তি, সামাজিক আচার-আচরণে সর্বাবস্থায় আমলী নমূনা উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হলো শুধুই আনুগত্য করে যাওয়া।

নিজস্ব মতামত বা ধারণা উপস্থাপনের কোনো অবকাশ নাই। কিয়ামত পযর্ন্ত সকল উম্মতের জন্য যা অকাট্য সত্যরূপে অবশ্য করণীয় হিসাবে বলবৎ থাকবে। কালের পরিক্রমায় তা রহিত হওয়ার নয়।

বর্তমানে অবস্থা এ পর্যায়ে চলে এসেছে মানুষ আল্লাহকে নিজের অনুগত করতে চাচ্ছে (নাউযুবিল্লাহ)। নিজে তাঁর অনুগত হতে চাচ্ছে না। সবকিছু নিজ মর্যী মাফিক হওয়া কামনা করে। মাসআলা জানতে চাইলেও কামনা করে যে আমার মর্যী মতো ফতুয়া হোক। দু'আয় নিজের চাহিদা মোতাবেক, ইবাদত নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক- এতো আল্লাহকে নিজের অনুগত বানানো। মুসলিম হওয়ার অর্থ হলো আমি আল্লাহর মর্যীর অনুগত। আমার কোনো মর্যী নেই। নিজস্ব মর্যী কামনা-বাসনাকে বিলীন করে দেয়ার নাম ইসলাম। আমাদের মধ্যে যদি নিজস্ব মর্যী বজায় থাকে তাহলে আমরা কি করে মুসলিম হলাম?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

অর্থ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হও।

সুতরাং ইসলামের অর্থ হচ্ছে- নামায, রোযা হবে আল্লাহর জন্য, হজ্ব, যাকাত তাও হবে আল্লাহর জন্য, মরতে হলে আল্লাহর জন্য, বাঁচতে হলে আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ

অর্থ- তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য সকল কিছু হতে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। -সূরা বাইয়্যিনাহ

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

অর্থ– নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার তোমাদের মাল-দৌলতের দিকে লক্ষ্য করেন না; কিন্তু তোমাদের নিয়্যত ও আমলের প্রতি লক্ষ্য করেন। -সহীহ মুসলিম

তিনি আরও ইরশাদ করেন,

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِيْكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

অর্থ– দ্বীনের কাজে ইখলাসের এহতেমাম করবে। কেননা ইখলাসের সঙ্গে সামান্য আমলও যথেষ্ট।

অতএব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত জরুরী যে, নিজেদের সমস্ত আমলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ ও অনুকরণকে নিজের উপর অপরিহার্য্য করে নিবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

হালাল রুযির ফযীলত ও উপকারিতা

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হালাল রুযি উপার্জন করা নামায রোযা ইত্যাদি ফরযের পর একটি ফরয।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হালাল রুযির বরকতে আল্লাহ তা'আলা দু'আ কবূল করেন।

৩. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের কোনো তাবেদার বান্দা জমিনে বাগান করলে বা অন্য কোনো কৃষিকাজ করলে যদি তা হতে কিছু অংশ কোনো মানুষ খায় বা কোনো পশু-পাখি খেয়ে যায়, এমনকি চোরও যদি কিছু অংশ চুরি করে নিয়ে যায়, তবে তা তার পক্ষ থেকে সদকা ধরা হবে এবং আল্লাহর কাছে ওই সদকার সওয়াব পাবে।

৪. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যারা দিনভর নিজ হাতে খেটে সন্ধ্যা বেলায় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে, আল্লাহ পাক তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। –তাবারানী

অনেকে বলে থাকে যে, 'খাটতে খাটতে মরলাম' তাদের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ অন্যায় তা এই হাদীস পাক থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। খাটতে খাটতে মানুষ মরে না; বরং আল্লাহ যে তাকে খাটার যোগ্য শক্তি ও স্বাস্থ্য দান করেছেন, ফলে নিয়্যত ও দিল ঠিক রাখতে পেরেছে, এজন্য তাকে মহান আল্লাহর শোকর করা উচিত।

৫. হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর যে কোনো বান্দা হালাল উপায়ে নিজ হাতে জীবিকা উপার্জন করে স্বয়ং নিজের ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করবে, অথবা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্ট জীবকে খাওয়াবে, এটা তার পক্ষে শরীরের যাকাত স্বরূপ হবে।

৬. হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যারা সকাল সকাল কাজ শুরু করবে, তাদের বরকত দান করা হবে, বিশেষত বৃহস্পতিবার সকালে।

এই হাদীস শ্রবণ করে সে অনুযায়ী আমল করায় সখর নামক একজন সাহাবী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর তিজারতে (ব্যবসায়) বরকত হয়ে তাঁর মাল-দৌলত অনেক বেড়েছিলো। হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল সকাল কাজ শুরুকারীদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে বরকতের দু'আ করেছেন এবং বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের মধ্যে যারা সকাল সকাল কাজ শুরু করবে, তাদের তুমি বরকত দান করো।' আর তিনি নিজেও কোনো কাজ করলে সকাল সকালই শুরু করতেন।

৭. হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একদিন আমি সুবহে সাদেকের পর সকাল বেলায় শুয়েছিলাম। আব্বাজান আমাকে পা দ্বারা ধাক্কা দিয়ে বললেন, উঠে দেখো! আল্লাহ রুযি বণ্টন করছেন। এমন সময় গাফেলভাবে ঘুমিয়ে থাকতে নেই। কেননা আল্লাহ দৈনিক সুবহে-সাদিক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে রুযি বণ্টন করেন।

৮. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আমার উম্মত! তোমরা ব্যবসা করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা রিযিকের দশ ভাগের নয় ভাগই তিজারতের মধ্যে রেখেছেন।

এহইয়াউল উলূম কিতাবে আছে, হযরত ঈসা (আ.) একদিন এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী করো? লোকটি উত্তর দিলো, আমি কাজ-কাম কিছু করি না। দিবারাত্রি ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে থাকি।

হযরত ঈসা (আ.) বললেন, তোমার ভরণ-পোষণ, খোরাক-পোশাক চলে কীভাবে? উত্তরে লোকটি বললো, আমার ভাই আমাকে দেয়। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, তবে তোমার ভাই তোমার চেয়ে বড় আবেদ এবং সে তোমার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে।'

ইসলাম কর্ম ছেড়ে শুধু ধর্ম করতে বলেনি; আবার ধর্ম ছেড়ে শুধু কর্ম করতেও বলেনি; বরং কর্ম-ক্ষেত্রেই ধর্ম পালন করার এবং ধর্মের বিধান অনুসারে কর্ম করার নির্দেশ দিয়েছে। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে যখন কোনো লোক সাক্ষাৎ করতে আসতো, তখন সবকিছুর আগে তিনি প্রশ্ন করতেন, তোমার কর্মক্ষেত্র এবং জীবিকার উপায় কী?

হালাল রুযির বরকত

১. হালাল রুযিতে দিলের নূর বাড়ে এবং লোক কামেল হয়।
২. হালাল রুযিতে ইলম হাসিল হয়, দিল নরম হয়, আল্লাহ তা'আলার ইশক ও মা'রেফাত হাসিল হয়।
৩. হারামের কারণে জাহালাত (মূর্খতা), দিলের গাফলত বাড়ে এবং হিংসা জন্মে।
৪. যব বুনে যেমন গম পাওয়া যায় না, গাধার পেটে যেমন ঘোড়া জন্মে না, তদ্রূপ হারাম রুযিতেও দিলে নূর পয়দা হয় না।
৫. লোকমা হলো বীজ, মনের ভাব হলো তার ফল। লোকমা হলো দুনিয়া, মনের গতি হলো তার মোতি। অর্থাৎ ভালোতে ভালো হয়, মন্দতে মন্দ।
৬. হালাল রুযি খেলে ইবাদতে শান্তি লাগে এবং আখেরাতের দিকে রুজূ হতে ইচ্ছা হয়।
৭. হালাল রুযিতে হুযুরে কলব অন্তরের একাগ্রতা এবং দিলের নূর পয়দা হয়।

হারাম খাদ্যের কু-প্রভাব

কা'বা শরীফের পাক জমিতে স্বয়ং ইবরাহীম আলাইহিস সালামও যদি বীজ বপন করেন এবং আসমানের গরুর দ্বারা হাল চাষ হয়, নতুন চাঁদের কাস্তের দ্বারা শস্য কাটা হয় এবং হাজরে আসওয়াদের দ্বারা তা পিষা হয়, আবে যমযম দ্বারা খানা তৈরি করা হয়, মারইয়ামের ন্যায় সতী বেহেশতী হুরের দ্বারা খানা পাকানো হয়, খানা পাকানোর সময় অসংখ্যবার সূরা ফাতেহা ও কুল হুওয়াল্লাহ পড়া হয়, বেহেশতের গাছের লাকড়ি কুড়িয়ে আনা হয়, হাজারবারও বিসমিল্লাহ পড়ে খাওয়া হয়, তবুও হারাম মালের বদ আছর তোমার দিলের মধ্যে যাহের হবেই হবে। তোমার কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যাবে, ইবাদতে শিথিলতা ও আলস্য আসবে। অতএব ঈমানের মায়া যদি থাকে সত্বর কোনো উপায় বের করো, বিলাসিতা ছেড়ে হালালের অল্পে তুষ্ট থাক। –মাসনবীয়ে রুমী, সাফাইয়ে মু'আমালাত

নিজ উপার্জন খাওয়া সুন্নাত

- হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিজের হাতের উপার্জন অপেক্ষা ভালো রিযিক আর নেই। পয়গম্বর আলাইহিমুস সালামগণ নিজের হাতের কামাই খেয়েছেন। –সহীহ বুখারী

- ব্যভিচারের পয়সা, মিথ্যা তা'বীয-তুমারের পয়সা, ভাগ্য গণনার পয়সা, কুকুর বিক্রির পয়সা এসবই হারাম। –সহীহ বুখারী
- বসে খাওয়া অপেক্ষা নিজে কামাই করে খাওয়া ভালো। আল্লাহ তা'আলা হাত-পা কাজ করার জন্য দিয়েছেন। হ্যাঁ, যাঁরা দ্বীনের খেদমতে মশগুল আছেন, যাঁরা ব্যবসা বা শিল্প কাজ অবলম্বন করলে দ্বীনের খেদমতের ক্ষতি হয়, তাদের জন্য আসবাব অর্থাৎ এসব পেশা অবলম্বন না করে আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে দ্বীনের খেদমত করতে থাকা জায়েয আছে এবং অনেক সময় উত্তমও বটে। তাঁদের খেদমত সমস্ত মুসলমানের যিম্মায়। অর্থাৎ তাঁদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে দেয়া মুসলমান সমাজের উপর ওয়াজিব।
- বর্তমান যুগে টাকা-পয়সার বড়ই দরকার। মূর্খ সমাজে নিন্দনীয় হলেও ধর্মপথে থেকে হালাল উপায়ে আয় করতে লজ্জাবোধ করবে না এবং আয় করে হিসাব করে খরচ করবে, অপব্যয় করবে না।
- যে পেশায় সব সময় নাপাক জিনিস ধরতে হয়, মুসলমানের তা না করা ভালো। যেমন মেথরের কাজ, পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি বের করার কাজ।
- যে পেশায় যার জীবিকা চলতে থাকে, একান্ত অপারগতা না পড়লে তা ত্যাগ না করা চাই। –মুসলিম, আবু দাউদ

নারীদের ঘরে বসে হাতের কাজের ফযীলত

১. বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ আনসারী (রাযি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আমার উম্মত! তোমরা তোমাদের ছেলেদের (যুদ্ধবিদ্যা) দৌড়, সাঁতার কাটা, তীর চালনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা লাভ করার শিক্ষা দাও। আর মুসলিম নারীদের জন্য তাদের গৃহের মধ্যে চরকা ঘুরানোর মতো নির্দোষ লাভজনক, উপকারী জিনিস আর নেই।

২. আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চরকায় সুতা কাটা স্ত্রী-জাতির জন্য অতিউত্তম পেশা।

৩. সাহল ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নেককার ধর্মপরায়ণ পুরুষের কাজ দর্জিগিরী। নেককার ধর্মপরায়ণ স্ত্রীলোকদের কাজ চরকায় সুতা কাটা।

ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণিত পেশা

● ভিক্ষার তুল্য ঘৃণিত, জঘন্য এবং পাপজনক পেশা আর নেই। মাছ ধরে বিক্রয় করা, মাঠের ঘাস কেটে বিক্রয় করা ভিক্ষাবৃত্তির চেয়ে শতগুণে ভালো। আল্লাহ না করুন, এমন মসীবত যদি এসে পড়ে, অপরের নিকট হাত পাতা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, তবে এমতাবস্থায় নেকবখত, দ্বীনদার ও উদারমনা লোক দেখে লজ্জায় জড়সড় হয়ে তার নিকট চাইবে। একেবারে নির্লজ্জ হওয়া বড়ই খারাপ কথা।

● বিনালোভে এবং বিনাচাওয়ায় খালেস নিয়্যতে যদি কেউ কিছু দেয় (লোকলজ্জা বা লোক ভয়বশত নয়), তবে তা গ্রহণ করতে দোষ নেই। তা নিজেও খেতে পারবে, অন্যকেও দিতে পারবে।

হারাম উপার্জনের পরিণাম

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দশ দেরহামের একটি জামায় যদি এক দেরহাম (চার আনা) পরিমাণও হারাম থাকে, তবে যতক্ষণ ওই জামা গায়ে থাকবে, নামায কবূল হবে না।

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হারাম মাল খয়রাত করলে তা কবূল হয় না। হারাম মালে বরকতও থাকে না এবং যা কিছু ছেড়ে মারা যায় তা তাকে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে শরীর হারাম খাবারের দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তা বেহেশতে যাবে না। ওই শরীর দোযখেরই উপযুক্ত। –মুসনাদে আহমাদ

ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধান

ক্রয়-বিক্রয় মু'আমালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ সম্পর্কে অনেক বিধি-বিধান রয়েছে। যা জানা প্রত্যেক মুসলমান ব্যবসায়ীদের জন্য জরুরী। হযরত উমর (রাযি.)-এর যুগে কোনো ব্যবসায়ীকে তিজারতের অনুমতি দিতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসা সংক্রান্ত দ্বীনী আহকাম সে না জানতো। আজকাল ব্যবসায়ীরা ব্যবসা সম্পর্কে শরঈ বিধি-বিধানের কোনো পরওয়াই করে না। যার কারণে আমাদের মু'আমালাত তথা লেন-দেনের মধ্যে অধঃপতন ও বিপর্যয় নেমে এসেছে। নিম্নে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জরুরী কিছু আহকাম উল্লেখ করা হলো।

১. যে জিনিসের দ্বারা গুনাহ্‌র কাজ করা হবে, তা বিক্রয় করবে না। যেমন

পূঁজার জন্য পাঁঠা বিক্রয় করা, হারমোনিয়াম, টিভি, ভিসিআর, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি গুনাহ'র উপকরণাদি বিক্রয় করা।

২. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এবং নিজের পাওনা আদায় করার সময় মিষ্ট আলাপ ও নম্র-ভদ্র ব্যবহার করবে, কর্কশ বা অভদ্র ব্যবহার ভালো নয়।

৩. জিনিস বিক্রয় করার জন্য কসম খাবে না। কারণ হয়তো দুই একটা মিথ্যা কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে, তাহলে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে।

৪. ব্যবসা বড়ই ভালো জিনিস, যদি বিশ্বস্ততা এবং সত্যবাদিতার সঙ্গে করা হয়। কারণ এতে দুনিয়ায় বিশ্বাস বাড়ে এবং আখেরাতে আম্বিয়া, সিদ্দীকীন এবং শহীদদের সঙ্গ লাভ হয়।

৫. ব্যবসায় যা লাভ হয়, তা হতে কিছু কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে দান করবে। কারণ শত চেষ্টা করেও কিছু না কিছু মাপে বেশ-কম হয়ে যায়, দানের দ্বারা ওই গুনাহ কিছু কেটে যাবে।

৬. নিজের জিনিস বা টাকা-পয়সায় যদি কোনো দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে তা কিছুতেই লুকাবে না। পরিষ্কার বলে দিবে; নতুবা বরকত থাকবে না।

৭. সুদের কারবারের কাছেও যাবে না; নিবেও না, দিবেও না, লিখবেও না, সাক্ষ্যও দিবে না। কারণ হাদীস শরীফে এই সবের উপরই লা'নত এসেছে।

৮. যে সমস্ত জিনিস মেপে বা ওজনে বিক্রয় হয় এবং উভয় দিকে যদি একই প্রকারের বস্তু হয়, তবে দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। ১. যদি একটি উত্তম আরেকটি অধম হয়, তবুও উভয় দিকে সমান সমান হওয়া দরকার। ২. হাতে হাতে আদান-প্রদান হওয়া আবশ্যক, অন্যথায় সুদ হয়ে যাবে। যদি এক দিকে কিছু বেশি হয় বা বাকি থাকে, তবে সুদ হবে। যদি মাপে বা ওজনে বিক্রয় হয়, কিন্তু দুই প্রকারের জিনিস হয়; যেমন ধান ও তিল, তবে কম বেশিও জায়েয আছে, কিন্তু হাতে হাতে আদান-প্রদান হওয়া চাই; নতুবা সুদ হবে। যদি মাপে বা ওজনে বিক্রয় না হয়, কিন্তু একই প্রকারের জিনিস হয়; যেমন বকরীর বদলে বকরী, তবুও কম বেশি জায়েয আছে, কিন্তু হাতে হাতে আদান-প্রদান হওয়া চাই। যদি মাপে বা ওজনেও বিক্রয় না হয় এবং প্রকারও এক নয়, যেমন ঘোড়া এবং উট, তবে কম বেশি জায়েয আছে, বাকীও জায়েয আছে। মানুষ শুধু টাকা লাগিয়ে টাকার সুদ খাওয়াকে সুদ বলে মনে করে, কিন্তু পণ্যের কারবারের মধ্যেও যে সুদ আছে সেসব লক্ষ্য রাখা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরী।

৯. কারো নিকট থেকে যদি কেউ টাকা ঋণ নেয় এবং তারপর তাকে

দাওয়াত করে বা হাদিয়া তোহফা দেয়, তবে তা গ্রহণ করবে না। কেননা তা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। যদি পূর্ব থেকে দাওয়াত করার বা হাদিয়া দেয়ার রীতি জারি থাকে, তবে তা পৃথক কথা।

এ থেকে আমরা বন্ধকী জমিন বা জিনিসের দ্বারা লাভবান হওয়ার অবস্থা বুঝে নিতে পারি। কেননা যে ব্যক্তি জমিন বন্ধক দিয়েছে, সে তার নিকট থেকে টাকা করয নিয়েছে। এখন সে করযের খাতিরে তাকে জমিনের দ্বারা লাভবান হওয়ার অনুমতি দিচ্ছে। তা কেমন করে হালাল হতে পারে?

১০. আপনি সাঈদের নিকট থেকে ১০ টাকায় একটি ঘড়ি ক্রয় করলেন। পরে টাকা না দিতে পারায় সাঈদেরই নিকট গিয়ে বললেন, 'ভাই আমি টাকা দিতে পারছি না, আপনি ঘড়িটা ৮ টাকায় খরিদ করুন, বাকি ২ টাকা আমি আপনাকে দিয়ে দিবো', এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়। কেননা সাঈদ যে ২ টাকা লাভ করে যাচ্ছে, এটা সুদ। যদি কোনো সময় ঠেকা পড়ে, তবে এমন করতে পারো, হামেদের নিকট থেকে ১০ টাকা নিয়ে তার ঘড়ির দাম পরিশোধ করে দিবে। যখন ঘড়ির দাম পরিশোধ হয়ে যাবে, তখন ৮ বা যে কয় টাকায় ইচ্ছা বিক্রয় করতে পার, তাতে মানা নেই।

১১. গাছের ফল যতক্ষণ ব্যবহারোপযোগী না হয়, ততক্ষণ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নয়।

১২. মাল এখন পর্যন্ত হাতে আসেনি শুধু বিল এসেছে, এ অবস্থায় শুধু বিল দেখে মাল বিক্রয় করা জায়েয নয়; মাল হাতে এসে গেলে, মাল না দেখে শুধু বিল দেখে বিক্রি করা জায়েয আছে বটে, কিন্তু যখন ক্রেতা মাল দেখবে, তখন শরীয়ত অনুসারে তার গ্রহণ করা– না করার ইখতিয়ার থাকবে।

১৩. কোনো বেপারী কোনো মাল বাজারে এনেছে। আপনি সুযোগ দেখে পথিমধ্যেই ওই মাল কিনবেন না। কারণ এতে ঐ বেপারির ধোঁকা খাওয়ার আশঙ্কা আছে।

১৪. একজন একটা জিনিস দরদাম করছে, বিক্রেতা দিবে কিনা, তা এখনও ঠিক হয়নি এবং ক্রেতার গ্রহণ না-করাও নিশ্চিত হয়নি, এ অবস্থায় কেউ গিয়ে জিনিসটির দর বাড়ানো ঠিক নয়। কারণ এতে অন্য ভাইয়ের মনে কষ্ট লাগতে পারে। যখন তার গ্রহণ না করা নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন গিয়ে দর করতে পারবে। অবশ্য নিলামের মাল খরিদ করতে এই মাসআলা প্রযোজ্য নয়।

১৫. মাল নেয়া ইচ্ছা নয়; শুধু অন্য খরিদ্দারকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দাম বাড়াবে না।

১৬. কোনো গাভী বিক্রয় করতে হলে খরিদ্দারকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দুই তিন দিন দুধ না দোহন করে ওলান বড় করবে না।

১৭. জমিনের যে ঘাস নিজে নিজে হয়েছে, তাও না কেটে বিক্রি করবে না। পানির ভিতরে থাকা মাছের মাসআলাও অনুরূপ অর্থাৎ না ধরে বিক্রি করবে না।

১৮. জিনিস বিক্রি করতে এমন কোনো কাজ করবে না বা এমন কোনো কথা বলবে না, যাতে খরিদ্দার ধোঁকায় পড়ে। –মুসলিম

১৯. বিপদে পড়ে কেউ কোনো জিনিস বিক্রি করতে এলে সুযোগ পেয়ে তার জিনিসের দাম কমাবে না; বরং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তার কিছু সাহায্য করে দিবে। না হয় উচিত মূল্যে জিনিস খরিদ করে রাখবে। –আবু দাউদ

২০. জিনিস তোমার দোকানেই নেই, অন্য দোকান থেকে এনে দিবে আশায় ওই জিনিস বিক্রি করবে না।

২১. বিক্রিত মাল ক্রেতা ফেরত দিতে চাইলে সাদরে গ্রহণ করবে, কেননা এতে অনেক সওয়াব রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের কাছ থেকে বিক্রিত মাল ফেরত নেবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। -আবু দাউদ

২২. রেহান (বন্ধক) রাখার সময় এরূপ শর্ত করা, 'এতো দিনের মধ্যে টাকা না দিতে পারলে সে টাকায় বিক্রি সাব্যস্ত হবে'–এমনটি করা জায়েয নয়। মুদ্দত (সময়সীমা) পার হয়ে গেলে তাতে বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না।

২৩. মাপার সময় ধোঁকাবাজি করে কম বেশি করবে না।

২৪. অগ্রহায়ণ মাসে ধান দিবে বলে সাঈদকে ১০ টাকা দিয়ে 'বায়য়ে-সলম' করলে, কিন্তু সময়মতো সাঈদ ধান দিতে পারলো না, এখন আসল ১০ টাকাই ফেরত নিতে পারবে। বেশি নিতে পারবে না বা সে টাকার পরিবর্তে অন্য কোনো জিনিসও নিতে পারবে না। তবে টাকা হাতে এনে তা দিয়ে যা ইচ্ছা কিনতে পারবে।

২৫. কম দামে ধান কিনে বেশি দামে বিক্রি করা জায়েয আছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় যখন মানুষের কষ্ট হয়, তখন বিক্রি না করে আরও বেশি দরের আকাঙ্ক্ষা করা হারাম।

২৬. বাদশাহ (সরকার) বলপূর্বক জিনিসের দর ঠিক করে দিতে পারে না; হ্যাঁ ব্যবসায়ীদের প্রতি উপদেশ বা নসীহতস্বরূপ কিছু বলতে পারে।

২৭. জিনিস মেপে দেয়ার সময় কিছু বেশি দেয়াই ভালো।

২৮. শ্রমিক কাজ করলে মজুরিতে দেরি বা কম করবে না। দুর্বলদের এসব বিষয়ে ফরিয়াদী স্বয়ং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তা'আলা হবেন।

শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরঈ বিধানঃ সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নির্ভর স্থির সম্পদ সমৃদ্ধ, ফটকাবাজী ও জুয়া-মুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া এবং পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে।

সুদী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের হুকুমঃ ইসলামী অর্থনীতি ও লেন-দেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ কিছু সংখ্যক আলিমের মতে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এ-জাতীয় কোম্পানীর শেয়ার কেনা জায়েয বললেও বিশ্বের অধিকাংশ আলিমের মতে সুদের মতো জঘন্য পাপের ক্ষুদ্রতম দায় বর্তায় এমন কাজেও বিনা ঠেকায় কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। কাজেই মুল ব্যবসা হালাল হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী লেন-দেন করে এমন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়।

বর্তমান শেয়ার বাজারের শরঈ বিধানঃ বর্তমান শেয়ার বাজার দ্বারা উদ্দেশ্য হল– যেখানে শুধু Capital Gain তথা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয় (যদিও কখনো লোকসানও গুনতে হয়) কোম্পানীতে অংশীদার হয়ে লভ্যাংশ (Dividend) গ্রহণ মূল উদ্দেশ্য নয়; যদিও কখনো দাম বাড়ার অপেক্ষা করতে হয়। এ বাজারকে Secondary market (সেকেন্ডারী মার্কেট), Money market (মানি মার্কেট), Capital market (ক্যাপিটাল মার্কেট)-ও বলা হয়। এ বাজারে শেয়ারের লেন-দেন হয় স্বতন্ত্র গতিতে। কোম্পানী-ঘোষিত 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু' তথা শেয়ারের বাস্তব মূল্যের সাথে এবং কোম্পানীর বাস্তব অবস্থার সাথে শেয়ার বাজারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক একবারে গৌন।

এ-বাজারের শেয়ার আর কোম্পানীতে আনুপাতিক অংশিদারিত্ব মোটেও এক জিনিস নয়। অথচ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার মূল ভিত্তিই ছিল এ-কথার উপর যে, শেয়ার মূলত কোম্পানীর সকল সম্পদের আনুপাতিক মালিকানা। শুধু কাগজ বা সংখ্যা হলে তার ব্যবসা জায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা তখন সে ব্যবসার অর্থ হবে টাকার বিনিময়ে টাকার ব্যবসা। বর্তমান শেয়ার বাজারের

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থোপার্জন এক ধরনের জুয়া যা কোনো সূরতেই জায়েযের আওতায় পড়ে না। সুতরাং শেয়ার ব্যবসা করাকে কোনো নির্ভরযোগ্য আলিম বৈধ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

শেয়ার ব্যবসাকারীর করণীয় কি?

হারাম কারবারে জড়িত কোম্পানীর শেয়ার দ্বারা যারা ব্যবসা করেছেন তাদের তো সম্পূর্ণ আয়ই সদকা করে দেয়া জরুরী কোনো ধরনের সওয়াবের নিয়্যত ছাড়া। এক সাথে সম্ভব না হলে আস্তে আস্তে সদকা করতে থাকবে। এ ছাড়া সংশিষ্ট সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি মনে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে অপার কৃপায় ক্ষমা করুন। আমীন।

এই শেয়ার ব্যবসা বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে মুত্তাবায়ে সুন্নাহ মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম থেকে জেনে নিতে পারেন।

ঋণ নেয়া ও দেয়ার আদব

১. কারো কাছে ঋণী থেকে হাতে টাকা থাকতেও তা পরিশোধে টাল-বাহানা করা ভারী গোনাহ।

২. খবরদার! খবরদার! একান্ত বাধ্যবাধকতা না হলে করয করবে না, কিন্তু একান্তই যদি করতে হয়, তবে তা দ্রুত পরিশোধ করার চিন্তা ও চেষ্টা করবে, গাফেল হবে না।

৩. ঋণদাতা যদি কিছু শক্ত বা কর্কশ কথা বলে, তবে সবর করবে। কারণ তার হক আছে।

৪. যদি সঙ্গতি থাকে, তবে অন্য ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করে দিতে পারলে অনেক সওয়াব পাবে।

৫. কারও নিকট থেকে করয নিলে করয পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য দু'আ করবে এবং তার শুকরিয়া আদায় করবে। কারণ সে তোমার মুহসেন বা উপকারকারী।

৬. পিপাসার সময় পানি দান করা অনেক বেশি সওয়াব। যেখানে পানি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানে একজন পিপাসার্তকে পানি পান করালে একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব হয়। আর যেখানে প্রচুর পরিমাণে পানি পাওয়া যায় না, সেখানে পানি দান করলে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করার তুল্য সওয়াব পাওয়া যায়। –ইবনে মাজাহ

৭. ঋণগ্রহীতা যদি গরীব হয়, তবে তাকে পেরেশান করবে না। কিছু সময় তাকে দিবে অথবা ঋণ পুরোটা বা কিছুটা মাফ করে দিবে। তাহলে কিয়ামতের কষ্ট থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নাজাত দিবেন। –মুসলিম

৮. যদি কারও কাছে ঋণী হয়ে থাকো, তবে খারাপ জিনিস দিয়ে তার দেনা পরিশোধ করতে চাইবে না; বরং কিছু ভালো জিনিসই দিতে চেষ্টা করবে, কিন্তু করয দেয়ার সময় মাদরাসার পক্ষ থেকে এইরূপ শর্ত করা জায়েয নয়।

৯. কাউকে ভাত তরকারি পাকানোর জন্য কিছু আগুন দান করলে এতো সওয়াব হয়, যেমন ভাত-তরকারি দান করলে হয়। নিমক দান করলেও সেরূপ সওয়াব হয়।

১০. তোমার কাছে কারো কিছু পাওনা থাকলে বা কারও কিছু আমানত থাকলে তা লিখে রাখবে, নতুবা ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে।–সহীহ বুখারী

এতীমের প্রতি দয়া করা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ কোনো এতীমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, সে এবং আমি জান্নাতে এক সঙ্গে থাকবো, যেমন আমার হাতের এ দু'টি আঙ্গুল এক সঙ্গে রয়েছে। (শাহাদত ও মধ্যম আঙ্গুল) –মুজামে কাবীর, তবারানী ৭৮২১

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রেওয়ায়েতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলমানদের ঘরসমূহের মধ্যে ওই ঘরই সর্বোত্তম, যাতে কোনো এতীম থাকে এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে ওই ঘর হলো নিকৃষ্ট, যাতে কোনো এতীম থাকে এবং তার সঙ্গে অসদাচরণ করা হয়। –ইবনে মাজাহ

যারা এতীমের ধন-সম্পদ আত্মসাত করে, তাদেরকে কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠানো হবে, তাদের মুখ থেকে অগ্নিশিখা বের হতে থাকবে।–আবু ইয়া'লা

হযরত আওফ ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এবং বিধবা কিয়ামতের দিন এমনভাবে থাকবো (এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে যরী। মধ্যবর্তী ও শাহাদত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বলেন,) যেমন এ দুটি আঙ্গুল কাছাকাছি রয়েছে, তেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পোড়া-কপাল নারী কিয়ামতের দিন কাছাকাছি থাকবে। 'বিধবা' নারীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি

বলেন, এর অর্থ সেই নারী, যার স্বামী মারা যায় অথবা তালাক দিয়ে দেয়। অতঃপর সে প্রভূত নাম, যশ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও এতীম শিশুদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিয়ে করে না এবং নিজের প্রবৃত্তিকে বশে রাখে সন্তানরা যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত অথবা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত।

–আবু দাউদ, মেশকাত

এতীমের ভালোবাসা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে স্বস্নেহে এতীমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, যতোগুলো চুলের উপর দিয়ে তার হাত চলে, ততোগুলো সওয়াবই সে পায়। যে ব্যক্তি এতীম বালক্-বালিকার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে, আমি এবং সে জান্নাতে মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুলের মতো কাছাকছি থাকব। –বেহেশতী জেওর

অন্তরের কোমলতা ও প্রয়োজন পূরণের আমল

- হযরত আবু দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কামনা করে তার অন্তর নরম হোক, তার প্রয়োজন পূর্ণ হোক, সে যেন এতীমের উপর করুণা করে, তার মাথায় হাত বুলায় এবং তাকে নিজের মতো খানা খাওয়ায়। এতে তার অন্তরের কঠোরতা দূর হবে, সকল প্রয়োজন পূর্ণ হবে। -কানযুলউম্মাল পৃ. ১৬৯

জান্নাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথী হওয়া

হযরত সাহল ইবনে সায়াদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এবং ইয়াতিমের অভিভাবকগণ জান্নাতে এমন ভাবে থাকবো। অতঃপর তিনি নিজের শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী খাড়া করে ইশারা করে দেখিয়েছেন। -সহীহ বুখারী-২/৮৮৮

আজীবন জিহাদকারীর সওয়াব

- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুঃস্থ ও বিধবার সেবক আল্লাহর পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। -সহীহ বুখারী -সহীহ মুসলিম

এতীমের মাল খাওয়া

বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতীমের মালের সঠিক তদারকি করা হয় না। যার পরিণতিতে এতীম নাবালেগ সন্তানের মুরুব্বী চাচা, মামা, মা বা বড় ভাই যারা

থাকে, তারা নিজেরাই এতীমের মাল খেয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজন ও মেহমানদের খাইয়ে থাকে, কখনো মসজিদ-মাদরাসায় দানও করে থাকে। অনেক বছর পর এতীম যখন বড় হয়, তখন তাকে শুধু জমি ও বাড়ি ইত্যাদি বুঝিয়ে দেয়া হয়। অথচ এতো বছর তার সেসব সম্পত্তি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়েছে বা ভাড়া পাওয়া গিয়েছে বা উপার্জন হয়েছে, তা থেকে আয়ের সবটা তার পিছনে ব্যয় হয়নি। এ অবশিষ্টাংশ নিজেরা খরচ করে ফেলে এবং এতীমকে বুঝিয়ে দেয় না। মনে রাখতে হবে, এতীমের এসব মাল খাওয়া হারাম ও জাহান্নাম খরিদ করার শামিল। এতীম সন্তান মিরাস সম্পত্তি থেকে বড়দের সমান অংশ পাবে। কোনো ব্যাপারে এক কড়া-ক্রান্তিও কম পাবে না। তারপর উক্ত মাল থেকে তার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসা ও লেখাপড়ার জন্য খরচ করতে থাকবে এবং অবশিষ্ট অংশ তার নামে হেফাযত করতে থাকবে। যখন এতীম বালেগ ও বুদ্ধিমান হবে, তখন তার সমুদয় সম্পত্তি এবং তা থেকে বর্ধিত আয় তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটি বড়ই নাজুক। কারণ কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা অবৈধভাবে এতীমের মাল খায়, তারা তাদের পেটে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করায়।' –সূরা নিসা : ১০

ইসলাহ : শুধু মৃত গরীবের সন্তানকেই এতীম বলা হয় না; বরং সম্পদশালী মৃত ব্যক্তির নাবালেগ ছেলে-মেয়েও এতীম। সুতরাং তাদের মাল কোনোভাবে খাওয়াও এতীমের মাল খাওয়া এবং জাহান্নামের আগুন খাওয়ার নামান্তর।

মীরাস বণ্টন

মাইয়্যেতের কাফন-দাফনের পর বেশি বিলম্ব না করে তার মীরাস বণ্টন করে হকদারকে বুঝিয়ে দেয়া কর্তব্য। বিশেষ করে যদি কোনো ওয়ারিস নাবালেগ থাকে, তখন বিষয়টি আরো বেশি জরুরী হয়ে পড়ে। সুতরাং কোনো হক্কানী মুফতী সাহেব বা আলেম দ্বারা মীরাস বণ্টন করে সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে যিনি মুরুব্বী হবেন, তিনি দেখাশুনা করবেন। এটা খুবই জরুরী।

বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেয়া জরুরী

এ ব্যাপারে আরো একটি মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে, সাধারণতঃ ভাইয়েরা বোনদের অংশ দেয় না বা দিলেও সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করে দেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, বোনেরা লৌকিকতা করে ভাইদেরকে বলে, আমি অংশ নিবো না, ভাইকে দিয়ে দিলাম। বোনদের এ-কথায় ভাইয়েরা তো মহাখুশী। বোনদের খুবই আদর যত্ন শুরু করে দেয়। তারা একবারও চিন্তা করে না, বোনেরা এ-কথা কেন বলে? তাদের কি সম্পদের প্রয়োজন নেই? না তাদের সন্তান নেই? সবই তো আছে, তাহলে তারা কেন ছেড়ে দিচ্ছে? আসল কথা হলো, অনেক বোন মনে করে, আমি যদি বাপের অংশ গ্রহণ করি, তাহলে বাপের ভিটায় আসার রাস্তা

বন্ধ হয়ে যাবে, ভাইয়েরা স্থান দিবে না, খাতির তোয়াজও করবে না। সুতরাং সেটা জারি রাখার জন্য যেহেতু আর কোনো রাস্তা নেই, তাই তারা লৌকিকতা করে তাদের অংশের দাবি ছেড়ে দেয়। অথচ এভাবে দাবি ছাড়লে উক্ত সম্পত্তি ভাইয়ের জন্য কখনো হালাল হবে না। অন্তরের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে একজনের মাল অপরের জন্য হালাল নয়। সুতরাং বোনদেরকে ঠকানো বা বোনদের পক্ষ থেকে লৌকিকতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত মাল অবৈধ ও হারাম। এতে বান্দার হক নষ্ট করা হয়, যা মহাপাপ। এটা এতো বড় পাপ, আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করবেন না। কিয়ামতের ময়দানে-এর বদলে নেকী দিতে হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে পাওনাদারদের গুনাহ'র বোঝা নিতে হবে। তাছাড়া-এর দ্বারা হারাম খাওয়া হয় এবং পরিবার-পরিজনকে হারাম খাওয়ানো হয়। এই ধরনের সম্পদ দিয়ে সন্তানাদি লালন-পালন করলে তারা নাফরমান হয়। সুতরাং কখনো এ-ধরনের লোভ করা উচিত নয়।

এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর ভাইয়েরা বোনদের ন্যায্য অংশ তাদের বুঝিয়ে দিবে এবং তাদের লৌকিকতার দান গ্রহণ করবে না; বরং বুঝিয়ে বলবে, তোমাদেরও মালের প্রয়োজন আছে। তোমাদের ছেলেমেয়ের মালের প্রয়োজন পড়বে। সুতরাং তোমাদের অংশ অবশ্যই তোমরা নিয়ে যাও। আমি/আমরা আজীবন আমার/আমাদের নিজের মাল দ্বারা সাধ্যানুযায়ী তোমাদের খেদমত ও দেখাশুনা করবো ইনশাআল্লাহ। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, কেউ যদি নিজের হায়াতের মধ্যে ও মালের মধ্যে বরকত চায়, তাহলে সে যেন সেলায়ে রেহমী করে। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে বোন, ফুফু ও খালাদের খেদমত করে ও খোঁজ খবর রাখে।' -বুখারী শরীফ, হাদীস : ৫৯৮৬

এভাবে বুঝিয়ে বললে দেখা যাবে তারা তাদের অংশ গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, এভাবে বুঝিয়ে বলে যখন তাদের নিজ অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে, এরপরও যদি কোনো বোন নিজের মালের পুরোটা বা একাংশ নিজের কোনো ভাইকে হাদিয়া দেয়, তাহলে সেটা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই, এটা ভাইয়ের জন্য হালাল হবে।

স্ত্রীর মহরের ব্যাপারটি-এর উপর ভিত্তি করে বুঝে নেয়া কর্তব্য। কোনো চাপে বা লৌকিকতা করে যদি স্ত্রী মহর মাফ করে দেয়, তবে কখনো সেটা মাফ হবে না।

বিবাহ্ শাদীর আহকাম

বিয়ের সুন্নাতসমূহ

১. মাসনূন বিয়ে সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর হবে, যা অপচয়-অপব্যয়, বেপর্দা ও বিজাতীয় সংস্কৃতি, গান-বাদ্য, ভিডিও-অডিও করা, ফটো উঠানো ইত্যাদি থেকে মুক্ত হবে এবং তাতে যৌতুকের শর্ত বা সামর্থ্যের অধিক মোহরানা থাকবে না।

২. সৎ ও খোদাভীরু পাত্র-পাত্রীর সন্ধান করে বিয়ের পয়গাম পাঠাবে।

৩. বিয়ের খবর ব্যাপকভাবে প্রচার করে বিয়ে করা এবং বিয়ের পরে আক্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত লোকদের মাঝে খেজুর বিতরণ করা। –বুখারী,: ৫১৪৭

৪. শাওয়াল মাসে এবং জুমু'আর দিনে মসজিদে বিয়ে সম্পাদন করা। উল্লেখ্য, সকল মাসের যে কোনো দিন বিয়ে সম্পাদন জায়েয আছে।
–মুসলিম, বাইহাকী

৫. সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করুন।

৬. আকদের মজলিসে বরের কবূল বলার পর এই দু'আ পড়া সুন্নাত–

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

(আল্লাহ আপনার বিবাহে বরকত দান করুন। আপনার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং আপনাদেরকে কল্যাণে একত্র করুন।) -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৩২; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১০৯১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৯৫৭

৭. বাসর রাতে স্ত্রীর কপালের চুলের উপর হাত রেখে স্বামী এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তার কল্যাণকর স্বভাব (তার মাঝের ভালো গুণ) কামনা করছি। আর তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এবং তার অকল্যাণকর স্বভাব (তার মাঝের মন্দ গুণ) থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৬২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৫২; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ২৭৫৭

৮. স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হওয়ার পর যখন সহবাসের ইচ্ছা হয় তখন প্রথমে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে নেয়া।

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا

(আল্লাহর নামে শুরু করছি! হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হতে রক্ষা করুন এবং আপনি আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাকে শয়তান হতে রক্ষা করুন।) -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩৪;সুনানে আবু দাউদ,হাদীস নং ২১৬৩

৯. ওলীমা খাওয়ানোর আয়োজন করা। অলীমার মজলিসে হাদিয়া লেন-দেন ঠিক নয়। কেউ হাদিয়া দিতে চাইলে নিজের সুযোগমত পাঠিয়ে দিবে, প্রচার করবে না। গোপনে দিবে, এটাই হাদিয়ার সুন্নাত।

১০. শর্ত আরোপ করে বরযাত্রীর নামে বরের সঙ্গে অধিক সংখ্যক লোকজন নিয়ে যাওয়া এবং কনের বাড়িতে মেহমান হয়ে কনের পিতার উপর বোঝা সৃষ্টি করা আজকের সমাজে একটি জঘন্য কু-প্রথা, যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা জরুরী।

বিয়ে ও দাম্পত্যের কিছু আদব

১. বিয়ে করতে বংশ, সম্পদ, সৌন্দর্য– এই সব বেশি না দেখে পাত্র বা পাত্রী দ্বীনদার পরহেযগার কি না তাই দেখবে। –সহীহ বুখারী

২. সফর থেকে এসে বাড়ির মধ্যে যেতে এ পরিমাণ দেরী করবে, যাতে স্ত্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সাজসজ্জা করে ঠিকঠাক হতে পারে। কেননা ভিন্ন অবস্থায় দেখলে হয়ত ঘৃণা জন্মাতে পারে। –সহীহ বুখারী

৩. কোনো মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব থাকলে, তার জন্য দ্বীনদার পরহেযগার পাত্র দেখে বিবাহ দিবে। দ্বীন ছেড়ে দুনিয়ার প্রাচুর্য, প্রভাব প্রতিপত্তি তালাশ করতে গেলে তার পরিণাম খারাপ হয়। –জামে তিরমিযী

৪. ঘটনাক্রমে যদি কোনো বিধবা বা অবিবাহিতা কন্যার সঙ্গে কারো ইশ্ক-মুহাব্বত হয়ে পড়ে, তবে তাদের উভয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়াই ভালো। –ইবনে মাজাহ

৫. যে বিয়ের মধ্যে খরচ কম হয় এবং মোহরও হাল্কা হয়, সেই বিয়ের বরকত বেশি হয়। –জামে তিরমিযী

৬. সচরাচর মেয়েলোকের অভ্যাস যে, অন্য মেয়ের রূপ-গুণ নিজের স্বামীর নিকট বলে; এটা বড়ই খারাপ।

৭. যে কন্যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়, বিয়ের পূর্বে বর তাকে কোনো কৌশলে এক নযর দেখে নিতে পারলে ভালো হয়, নতুবা বিয়ের পরে সুরত দেখে পসন্দ না হলে অশান্তি হতে পারে।

৮. বিয়ে করে অলীমা খাওয়ানো মুস্তাহাব, কিন্তু নিয়্যত খালেছ রাখা চাই। নাম-যশের খেয়ালে অনেক ধুমধাম করা ভালো নয়। তাওফীকে যেমন জুটে তেমনি সাদাসিধাভাবে অলীমা করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিবির ওলীমা কেবল দুই সের যবের দ্বারা করেছিলেন। বিবি সফিয়ার অলীমা খোরমা, পনির এবং ঘি দ্বারা করেছিলেন। সবচেয়ে বড় অলীমা বিবি যয়নবের জন্য হয়েছিল। তাতে একটা বকরী যবেহ করে লোকদের পেট ভরে গোশত রুটি খাইয়েছিলেন। তারও অনুসরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। –সহীহ বুখারী

৯. এক জায়গায় কেউ বিয়ের কথাবার্তা বলছে, যতক্ষণ সে ছেড়ে না যায় বা মেয়ে/অভিভাবক ছাফ জওয়াব না দিয়ে দেয়, ততক্ষণ তুমি সেখানে বিয়ের প্রস্তাব করবে না। –সহীহ বুখারী

১০. একজনের এক স্ত্রী আছে, এখন অন্য আরেকটি বিয়ে করতে চায়। তার নিকট প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার নিবে না। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর আপন আপন তকদীর।

১১. স্বামী-স্ত্রীর নির্জনের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম অন্য কারও নিকট (চাই শত দোস্ত হোক) বলা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত না-পসন্দ। প্রায়ই অনেকে নতুন দুলহা-দুলহান এর খেয়াল রাখে না, এটা ঠিক না।

১২. দুই বা ততোধিক স্ত্রী থাকলে সকলকে সমানভাবে রাখবে। অন্যথায় অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাশর হবে।

১৩. স্ত্রীলোকের সাধারণত বুদ্ধি কম হয়। এটা খোদায়ী বিধান। তাই সাধ্যানুযায়ী তাদের অন্যায় কথা বা অন্যায় ব্যবহার সহ্য করবে। শত্রুতা বা জিদ করবে না। চিন্তা করে দেখবে, তার কোনো বিষয় না-পসন্দ হলেও আবার অনেক বিষয় পছন্দেরও আছে। স্ত্রী কোনো অন্যায় করলে আগে তাকে বুঝাবে। কাজ না হলে, দু-এক দিন কথা বন্ধ করে রাখবে। তাতে কাজ না হলে আলাদা বিছানায় শোবে। এতেও কাজ না হলে, হালকা কিছু প্রহার করবে। তবে সাবধান! জিদ করে তাকে প্রহার করবে না; মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না এবং এমনভাবে প্রহার করবে না যাতে শরীরে কোনো দাগ পড়ে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের ভদ্র শ্রেণীর লোক তাদের স্ত্রীদের প্রহার করবে না।

স্ত্রীর মন সবসময় সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবে, গালাগালি করবে না। রাগ হয়ে তাকে একা ছেড়ে চলে যাবে না।

১৪. স্ত্রীর কর্তব্য প্রাণপণে স্বামীর খেদমত করা। স্বামীর আদেশ পালনে আদৌ কোনো রকম টাল-বাহানা আলস্য বা অবহেলা করবে না। স্বামীর সামর্থ্য অপেক্ষা বেশি মূল্যবান অলঙ্কার, পোশাক বা খোরাক চাইবে না। স্বামীর সাক্ষাতে মুখ চালাবে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল নামায-রোযা করবে না। স্বামীর কোনো সম্পদ তার বিনা অনুমতিতে কাউকে দিবে না, নিজেও প্রয়োজনের বেশি খরচ করবে না। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে বাড়ির মধ্যে আসতে দিবে না, নিজেও অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না। একান্ত অপারগতা না হলে তালাক চাইবে না।

১৫. স্বামী যদি স্ত্রীকে সামান্য প্রহার করে তার জন্য অন্য লোকের কাছে নালিশ করতে নেই। কারণ যার কাছে নালিশ করা হবে, সে স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে স্বামী লজ্জায় কিছু বলতে পারবে না।

১৬. শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কখনও তালাক দিবে না। কারণ যতো মুবাহ কাজ আছে তন্মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মুবাহ কাজ হল তালাক।

১৭. একান্ত অপারগতাবশত তালাক দিতে হলে ঋতুর পর পাক সময় ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে মাত্র এক তালাক দিবে। হায়েযের অবস্থায় বা রাগের মুহূর্তে বা এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে না।

বিয়ে পড়ানোর নিয়ম

- মসজিদের মধ্যে বিয়ে সম্পাদন করা সুন্নাত।
- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতএব, বিয়ের খুৎবাও দাঁড়িয়ে দেয়া উত্তম।
- বিয়ের খুৎবার পরে আকদ সম্পাদন করা। অলীর নিজেরই খুৎবা এবং আকদ দু'টিই সম্পন্ন করা উত্তম; বরং এটাই সুন্নাত।
- আকদের নিয়ম এই যে, কনের অভিভাবক বলবে, আমি আমার অমুক মেয়েকে বা আমার মোয়াক্কেলাকে এই পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম। বর বলবে, আমি কবূল করলাম।

বিয়ের খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ, وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ, وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً, وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا – يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

বিয়ে-শাদীর প্রচলিত ভুলসমূহ

বিবাহ-শাদী মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে বিশেষ নে'আমত হিসেবে দান করেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবাহ-শাদী দুনিয়াবী কাজ বা মুবাহ মনে হলেও যথা নিয়মে সুন্নাত তরীকায় যদি তা সম্পাদন করা হয় তাহলে সেটা বরকতপূর্ণ ইবাদত ও অনেক সওয়াবের কাজ হয়। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিবাহ-শাদী সুন্নাত তরীকায় তো হয়ই না। উপরন্তু এটা বিভিন্ন ধরনের কু-প্রথা এবং বড় বড় অনেক গুনাহ'র কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পারিবারিক জীবনে অশান্তির ঝড় বয়ে চলছে। এজন্য নিম্নে বিবাহ-শাদী সম্পর্কিত কিছু ভুল এবং কু-প্রথা তুলে ধরা হল। যাতে এগুলো থেকে বাঁচা সহজ হয়।

বিয়ের পূর্বের ভুলসমূহ

১. বিয়ে শাদী যেহেতু ইবাদত, সুতরাং এখানে দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দিতে হবে। দুনিয়াদারগণ সৌন্দর্য, মাল-দৌলত ও খান্দানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের বিপরীত হওয়ায় এটা শান্তি বয়ে আনে না।

২. কোনো কোনো জায়গায় অভিভাবক এবং সাক্ষী ছাড়া শুধু বর-কনের পরস্পরে সন্তুষ্টিতেই বিয়ের প্রচলন আছে। অথচ এভাবে বিয়ে বিশুদ্ধ হয় না। বরং এটা যিনা-ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও যদি মেয়ে পক্ষের অভিভাবকের সম্মতি না থাকে, আর ছেলে ও মেয়ের মাঝে 'কুফু' তথা দ্বীনদারী, মালদারী ও পেশাগত দিক থেকে সামঞ্জস্যশীল না হয় তাহলে সে বিয়েও শুদ্ধ হয় না।

৩. কেউ কেউ ধারণা করে যে, কনের মাসিক চলাকালীন বিয়ে শুদ্ধ হয় না। অথচ এ অবস্থায়ও বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এ অবস্থায় সহবাস জায়েয নয়।

৪. কেউ কেউ ধারণা করে যে, মহিলা মুরীদের সঙ্গে পীর সাহেবের বিয়ে জায়েয নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ সকলেই তাঁর মুরীদ ছিলেন।

৫. অনেকে অনেক বয়স হওয়ার পরও বিয়ে করে না কিংবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর বা সে মৃত্যুবরণ করার পর আর দ্বিতীয় বিয়ে করে না। অথচ শারীরিক বিবেচনায় তার বিয়ে করা জরুরী ছিল। এ অবস্থায় থাকা মানে যিনা-ব্যভিচারে জড়িত হওয়ার রাস্তা খুলে দেয়া।

৬. অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় (উদাহরণস্বরূপ) ৬০ বছরের বয়স্ক লোক অল্প বয়সী যুবতী মেয়েকে বিয়ে করে বসে। ফলে ঐ মেয়ে নিশ্চিত জুলুমের শিকার হয়।

৭. অনেকে স্ত্রীর খেদমতের হক আদায়ের অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও দুর্বলতা লুকিয়ে লোক দেখানোর জন্য বিয়ে করে স্ত্রীর জীবনকে নষ্ট করে দেয়। এটি মারাত্মক গুনাহ'র কাজ।

৮. কোনো কোনো আধুনিক শিক্ষিত লোক আধুনিক শিক্ষা তথা ডাক্তারি প্রফেসারি ইত্যাদি ডিগ্রি দেখে মেয়ে বিয়ে করে। তাদের ভাবা উচিত বিয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য কী? যদি তার স্ত্রীর দ্বারা টাকা কামানো উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা তো বড় লজ্জাজনক কথা যে, পুরুষ হয়ে মহিলাদের কামাইয়ের আশায় বসে থাকবে। মনে রাখতে হবে এ ধরনের পরিবারে শান্তি আসে না।

৯. কেউ কেউ পালক পুত্রের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করাকে নাজায়েয মনে করে। এটা জাহিলী যুগের বদরসম।

১০. কেউ কেউ বিধবা মহিলাদের বিয়ে করাকে অপসন্দ করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকাংশ স্ত্রী বিধবা ছিলেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৭৭

বিয়ে শাদীতে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি

বরপক্ষের ভুলসমূহ

১. বিয়ে-শাদী যেহেতু ইবাদত, তাই বিয়েকে কেন্দ্র করে কোনো প্রকার গুনাহ্ না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে খায়ের-বরকত লাভ হবে। যদি বিয়েকে গুনাহমুক্ত করা না যায় তাহলে সেখানে অশান্তি হওয়া নিশ্চিত।

২. প্রথাগতভাবে অনেক লোকের বরযাত্রী হিসেবে যাওয়া।

৩. দাওয়াতকৃত সংখ্যার অধিক লোক নিয়ে যাওয়া।

৪. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কন্যার জন্য যৌতুক পাঠানো এবং এটাকে আবশ্যকীয় জরুরী মনে করা।

৫. গায়ের মাহরাম পুরুষ দ্বারা মেয়ের ইযিন বা অনুমতি আনা।

৬. বেগানা পুরুষদের কন্যার মুখ দেখা এবং দেখানো।

৭. নাচ-গান, বাজনা ইত্যাদি করা।

৮. সালামী গ্রহণ করা।

৯. মোহরানা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পূর্বেই না করা, বরং করাকে দোষ মনে করা। অতঃপর বিয়ের সময় তর্ক-বিতর্ক করা।

১০. লোক দেখানোর জন্য বা গর্বের সঙ্গে অলীমা করা।

১১. মহরানার বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া এবং মহরানা আদায়ে গাফলতী করা।

১২. ইচ্ছাকৃত এমন কর্মকাণ্ড করা, যে কারণে কোনো পক্ষের অদূরদর্শিতা প্রমাণিত হয় অথবা তাদের অস্থিরতার কারণ হয়। আর নিজেদের সুনাম প্রকাশ পায়।

১৩. বিয়ে অনুষ্ঠানের কারণে ফরয-ওয়াজিবসহ শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করা।

কন্যাপক্ষের ভুলসমূহ

১. বরযাত্রার চাহিদা।
২. ছেলের জন্য উপঢৌকন/যৌতুক প্রকাশ্যে পাঠানো, পাঠানোকে পসন্দ করা এবং জরুরী মনে করা।
৩. আত্মীয়-স্বজন মহল্লাবাসীদের জন্য প্রথাগত দাওয়াত এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা।
৪. বিয়ের সরঞ্জাম, অলঙ্কারাদি প্রকাশ্যে দেখা এবং অন্যদেরকে দেখানো।
৫. বিয়ের পর রসম হিসেবে জামা'আতাকে শরবত পান করানো।
৬. বেগানা মহিলারা জামা'আতার সামনে আসা।
৭. সালামী গ্রহণ করা। এটাকে জরুরী মনে করা এবং দেয়া-নেয়া করা।
৮. যাতে মহল্লায় খুব প্রসিদ্ধ হয় সেজন্যে ইচ্ছাকৃত কোনো কিছু করা।
৯. ফরয-ওয়াজিব ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন হওয়া। এছাড়াও বিয়ে উপলক্ষে বেপর্দা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা, অপব্যয়, ছবি তোলা এবং ভিডিও ইত্যাদি করা হয়, যাতে বিয়ের সকল খায়ের-বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

বিয়ের কিছু কু-প্রথা

১. মেয়ের ইযিন আনার জন্য ছেলেপক্ষ স্বাক্ষী পাঠিয়ে থাকে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোনো প্রয়োজন নেই।
২. বিয়ের সময় অনেকে বর-কনের দ্বারা তিনবার করে ইজাব কবূল পাঠ করিয়ে থাকে এবং পরে তাদের দ্বারা আমীন বলানো হয়। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।
৩. ইজাব-কবূলের মাধ্যমে আকদ সম্পাদন হওয়ার পর মজলিসে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করে সামনে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে বর যে সালাম করে থাকে তারও কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই।

ঝগড়া-ফাসাদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও খেজুর ছিটানোকে জরুরী মনে করা হয়। অথচ এ সম্পর্কিত হাদীসকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম 'যঈফ' বলেছেন।

বিয়ে-শাদীর আরো কতিপয় কুসংস্কার

১. অনেক জায়গায় বিবাহে রওয়ানা হওয়ার আগে এলাকার প্রসিদ্ধ মাযার যিয়ারত করে তারপর রওয়ানা হয়। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।

২. বরের নিকট কনে পক্ষের লোকেরা হাত ধোয়ানোর টাকা, পান-সুপারির পাত্রের পানের সঙ্গে দিয়ে তার থেকে কয়েকগুণ বেশি টাকা জোর জবরদস্তী করে আদায় করে থাকে। এটা নাজায়েয।

৩. অনেক জায়গায় গেট সাজিয়ে সেখানে বরকে আটকে দেয়া হয় এবং টাকা না দেয়া পর্যন্ত ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। এটাও একটা গর্হিত কাজ।

৪. খাওয়া-দাওয়া শেষে কনে পক্ষের লোকেরা বরের হাত ধোয়ায়। পরে হাত ধোয়ানো বাবদ টাকা দাবি করে। অনেক জায়গায় এ নিয়ে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। এটা একেবারেই অনুচিত। মূলত এসব হিন্দুয়ানী প্রথা। দীর্ঘদিন যাবত হিন্দুদের সঙ্গে বসবাস করার কারণে আমাদের মাঝে এসব কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ করেছে।

৫. বিয়ে পড়ানোর আগে বা পরে যৌতুকের বিভিন্ন জিনিস-পত্র প্রকাশ্য মজলিসে সকলের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এটাও অন্যায় ও নির্লজ্জতার কাজ।

৬. বিয়ের পরে নারী-পুরুষ সকলের সামনে কনের পিতা বা মাতা জামাই-মেয়ের হাত একসঙ্গে করে তাদেরকে দু'আ দেয়। কনের পিতা জামাইকে বলে "আমার মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম, তুমি একে দেখে শুনে রেখ।" এর কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই।

৭. বিয়ে করে আনার পর শ্বশুরবাড়িতে নববধূকে বিভিন্ন কায়দায় বরণ এবং নববধূর চেহারা সকলকে দেখানো হয়; এ-সবই হিন্দুয়ানী প্রথা। কোনো মুসলমানের জন্য এসব করা জায়েয নয়।

৮. অনেক জায়গায় মেয়ের বিয়ের আগের দিন আবার কোথাও মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পরের দিন মেয়ের বাড়ি থেকে ছেলের বাড়িতে মাছ-মিষ্টি ইত্যাদি পাঠানো হয়ে থাকে। কোথাও এটাকে চৌথি বলা হয়। এটাও বিজাতীয় নাজায়েয প্রথা।

৯. বর বা কনেকে কোলে করে গাড়ি বা পালকী থেকে নামিয়ে ঘরে তোলাও চরম অভদ্রতা বৈ কিছু নয়।

১০. ঈদের সময় বা অন্য কোনো মৌসুমে মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে চাল, আটা, ময়দা, পিঠা ইত্যাদি পাঠানো এবং এ প্রচলনকে জরুরী মনে করার প্রথা অনেক জায়গায় চালু আছে। আবার অনেক জায়গায় আনুষ্ঠানিকভাবে জামাইকে এবং তার ভাই-বোনদেরকে কাপড়-চোপড় দেয়ার প্রথা

আছে। এমনকি এটাকে এতোটাই জরুরী মনে করা হয় যে, ঋণ করে হলেও তা দিতে হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে সীমালংঘন ছাড়া আর কিছু নয়।

১১. আজকাল বিয়ে অনুষ্ঠানে বেগানা মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে নিজেকে বিকশিত করে একত্রিত হতে দেখা যায় এবং যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলা-মেশা করতেও দেখা যায়। এ ধরনের বেপর্দা আর বেহায়াপনার কারণে উক্ত মজলিসে উপস্থিত নারী পুরুষ সকলেই গুনাহগার হবে।

১২. বিয়ে উপলক্ষে গান-বাজনা, ভিডিও করা, ফটো উঠানো ইত্যাদি মহামারী আকার ধারণ করেছে। আর কোনো কোনো এলাকায় তো যুবতী তরুণী মেয়েরা একত্রিত হয়ে নাচ গানও করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এসব হারাম ও নাজায়েয।

১৩. আজকাল বিয়ে অনুষ্ঠান মানেই গুনাহ'র ছড়াছড়ি। এমন এমন গুনাহ সেখানে সংঘটিত হয়, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছবি তোলা। চাই ইহা ক্যামেরার মাধ্যমে হোক কিংবা ভিডিও-এর মাধ্যমে হোক বা অঙ্কন করাই হোক না কেন, সবই হারাম।

১৪. বিয়ের পরে মেয়েকে উঠিয়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে মেয়ের বাড়িতে পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা একত্রিত হয়, আর বরকে অন্দর মহলে এনে সকলে মিলে হৈ হল্লা করে তার মুখ দর্শন করে। মেয়েরা হাসি তামাশা করে বিভিন্ন উপায়ে নতুন দুলাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে। আর নির্লজ্জ হাসি তামাশায় মেতে উঠে। এ-ধরনের বেপর্দেগী শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম।

১৫. অনেক জায়গায় এমন প্রথা চালু আছে যে, নববধূকে বর নিজে বা তার ভগ্নিপতি অথবা তার ছোট ভাই পালকী বা গাড়ী থেকে নামিয়ে কোলে করে ঘরে নেয়। তারপর উপস্থিত মহল্লাবাসীর সামনে নববধূর মুখ খুলে দেখানো হয়। এ সকল কাজ হারাম এবং না-জায়েয।

পর্দার গুরুত্ব ও বিধান

লজ্জা-শরম হচ্ছে মেয়েদের মহামূল্যবান অলঙ্কার। একজন নেক মেয়ে আর লজ্জা-শরমের মধ্যে এতোটাই দৃঢ় সম্পর্ক যে, একটা ছাড়া অন্যটা কল্পনা করাও কঠিন। নেক মেয়ে মানেই হচ্ছে- লাজ-শরমের মূর্তপ্রতীক এক অসাধারণ মহিলা।

কোনো মেয়ের এই মহামূল্যবান অলঙ্কার হারিয়ে গেলে সে দুনিয়াবী মান-মর্যাদা আর অর্থ সম্পদের দিক থেকে যত উঁচুতেই অবস্থান করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে তার স্থান অতি নিম্নে। তাই শরম-হায়ার হেফাযত করা প্রতিটি মেয়ের কর্তব্য। আর এটি হেফাযতের সবচেয়ে উত্তম পন্থা হলো পর্দা। পর্দার মাধ্যমে তারা ভিন্ন-পুরুষের কাছে নিজেদের দৈহিক সৌন্দর্য গোপন রাখবে। হায়া-শরমের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখবে, এটাই শরীয়তে ইসলামীর মর্মকথা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থ- (হে মুমিন নারীগণ) তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের জাহিলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। –সূরা আহযাব : ৩৩

উক্ত আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ জরুরী প্রয়োজনে শরঈ অনুমতি ব্যতীত তারা বাইরে বের হবে না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলাম পূর্ব জাহেলী ও অন্ধ যুগে নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দায় চলাফেরা করতো, তোমরা সে রকম চলাফেরা করো না।

বর্ণিত আয়াতে পর্দা সম্পৃক্ত দু'টি বিষয় জানা গেল-

প্রথমত : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য। গৃহকর্ম তথা গৃহের অভ্যন্তরীণ কর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। যেমন স্বামীর সেবা যত্ন, সন্তানদেরকে দ্বীনী ও কুরআনী তা'লীম, স্বামীর সংসার ও সম্পদের সংরক্ষণ, মহিলা মহলে দ্বীনের দাওয়াত ও তা'লীম এবং নিজের ইবাদত বন্দেগীই তার জীবনের মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত : শরঈ প্রয়োজনের তাকীদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতেই হয়, তাহলে তার বের হওয়া জায়েয আছে বটে, তবে শর্ত হল যেন সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে পর্দার সাথে বের হয় বরং চেহারাসহ গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন বোরকা অথবা এমন বড় আকারের চাদর ব্যবহার করে বের হবে।

–মা'আরিফুল কুরআন ৭/১৩৩

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থ- হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের বিশেষ অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (আযাদ মহিলা হিসেবে) চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দিবে না। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। –সূরা আহযাব-৫৯

উল্লিখিত আয়াতে নারীদেরকে পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে বলা হয়েছে- সমস্ত শরীর পর্দায় আবৃত রাখার ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দাই নারী জাতির নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

অর্থ- হে নবী পত্নীগণ! (উদ্দেশ্য উম্মতের সকল মহিলা। -মা'আরিফুল কুরআন, ৭/১৩১) তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে পরপুরুষের সঙ্গে এমন কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, যার ফলে যে ব্যক্তির অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে কু-বাসনা করবে। আর তোমরা সংযত কথাবার্তা বলবে। –সূরা আহযাব, ৩২

উক্ত আয়াতটিও নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত। আয়াতে فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি পরপুরুষের সঙ্গে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে বাক্যালাপের সময় নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা কৃত্রিমভাবে পরিহার করবে। অর্থাৎ এমন কোমলতা যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে, তার কোনো

সুযোগ দিবে না। যেমন- এরপরে ইরশাদ হয়েছে- فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ- অর্থাৎ এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করবে না, যা ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কু-বাসনা, লালসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

মোদ্দাকথা, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নতস্তর অর্জন করা উচিত, যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোনো কামনা ও লালসা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, তার নিকটেও ঘেঁষতে চাইবে না। তাই কু-প্রবৃত্তির লালায়িত হওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। –মাআরিফুল কুরআন-৭/১৩২

স্বর্ণযুগের সোনার মানুষ পুণ্যাত্মা নবীপত্নীগণকে যদি স্বর্ণযুগের স্বর্ণমানব সাহাবায়ে কিরামের (রাযি.) সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার ক্ষেত্রে এমন কড়া নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে যে, তাঁদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, তাহলে আধুনিক যুগের নারী-পুরুষদের কি পর্দার প্রয়োজন নেই? অথবা পর্দার প্রয়োজন থাকলেও তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন নেই? অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না; বরং বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর সে প্রয়োজন আরো তীব্রভাবে অনুভূত হয়। বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যবহার ও সহজলভ্যতার কারণে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেইসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ ও কথোপকথনের মাধ্যমে কতো অধিক সংখ্যক অবৈধ প্রণয় যে সংঘটিত হচ্ছে যার কোনো ইয়ত্তা নেই। এ সবেরই যার অশুভ পরিণামে আত্মহত্যা, সংসার জীবনে অবিশ্বাস, সন্দেহের দানা ঘনীভূত হয়ে এক পর্যায়ে নির্মম পরিণতি নিয়ে আসে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী হত্যা, এমনকি নিজের আদরের দুলাল সন্তানকে নিজ হাতে খুন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না আবার ঐ আদরের দুলালও কখনো পিতা মাতার গলাকেটে হত্যা করে ফেলার ঘটনা ঘটে। এসব হয় অবৈধ প্রণয়ে নিমজ্জিত থাকার কারণে।

উল্লেখ্য যে, শরীয়তের এই বিধি-নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার কারণেই এসব অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই মহিলাদের অন্যদের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ, কথোপকথনের ব্যাপারেও শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা নিহিত।

পর্দার প্রতি যত্নবান মেয়েদের দেখা যায় তারা ভিন্ন পুরুষ তো দূরে থাক, আপন লোকদের সামনেও যথাসম্ভব নিজেদের ঢেকে রাখে। বাপ-ভাইয়ের সামনেও তারা এমন পাতলা ফিনফিনে কাপড় পরে আসে না যাতে বেপর্দা হওয়ার

আশঙ্কা থাকে। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ মাহরামের সঙ্গেও জরুরী পর্যায়ের পর্দা ও সতরের মাসআলা অনুসরণ আবশ্যক।

পর্দার প্রতি যত্নবান বহু পুণ্যবতী মহিলার কথা ইতিহাসে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর কোনো তুলনা হয় না। তিনি পর্দার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক।

পর্দার ব্যাপারে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) কতোটা সতর্ক ছিলেন তা নিম্নের ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) উভয়কে একই ঘরে দাফন করা হয়। এ ঘরেই তৃতীয় আরেকটি কবরের স্থান বাকি ছিল যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) নিজের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাযি.) সে স্থানটি নিজের জন্য চেয়ে নিলেন এবং শাহাদাতের পর তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

প্রথম কবর দুটির অধিবাসীদের একজন হলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-এর স্বামী দু'জাহানের বাদশাহ হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর অপরজন হলেন তাঁর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এজন্য এখানে তাঁর পর্দার কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু হযরত উমর (রাযি.)-এর দাফন হওয়ার পর থেকে কখনও তিনি বেপর্দা অবস্থায় এ হুজরা মোবারকে আসেননি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) শুধু নিজে পর্দা করেই ক্ষান্ত হননি। অন্যদের পর্দার ব্যাপারেও তাকীদ করেছেন।

একবার তাঁর এক ভাতিজী পাতলা ওড়না পরে তাঁর সামনে এলে তিনি রেগে যান। তার ওড়না ছিঁড়ে ফেলেন। তারপর একটি মোটা কাপড়ের ওড়না এনে তাকে পরিয়ে দেন।

আরেকবার তিনি কোনো বাড়িতে মেহমান হন। ওই বাড়ির যুবতী মেয়েরা ওড়না ব্যতীত নামায পড়ছিল। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, আগামীতে যেন কোনো মেয়ে ওড়না ব্যতীত নামায না পড়ে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ (ترمذي)

হযরত ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নারী হলো গোপনীয় বস্তু (যার পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকা উচিত)। সে যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি উঁচু করে তাকাতে থাকে। (অর্থাৎ, তাকে মানুষের চোখে সুশোভিত করে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়) –জামে তিরমিযী, ১/২২২

অর্থাৎ পরপুরুষের নযরে তাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে।

উক্ত হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য হলো, পর্দার ভেতর থাকাটাই নারীর জন্যে শোভনীয়। যদি কোনো নারী ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান পুরুষদের মনে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং মহিলার দ্বারা পুরুষদেরকে ফিতনায় ফেলতে চেষ্টা করে। যেমন এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'মহিলারা শয়তানের জাল'। -রাযীন

অর্থাৎ পুরুষদেরকে গুনাহ'র মধ্যে লিপ্ত করে আল্লাহ তা'আলার আযাবে নিপতিত করার জন্য শয়তানের বড় মাধ্যম হলো মহিলা। শয়তান যখন গুনাহে লিপ্ত করার সর্বপ্রকার মাধ্যম হতে নিরাশ হয়ে যায়, তখন মহিলাদেরকে ব্যবহার করে।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ফরয। এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদে দ্বীন হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক সাহেব (রহ.) বলেন, আপনারা বাজার থেকে যখন গোশত বা কোনো পণ্য খরিদ করে আনেন তখন সেটাকে অত্যন্ত হেফাযতের সঙ্গে ঢেকে আনেন যাতে চিল, কাক ইত্যাদি উক্ত গোশত ছোঁ-মেরে নিতে না পারে। তেমনি এক শত টাকার নোট ভিতরের পকেটে সীনার সঙ্গে মিলিয়ে রাখেন যাতে চোর পকেট কেটে টাকা নিতে না পারে। খাদ্যদ্রব্যকেও ঢেকে রাখা হয় যাতে ইঁদুর, বিড়াল পোকামাকড় ইত্যাদি প্রাণী তা নষ্ট করে না ফেলে। এখন আপনারাই বলুন মহিলাদের মূল্য কি আপনাদের নিকট এক কেজি গোশ্ত, এক শ টাকার নোট বা সামান্য খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের চেয়েও কম যে, মহিলাদের হেফাযতের জন্য পর্দায় রাখতে আপনারা যত্নবান নন?

অপর দিকে গোশত নিজে উড়ে চিলের নিকট, এক শ টাকার নোট চোরের নিকট, খাদ্য দ্রব্য ইঁদুরের গর্তে একা যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও এতো হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মহিলাদের তো নিজে উড়ার ক্ষমতা রয়েছে। নিজে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ মহিলাদের কারো প্রেমের জালে আবদ্ধ হয়ে পলায়নের ক্ষমতা রয়েছে। এরপরও কি তাদের দ্বীনী তা'লীম ও পর্দার ব্যবস্থার দ্বারা হেফাযতের প্রয়োজন নেই? অনেকেই আমরা নিজেদেরকে

বুদ্ধিজীবী দাবি করি। সত্যিকার অর্থে বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকলে চিন্তা করে দেখা উচিত যে, মহিলাদের জন্য পর্দার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে কি না?

–মাজালিসে আবরার/৩২

তাছাড়া যুক্তি বা বিবেকের দাবিও এটা যে, পর্দা নারী জাতির ইযযতকে হেফাযত করে; তাদের জীবনকে করে সুখময়। পর্দা কখনও মহিলাদের জন্য অপমানজনক নয়। আপনি চিন্তা করে দেখুন, নিজের স্বর্ণ-রূপা, হিরকখণ্ড কিভাবে লোকচক্ষু থেকে আড়াল করে হেফাযত করেন। আলমারীর সিন্দুক, তার মধ্যে কুঠরী, তার মধ্যে এগুলোকে রাখেন। এতে কি ঐসব বস্তুর অবমাননা হয়? না কি সেগুলো অতি মূল্যবান হওয়া প্রমাণিত হয়? পর্দার বিষয়টি ঠিক অনুরূপ। মহিলারা অধিক মূল্যবান ও সম্মানিত হওয়ায় তাদের হেফাযতের লক্ষ্যে পর্দার হুকুম দেয়া হয়েছে।

পর্দাহীনতার কুফল

পর্দা শরীয়তের অবধারিত ফরয বা অত্যাবশ্যকীয় বিধান। এটা পালন করলে যেমন প্রভূত শান্তি, নিরাপত্তা, সম্মান লাভ হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়, তেমনিভাবে এটা লঙ্ঘন করলে হয় অসংখ্য, অপূরণীয় ক্ষতি। পর্দার বিধান লঙ্ঘন করলে ধর্মীয়, আত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিভিন্ন অনিষ্ট ও ধ্বংস-বিপর্যয় দেখা দেয়।

বেপর্দা ও বেহায়াপনার গুনাহ শুধু নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে না এবং বেপর্দা মহিলাই শুধু এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না, বরং এর দ্বারা বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, খুন-খারাবী বিয়ে বিচ্ছেদের মতো ইত্যাকার ঘটনা বিস্তার লাভ করে। পুরো সম্প্রদায়-এর পার্থিব অশুভ পরিণতি এবং আখেরাতের ভয়ঙ্কর আযাব ভোগ করে।

নারীরা যেহেতু অভিভাবকের অধীনে জীবন-যাপন করে অর্থাৎ বিয়ের পূর্বে পিতা ও ভাই, আর বিয়ের পর স্বামী ও পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকে, তাই নারীকে যখন বেপর্দায় চলার দরুন আখেরাতে কঠিন আযাব দেয়া হবে, তখন এই চারজন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পুরুষকে আল্লাহ পাকের দরবারে জবাবদিহী করতে হবে।

বেপর্দেগীর খারাবী ও ক্ষতি

দুনিয়া ও আখেরাতের অসংখ্য ক্ষতি তো আছেই বেপর্দেগীর কারণে কিয়ামতের বিচারদিনের পূর্বেই আলমে বরযখে বা কবর জগতে ভীষণ শাস্তির কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে।

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাযি.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে মানুষের কৃতকর্মের সুরতে মেছালিয়া অর্থাৎ দুনিয়াতে যেরূপ আমল করেছে তার রূপক নমুনা দেখানো হয়েছে। যাতে অনেকগুলো বিষয়ের একটি এই ছিল যে, একটি বিশাল আকৃতির আগুনের তন্দুর যার মধ্যে ভীষণ শব্দে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তার মধ্যে দেখতে পেলাম অনেকগুলো উলঙ্গ নারী-পুরুষ। তন্দুরের ভিতরে আগুনের মধ্যে যেন ভাসছে। আগুনের লেলিহান শিখা যখন ভীষণ তেজোদীপ্ত হয়, তখন যেন ভাসমান নারী-পুরুষ তন্দুরের মুখপানে চলে আসে আবার যখন আগুন নিম্নগামী হয় তখন ভিতরকার প্রজ্বলিত নারী-পুরুষগুলো নিচে চলে যায়। কবর জগতে এহেন শাস্তির কারণ হলো, এ সমস্ত নারী-পুরুষ দুনিয়াতে বেপর্দেগীর মধ্যে জীবন-যাপন ও অবাধে যিনা-ব্যভিচার করত। কিয়ামতে, হাশরে, বিচার দিবসে, জাহান্নামের কঠিন সাজার কথাও কুরআন-হাদীসে উল্লেখ আছে। সুতরাং করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন ও প্রতিপালন করা সময়ের দাবি।

১. পর্দা শরীয়তের বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ফরযে আইন। শরীয়তের অন্যান্য আহকামের ইলম যেমন শিক্ষা করা ফরয পর্দার হুকুমসমূহও অনুরূপ শিক্ষা করা ফরয।

২. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আইনে নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই ভালো ও নিরাপদ।

৩. একান্ত শরঈ প্রয়োজনের তাকীদে যদি বাড়ি থেকে বের হতেই হয় তাহলে বের হওয়া জায়েয আছে বটে তবে শর্ত হলো, যেন সৌন্দর্য প্রদর্শন না হয়। বরং চেহারাসহ গোটা শরীর মোটা কাপড়ে আবৃত করে ফেলে এমন বড় আকারের ডিজাইনবিহীন বোরকা অথবা মোটা কাপড়ের বড় চাদর দ্বারা সম্পূর্ণ শরীর আবৃত রাখা।

৪. জরুরী প্রয়োজন হলে পরপুরুষের সঙ্গে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলা ও মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা না বলা বরং কৃত্রিমভাবে হলেও কঠোরতার সঙ্গে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে।

৫. বেগানা পুরুষ ও বেগানা মহিলা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বিরত থাকবে।

৬. গায়রে মাহরাম পুরুষ ও মহিলা যাদের সঙ্গে পর্দা করা ফরয, তাদের সঙ্গে কঠোরভাবে পর্দা করে চলবে। পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই।

৭. শরীরের সঙ্গে আট-সাঁট হয়ে লেগে থাকে এ ধরনের পোশাক এবং মহিলা হয়ে পুরুষের সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরিধান নিষেধ।

৮. আতর, সেন্ট, লিপিস্টিক লাগিয়ে এবং জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক ও অলঙ্কার পরে বের হওয়া নিষেধ।

৯. কাফের মহিলাদের আকার-আকৃতি ও তাদের অনুকরণ করা নিষেধ।

১০. পর্দানশীন মহিলাকে পর্দাহীন মহিলা থেকেও পর্দা করতে হবে।

১১. স্বামী ব্যতীত মাহরাম যাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম তাদের সঙ্গেও নির্জনে একাকিত্বে সময় অতিবাহিত করা থেকে পরহেয করতে হবে।

১২. সহশিক্ষা, চাকুরি, শপিং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে পর্দা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে এগুলোতে অংশগ্রহণ করা থেকে মহিলাদের বিরত থাকতে হবে। মহিলাদেরকে পর্যাপ্ত দ্বীনী শিক্ষাসহ গার্হস্থ্য শিক্ষা, হাতের কাজ, সেলাই শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা দিতে হবে।

১৩. মহিলাদের জন্য যাবতীয় ইবাদত গৃহাভ্যন্তরে হওয়াই উত্তম। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতেন তাহলে তিনি অবশ্যই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করতেন।

–বুখারী ১/১৮৩

খুলাফায়ে রাশেদার যুগেই আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাযি.) মহিলাদের জামা'আতে হাযির হওয়ার জন্য মসজিদে আসা কঠোরভাবে নিষেধ করে দেন এবং সকল সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) তা মেনে নেন।

১. একান্ত প্রয়োজনবশত কোনো মহিলাকে আয় রোযগার করতে হলে, সেলাই কাজ, হাতের কাজসহ শিক্ষাদান ইত্যাদি শেখার মাধ্যমে পর্দার অন্তরালে থেকে আয় রোযগার করা।

২. স্বামী, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা জায়েয নেই।

৩. বর্তমানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে নারী-পুরুষ বেপর্দেগীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে ও অবস্থান করে, এর মাধ্যমে বেপর্দেগী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে পর্দা রক্ষাসহ প্রয়োজনীয় ফিকির করা উচিত।

মোদ্দাকথা, বেপর্দা চললে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী বা অবাধ্যতা করা হয়। বেপর্দার দ্বারা কবীরা গুনাহ'র ভাগী এবং ইবলীস শয়তানের অনুসারী সাব্যস্ত হয়। পর্দাহীনতা দ্বারা মানুষ অভিশপ্ত হয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হয়। পর্দাহীনতা জাহান্নামের পথ। হাদীসে পাকের ভাষ্য অনুযায়ী পর্দাহীনতা সমাজে অশ্লীলতা, চারিত্রিক

অবক্ষয় ও পশুত্বের খাসলত জন্ম দেয়। নারীদের বেপর্দা চলা ও দেহ প্রদর্শন পুরুষদেরকে অবৈধ ও অশ্লীল কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলে পরকীয়া প্রেম, ইভটিজিং ও যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। তাছাড়া যিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ, নির্যাতন ইত্যাকার অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

পর্দাহীনতার দরুন মানুষ আল্লাহর শাস্তি ও গযব প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়ে উঠে। আর এর পরিণতি আনবিক বোমা ও ভূমিকম্পের চেয়েও বেশি বিপদজনক। পর্দাহীনতা পারিবারিক প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে। পর্দাহীনতা তালাকের প্রসার ঘটায়। পর্দাহীনতা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। এভাবে পর্দাহীনতা আরো বহু অনিষ্ট ও বির্পযয় ডেকে আনে, যার থেকে বাঁচা একমাত্র পর্দার মাধ্যমেই সম্ভব।

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিধান পালনার্থে বর্ণিত মারাত্মক কুফলসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্কা নারীর পর্দা করা অপরিহার্য ও ফরয দায়িত্ব।

বস্তুত পর্দাই মানুষের মন, মস্তিষ্ক, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশকে সুন্দর, মার্জিত ও সুখময় রাখতে পারে। আর পরকালীন প্রতিদান ও সুখময় পুরস্কার তো রয়েছেই।

মহিলাদের পর্দা করার সময় ও পরিমাণ

মেয়েরা যখন কারীবুল বুলুগ বা বালেগা হওয়ার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌছে, অর্থাৎ তারা নিজেরা কামভাব অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের দিকে তাকালে অন্য পুরুষের মনে কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন থেকেই তাদের জন্য পর্দা করা জরুরী হয়ে পড়ে। –আহসানুল ফাতাওয়া, ৮/৩৭

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, গায়রে মাহরাম অনাত্মীয় হলে তাদের থেকে সাত বছর পূর্ব হতেই পর্দা করা উচিত এবং গায়রে মাহরাম আত্মীয় হলে সাত বছর থেকেই পর্দা করা উচিত। কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা সামনে আসা-যাওয়া করাতে এ পরিমাণ ফিতনার আশঙ্কা থাকে না, যে পরিমাণ আশঙ্কা থাকে কারীবুল বুলূগ মেয়েদের সামনে আসা-যাওয়া করাতে। ইসলাহে খাওয়াতীন-৩৭২

মেয়েদের পর্দার পরিমাণ বা ক্ষেত্র দুটি। এক. মাহরাম পুরুষ যথা বাপ, ভাই প্রমুখ থেকে পর্দা করা। দুই. গায়রে মাহরাম পুরুষ যথা চাচাত ভাই, খালাত ভাই ইত্যাদি থেকে পর্দা করা। মেয়েদের পরস্পর পর্দা বা সতর যতোটুকু তথা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত, মাহরাম পুরুষদের ক্ষেত্রে ততোটুকু পরিমাণসহ পেট ও পিঠ

ঢেকে রাখতে হবে। অর্থাৎ মাহরাম পুরুষ বাপ, ভাই, ছেলে প্রমূখ থেকে পুরা শরীর ঢাকা যেমন ফরয নয় তেমনি পূর্ণ শরীর খোলারও অবকাশ নেই; বরং পেট-পিঠসহ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা জরুরী। অবশিষ্ট অংশ মাহরাম থেকে ঢাকা জরুরী নয়। –ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, ৬/৩৭৪, ৫/২১১২

আর গায়রে মাহরাম বা বেগানা পুরুষ তথা যাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ তাদের সামনে কোনো অঙ্গই প্রদর্শন করা জায়েয নাই। –কিফায়াতুল মুফতী, ৫/৩৮৭, ৩৮৯

উল্লেখ্য, প্রথম যমানায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখমণ্ডল ও দু'হাতের কব্জি, পায়ের পাতা খোলা রাখা তথা পর্দা না করারও অবকাশ ছিল। কিন্তু ফিতনার যমানা হিসেবে উলামায়ে মুতাআখখিরীনের ফাতাওয়া অনুযায়ী পর-পুরুষদের সামনে মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর ভালোভাবে ঢেকে রাখা জরুরী।

–ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া-৪/১০৬, কিফায়াতুল মফতী, ৫/৩৮৮

সতর ঢাকা ও খোলার আদব

১. পেশাব, পায়খানা এবং সহবাসের জরুরত ব্যতীত কখনও নির্জনেও উলঙ্গ হবে না। ফেরেশ্‌তা এবং আল্লাহ্ তা'আলা থেকে শরম করা চাই। –জামে তিরমিযী

২. গায়রে মাহরাম মহিলার সঙ্গে একাকী বসা তীব্র বিষতুল্য এবং শক্ত গুনাহ্। এইরূপ গায়ের-মাহরামের সঙ্গে যাতায়াত করাও নাজায়েয।

কিন্তু আজকাল ভণ্ড পীরেরা এবং এক শ্রেণীর আধুনিকতার পূজারী লোকেরা গায়রে মাহরাম আত্মীয়-অনাত্মীয়ের সঙ্গে পর্দার ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও খেয়াল করে না।

চিরজীবনে যার সঙ্গে কখনও বিয়ে দুরুস্ত হতে পারে, তাকে গায়রে মাহরাম বলে।

৩. বিনা জরুরতে স্ত্রীলোক পরপুরুষকে দেখতে পারবে না। সাধারণত স্ত্রীলোক এই মাসআলার উপর আমল করে না; বরং উঁকি মেরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে, এটা অতি খারাপ অভ্যাস।

৪. দুগ্ধপানের কারণে যে আত্মীয়তা হয়, তাতে সব জায়গায় খুব ইহ্‌তিয়াত ও সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। পুরা তাহ্‌কীক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীলোক দুগ্ধ পানের কারণে তৈরী হওয়া কোন আত্মীয়ের সাথে দেখা দিবে না এবং সেখানে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হয়, সেখানে বিয়ে-শাদী হওয়া উচিত নয়।

পুরুষগণ যেসব মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

পুরুষগণ নিম্নে বর্ণিত মহিলাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদেরকে বিয়ে করা হারাম।

১. আপন মা।

২. আপন দাদী, নানী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

৩. সহোদর বোন, বাপের দিকের সৎ বোন, মায়ের দিকের সৎ বোন।

৪. আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোনো কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

৫. যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ি, নানী শাশুড়ি ও দাদী শাশুড়ি।

৬. ফুফু অর্থাৎ সহোদর, পিতার দিকের সৎ বোন, মায়ের দিকের সৎ বোন।

৭. খালা অর্থাৎ মায়ের সহোদর বোন, মায়ের বাপের দিকের সৎ বোন, মায়ের দিকের সৎ বোন।

৮. ভাতিজী অর্থাৎ সহোদর, নিজের বাপের দিকের সৎ ভাই, মায়ের দিকের সৎ ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

৯. ভাগ্নী অর্থাৎ সহোদর, নিজের বাপের দিকের সৎ বোন, মায়ের দিকের সৎ বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

১০. দুগ্ধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কোনো কন্যা সন্তান এবং দুধ সর্ম্পকীয় ছেলের স্ত্রী।

১১. দুগ্ধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

১৩. দুগ্ধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোনো কন্যা সন্তান।

১৪. যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার প্রতি পুরুষের কোনো প্রকার আকর্ষণ নেই।

উল্লেখ্য, ১৪ নং বর্ণিত মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে জায়েয আছে। উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত পুরুষের জন্য অন্য কোনো মহিলার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেও জায়েয নয়, বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

–সূরায়ে নিসা-২৩, তাফসীরে মাযহারী ২/২৫৪, মাআরিফুল কুরআন ২/৩৫৬ -৫৬১

মহিলাগণ যেসব পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

মহিলাগণ নিম্নে বর্ণিত পুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদের সঙ্গে বিয়ে হারাম।

১. পিতা।

২. দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৩. সহোদর ভাই, বাপের দিকের সৎ ভাই, মায়ের দিকের সৎভাই।

৪. শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

৫. আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্রসন্তান।

৬. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৭. ভাতিজা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোনো ছেলে।

৮. ভাগিনা অর্থাৎ সহোদর, বাপের দিকের সৎ বোন, মায়ের দিকের সৎ বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোনো ছেলে।

৯. আপন চাচা অর্থাৎ বাপের সহোদর, বাপের সৎ ভাই।

১০. দুগ্ধসম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুগ্ধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যে কোনো পুত্র সন্তান এবং দুগ্ধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

১১. দুগ্ধ সম্পর্কীয় বাপ, দাদা, মামা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ।

১২. দুগ্ধ সম্পর্কীয় ভাই, দুগ্ধ ভাইয়ের ছেলে, দুগ্ধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোনো পুত্র সন্তান।

১৩. যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, যার মহিলাদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোনো আকর্ষণ নেই।

১৪. অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন বালক যার এখনও যৌন চাহিদা বা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

পঞ্চম অধ্যায়

মু'আশারাত

ইসলামের বিধি-বিধান পাঁচভাবে বিভক্ত। তার মধ্যে মু'আশারাতের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। মু'আশারাত অর্থাৎ সামাজিক রীতি-নীতি ঠিক করার অর্থ হলো একজন মানুষ তার চাল-চলন, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, রীতি-নীতি ইত্যাদি কেমন হবে? অপরের সঙ্গে কীভাবে চলাফেরা করবে? এসব বিষয় সামাজিকতার একটি অংশ। হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, বর্তমান যুগের মুসলমান সামাজিকতা বা পারস্পরিক আচরণের নীতিকে ইসলাম থেকে একেবারেই দূরে সরিয়ে দিয়েছে। সামাজিকতার মধ্যে ইসলামের কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্তিকে মানুষ পসন্দই করে না। এমনকি যারা নামায, রোযার পাবন্দী করে, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করে, প্রতি বৎসর হজ্ব, উমরা আদায় করে তাদের অনেকেই ইসলামী সামাজিকতার ধার ধারে না। এ কারণেই সামাজিকতার ব্যাপারে যে বিধান ও শিক্ষা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন তা জানা, তার গুরুত্ব বোঝা ও সে আনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত জরুরী। মু'আশারাত দুরস্ত না থাকলে সারা যিন্দেগীর অন্যান্য আমলের দ্বারা অর্জিত নেকী নিয়েও নাজাত পাওয়া যাবে না। একদা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জানো মিসকীন কে? উপস্থিত সাহাবীগণ জবাব দিলেন, যার নিকট টাকা-পয়সা কিছুই নেই সে হলো মিসকিন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, না। তোমাদের মধ্যে অধিক মিসকিন সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি সওয়াব নিয়ে উপস্থিত হবে এবং সঙ্গে এমন অনেক পাওনাদারদেরকে নিয়ে আসবে যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছিলো বা কাউকে অপবাদ দিয়েছিলো বা কারো মাল আত্মসাৎ করেছিলো, কাউকে অন্যায়ভাবে মেরেছিলো বা হত্যা করেছিলো। অতঃপর বিচারের সময় মহান আল্লাহর হুকুমে প্রথম ব্যক্তিকে তার সাওয়াব থেকে পাওনা পরিশোধ করা হবে। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও নেকী দ্বারা

পাওনা পরিশোধ করা হবে। এমনিভাবে সকল পাওনাদারের হক নেকী দ্বারা মিটানো হবে। যদি পাওনাদারের প্রাপ্য দেয়ার পূর্বেই তার নেকী শেষ হয়ে যায় তখন পাওনাদারের গুনাহসমূহকে তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। অবশেষে সকলের গুনাহ'র বোঝার কারণে তাকে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে।

–মুসলিম হা : ৫১২৭

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা জানা গেলো, অনেকে কিয়ামতের দিন নেকীর পাহাড় নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, কিন্তু মু'আশারাত বা আচার-আচরণ ও বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় না করার দরুন পরিশেষে গুনাহ'র পাহাড় নিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

হুকুকুল ইসলাম

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, ইসলামী শরীয়ত ও বিবেক-বুদ্ধি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে একথা প্রমাণিত, আমাদের কাছে কিছু হক ও কর্তব্যের বিষয় দাবি করা হয়েছে। তন্মধ্যে কতক রয়েছে আল্লাহ তা'আলার হক, আর কতক রয়েছে বান্দার হক। বান্দার হকসমূহের মধ্যে কিছু রয়েছে দ্বীনী হক আর কিছু রয়েছে দুনিয়াবী হক। দুনিয়াবী হকসমূহের মধ্যে কিছু আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে, কিছু সাধারণ (অপরিচিত) লোকজনের সঙ্গে আর কিছু বিশেষ লোকদের সঙ্গে সম্পর্কিত। আরও কিছু হক রয়েছে সাধারণভাবে সকল মুসলমানের প্রতি এবং কিছু হক রয়েছে সমপর্যায়ের লোকদের প্রতি। এমনিভাবে শরীয়ত হলো হুকূক-এর সমষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হক ও বান্দার হক আদায়ের নাম শরীয়ত। বান্দার দায়িত্বে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হলো মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর হক।

আল্লাহ তা'আলার হক

সর্বপ্রথম বান্দার উপর আল্লাহর হক বর্তায়। যিনি বিভিন্ন ধরনের অনুগ্রহ ও অনুকম্পার দ্বারা বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেছেন। পথভ্রষ্টতা থেকে বের করে হেদায়াতের পথে এনেছেন এবং হিদায়াতের উপর টিকে থাকার বিনিময়ে প্রচুর নেয়ামত দানের আশা দিয়েছেন। বান্দার উপর আল্লাহর হক নিম্নরূপ :

১. আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. আকীদা, আমল, লেনদেন ও চারিত্রিক বিষয়সমূহ তাঁর সন্তুষ্টির আলোকে গ্রহণ করা ও তাঁর অপসন্দনীয় বিষয়সমূহ বর্জন করা।
৩. তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে অন্য সকলের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দেওয়া।
৪. কারো সঙ্গে ভালোবাসা বা বিদ্বেষ অথবা কারো সহযোগিতা করা বা না করা সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা।

কুরআন পাকের হকসমূহ

কুরআনের শিক্ষার্থীদেরকে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি কুরআনে কারীমের হকের বিষয়েও শিক্ষা দেয়া নেহায়েত দরকার। অধুনা এ সমস্ত বিষয়ে দারুন অবহেলা-উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পবিত্র কুরআনের মৌলিক হক চারটি। তাছাড়া আরো অনেক হক আছে। নিম্নে কয়েকটি হকের কথা উল্লেখ করা হলো।

১. আযমত অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি ভক্তি, তা'যীম করা।
২. মুহাব্বত অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ভালোবাসা থাকা।
৩. তিলাওয়াত মা'আস সিহহাত, অর্থাৎ সহীহ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করা।
৪. ইত্বা'আত অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের হুকুম-আহকামের উপর আমলের নিয়্যত করা।

নবী রাসূল (আ.) গণের হক

আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর পসন্দ ও অপসন্দনীয় বিষয়সমূহের জ্ঞান আমরা নবীদের মাধ্যমেই লাভ করেছি। ফেরেশতারা তাঁদের কাছে ওহী (আল্লাহ পাকের প্রেরিত বাণী) পৌঁছিয়েছেন, যার দ্বারা অনেক দুনিয়াবী লাভ-লোকসানের কথাও জানা গেছে। এছাড়া বহু ফেরেশতা আমাদের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে তাঁরা ওই কাজ পালন করে যাচ্ছেন। এ আলোকে নবী ও ফেরেশতাদের হকও আল্লাহ তা'আলার হকের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে; বিশেষভাবে সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহসান ও অনুগ্রহ আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি। তাই তাঁর সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য ও আমাদের প্রতি তাঁর হক অনেক বেশি। কিছু কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
২. সকল বিধি-বিধানে তাঁর আনুগত্য করা। (অর্থ্যাৎ, সুন্নাতের অনুসরণ করা)

৩. তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসাকে অন্তরে জাগ্রত রাখা।
৪. তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ করা।

ফেরেশতাদের হক

১. তাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করা।
২. তাদেরকে মা'সূম বা গুনাহ থেকে পবিত্র মনে করা।
৩. তাদের নামের সঙ্গে আলাইহিস সালাম বলা।

৪. দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য আহার করে মসজিদে গেলে অথবা বায়ু নির্গত করলে এর দ্বারা ফেরেশতাদের কষ্ট হয়, বিধায় এসব কর্ম না করা। এছাড়া অন্যান্য যেসব বস্তু দ্বারা তাদের কষ্ট বা ঘৃণা হয় তা না করা। যেমন ফটো টানানো, প্রয়োজন ছাড়া কুকুর পোষা, মিথ্যা বলা, অলসতা করে ফরয গোসল করতে বিলম্ব করা, শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতীত নির্জনে উলঙ্গ হওয়া।

সাহাবা (রাযি.) ও আহলে বাইতের হক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) ও আহলে বাইতের দুনিয়াবী ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে। এ কারণে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হকের মধ্যে তাঁদের হকও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং তা নিম্নরূপ–

১. তাঁদের আনুগত্য করা।
২. তাঁদেরকে ভালোবাসা।
৩. তাঁদেরকে আদেল (ন্যায়পরায়ণ ও সত্যের মাপকাঠি) মনে করা ও বিশ্বাস করা।
৪. তাঁদের সঙ্গে ভালোবাসা স্থাপনকারীদেরকে ভালোবাসা এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ করা।

ওলামা-মাশায়েখের হক

ওলামায়ে কিরাম ও পীর বুর্যূগানে দ্বীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে তাঁদের হকও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হকের মধ্যে শামিল আছে এবং তা নিম্নরূপ।

১. ফুকাহা, মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, দ্বীন শিক্ষাদানকারী পীর বুর্যূগ ও ধর্মীয় গ্রন্থপ্রণেতাদের জন্য দু'আ করা।

২. শরীয়ত মোতাবেক তাঁদের অনুসরণ করা।
৩. যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদেরকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা করা। বিদ্বেষ না রাখা ও বিরোধিতা না করা।
৪. সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে তাঁদেরকে হাদিয়া উপঢৌকন দেয়া।

উস্তাদ ও পীরের হক

দুনিয়াতে যাদের মাধ্যমে নিয়ামত পাওয়া যায় তাদের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। তাই উস্তাদ ও পীর সাহেব প্রমুখের হক কী তা জেনে নেয়া উচিত। কেননা পীর ও উস্তাদের ওসীলায়ই আসল নিয়ামত তথা দ্বীনী ইলম ও আল্লাহ তা'আলার মা'রেফত লাভ হয়। আর নিয়ামত যতো বড় হয় নিয়ামত দাতার বা নিয়ামতের ওসীলার শোকরও ততো বেশি ওয়াজিব হয়। সুতরাং উস্তাদ ও পীরের হক যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়। উস্তাদ ও পীর যতো বড় নিয়ামতের ওসীলা, এতো বড় নিয়ামত আর কোথাও নেই, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বর্তমান যুগে এ বিষয়টি গুরুত্বহীন। উস্তাদ এবং পীরের হক কেউই ঠিকভাবে আদায় করে না; অথচ নিয়ামতের শোকর আদায় করলে নিয়ামত বৃদ্ধি পায়, আর না করলে ক্রমশ সেটি হ্রাস পায়। আর আযাবের ধমকী তো আছেই।

উস্তাদের হকসমূহ

১. মিসওয়াক করে, পরিষ্কার কাপড় পরে পরিপাটি হয়ে উস্তাদের কাছে যাবে।
২. উস্তাদের সঙ্গে কথা বলতে, তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বা কোনো কাজ করতে সর্বাবস্থায় আদব ও তা'যীমের খেয়াল রাখবে।
৩. উস্তাদের দিকে ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাবে।
৪. উস্তাদ যা কিছু বলেন, ভক্তির সঙ্গে মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে শুনবে।
৫. উস্তাদ যা কিছু শিক্ষা দেন, খুব ভালো করে ইয়াদ করবে।
৬. উস্তাদের আলোচনা বুঝে না এলে এই মনে করবে, আমারই বুঝশক্তি কম, নতুবা উস্তাদ বোঝাতে কম চেষ্টা করেননি।
৭. উস্তাদের সামনে অন্য কারও বিপরীত মতামত বর্ণনা করবে না।
৮. যদি কেউ উস্তাদের শেকায়েত অর্থাৎ দোষ বর্ণনা করে, তবে যথাসাধ্য তার প্রতিবাদ করবে। যদি প্রতিবাদ করতে না পারে, তবে সেখান থেকে উঠে যাবে।

৯. যখন উস্তাদের কামরায় পৌঁছবে, তখন উপস্থিত ভাইদেরকে সালাম করবে এবং উস্তাদকে পৃথকভাবে তা'যীমের ভঙ্গিতে সালাম করবে, কিন্তু যদি তিনি পড়াতে বা কথায় লিপ্ত থাকেন, তবে তখন সালাম করবে না।

১০. উস্তাদের সামনে বেশি হাসবে না, অনর্থক কথা বলবে না, এদিক ওদিক তাকাবে না, অন্য কারো দিকে মন দিবে না, সম্পূর্ণ উস্তাদের দিকেই মন, কান ও মুখ করে থাকবে; কিন্তু আবশ্যকীয় কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে চুপ থাকবে না।

১১. উস্তাদ যদি রাগ করেন, শাস্তি দেন কিংবা কিছু এমন বলেন যা তোমার বিবেচনায় অন্যায় বলে মনে হয়, তবুও তা নীরবে সহাস্য বদনে হৃষ্টচিত্তে সহ্য করবে, নিন্দা-শেকায়েত করবে না বা মনও খারাপ করবে না।

১২. আজকাল সরকারী অনুমোদিত আলিয়া মাদরাসায় তো উস্তাদদের কোনো মূল্যই নেই। কওমী মাদরাসার তালেবে ইলমরাও অনেক সময় শুধু মাদরাসার নাম দেখে, উস্তাদ কামেল কি না তা দেখে না, এরূপ করা উচিত নয়। যে ফন (বিষয়) যিনি ভালো জানেন তাঁর নিকট সেই ফন হাসিল করতে চেষ্টা করবে। কামেল দেখে উস্তাদ ধরবে, কিন্তু যদি তাঁর মেজায কিছু কড়া হয়, তবুও তাঁর কাছে আসা-যাওয়া ছাড়বে না। জিজ্ঞাসা করাও ছাড়বে না বা তাঁর স্বভাবে কিছুটা গরমী বলে তাঁর ইলম-কালামের কথা ভুলে যাবে না। আজকাল মানুষ কারও একটি দোষ পেলে তার সমস্ত গুণের কথা ভুলে যায়, এমন করবে না; বরং অন্যান্য গুণ থাকলে আর একটি যাহেরী দোষ করলে তার তাবীল্ গ্রহণ করে নিবে।

১৩. উস্তাদ যখন দ্বীনদার, খেয়ানতকারী নন, তখন তিনি কিছুতেই তোমার খায়েরখাহী (কল্যাণ কামনা) করতে ত্রুটি করবেন না। অতএব, যদি কখনো তিনি কোনো অতিজরুরী কাজে লিপ্ত থাকেন বা তবীয়ত ভালো না থাকে অথবা শোকে, চিন্তায় বা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর থাকেন বা তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রা আসতে থাকে কিংবা অন্য কোনো কারণবশত মনোযোগের সঙ্গে না পড়াতে পারেন, তবে ওই সময় সবক পড়ার জন্য তাঁকে বিরক্ত করবে না; বরং 'হুযূরের কষ্ট হচ্ছে, এখন থাক, অন্য সময় পড়ে নেবো' এই বলে তাঁর মন তুষ্ট করবে।

১৪. উস্তাদ থেকে পৃথক হয়ে দূর দেশে গেলেও তাঁর হকের খেয়াল রাখবে; মাঝে মধ্যে হাদিয়া-উপঢৌকন পাঠিয়ে, চিঠিপত্র লিখে বা ফোনে কথা বলে তাঁর দিল খুশি রাখবে এবং দু'আ নিবে।

এই যুগে সর্বত্রই অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। শাগরেদ উস্তাদের হক আদায় করে না বলে সে অন্যায় করে, তবে অনেক উস্তাদও এরকম আছেন যাঁরা শাগরেদের হক আদায় করেন না, কিন্তু উস্তাদের দোষ ধরা শাগরেদের উচিত নয়। তাই প্রথমেই দেখে-শুনে উস্তাদ ধরবে এবং ইলম যেখানে হাসিল হয় সেখানে কিছু কষ্ট ভোগ করতে হলেও তা নীরবে সহ্য করবে।

পীরের হক

উপরে উস্তাদের যে সমস্ত হক লেখা হলো, এগুলো পীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এছাড়াও পীরের আরো কিছু হক রয়েছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. এ বিশ্বাস করবে যে, আমার উদ্দেশ্য এ পীরের মাধ্যমেই লাভ হবে। অন্যদিকে মনোযোগ দিলে পীরের ফয়েয-বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

২. সর্বোতভাবে পীরের আনুগত্য করবে। জানমাল দিয়ে তার খেদমত করবে। কারণ, পীরের মুহাব্বত ছাড়া কোনো কাজ হয় না। আর মুহাব্বতের পরিচয় এটিই।

৩. পীর যা বলবে তা অবিলম্বে পালন করবে। তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাজের অনুসরণ করবে না। কারণ, অনেক সময় সে তাঁর নিজের অবস্থা ও অব্স্থান অনুপাতে একটি কাজ করে, যা করা মুরীদের জন্য প্রাণনাশক বিষতুল্য।

৪. পীর যে সমস্ত যিকির ও ওযীফা দেন, শুধু তাই পড়বে। অন্য সব ওযীফা বাদ দিবে। চাই সেগুলো নিজেই পড়তে আরম্ভ করে থাকুক বা অন্য কেউ বলে দিয়ে থাকুক।

৫. পীরের উপস্থিতিতে আপাদমস্তক তাঁরই দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবে, এমনকি ফরয ও সুন্নাত ছাড়া নফল নামায ও অন্য কোনো ওযীফা তাঁর অনুমতি ছাড়া পাঠ করবে না।

৬. যতদূর সম্ভব এমন জায়গায় দাঁড়াবে না, যেখানে দাঁড়ালে তার দ্বারা মুর্শিদের ছায়া বা তাঁর কাপড়ের উপর পতিত হয়।

৭. তাঁর জায়নামাযের উপর পা রাখবে না।

৮. তাঁর পবিত্রতা ও উযূ করার জায়গায় পবিত্রতা অর্জন করবে না ও উযূ করবে না।

৯. পীরের ব্যবহারের পাত্রসমূহ ব্যবহার করবে না।

১০. তাঁর সম্মুখে খাবার খাবে না। পানি পান করবে না। উযূ করবে না। হ্যাঁ তাঁর অনুমতিক্রমে হলে কোনো দোষ নেই।

১১. তাঁর সম্মুখে কারো সঙ্গে কথা বলবে না, এমনকি কারো দিকে মনোযোগও দিবে না।

১২. যে জায়গায় পীর সাহেব বসেছেন, সেদিকে পা ছড়িয়ে বসবে না, যদিও তিনি সম্মুখে না থাকে।

১৩. যে জায়গায় পীর সাহেব বসেছেন সেদিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না।

১৪. পীর সাহেব যা বলেন বা করেন তার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করবে না। কারণ, তিনি যা কিছু করেন বা বলেন, তা ইলহামের ভিত্তিতে করেন বা বলেন। কোনো বিষয় বুঝে না এলে হযরত মুসা (আ.) এর ঘটনা স্মরণ করবে।

১৫. নিজের পীর সাহেবের কাছ থেকে কোনো কারামত প্রকাশ পাওয়ার ইচ্ছা করবে না।

১৬. মনে কোনো সন্দেহ দেখা দিলে সাথে সাথে তা পীর সাহেবকে জানাবে। যদি সে সন্দেহ নিরসন না হয়, তাহলে নিজের বুঝের ত্রুটি মনে করবে। আর যদি পীর সাহেব তার কোনো উত্তর না দেন, তাহলে বুঝবে যে, আমি এর উত্তরের উপযুক্ত নই।

১৭. স্বপ্নে যা কিছু দেখবে তা পীর সাহেবকে জানাবে, আর যদি তার কোনো ব্যাখ্যা বুঝে না আসে, তাহলে তাও তাকে জানাবে।

১৮. বিনা প্রয়োজনে এবং বিনা অনুমতিতে পীর সাহেব থেকে পৃথক হবে না।

১৯. পীর সাহেবের আওয়াজের উপর নিজের আওয়াজকে উঁচু করবে না। উঁচু আওয়াজে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে না। সংক্ষেপে প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলবে এবং খুব মনোযোগ সহকারে তাঁর জবাবের প্রতীক্ষা করবে।

২০. পীর সাহেবের কথাকে প্রত্যাখ্যান করবে না, এমনকি মুরীদের কথা ঠিক হলেও। বরং এরূপ বিশ্বাস রাখবে যে, শাইখের ভুল আমার ঠিকের চেয়ে ভালো।

২১. নিজের অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ হোক, পীরকে জানাবে। কারণ, পীর সাহেব হলেন অন্তরের ডাক্তার। তাঁকে জানালে তিনি তা সংশোধন করবেন। পীরের কাশফের উপর নির্ভর করে নীরব থাকবে না।

২২. তাঁর নিকট বসে ওযীফারত হবে না। যদি কিছু পড়া জরুরিই হয় তাঁর দৃষ্টির আড়ালে বসে পড়বে।

২৩. যা কিছু বাতেনী ফয়েয লাভ হবে, তার পীরের উছিলায় হয়েছে মনে করতে হবে। যদি স্বপ্নে বা ধ্যানযোগে অন্য বুর্যূগ থেকে তা পৌঁছেছে বলে মনে দেখতে পায়, তাহলেও বুঝবে যে, পীরের কোনো লতিফা ঐ বুযুর্গের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। –ফুরুউল ঈমান।

ছাত্র ও মুরীদের হক

ছাত্র ও মুরীদ নিজ সন্তানের মতো। অতএব, আন্তরিকতা ও কল্যাণকামিতায় তাদেরকে নিজ সন্তানতুল্য মনে করতে হবে। তাদের হকও নিজ সন্তানের অধিকার ও হকের ন্যায়। শুধু আইনী সম্পর্ক যথেষ্ট নয়, তাদের প্রতি মুহাব্বতের নযর থাকতে হবে।

পিতা-মাতার হক ১৪টি

জীবিত অবস্থায় ৭টি

১. পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
২. মনে-প্রাণে মুহাব্বত করা।
৩. সর্বদা তাঁদেরকে মেনে চলা।
৪. তাঁদের খেদমত করা।
৫. তাঁদের প্রয়োজন পূরণ করা।
৬. তাঁদেরকে সর্বদা আরাম ও সাচ্ছন্দ্যের মাঝে রাখার ফিকির (চিন্তা-ভাবনা) করা।
৭. নিয়মিত তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

মৃত্যুর পর ৭টি

১. তাঁদের মাগফেরাতের জন্য দু'আ করা।
২. সওয়াবরেসানী করা।
৩. তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সম্মান করা।
৪. তাঁদের সমবয়সী সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করা।
৫. ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা।
৬. শরীয়তসম্মত অসিয়্যত পূরণ করা।
৭. মাঝে মধ্যে তাদের কবর যিয়ারত করা।

- পিতা-মাতা কাফের হলেও তাঁদের খেদমত করবে। আল্লাহ ও রাসূলের কথার বিরুদ্ধে না হলে মা-বাপের কথার উল্টো চলবে না।
- কারো পিতা-মাতা তার উপর নারায হয়ে মরে গেলে তাঁদের জন্য খুব বেশি পরিমাণে দু'আ ও ইস্তেগফার করতে থাকবে, হয়তো এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে রাজি করে দিবেন। –বায়হাকী
- অন্য কারও পিতা-মাতাকে মন্দ বলবে না। কারণ তাহলে সে তোমার পিতা-মাতাকে মন্দ বলবে। অতএব, তোমার পিতা-মাতাকে মন্দ যেন তুমিই বললে। –বুখারী, মুসলিম
- পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁদের দোস্তদার লোকদের সম্মান উপকার করা মা-বাপের খেদমতের মধ্যে গণ্য হয়। –সহীহ মুসলিম

দাদা-দাদি, নানা-নানি, খালা-মামা, চাচা ও ফুফুর হক

দাদা-দাদি, নানা-নানি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার সমতুল্য। মাতা-পিতার হকসমূহ তাদেরও হক বা অধিকার মনে করতে হবে। খালা ও মামার হক মায়ের হকের মতো। চাচা ও ফুফুর হক পিতার হকের অনুরূপ। হাদীসে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

সন্তানের হক

সন্তানের উপর যেমন মাতা-পিতার কর্তব্য রয়েছে অনুরূপ মাতা-পিতার উপরও সন্তানের প্রতি কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা অবশ্য পালনীয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো।

১. নিজে সতী-সাধ্বী নারীকে বিয়ে করা। যাতে সুসন্তান জন্মলাভ করে।

২. আকীকা করা ও ভালো নাম রাখা।

৩. শৈশবে স্নেহ ও যত্নের সঙ্গে বাচ্চাদেরকে লালন-পালন করা। সন্তানের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করা ফযীলতের কাজ। বিশেষ করে মেয়েসন্তান জন্ম লাভ করার কারণে মনে সংকোচবোধ করা উচিত নয়। মেয়েদের লালন-পালন করার ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে অধিক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৪. সন্তানকে শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া।

৫. বিয়ের যোগ্য হওয়ার পর বিয়ের আয়োজন করে বিয়ে দেয়া, যদি কোনো

মেয়ের স্বামীর মৃত্যু ঘটে তখন দ্বিতীয় বিয়ে হওয়া পর্যন্ত নিজের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা।

দুধমাতার হক

দুধমাতা মায়ের সমতুল্য। তার প্রতিও বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণিত হয়েছে:

১. তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা।
২. তাঁর আর্থিক দুরবস্থায় নিজের সামর্থ্য থাকলে সহায়তা করা।
৩. সম্ভব হলে একজন খাদেমা তাঁর খেদমতের জন্য ব্যবস্থা করা।
৪. দুধমাতার স্বামী যেহেতু তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র, তাই তাঁর স্বামীকেও সম্মান করা।

সৎ মায়ের হক

সৎ মা পিতার সহধর্মিণী। এদিকে পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ এসেছে, তাই সৎ মায়েরও কিছু হক ও অধিকার রয়েছে। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি যে দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ভাই-বোনের হক

হাদীসে বড় ভাইকে পিতৃতুল্য বলা হয়েছে। এতে ছোট ভাই সন্তানতুল্য হলো। কাজেই তাদের পরস্পরের হক তেমনই হবে যেমন পিতা ও সন্তানের হক। অনুরূপ বড় বোন ও ছোট বোনের মধ্যকার হক বা অধিকার হবে মা ও মেয়ের মতো।

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের হক

অনুরূপ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের হক হাদীসে যা এসেছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. আত্মীয়-স্বজন যদি গরীব হয় এবং তাদের উপার্জন ক্ষমতা না থাকে, তবে প্রয়োজনানুসারে নিজের সন্তানদের মতো তাদের ভরণ-পোষণ, খোঁজ-খবর রাখা। কিন্তু সর্বদা ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব নয়। তবে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা চাই।
২. সুযোগমতো তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।
৩. আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ না করা। যদি তারা কোনো কষ্ট দেয় তবে ধৈর্য ধারণ করা উত্তম।

৪. যদি কোনো নিকটতম আত্মীয় ক্রীতদাস হিসেবে মালিকানায় আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে আযাদ হয়ে যাবে।

৫. খালার হক মায়ের মতো। –জামে তিরমিযী

৬. চাচার হক বাপের মতো। –বুখারী, মুসলিম

৭. বড় ভাইয়ের হক বাপের মতো। –বায়হাকী

৮. সন্তানকে দুধ, ভাত ইত্যাদি দেয়া যেমন তাদের হক, তেমনি দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়াও তাদের হক। তাই দুধ না দিয়ে সন্তানকে মেরে ফেললে যেমন তাদের হক নষ্ট হয়, তেমনি দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিলেও তাদের হক নষ্ট করা হয়। এই পাপের চাক্ষুষ ফল হলো, সন্তান বড় হয়ে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়।

–জামে তিরমিযী

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ফায়দা

- হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার বয়স বর্ধিত হোক, রিযিক প্রশস্ত হয়ে যাক, নিকৃষ্ট শত্রু থেকে রক্ষা পেয়ে যাক, সে যেন তাক্ওয়া অবলম্বন করে এবং আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। –তারগীব খ. ৩ পৃ. ৩৩৫

- হযরত আলী (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচে' দ্রুত পাওয়া যায় আত্মীয়তা বন্ধনের প্রতিদান। এমন কি গৃহবাসী যদি গুনাহগারও হয়। যখন সে মানুষের সঙ্গে ইহসান ও সদ্ব্যবহার করে, তখন তা সম্পদে, সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধি বয়ে আনে। এ আমল আল্লাহ পাকের কাছে কতোই না প্রিয়।

- হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জুমু'আর রাতে যখন সব মানুষের আমল পেশ করা হয় তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল কবূল করা হয় না।

স্বামী-স্ত্রীর হক

স্বামী-স্ত্রীর হকসমূহের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে–

১. নিজ সাধ্যমতো স্ত্রীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা।

২. স্ত্রীকে দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া।

৩. তার আত্মীয়-স্বজনদের সুযোগমতো তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে দেয়া।

৪. স্ত্রীর ভুলের জন্য অধিকাংশ সময় ধৈর্য ধারণ করা, চুপ থাকা। বিশেষ প্রয়োজনবশত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে

১. স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা এবং সর্বদা তার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। হ্যাঁ, স্বামী কোনো অবৈধ কাজের নির্দেশ প্রদান করলে অপারগতা প্রকাশ করা।

২. স্বামীর সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে তার কাছে কোনো কিছুর ফরমায়েশ না করা।

৩. অনুমতি ব্যতীত তার মাল-সম্পদ ব্যয় না করা।

৪. স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার না করা, যা স্বামীর অন্তরে ব্যথার কারণ হতে পারে। স্বামীর মাতা-পিতাকে বিশেষভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা।

শাসক ও শাসিতের হক

শাসকের মধ্যে বাদশাহ ও তার স্থলাভিষিক্তরা অন্তর্ভুক্ত আছে। আর শাসিতের মধ্যে সকল প্রজা ও ভৃত্য শামিল আছে।

প্রজাদের প্রতি বাদশাহর দায়িত্ব

১. কঠিন ও কঠোর বিধি-বিধান প্রয়োগ করবে না।

২. প্রজাদের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ মীমাংসা করতে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করবে না।

৩. যথাসাধ্য তাদের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। সাহায্য প্রার্থনাকারীদের জন্য দরবারে পৌঁছার জটিলতা দূর করবে।

৪. সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

শাসকের প্রতি শাসিতের হক

১. তাঁর জন্য হিতকামনা ও আনুগত্য করবে। অবশ্য শরীয়তবিরোধী কাজে কোনোরূপ আনুগত্য বৈধ নয়।

২. যদি শাসক প্রজার ইচ্ছার বাইরে কোনো কাজ করেন, তবে ধৈর্য ধারণ করবে। নিন্দা বা বদ-দু'আ করবে না। শাসক নম্রস্বভাবের হওয়ার জন্য দু'আ করবে ও নিজে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি যত্নবান হবে। যাতে আল্লাহ তা'আলা শাসকের অন্তর বিনম্র করে দেন। (এটি একটি হাদীসের সারমর্ম)

৩. শাসকপ্রদত্ত শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

৪. প্রবৃত্তির তাড়নায় বা মনের ইচ্ছায় শাসকের বিরোধিতা করবে না। যেখানে ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানে ক্রীতদাসের ভরণ-পোষণ মালিককে বহন করতে হবে। মালিকের খেদমত ছেড়ে ক্রীতদাসের পলায়ন করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। এছাড়া অন্য প্রজারা স্বাধীন। দেশের ভিতর থাকাকালীন এ সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে। বের হয়ে গেলে সব সময় পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের হক

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বংশের কথা যেমন উল্লেখ করেছেন, শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, শ্বশুর-শাশুড়ী, শ্যালক, ভগ্নিপতি, জামা'আতা, পুত্রবধূ ও স্ত্রীর পূর্ব বিয়ের সন্তান তাদেরও বিশেষ হক রয়েছে। অতএব, তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারে বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত।

সাধারণ মুসলমানের হক

আত্মীয়-স্বজন ছাড়া সাধারণ মুসলমানদেরও কিছু হক আছে। ইমাম ইস্পাহানী (রহ.) তারগীব ও তারহীবে হযরত আলী (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে নিম্নলিখিত হকসমূহের কথা উল্লেখ রয়েছে।

১. মুসলমান ভাইয়ের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা।
২. তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।
৩. তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা।
৪. তার ওযর-অসুবিধা মেনে নেয়া।
৫. তার কষ্ট দূর করা।
৬. সর্বদা তার মঙ্গল কামনা করা।
৭. মুসলমান ভাইয়ের নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।
৮. সে কারও জামিন হলে সহায়তার দৃষ্টি রাখা।
৯. অসুস্থ হলে সেবা শুশ্রূষা করা।
১০. মৃত্যুর পর জানাযায় উপস্থিত হওয়া।
১১. (উপার্জন হালাল হলে) দাওয়াত কবূল করা।
১২. তার পক্ষ থেকে পেশকৃত হাদিয়া গ্রহণ করা।
১৩. ইহসানের প্রতিদান দিতে চেষ্টা করা।

১৪. তার অনুগ্রহ ও নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
১৫. সময়-সুযোগ ও সাধ্যমতো সহায়তা করা।
১৬. তার পরিবারের প্রতি সুদৃষ্টি রাখা।
১৭. তাদের প্রয়োজন পূরণ করা।
১৮. তার আবেদন শ্রবণ করা।
১৯. সুপারিশ গ্রহণ করা।
২০. আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে নিরাশ না করা।
২১. মুসলমান ভাই হাঁচির পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।
২২. তার হারানো বস্তু পেলে তাঁকে পৌঁছে দেয়া।
২৩. সালামের উত্তর দেয়া।
২৪. নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে কথা বলা।
২৫. তার প্রতি ইহসান করা।
২৬. যদি কোনো (জায়েয) বিষয়ে কসম খায়, তবে কসম পূর্ণ করতে সুযোগ প্রদান করা।
২৭. অত্যাচারিত হলে তাঁকে সাহায্য করা এবং জালেমের প্রতিরোধ করা।
২৮. ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।
২৯. লা'নত না করা।
৩০. নিজের জন্য যা ভালো মনে করা হয়, তার জন্যও তা ভালো জানা।–অন্য হাদীসে এছাড়াও আরো হকের কথা এসেছে।
৩১. সাক্ষাতের সময় সালাম করা। সেই সঙ্গে মুসাফাহাও করা উত্তম।
৩২. পরস্পরে মনোমালিন্য দেখা দিলে তিনদিনের অধিক সময় কথা বন্ধ না রাখা।
৩৩. (শরঈ দলীল ব্যতীত) কু-ধারণা না করা।
৩৪. হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা।
৩৫. সাধ্যমতো সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা।
৩৬. ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
৩৭. দু-মুসলমান পরস্পরে কলহ হলে মীমাংসা করে দেয়া।
৩৮. গীবত (দোষচর্চা) না করা।
৩৯. তার ইজ্জত আবরুর ক্ষতিসাধন না করা।
৪০. যানবাহনে উঠতে অক্ষম হলে বা সামানপত্র উঠাতে না পারলে সাহায্য করা।

৪১. তাকে সরিয়ে তার আসনে না বসা।

৪২. তৃতীয় ব্যক্তিকে একা ছেড়ে দুজনে গোপনে কথা না বলা।
সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারে উল্লেখিত হকসমূহ বিশেষ লোকদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে।

প্রতিবেশীর হকসমূহ

হাদীসে প্রতিবেশীর বহু অধিকার বর্ণিত হয়েছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, বাড়ির চতুর্দিকে চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত সকলেই প্রতিবেশীর আওতাভুক্ত। তাছাড়া শহরে বা গ্রামে বাড়ির পার্শ্ববর্তীগণ যেমন প্রতিবেশী, তদ্রূপ বাড়ি থেকে যার সঙ্গে একত্রে সফরে যাওয়া হয় বা বিদেশে গিয়ে এক সঙ্গে সফর করা হয়, এইসব সফরসঙ্গী এবং মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত বা যে কোনো কর্মস্থলে এক সঙ্গে যারা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থাকে, তারাও প্রতিবেশী। হোক সাময়িক প্রতিবেশী, তবুও ততোক্ষণের জন্য প্রতিবেশীর নির্ধারিত অধিকার তাদের প্রাপ্য। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত প্রতিবেশীর অধিকারসমূহ নিম্নরূপ।

১. আবদার করলে সাহায্য সহযোগিতা করা।

২. ঋণ চাইলে, তা প্রদান করা।

৩. অসুস্থ হলে সেবা-শুশ্রূষা করা।

৪. অভাবী হলে আর্থিকভাবে তার উপকার করা।

৫. তার কারণে কোনোরূপ কষ্ট পেলে (যেমন গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী বা ছেলে-মেয়ে দ্বারা কোনো কিছু নষ্ট বা ক্ষতি হলে) সবর করা।

৬. প্রতিবেশীর বিবি, সন্তানাদি ও জীব-জন্তুর হেফাযত করা।

৭. প্রতিবেশীর খুশির বিষয়ে খুশি প্রকাশ করা।

৮. প্রতিবেশীর কোনো দুঃখের বিষয় হলে সমবেদনা প্রকাশ করা।

৯. বিশেষ কোনো রান্না-বান্না বা ফল-ফলাদির ব্যবস্থা হলে প্রতিবেশীকেও তা থেকে কিছু হাদিয়া দেয়া। সম্ভব না হলে গোপন রাখা এবং নিজের সন্তানেরা যেন তা নিয়ে বাইরে না যায়, যাতে প্রতিবেশীর সন্তানেরা তা দেখে মনক্ষুণ্ন হয় এ ব্যাপারে যত্নবান থাকা।

১০. মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশ নেয়া।

১১. প্রতিবেশীর সঙ্গে সমঝোতা ব্যতীত উঁচু দেয়াল বা ইমারত বানিয়ে তার বাতাস বন্ধ করে না দেয়া।

১২. প্রতিবেশীর অনুমতি ব্যতীত তার বাড়ির আশপাশে ময়লা-আবর্জনা ফেলে তাকে দুর্গন্ধে কষ্ট না দেয়া। –ফাতহুল মুলহিম : খণ্ড-১

১৩. প্রতিবেশীকে কোনো ধরনের কষ্ট দিবে না; বরং যেভাবে হোক তার উপকার করার চেষ্টা করবে।

১৪. তুমি পেট ভরে খেতে থাকো, আর তোমার প্রতিবেশী উপবাস থাকে, এটা বড়ই নিষ্ঠুরতা। –বাইহাকী

১৫. তাকে কষ্ট না দেয়া। ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে কথা বাড়াবাড়ি না করা। প্রতিবেশীর কষ্ট দূর করার নিমিত্তে শরীয়ত তার জন্য হককে শুফ'আর বিধান দিয়েছে।

আলেমগণ লিখেছেন, বাড়িতে থাকাকালীন যেমন প্রতিবেশী হয়ে থাকে তেমনি ভ্রমণেও প্রতিবেশী হয়। অর্থাৎ ভ্রমণসঙ্গী পুরো ভ্রমণের সঙ্গী হোক বা আংশিক ভ্রমণের সঙ্গী হোক। হাদীসে পাকে একজনকে 'জারে মাকাম' (স্থায়ী প্রতিবেশী) অন্যজনকে 'জারে বাদিয়া' (ভ্রাম্যমাণ প্রতিবেশী বা ক্ষণস্থায়ী প্রতিবেশী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভ্রমণসঙ্গীর হকও বাড়ির পার্শ্বস্থ প্রতিবেশীর হকের ন্যায়।

সারকথা, ভ্রমণসঙ্গীর আরামকে নিজের আরামের উপর প্রাধান্য দিবে। কেউ কেউ যানবাহনে ভ্রমণসঙ্গীর সঙ্গে (সিট ও জানালা ইত্যাদি ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে) ঝগড়া করে, এটা অত্যন্ত হীনমন্যতার পরিচয়।

অনাথ ও এতীমের হক

যেসব ব্যক্তি পরনির্ভরশীল যেমন এতীম, বিধবা, অনাথ, অসহায়, দুর্বল, অসুস্থ, মা'যূর, মুসাফির, ফকীর, মিসকীন, ভিক্ষুক প্রভৃতি লোকদের আরো কিছু হক আছে। যেমন-

১. তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
২. নিজ হাতে তাদের কাজে সহযোগিতা করা
৩. তাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করা ও তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা।
৪. তাদের আবেদনকে প্রত্যাখ্যান না করা।

মেহমানের হক

মেযবানের (গৃহকর্তার) উপর মেহমানের কিছু হক আছে, যেমন-

১. মেহমানকে সম্মান করা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।

২. ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো।
৩. আগমনের সময় হাস্যোজ্জ্বল মুখে অভ্যর্থনা জানানো।
৪. তার প্রয়োজন ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা।
৫. বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে আচরণ করা এবং নিজ হাতে তার খেদমত করা।
৬. কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো মেহমান আগমন করলে তিনি স্বহস্তে তাকে আপ্যায়ন করতেন।
৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানকে খাওয়ানোর সময় বার বার আরো খেতে বলতেন। তবে মেহমান তৃপ্ত হয়ে অস্বীকার করতে লাগলে তিনি পীড়াপীড়ি করতেন না।
৮. খাওয়া-দাওয়া কমপক্ষে একদিন (মধ্যম পর্যায়ের) ভালো আয়োজন করা। এতো বেশিও না যাতে নিজের ক্ষতি হয়, আবার কমও না যাতে কৃপণতা প্রকাশ পায়। অন্তত তিনদিন তার মেহমানদারী করা; এটা তার পাওনা হক। তারপরও যদি মেযবান আতিথেয়তা করে তবে তা তার ইহসান হবে। মেহমানের জন্যও অধিক অবস্থান করে বা অযথা ফরমায়েশ করে অথবা বাড়িওয়ালার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাপনায় দখল দিয়ে মেযবানকে কষ্ট দেয়া উচিত হবে না।
৯. বিদায়ের সময় বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া। –ইবনে মাজা

মেযবানের হক

১. দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাওয়াত দেয়া হয়নি এমন কাউকে মেযবানের বাড়িতে আনবে না। আনতে হলে মেযবানের অনুমতি গ্রহণ করবে। তবে মেযবানের কোনো আপত্তি থাকবে না, এমন বুঝতে পারলে অনুমতি না নিলে অসুবিধা নেই।
২. মেহমান মেযবান কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে বসবে এবং থাকবে।
৩. মেহমান মেযবানের অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত কাউকে ডেকে খানায় শরীক করবে না বা কাউকে খানা থেকে কিছু প্রদান করবে না।
৪. মেহমান খাওয়ার মজলিসে এমন কিছু আবদার করবে না, যা যোগাড় করা মেযবানের জন্য মুশকিল হতে পারে।
৫. খাওয়ার ব্যাপারে মেহমানের কোনো বাছ-বিচার থাকলে কিংবা বিশেষ কোনো অভ্যাস বা রুটিন থাকলে পূর্বেই তা মেযবানকে অবহিত করা উচিত। দস্তরখানে এসে এরূপ কিছু উত্থাপন করে মেযবানকে বিব্রত করা অন্যায়।

৬. কোনো বিশেষ অসুবিধা না থাকলে মেযবান কর্তৃক উপস্থিত সব রকম খাবার থেকে কিছু কিছু গ্রহণ করে তাকে খুশী করা।

৭. মেহমানের হক তিন দিন, তিন দিনের বেশি থেকে মেযবানকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

৮. মেযবান থেকে অনুমতি নিয়ে বিদায় নেয়া।

৯. মেযবানের ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় মেহমান পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

(হে আল্লাহ! তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও। তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।) -মুসলিম শরীফ।

১০. মেহমানের জন্য মেযবানের বাড়িতে এতো বেশিদিন অবস্থান করা জায়েয নয়, যাতে মেযবান অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

বন্ধু-বান্ধবের হক

কুরআনে মাজীদে বিশেষ বন্ধু-বান্ধবকে ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরও কিছু হক আছে, যথা–

১. যার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তার আকীদা-আমল, লেন-দেন, আখলাক-চরিত্র উত্তমরূপে যাচাই করে নিতে হবে। উল্লেখিত বিষয়ে উপযুক্ত পেলে বন্ধুত্ব করবে। নতুবা দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। অসৎসঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার জোর তাকীদ এসেছে। অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনেও-এর ক্ষতিসমূহ উপলব্ধি করা যায়। উপযুক্ত পাত্র পেলে বন্ধুত্ব করতে বাধা নেই, বরং সত্যিকার বন্ধুত্ব বড় সুখের হয়।

২. নিজের জান-মাল তার জন্য ব্যয় করতে কৃপণতা করবে না।

৩. মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ তার থেকে প্রকাশ পেলে মাফ করে দিবে। ঘটনাক্রমে মনোমালিন্য দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক ঠিক করে নিবে। সাধারণ ব্যাপারকে জটিল ও দীর্ঘ হতে দিবে না।

৪. বন্ধুর হিত কামনায় ত্রুটি করবে না। সুপরামর্শ দানে কৃপণতা দেখাবে না এবং বন্ধুর পরামর্শও আন্তরিকভাবে শ্রবণ করবে। বাস্তবায়নযোগ্য হলে গ্রহণও করা চাই। এখানে উল্লেখ্য, আমাদের দেশে পালকপুত্র করণের যে প্রথা প্রচলিত আছে, যাতে পালকপুত্রকে সব ক্ষেত্রে আপন সন্তানতুল্য মনে করা হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা ভিত্তিহীন। পালকপুত্র বন্ধু-বান্ধবের

মতোই। যেহেতু তার সঙ্গে সম্পর্কের কিছুটা গভীরতা রয়েছে, তাই তাকে বন্ধুত্বের বিধানে আনা যায়। কিন্তু উত্তরাধিকার ইত্যাদি সে পাবে না। কেননা উত্তরাধিকার ইচ্ছাধীন বস্তু নয় যে, যাকে ইচ্ছা ওয়ারিশ বানাবে আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবে।

এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয়, মৃত্যুর সময় কোনো সন্তান সম্পর্কে এ উক্তি করা– 'অমুককে মিরাস বা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক।' শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অন্যায় ও গর্হিত কাজ। কেননা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, উত্তরাধিকারসূত্রটা মানুষের ইচ্ছাধীন বিষয় নয়।

অমুসলিমদের হক

আত্মীয়তা বা ইসলামের সম্পর্কসূত্রে যেমন কারো প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তেমনি শুধু মানুষ হওয়ার কারণেও একে অন্যের প্রতি হক বা অধিকার আছে যদিও সে মুসলমান না হয়।

১. অযথা তার জান বা মালের ক্ষতিসাধন না করা।
২. শরীয়তের সমর্থিত কারণ ব্যতীত কারো নিন্দা না করা।
৩. যদি বিপদাপদে পড়ে বা ক্ষুধার্ত হয় অথবা রুগ্ন হয় তবে সাহায্য করা, অন্নদান করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৪. বৈধ উপায়ে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন না করা। ভীত-সন্ত্রস্ত না করে নিরাপদে থাকতে দেয়া।

জীব-জন্তুর হক

১. বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত জীব-জন্তু বন্দী না করা। পাখির বাসা থেকে বাচ্চা বের করে বাচ্চার মা-বাপকে কষ্ট দেয়া অত্যন্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

২. উপকারী জীবসমূহকে নিছক পেশা হিসেবে হত্যা না করা। শিকারী মানুষেরা এ গর্হিত কাজে অধিক লিপ্ত হয়।

৩. যে সব জন্তু আমাদের কাজে নিয়োজিত যেমন–গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি তাদের ঘাস পানি ও থাকার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া উচিত। জন্তুর উপর সাধ্যাতীত কাজ চাপিয়ে দেয়া অন্যায়। তাকে সীমাতিরিক্ত প্রহার করাও উচিত নয়।

৪. যে সব জন্তু যবাই করা প্রয়োজন বা কষ্টদায়ক হেতু হত্যা করা দরকার সেগুলোকে ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে যবাই বা হত্যা করা। ধুঁকে ধুঁকে

কষ্ট দিয়ে মারবে না, ক্ষুধার্ত রেখেও কষ্ট দিবে না।

বর্ণিত হকসমূহ ছিলো মানুষের উপর সরাসরি ওয়াজিব। এছাড়াও আরও কিছু হক আছে, যা মানুষ নিজের উপর চাপিয়ে নেয়। তন্মধ্যে কিছু আল্লাহর হক তা তিন প্রকার।

১. যেসব হকের উৎস ইবাদত তা মান্নত হবে। ইবাদতে মাকসূদা (মুখ্য ইবাদতসমূহ যথা নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত; উযূ ইবাদতে মাকসূদা নয়)-এর মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর যদি ইবাদতে গায়রে মাকসূদার (যা মুখ্য উদ্দেশ্য নয় যথা উযূ) মান্নত হয়, তবে তা পূর্ণ করা মুস্তাহাব। মুবাহ বা বৈধ কাজের মান্নত হলে বৃথা হবে। অন্যায় ও গর্হিত কর্মের মান্নত করলে পালন করা হারাম হবে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মান্নত করা শিরকের ন্যায়।

২. যে সব কর্মের উৎস মুবাহ যেমন বৈধ কসমের কাফফারা, মুসাফির বা রুগ্ন ব্যক্তির জন্য রমযানের রোযা না রাখা, এগুলো আদায় করা ওয়াজিব।

৩. আর যেসব হকের উৎস গুনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী যেমন হুদূদ (ইসলামের দণ্ডবিধি ও নির্ধারিত শাস্তিসমূহ) এবং কাফফারাসমূহ যা বিনা উযরে রোযা ভাঙ্গার কারণে অথবা ভুলবশত হত্যা বা যিহারের কারণে ওয়াজিব হয়, সে সব হক আদায় করা ওয়াজিব।

ইচ্ছাধীন হকসমূহ থেকে কিছু হক্কুল ইবাদ আছে-এটাও তিন প্রকার :

১. যে হকের উৎস আনুগত্য ও সততা যেমন ওয়াদা পূর্ণ করা- এটা জরুরী এবং এতে উদাসীনতা ও ত্রুটি করা মুনাফিকের লক্ষণ।

২. যে হকের উৎস মুবাহ বা বৈধ, সেটা দ্বীনী বিষয়ক হোক বা দ্বীনী বিষয়ের অনুরূপ অন্য বিষয় হোক তা পালন করা ওয়াজিব। যেমন বিক্রিত মাল ক্রেতাকে হস্তান্তর করা, কনে নিজেকে স্বামীর জন্য পেশ করা (অর্থ্যাৎ বাধা প্রদান না করা), জমির হচ্ছে শুফআ (পার্শ্ববর্তীরা অংশীদার হওয়ার) দাবিকারী হকদার হলে জমি চাওয়া মাত্র প্রদান করা, শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদান করা, ধার কর্জ পরিশোধ ও আমানতের মাল ফেরত দেয়া ইত্যাদি।

৩. যে সব হক গুনাহ'র কারণে আসছে যেমন কাউকে হত্যা করা, কারো ইয্যতে হামলা করা, গালি-গালাজের মাধ্যমে হোক বা দোষচর্চার মাধ্যমে হোক এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে মাফ করানো ফরয, নতুবা আখেরাতে এসবের জন্য ইবাদত দিয়ে প্রতিশোধ নেয়া হবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আদব সৌভাগ্যের সিঁড়ি

দ্বীনের জন্য আদব একটি মৌলিক জিনিস, আদব যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে সে অনুপাতে মানুষের দ্বীনদারী বা ধর্মপরায়ণতাও বৃদ্ধি পাবে এবং যে পরিমাণ বেআদবী-গোস্তাখী, দুঃসাহস পাপকর্মের প্রতি নির্ভীকতা ও উদাসীন হতে থাকবে মানুষ সে পরিমাণ বঞ্চিত ও সম্পর্কহীন হতে থাকবে। ইলম, আমল, আখলাক ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে শরীয়তে আদবের গুরুত্ব অপরিসীম। শরীয়তে যেখানে আহকাম রয়েছে সেখানে আদবও রয়েছে। যেমন কুরআনে পাকের ইরশাদ,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থ- "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সঙ্গে যেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো, তাঁর সঙ্গে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের আমলসমূহ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। -সূরা হুজরাত : ২

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রাযি.)-এর কণ্ঠস্বর জন্মগতভাবে বুলন্দ ও উচ্চ ছিল। তাঁর আওয়ায এমন ছিল যে, নিচুস্বরে কথা বললেও মনে হতো উচ্চস্বরে কথা বলছেন। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর আওয়ায এতো ক্ষীণ বা নিচু হয়ে গিয়েছিলো যে, কোনো কোনো সময় তাঁর কথা শোনার জন্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে শুনতে হতো। তিনি বলতেন, আমার ভয় হয় যে, অজ্ঞাতসারে আমার গলার স্বর উচ্চ না হয়ে যায়। এ বিষয়টির দ্বারা আদবের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আর প্রকৃত পক্ষে সর্বাপেক্ষা আদব হলো আল্লাহ তা'আলার হক। মহান সত্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এজন্য তার দরবারে আদব, বিনয় ও নম্রতা একান্ত প্রয়োজন। তারপর আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সম্পর্কিত যতো বিষয় রয়েছে, নিসবত যার যতো বেশি রয়েছে তার প্রতি আদব ও একরাম তত বেশি। যেমন কুরআনে মাজীদে বলা হয়েছে, নাপাকি অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে না এবং নাপাকি যদি জানাবাত পর্যন্ত পৌঁছে যায় তবে মৌখিক তিলাওয়াতও জায়েয নয়। এমন অবস্থায় জিহ্বা নাপাক হয়ে গেছে বলে ধরা হয়। এ সমস্ত আদব সম্পর্কে কুরআনে পাকে উল্লেখ আছে। কারণ কালামে

পাকের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে। আল্লাহ তা'আলাকে আদব করা যখন জরুরী তখন তাঁর কালামে পাককেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। অনুরূপ আমাদের নিকট কুরআনে মাজীদ যে কাগজে লিখিত আকারে রয়েছে, সে কাগজও বিনা উযূতে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। কালামুল্লাহ শরীফ লিখিত কাগজ বাঁধাই করে যে বোর্ডে লাগানো থাকে তাও কালামুল্লাহ শরীফের কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে যায়। কালামের কারণে অক্ষরগুলি, অক্ষরের কারণে কাগজ কভার ও বোর্ড সবই। এসব কোনো একটি জিনিসের সঙ্গে সামান্যতম বেআদবী ও গোস্তাখীতে সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বেআদবী ও গোস্তাখীর সঙ্গে দ্বীন কায়েম থাকতে পারে না। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার আদব ওয়াজিব অদ্রুপ আল্লাহ পাকের ঘর কা'বা শরীফের আদব রক্ষা করাও ওয়াজিব। বায়তুল্লাহ শরীফের আদব করা, সম্মান প্রদর্শন করা যখন ওয়াজিব, বায়তুল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত মসজিদে হারামেরও আদব ও সম্মান করা ওয়াজিব। বায়তুল্লাহ শরীফে এক রাকা'আত নামাযে এক লাখ রাকা'আতের সওয়াব লাভ হয়, অনুরূপ বায়তুল্লাহর নিসবতে মসজিদে হারামে এক রাকা'আত নামাযে এক লাখ রাকা'আতের সওয়াব লাভ হয়। মসজিদে হারাম যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানের নাম হলো মক্কা মুকাররমা। মসজিদে হারামের কারণে মক্কা মুকাররামা সম্মানের স্থানে পরিণত হলো। আর মক্কা মুকাররামা হলো হিজায অঞ্চলের অংশ বিশেষ, এ কারণেই হিজায ও সম্পূর্ণ আরব ভূমি সম্মানের পাত্র হয়ে গেল। হাদীসে বলা হয়েছে, আরবের সঙ্গে মুহাব্বত ও ভালোবাসা ঈমানের আলামত এবং তাদের সঙ্গে শত্রুতা করা নিফাক ও কপটতার লক্ষণ। মোটকথা স্তর হিসেবে এ সবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কুরআনে পাকে হযরতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণ সবচেয়ে বেশি আদব ও শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অতঃপর পরবর্তী পর্যায়ে তাদের অনুসরণ অনুকরণে যিনি যতো বেশি অগ্রসর তিনি ততো বেশি আদব ও ইহতেরামের নযীর রেখেছেন।

মানব জীবনের দৈনন্দিন কার্যক্রম যথা- মেলা-মেশা, থাকা-খাওয়া ইত্যাদির সুন্দর বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিকে আদব ও শিষ্টাচার বলা হয়। আদব ও শিষ্টাচারের মাধ্যমেই মানুষ ভদ্র ও সুসভ্য হিসেবে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে থাকে। সমাজের প্রতিটি মানুষ শিষ্টাচারী হলে তার দ্বারা অন্যরা অধিক উপকৃত হবে। শান্তি ও সুখের নীড়ে একসঙ্গে সবাই বসবাস করতে সক্ষম হবে। কেউ কারো অনিষ্ট করবে না। একজনের দ্বারা অপরজন দুঃখ-কষ্ট পাবে না। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনবিধান, যাতে ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, আদব-আখলাক ও শিষ্টাচারের জন্য সীরাতে নববী বা বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শকে সূতিকাগার বা মূলভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যে কারণে দেখা যায়, চূড়ান্ত পর্যায়ের অসভ্য এবং বর্বর একটি জনগোষ্ঠী

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছে। এ যুগে অধিকাংশ মুসলমানের মাঝে একটি বিষয় তীব্রভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা ঈমান এনেছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর, অথচ তাদের জীবন পরিচালনার ধারা হলো কাফের মুশরিক ও ইহুদী নাসারাদের অনুকরণে। ঈমানের সঙ্গে জীবন-যাপনের মিল নেই। এ কারণে আদবও নেই। সুতরাং নফসকে সকল ধরনের অসাধুতা ও অশালীনতা এবং অপসন্দনীয় কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখার নামই হলো আদব। অনুরূপ নিজের ও অপরের ইজ্জত-সম্মান রক্ষার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং কারো মানহানি করা থেকেও নিজের নফসকে ক্রোশ ক্রোশ দূরে রাখা চাই। মোদ্দাকথা, সর্বাবস্থায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা হলো পূর্ণাঙ্গ আদব।

তাঁর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ শিষ্টাচার পূর্ণ আর কেউ হতে পারবে না। কবি বলেন,

ادب اموخ زاادیب کہ او * ادب از حضرت خدا اموخت

"আদব আমুখ যাঁ আদীব কে ঊ, আদব আয হযরতে খোদা আমোখ্‌ত"

অর্থ- আদব শিক্ষা কর ওই আদীব তথা শিষ্টাবান লোকের নিকট থেকে যিনি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে আদব শিখেছেন।

কাজেই মুমিন মুসলমানের উচিৎ শিষ্টাচার সম্বলিত জীবন-যাপনে সচেষ্ট হওয়া। জীবনের প্রতিটি পদে শিষ্টাচারী হওয়া। শিষ্টাচার বিবর্জিত কোনো কাজ তা মূলত অসুন্দর ও অপূর্ণাঙ্গ হয়। আল্লাহ তা'আলার দরবারে এ জাতীয় কাজ হয় অপসন্দনীয়। হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।"

-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দ্বীন পুরোটাই হচ্ছে আদব ও শিষ্টাচারের সমন্বয়। মাসনবী শরীফে আছে,

از خدا خواہیم توفیق ادب * بے ادب محروم گشت از فضل رب

"আয খোদা খাহেম তাওফীকে আদব * বে আদব মাহরূম গাশত্‌ আয ফাযলে রব্ব।"

অর্থাৎ আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আদব ভিক্ষা চাই, কারণ বেআদব আল্লাহ তা'আলার ফযল ও করম থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকে। প্রসিদ্ধ

বাক্য "বা আদব বা নসীব বেআদব বেনসীব" আদবওয়ালা সৌভাগ্যবান বেআদব হতভাগা। সাইয়েদুনা হযরত উমর (রাযি.) বলেন, প্রথমে শিষ্টাচার ও আদবের সবক নাও, অতঃপর ইলম শিক্ষা কর।

ফকীহ আবুল লাইস সমরকন্দী (রহ.) বলেন, ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি, প্রথমটি হচ্ছে ঈমান-আকীদা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইখলাস, তৃতীয়টি হচ্ছে ফরিযায়ে দ্বীন, চতুর্থটি হচ্ছে সুন্নাতের অনুসরণ, পঞ্চমটি হচ্ছে আদব ও শিষ্টাচারের সংরক্ষণ। মানুষ যতক্ষণ শিষ্টাচারের সংরক্ষণ করতে থাকবে শয়তান তার থেকে নিরাশ হতে থাকবে। যখন শিষ্টাচার ও আদব বর্জন করবে তখন তার সুন্নাত ছুটতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে তার ইখলাস ও ফরিযায়ে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত আবু আবদুল্লাহ বলখী (রহ.) বলেন, আদব ও শিষ্টাচার অর্জন ইলম অর্জনের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) বলেন, বেআদব স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের কাছেই অভিশপ্ত লাঞ্ছিত।

আদব মানুষকে জিরো থেকে হিরো বানিয়ে দেয়

হযরত বিশরে হাফী (রহ.) সে যুগে পুলিশের একজন সাধারণ সদস্য ছিলেন। আখলাক-চরিত্র তেমন ভালো ছিল না। একদিন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় চলার সময় একখানা কাগজের টুকরা পড়ে থাকতে দেখে তিনি তা হাতে নিয়ে দেখলেন যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার নাম লিখা আছে। তিনি কাগজখানা স্বযত্নে উঠিয়ে বাজারে গিয়ে দামী কাপড়, আতর, খুশবু খরীদ করে ঘরে গিয়ে পাক পবিত্র হয়ে 'আল্লাহ' লিখা কাগজের টুকরাখানা ওই দামী কাপড় দিয়ে ভালো করে মুড়িয়ে আতর খুশবু মেখে ঘরের উঁচু স্থানে মর্যাদার সঙ্গে রেখে দিলেন। ওই রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন, এক নূরানী চেহারা-বিশিষ্ট বুর্যূগ তাকে লক্ষ্য করে বলছেন, তুমি যে দিনের বেলায় আল্লাহ তা'আলার নাম লিখিত কাগজকে সম্মান ও আদব প্রদর্শন করেছো, এর বদলা হিসেবে আল্লাহ পাক তোমাকেও সমস্ত জগদ্বাসীর নিকট সম্মানিত করবেন। যার ফলশ্রুতিতে ঐ যুগে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হযরত বিশরে হাফী (রহ.)-এর সোহবতে যেতেন। আল্লাহ তা'আলার নামের সম্মান ও আদবের খাতিরে হযরত বিশরে হাফী (রহ.)কে ওই যুগের শ্রেষ্ঠ বুর্যূগ এবং সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন আল্লাহ পাক।

কুরআন শরীফের আদব

কুরআনে কারীম এমন এক পবিত্র ও বরকতপূর্ণ গ্রন্থ, পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা ছাড়া যা স্পর্শ করা বৈধ নয়। হযরত ইমাম মালিক (রহ.) তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে হাযম রাযিয়াল্লাহু আনহুকে একথা লিখেছিলেন– আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

অর্থ : এই কুরআনকে কেবল পবিত্রজনরাই স্পর্শ করতে পারবে।

-সূরা ওয়াকিয়া : ৭৯

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) কর্তৃক সংকলিত মারাসিল গ্রন্থে আছে, ইমাম জুহরি (রহ.) বলেছেন, আমি নিজে এই পত্র দেখেছি এবং এই বাক্যটি পাঠ করেছি।

কুরআন পাকের সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় আদব

ক) পবিত্র কুরআনের আযমত ও মুহাব্বতের দাবি হলো, সর্বাধিক সম্মান ও ভক্তি করা। কুরআন শরীফের গায়ে উন্নতমানের কাপড়ের গিলাফ বানিয়ে তা দিয়ে আবৃত করে রাখা।

খ) পবিত্র কুরআনের গিলাফ মাঝে মধ্যে ধৌত করা, গিলাফ ধোয়া পানি যেখানে সেখানে বা বাথরুম টয়লেটে না ফেলা। পুকুর, নদীতে ধৌত করা, অথবা পাত্রের মধ্যে ধৌত করলে ব্যবহৃত পানি বরকতের জন্য ঘরের দেয়ালে, দোকানপাটে ছিঁটিয়ে দিবে অথবা ফুলের টবে ঢেলে দিবে, যাতে মানুষের পদতলে না যায়।

গ) কুরআন শরীফ রাখার জন্য বিশেষ সেলফ অথবা আলমারি রাখা। তাতে অন্য কিছু না রাখা এবং সেলফের তাকে কাপড় বিছিয়ে তারপর সুন্দরভাবে কুরআন শরীফ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা।

ঘ) কুরআন শরীফের পাতা ছিঁড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়া পাতা জোড়া লাগানো এবং ছেঁড়া পাতা হেফাযত করা।

ঙ) কুরআন শরীফ রেখে তিলাওয়াত করার জন্য ভালো উন্নত রেহাল ব্যবহার করা চাই। ইদানিং প্লাস্টিকের তৈরি রেহাল অত্যন্ত নিচু, তাই পাশ দিয়ে চলার সময় পা কুরআন শরীফের উপর উঠে যেতে পারে। সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাধারণ টুল বা তেপায়ার উপর রেখে

আল্লাহ পাকের কালাম তিলাওয়াত করা হয়, তা আযমতের খেলাফ। কুরআন পাকের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে পায়ের উপর রেখে, শুধু জমিনের উপর রেখে কেউ কেউ তিলাওয়াত করে, তা কতো বড় অসম্মানজনক!

চ) হাদীসে আছে, অশুদ্ধ তিলাওয়াতের কারণে তিলাওয়াতকারী নিজেই অভিশপ্ত হয় এবং অশুদ্ধ উচ্চারণের কারণে অর্থ বিকৃত হয়।

ছ) সভা-সমিতি ও মাহফিলের শুরুতে বরকতের জন্য কুরআন পাকের তিলাওয়াত করা হয়ে থাকে। এটা উত্তম কাজ, কিন্তু যাদের শোনানোর উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা হয় তাদের যদি তিলাওয়াত শোনার প্রতি ধ্যান না থাকে, তাহলে উচিত হলো প্রথমে সকলকে শোনার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ সৃষ্টি করে তারপর তিলাওয়াত করা। অন্যথায় পবিত্র কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের দরুন ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে। সভা-সমিতিতে মাইকের আওয়ায পরীক্ষা করার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। উদ্দেশ্য তিলাওয়াত নয়, মাইকের আওয়ায পরীক্ষা করা। এমন আচরণ পবিত্র কুরআনের আদবের খেলাফ।

জ) সভা-সমিতিতে মাহফিলে রেওয়াজে পরিণত হয়েছে যে, তিলাওয়াতকারী দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে তিলাওয়াত করে থাকে, আর অন্যরা বসে থাকে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আল্লাহ তা'আলার কালামে পাকের মহত্বের কারণে তাঁর কালামের তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা এটা অপরাধীর সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তিলাওয়াতকারীর মর্যাদার পরিপন্থী। তাই মজলিসে যদি সকলে বসে তিলাওয়াত শুনে, তাহলে তিলাওয়াতকারী কুরসী বা চেয়ারে বসে তিলাওয়াত করবেন।

ঝ) দারুল হাদীস তথা হাদীসের শ্রেণীকক্ষকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। এটা ভালো কাজ। অথচ দারুল কুরআন তথা কুরআন শিক্ষার জন্য নির্ধারিত কক্ষকে ততোটা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। আবার কোথাও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয় না। থাকলেও তা সম্মানের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হয় না। যেমন দেখা যায়, দারুল হাদীসের কামরায় দামী কার্পেট বিছানো হয়। দারুল কুরআন তথা হিফযখানা, নাযেরা, মক্তব বিভাগের কামরাসমূহে ছেঁড়া চট, চাটাই বিছানো হয়। এ ধরনের আচরণ কুরআন পাকের শানের পরিপন্থী।

ঞ) খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান যে গুরুত্বের সঙ্গে আঞ্জাম দেয়া হয়, খতমে কুরআনের অনুষ্ঠান সে গুরুত্বের সঙ্গে আঞ্জাম দেয়া হয় না এবং সেরকম গুরুত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণও করা হয় না।

ট) হাদীস শিক্ষার উস্তাদকে যে মর্যাদায় বিবেচনা করা হয়, কুরআনের উস্তাদকে সে মানের বিবেচনা করা হয় না।

ঠ) কুরআনের আয়াত, হাদীস, আল্লাহর নামের যথাযথ সম্মান রক্ষা করা জরুরী।

ড) কুরআন শরীফের উপর কুরআনের তাফসীরের কিতাব বা হাদীসের কিতাব রাখা আদবের খেলাফ। সেক্ষেত্রে কুরআন শরীফের উপর রেহাল রাখা বা অন্যান্য জিনিস রাখা কতোই না বেআদবী।

ইসলাহ : কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও দ্বীনী কিতাবাদির মুদ্রণ শিল্প, প্রকাশনা এবং এ সকল ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা কুরআন পাকের আদব-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। পাক-নাপাকের কোনো ধার ধারে না। যেখানে সেখানে পবিত্র কুরআন শরীফ রেখে দেয়। প্রেসের কর্মী, কুলি-মিস্ত্রীরা নাপাক অবস্থায় নাড়াচাড়া করে থাকে। কুরআন-হাদীসের কম্পোজকৃত কাগজ যেখানে সেখানে ফেলে রাখে। মাসআলা অনুযায়ী এগুলো যথাযথ হেফাযত করা হয় না। কুরআন পাককে সাধারণ বই-পুস্তকের মতোই মনে করা হয়। এ বিষয়টির সংশোধন হওয়া অতি জরুরী।

* অনেক সময় ভূলবশত ছোট পকেট সাইজের কুরআন শরীফ পকেটে রেখেই টয়লেটে যাওয়া হয়। অনুরূপভাবে ছোট দোয়া, ওযীফার কিতাব যাতে কুরআন হাদীস লিখা থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিৎ।

* হযরত শেখ আহমাদ শেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. সর্ম্পকে কথিত আছে একদিন তিনি টয়লেটে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে হাতের নখের মধ্যে একটি কালির দাগ ছিল তা পরিস্কার করে টয়লেটে প্রবেশ করেছেন।

* মাদরাসায় পড়ুয়া দেখতে ছোট শিক্ষার্থী বালেগ হওয়ার আলামত শারীরিক ভাবে প্রকাশ না পেলেও অনেকে স্বপ্ন দোষে শরীর নাপাক হয়ে যেতে পারে অথবা অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে শরীর নাপাক হলে এক্ষেত্রে লজ্জা-শরম অথবা উস্তাদ বা অন্য কোনো ভয়ে ফরয গোসল না করেই দিবা রাত্রি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত ও বা-দস্তুর নামায পড়তে থাকে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের ভূমিকা অত্যন্ত জরুরী।

তিলাওয়াতের বিশেষ ৩টি ফায়দা

১. কালামে পাক তিলাওয়াত করলে দিলের জং দূর হয় ও দিল পরিস্কার হয়।

২. কালামে পাক তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে এবং তাঁর নৈকট্য লাভ হয়।

৩. কালামে পাক তিলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফে কমপক্ষে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়– চাই বুঝে পড়ুক অথবা না বুঝে পড়ুক।

যারা বলে না বুঝে পড়লে কোনো ফায়দা নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। তারা বদদ্বীন বা জাহেল অথবা উভয়টি।

তিলাওয়াতের বিশেষ ২টি আদব

১. তিলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করবে, আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিচ্ছেন, পড় দেখি আমার কালাম কেমন সুন্দর করে পড়তে পারো? তাই আল্লাহ পাককে শুনানোর নিয়্যতে তিলাওয়াত করবে।

২. শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করবে, আহকামুল হাকিমীন ও মুহসিনে আযম-এর কালাম তিলাওয়াত করা হচ্ছে; তাই খুব আযমত ও মুহাব্বতের সঙ্গে শোনা চাই।

কুরআন পাক দেখে পড়ার বিশেষ ৩টি ফায়দা

১. যিয়ারত তথা কুরআনে কারীম দেখার সওয়াব।
২. তিলাওয়াতের সওয়াব
৩. সামাআত তথা কুরআন শোনার সওয়াব।

আর মুখস্থ পড়লে শুধুমাত্র ২টি সওয়াব লাভ হয় ১. তিলাওয়াত ২. সামাআতের সওয়াব। মসজিদসমূহে কুরআনে কারীমের যে পারা রাখা থাকে সেটা মূলত কুরআন কারীমের তিলাওয়াত দেখে দেখে করার জন্য।

হাদীসে পাকের আদব

১. আযমত অর্থাৎ ভক্তি ও সম্মান করা।
২. মুহাব্বত অর্থাৎ মনে-প্রাণে ভালোবাসা।
৩. ইতা'আত অর্থাৎ মান্য করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মুহাব্বাত ও আদবের বিভিন্ন নমুনা–

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ

অর্থ– নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বাত মুমিনগণের অন্তরে প্রাণের চেয়ে বেশি, এবং তাঁর পত্নিগণ তাদের মাতা। –সূরা আহযাব : ৬

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থ– তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত নিজ পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমার সহিত অধিক মুহাব্বাত না রাখে। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুগ্রহ ও অবদান উম্মতের স্বার্থে ও কল্যাণে নিবেদিত ও উৎসর্গিত হয়েছে। তার সংখ্যা গুরুত্বের বিবেচনায় উম্মতের ঘাড়ে তাঁর প্রাপ্ত হক ও ঋণের বোঝা এত বেশি, যা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মুক্ত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এ প্রাপ্য হকের সংখ্যা যদিও অগণীত- অসংখ্য তথাপি তা মোটামুটি তিনটি বিষয়ের ভিতরে এসে যায়।

১. সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ।
২. এত্তেবা বা অনুসরণ।
৩. মর্যাদা দান।

উপরোক্ত তিনটি প্রাপ্য হকে হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) ও পূর্বসূরী বুযূর্গানেদ্বীন যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা থেকে অতি সামান্য কিছু ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

হযরত যায়েদ ইবনে দাসীনা (রাযি.) কে কাফেরদের কর্তৃক যখন শুলীতে চড়ানো হচ্ছিল তখন হযরত আবু সুফিয়ান (রাযি.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি এমনটি পসন্দ কর যে, আমরা তোমাকে মুক্ত করে দিব আর তোমার পরিবর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শূলীতে চড়ানো হউক। হযরত যায়েদ ইবনে দাসীনা (রাযি.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এতটুকুও পসন্দ করি না যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আছেন সেখানেই তাঁহার শরীর মুবারকে একটি কাঁটা বিদ্ধ হউক আর আমি এর বিনিময়ে মুক্ত হয়ে যাই।

কাফের কুরাইশরা এমন মুহূর্তে এ-ধরনের জবাব শুনে বিস্মিত হয়ে গেল। আবু সুফিয়ান বললেন, মুহাম্মাদের প্রতি তাঁর সাথীদের যে ভালোবাসা দেখেছি তার নযীর আমি আর কোথাও দেখিনি। অতঃপর কাফেররা হযরত যায়েদ রাযি. কে শহীদ করে দিল। অনুরুপভাবে হযরত খুবাইব (রাযি.)-কে যখন শুলিতে চড়ানো হল তখন চল্লিশ জন কাফের চারিদিক থেকে তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করছিল এবং তাঁহার দেহকে চালনীর মত ঝাঁঝরা করে দিল। ঐ মূহূর্তে কেহ তাঁহাকে কছম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এমনটি পসন্দ কর যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হত্যা করা হোক আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হোক? উত্তরে তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তা'আলার কসম, আমার প্রাণের বিনিময়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গায়ে একটা কাঁটা বিদ্ধ হোক আমি এও পসন্দ করি না। –ফতহুল বারী

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন এবং অনেক সাহাবী শহীদ হয়েছেন। এই মর্মান্তিক খবর মদীনা তাইয়্যেবায় পৌঁছলে মহিলাগণ খবরাখবর জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘর হতে বাহির হয়ে পড়েন। এক আনসারী মহিলা ওহুদের প্রান্তরে একটি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? দলের মধ্যে থেকে কেউ বলল, তোমার পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তিনি ব্যাকুল হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? কোথায় আছেন? উত্তরে তার স্বামী, ছেলে, ভাইয়ের ইন্তেকালের খবর জানালে মহিলা বললেন, আগে বল রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন? কেমন আছেন? লোকেরা বললো, তিনি ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। তারা ইশারায় দেখিয়া দিলেন ঐ দলের মধ্যে আছেন। তিনি দৌড়ে গেলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দেখার পর আমার সমস্ত মুসীবত ও কষ্ট বিদূরিত হয়ে গেছে। আপনি যখন জীবিত ও সুস্থ আছেন তখন আর আমার কারো মৃত্যুর পরোয়া নাই। –খাসীস

হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর আদব

হযরত আব্বাস (রাযি.) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আপন চাচা। তাদের উভয়ের বয়স প্রায় কাছাকাছি। একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাযি.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আমার চেয়ে বড়? একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আব্বাস (রাযি.) শিহরিয়ে উঠলেন এবং উত্তর দিলেন,

أَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনেক বড় এবং সম্মান ও মর্যাদায় সকলের উর্ধ্বে। তবে আমার বয়স একটু বেশি।

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.)-এর আদবের নমুনা

মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় আগমনের পর হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.)-এর বাড়িতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.)-এর বাড়িটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট। তিনি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে দোতলায় অবস্থান নিলেন। আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান নিলেন নিচের তলায়। রাতের বেলায় হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযি.)-এর কোনো ক্রমেই ঘুম আসছিল না। বহু চেষ্টা করেও দু'চোখের পাতা একত্রিত করতে পারছিলেন না। কারণ তার মাঝে এই চিন্তা বিদ্যমান ছিল যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমার নিচে শুয়ে আছেন। এটাতো আমার চরম বেয়াদবী ও ধৃষ্টতার শামিল। শেষ পর্যন্ত তিনি শোয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে চেপে সারারাত দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলেন। সকাল বেলায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হয়ে খুব বিনীতভাবে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনাকে নিচের তলায় রেখে আমি দোতলায় অবস্থান করতে পারবো না। দয়া করে আপনি উপরের তলায় তাশরীফ নিয়ে আসুন। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি কোনো ক্রমেই রাযী করাতে পারলেন না। অগত্যা তিনি নিজেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ মনে করে উপরের তলায় অবস্থানের বিষয়টি মেনে নিলেন।

রণাঙ্গনে আদব রক্ষার দৃষ্টান্ত

গযওয়ায়ে ওহুদে হযরত আবু দুজানা (রাযি.) যখন দেখলেন দু-জাহানের সরদার প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বৃষ্টির মতো তীর বর্ষিত হচ্ছে, তখন তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াতে চাইলেন। কিন্তু চিন্তা করে দেখলেন নিক্ষিপ্ত তীরের দিকে যদি ঢাল হয়ে দাঁড়ান তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে তার পিঠ হয়ে যাবে। হোক না যুদ্ধক্ষেত্র, তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি পিঠ দেয়া তিনি মেনে নিতে পারলেন না। সুতরাং তিনি

নিজের বুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে আর পিঠ শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীরের দিকে দিয়ে ঢাল হয়ে থাকলেন। জীবনের চেয়ে আদবের গুরুত্ব দিলেন বেশি।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর আদবের নমূনা

হযরত ইমাম মালেক (রহ.) সারাটা জীবন মদীনাতেই কাটিয়ে দিয়েছেন।

ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন হলে তিনি মদীনা শরীফের পবিত্র আঙ্গিনার একেবারে শেষ সীমানায় চলে যেতেন এবং এমনভাবে মলত্যাগ করতেন যে, তাঁর দেহ থাকতো মদীনার সীমানার ভিতরে আর মলত্যাগ করতেন তার বাইরে। কেউ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন, আমার আশঙ্কা হয় আমার মৃত্যু মদীনার বাইরে হয়ে যায় কিনা? অন্যদিকে এ পবিত্র শহরের আদব ভক্তি। এখানে মলত্যাগ করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শহরের সঙ্গে বেয়াদবী গোস্তাখী করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন আদবের নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

পাহলোয়ান থেকে আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো আলেম বা বুর্যূগও ছিলেন না। একজন প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর ছিলেন। তৎকালীন আরব জাহানে তার সমকক্ষ কোনো পাহলোয়ান ছিল না। তার এই কাজের কৃতিত্বস্বরূপ তার ভরণ-পোষণের সকল ব্যয়ভার রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্বাহ করা হতো। তৎকালীন বাগদাদের বাদশাহ ঘোষণা দিলেন যে, রাষ্ট্রীয় বীর জুনাইদকে যে কুস্তিতে পরাজিত করতে পারবে তাকে নগদ দশহাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেয়া হবে। এতো বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা সত্ত্বেও জুনাইদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুস্তিতে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তৎকালীন আরব ভূখণ্ডে দ্বিতীয় আরেকজন ছিল না।

মদীনাবাসী জনৈক সাইয়্যেদ খান্দানের এক পাহলোয়ান অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটে নিপতিত হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে খুবই মানবেতর জীবন অতিবাহিত করছিলেন। সেই মুহূর্তে বাগদাদের বাদশাহর পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা শ্রুত হয়ে বাগদাদে পৌঁছে বাদশাহের নিকট জুনাইদের সঙ্গে মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত জানালে বাদশাহ দিন-তারিখ-স্থান ঠিক করে রাষ্ট্রময় প্রচার সম্পন্ন করাসহ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। প্রচুর দর্শনার্থী সমাগমে খোদ বাদশাহের উপস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ে মল্লযুদ্ধে জুনাইদের মোকাবেলায় মদীনাবাসী সেই ব্যক্তি ময়দানে এলেন। মুখোমুখী হওয়ার প্রারম্ভে পরিচয় পর্বে জুনাইদকে লক্ষ্য করে মদীনাবাসী

নিজের আসল মাক্‌সাদ প্রকাশ করে বললেন, ভাই জুনাইদ! আমি জানি আপনি আরব বিশ্বের একমাত্র অপরাজেয় কুস্তিগীর, আপনার সঙ্গে এক মুহূর্ত মোকাবেলা করার মতো শক্তি ও সাহস আমার নেই, কিন্তু অন্য কোনো উপায় না পেয়ে এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খান্দানের একজন নগন্য সদস্য। আমার পরিবারে লোকসংখ্যা অনেক। রুজি-রোজগারের কোনো ব্যবস্থা নাই। সন্তান-সন্ততি নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এর মধ্যে বাদশাহর ঘোষণা শুনে শুধুমাত্র মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছি। আপনাকে পরাস্ত করে সেই স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার জন্য নয়। বরং আপনার কাছে সেই দশহাজার স্বর্ণ মুদ্রা ভিক্ষা চাইবার জন্যে। জনাব! আমার একান্ত অনুরোধ, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনাবাসী এক দরিদ্র পরিবারের ইয্‌যতের খাতিরে আপনি যদি আজ সেচ্ছায় পরাজয় বরণ করতেন, তাহলে আওলাদে রাসূলের এ-অভাবী পরিবার দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে খেয়ে দেয়ে বাঁচতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খান্দানের ইয্‌যত-আবরু রক্ষা পাবে। ভাই জুনাইদ! আমি ভালোভাবেই জানি এতে আপনার মান-মর্যাদা-খ্যাতি সবই ভুলুণ্ঠিত হবে। আপনি জাতীয় বীর, বাদশাহ ও দেশবাসীর নিকট হেয় প্রতিপন্ন হবেন। আবারও আপনাকে অনুরোধ করছি এতো সবকিছুর বিসর্জন আপনার জন্যও নয়, আমার জন্যও নয় বরং আমার, আপনার এবং সকলের প্রিয়তম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার খাতিরে। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আপনার নিকট এতো দূর থেকে এসেছি। এখন আপনার ইচ্ছা।

মদীনাবাসী পাহলোয়ানের করুণ আহাজারী শুনে জুনাইদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার জোশ উথলে উঠলো। ক্ষণিকের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে দিলে-দিলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হে প্রিয় নবীজীর খান্দানের ভাই! আপনি চিন্তা করবেন না। একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইয্‌যত ও সম্মানের খাতিরে আমি আমার অর্জিত সকল খ্যাতি ও আত্ম-মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে আপনাকেই বিজয়ী করতে প্রস্তুত। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হলো, সকলেরই ধারণা ছিল সাধারণ একজন পালোয়ানকে জুনাইদ এক মিনিটেই ধরাশায়ী করে ফেলবে। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে সামান্য হাতাহাতি ও কুস্তির পর জুনাইদ সকলকে হতভম্ভ করে দিয়ে এমনভাবে ধরাশায়ী হয়ে গেলেন, যেন মদীনাবাসী সেই পাহলোয়ানই তাকে ধরাশায়ী করেছে। উপস্থিত বাদশাহ ও সকলেই স্তম্ভিত। এ পরাজয় যেন কেউ মেনে নিতে পারছিলো না। সকলের তীব্র সমালোচনার তীর যেন জুনাইদকে ঘিরে। এদিকে

মদীনার পাহলোয়ান বিজয়ীবেশে আনন্দচিত্তে চলছিলেন। সকলের সামনে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার গ্রহণ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এদিকে জুনাইদের পরাজয় যেন গোটা বাগদাদবাসীর পরাজয়। পরাজয়ের গ্লানি, মনের দুঃখ-বেদনায় এক পর্যায়ে জুনাইদ মনে মনে ভাবতে লাগলেন অজানা-অচেনা সাধারণ একজন লোকের কথায় বিশ্বাস করে সুনাম, সুখ্যাতি সবই হারালাম। যদি সে তার দাবিতে সত্য না হয়, তাহলে তো আমার সবই গেলো। নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনায় চিন্তামগ্ন হয়ে নীরবে নিভৃতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সামান্য সময়ের মধ্যে জুনাইদ ঘুমে বিভোর। এমনি গভীর নিদ্রায় জুনাইদ স্বপ্নে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার লাভ করলেন। তিনি তাকে সম্বোধন করে বলছেন- হে জুনাইদ! আজ তুমি আমার একজন আহলে বাইতের সম্মান রক্ষার্থে যে ত্যাগ ও কুরবানী করেছ, তজ্জন্য তুমি আফসোসকারী ও দুঃখীত হয়ো না। আমি তোমার এ কাজে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এর বদলা হিসেবে তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি এবং আজ থেকে তোমাকে "সাইয়্যিদুত তায়েফা" (অলীগণের সরদার) উপাধিতে ভূষিত করলাম। তুমি একদিকে পাহলোয়ানী সম্মান হারালে আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ হলে। সেই থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী হযরত জুনাইদ বোগদাদীর নাম মানুষের হৃদয়ের রাজ্যে শ্রদ্ধা-ভক্তির আসনে আজও অধিষ্ঠিত।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর আদবের নমুনা

হুজ্জাতুল ইসলাম কাসেম নানুতবী (রহ.) একবার দ্বীনী সফরে ভারতের মুরাদাবাদ এলাকায় আসেন। মাত্র একদিনের প্রোগ্রাম শেষে ফেরার সময় সকলেই আরয করলেন যেন আরও একদিন এখানে অবস্থান করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাযী হলেন না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উলামায়ে কিরাম সকলেই অনুরোধ জানালেন। হযরত তাঁর সিদ্ধান্তে অনঢ়। এদিকে মুরাদাবাদবাসীও নাছোড়বান্দা, যে কোনোভাবেই হোক হযরতকে রাখতেই হবে। তখন এক মুরুব্বী ব্যক্তি পরামর্শ দিলেন, তাঁকে আটকিয়ে রাখার একটি মাত্র পথ আছে। আর তা হলো অমুক অফিসে এক যুবক ছেলে আছে, তাকে দিয়ে যদি সুপারিশ করানো যায় তাহলে মাওলানা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন।

পরামর্শ মোতাবেক ঐ যুবকটিকে ডেকে আনা হলো, হযরত (রহ.) ছেলেটিকে দেখামাত্র তার আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আগত ছেলেটির সঙ্গে দাঁড়িয়ে মুসাফাহা করলেন এবং নিজের আসনে বসিয়ে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নিজে সামনে

বসে পড়লেন। ছেলেটি বললো, হযরত আমার ইচ্ছা ও আগ্রহ, আপনি আরো কিছুদিন এখানে অবস্থান করুন। হযরত নানুতবী (রহ.) বললেন, বহুত আচ্ছা। এই বলে অবস্থান শুরু করলেন। এক সপ্তাহ হয়ে গেল এখন আর ফিরে যাওয়ার নামটিও নিচ্ছেন না। সকলেই চিন্তায় পড়ে গেলেন। এতো বড় মানুষ তাকে এতোদিন ধরে রাখাও ঠিক না। তিনি এখানে থাকলে আমাদের জন্যও সমস্যা। সর্বক্ষণ তার সঙ্গেই সময় দিতে হয়। তখন ওই পূর্বের মুরুব্বী পরামর্শ দিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ যুবকটি যেতে না বলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি যাবেন না। পরিশেষে ওই ছেলেটিকে আনা হলো, তিনি অনুমতি দিলে হযরত রওয়ানা হতে আর দেরী করলেন না।

এর কারণ কী ছিল? কারণ হলো শাইখের নিসবত! হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর পীর ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) এবং তাঁর পীর হযরত হযরত মিয়াঁজী নূর মুহাম্মদ ঝানজানবী (রহ.)। আর ছেলেটি হলো মিয়াঁজী (রহ.)-এর দৌহিত্র। শায়খের নিসবত ও আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি আদব ও সম্মানের কারণে আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমে দ্বীনের কতো বড় কাজ নিয়েছেন। ইসলামী শরীয়তে আদবের মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে এবং তার গুরুত্ব ইসলামে অনেক বেশি। আদবও একটা শিখার বিষয়। সলফে সালেহীনের অবস্থা ছিল, তাঁরা ইলমের আগে আদব শিখতেন এবং শিখাতেন। ইমাম ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন, তাঁরা ইলম যেমন শিক্ষা করতেন, জীবনাচারও তেমন শিক্ষা করতেন।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, আমার আম্মা আমাকে পাগড়ি পরিয়ে ইমাম রাবিয়াতুর রায় (রহ.)-এর নিকট পাঠাতেন এবং বলতেন তাঁর ইলমের আগে তাঁর আদবগুলো শিখে নাও। আজ আমরা হাদীস ও ফিকহের ইলম শিখলে সনদ তালাশ করি। আমাদের আকাবিরদের কাছে আদবেরও সনদ থাকতো। সে সনদ কিন্তু এজাযত দেয়া-নেয়ার সনদ ছিল না। সেটা ছিল আদব শিখে সে আদব নিজের জীবনে বাস্তবায়নের সনদ।

বেআদবীর কারণে ইলমী ফয়েয থেকে বঞ্চিত হতে হয়

হাকীমুল ইসলাম হযরত কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.) বলেন, অনেক আলেম ফাযেলে দেওবন্দ হওয়ার পরও ইলমের খেদমত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। অথচ তারা ছাত্র যমানায় অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ইলম হাসিল করেছেন এবং তাঁরা অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু উস্তাদ সাহেবানের সঙ্গে বেআদবী করেছিলেন। পরিণতিতে তারা কেউ দোকানদার, কেউ ড্রাইভারী করছেন।

মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, মুদাররিস হওয়া তাদের ভাগ্যে জুটেনি। তাছাড়া অনেক কম মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র কিন্তু আদব ও উস্তাদগণের খেদমত এবং দু'আর বরকতে অনেক উঁচুস্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। তারা দ্বীনের এই পরিমাণ খেদমত আন্‌জাম দিয়েছেন যা অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান কামিল ফাযিলগণের দ্বারা সম্ভব হয়নি। কাজেই ইলমের রাস্তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নাজুক। উস্তাদ এবং কিতাবের আদব রক্ষা করা জরুরী।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, আমি উস্তাদকে বাদশাহের মতো ভয় পাই। উস্তাদ-কিতাবের প্রতি আদব, তমীয না থাকার কারণে অনেক তলাবা ইলমের রাস্তায় শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কেউ মেশকাত পর্যন্ত পড়ে, আবার কুরআন শরীফ ২৬/২৭ পারা মুখস্থ করে থেমে যায় আর সামনে এগুতে পারে না। উস্তাদ, কিতাব, শিক্ষার উপকরণাদিকেও সম্মান করা জরুরী। আসল কথা হলো, দ্বীনের ভিত্তি আদব, ভক্তি, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হলো শরীয়তের একটি অধ্যায়। যেখানে আহকাম রয়েছে সেখানে আদব রয়েছে। মানুষ যদি আদব রক্ষা করতে সমর্থ না হয়, তবে সে মূল আহকাম থেকেও বঞ্চিত থেকে যায়। এজন্যেই আদবের প্রয়োজন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (রহ.) তাঁর তাফসীরে ফতহুল আযীযে উদ্ধৃত করেছেন–

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আদব পালনে আলস্য প্রদর্শন করে, সে সুন্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর আমল করতে আলস্য করে, সে ওয়াজিব আদায়ে আলস্য ও উদাসীন থাকায় ফরয থেকে বঞ্চিত হয়ে গোমরাহীতে নিপতিত হয়ে যাবে।

ইসলাম তলোয়ারে নয় আখলাকে ছড়িয়েছে

ইসলামের সোনালী যুগের মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনিত জীবনধারাকে পূর্ণমাত্রায় আপন করে নিয়েছিলেন। তাদের সকলের অবস্থা এই ছিলো যে, আল্লাহর ভয় এবং আখেরাতের বিষয়ের ভাবনা তাদের যিন্দেগীর অন্য সকল বিষয়ের উপর ছিলো প্রবল। তারা প্রতিটি মু'আমালায় নিজেদের মনের চাহিদা অথবা নিজেদের ব্যক্তি লাভ ও সুবিধার পরিবর্তে দেখতেন আল্লাহর হুকুম এবং সীরাতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণমাত্রায় অনুসরণ। সংখ্যা ও অন্যান্য জাগতিক বস্তুগত কোনো সম্পর্কের কারণে নয়, মেধাশক্তির বলে নয়, সংখ্যাধিক্যের কারণে নয়; প্রথম যুগের অল্প সংখ্যক মুসলমানগণের উপর খোদায়ী মদদ-নুসরত ও ইসলামের প্রচার-প্রসার ও বিজয় যে মাত্রায় হাসিল হয়েছিল, তা হয়েছিল আমলে সালেহ

এবং পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুরানী তরীকা অনুযায়ী মানবতার নিষ্ঠাপূর্ণ সেবা এবং রাহনুমায়ীর কারণে। সেই সময়ের পৃথিবীতে তাঁরাই ছিলেন সকলের চেয়ে অনন্য এবং সকলের চেয়ে উন্নত।

অনুপম ধৈর্য্য ও সহনশীলতা

যায়েদ ইবনে সুনা ইহুদীদের বড় পণ্ডিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার কাছ থেকে কিছু গম খরিদ করেছিলেন। চুক্তি ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় মাস পর তার বিনিময়ে খেজুর দিবেন। লেনদেন চূড়ান্ত। ইহুদী পণ্ডিত নির্ধারিত গম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করল। ওয়াদা করল ছয় মাস পর এসে গমের বিনিময়ে খেজুর নিয়ে যাবে। কিন্তু কয়েকদিন না যেতেই পণ্ডিত এসে হাযির। এসে বললো, আমার ঋণ পরিশোধ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ম মতো বলতে পারতেন যে, ভাই চুক্তিতে ছয় মাসের সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে। তুমি তিন দিনের মাথায় এসে হাযির। কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইনের পথে না গিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে বললেন, ভাই এ সময় আমার কাছে তো কিছু নেই। সে বললো, আমি এসব বুঝি না। এক্ষুণি আমার পাওনা পরিশোধ কর। এবারও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনম্রভাবেই বললেন, আমার কাছে কিছু থাকলে তো দিব? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, কমবখত! তুমি ওয়াদা ভঙ্গ করেছো, চুক্তি হয়েছিলো ছয় মাসের। তুমি তো তিন দিনের মাথায় এসে হাযির। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইনের পথে না চলে খুলুকে আযীমের আচরণ করলেন। বললেন, ভাই আমার কাছে এখন কিছু নেই। ব্যবস্থা হলে দিব।

ইহুদী এবার কঠোর আচরণ শুরু করল। বললো, শুধু তুমি না, তোমার পুরো বংশেরই অভ্যাস ছিল ঋণ নিয়ে টাল-বাহানা করা। এছাড়াও আরো নানারকম কঠোর কথা বলতে লাগলো। হযরত উমর (রাযি.) সেখানে উপস্থিত। ইহুদীর অশোভনীয় আচরণ দেখে তিনি রেগে ফেটে পড়ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আবেদন করলেন, অনুমতি দিন এ কাফেরের গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ! আল্লাহর রাসূল ইহুদী পণ্ডিতের উপর রাগ না করে উল্টা হযরত উমর (রাযি.)-এর প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, হে উমর! আমি কিছুতেই আশা করিনি যে, তুমি এমন কথা বলবে। তোমার বরং আমাকে বুঝানো উচিৎ ছিল। আমি তোমার কাছে মানুষের পাওনা সঠিকভাবে পরিশোধ করার নসীহতের মুখাপেক্ষি ছিলাম। এটা না

করে তুমি একে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়ে গেলে। সে তো তার পাওনা চাইতে এসেছে। তুমি তাকে অধিকার চাইতে বারণ করছ। হযরত উমর (রাযি.)বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার কঠোর কথা সহ্য হচ্ছিল না, তাই বলছি। আচ্ছা আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি তার পাওনা শোধ করে দেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, অনুমতি আছে। তবে সে গমের বিনিময়ে যতটুকু খেজুর পাবে, তার চেয়ে বেশি দেবে। কেননা আমরা তাকে পেরেশান করেছি। সে পাওনা চাইতে এসেছে, কিন্তু আমরা সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ করিনি, হযরত উমর (রাযি.) ইহুদীকে নিয়ে গেলেন। নির্ধারিত পাওনার চেয়ে অতিরিক্ত খেজুর দিয়ে তাকে খুশি করলেন। তারপর তার প্রতি গভীরভাবে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি ইহুদী পণ্ডিত যায়েদ ইবনে সুনা? বললো, হ্যাঁ!

হযরত উমর (রাযি.) বললেন, আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে এহেন অশোভনীয় আচরণ করার কী প্রয়োজন ছিল? সে বললো, আমি ইচ্ছা করেই এমনটি করেছি। তার কারণ হলো আমি তাওরাত কিতাবে আখেরী নবীর সকল নিদর্শন এবং স্বভাব-চরিত্র অধ্যয়ন করেছি এবং সবগুলোই পরীক্ষা করে দেখেছি। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, তিনিই তাওরাতে বর্ণিত প্রতিশ্রুত শেষ নবী। তবে একটি গুণ সম্পর্কে যাচাই করা বাকী ছিল। সেটি হলো তার সামনে কেউ যতো বেশি অসদাচরণ করবে তিনি তার প্রতি ততই দয়ার আচরণ করবেন। তাই আমি এ গুণটি পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়ার আশায় ইচ্ছা করে এমন আচরণ করেছি। এখন সুস্পষ্ট হলো যে, তিনিই প্রতিশ্রুত শেষ নবী। আমি তার সঙ্গে সীমাহীন বেআদবী করেছি। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে বিনয়ের আচরণ করেছেন। প্রতিশোধ গ্রহণমূলক কোনো আচরণ করেননি। যেহেতু আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে তাই আমি ঘোষণা দিচ্ছি-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। আমার অঢেল সম্পদ ইসলামের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম।

কী সহনশীলতা ও ধৈর্য্য ছিল রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর! অঙ্গিকার ও চুক্তি ভঙ্গকারীর সঙ্গেও চূড়ান্ত সদাচার ও দয়ার আচরণ করেছেন। যে পরিমাণ ঋণ তার পাওনা ছিল তারচেয়ে বেশি প্রদান করেছেন। নিজে কোনো প্রতিশোধ নেননি। এমনকি অন্যকেউ তার প্রতি কঠোর আচরণ করতে চাইলে অনুমতি দেননি। এই ছিল তার মহান চরিত্রের অনুপম

নিদর্শন। তাঁর এ চরিত্রে মুগ্ধ হয়েই গোটা বিশ্বের অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইসলামী যিন্দেগীর এই নকশা উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সময়ের কালপরিক্রমায় জীবনের এই চিত্রে ব্যবধান ঘটতে শুরু করলো। ক্রমঃঅবনতিশীল উম্মতের ঈমান একীনে এলো দুর্বলতা, আমল আখলাকে ধরলো ভাঙ্গন, মু'আমালাত, মু'আশারাত হয়ে পড়লো অনৈসলামিক, তাহযীব-তামাদ্দুনে ধরলো পচন, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার মুআমালাতেও ব্যবধান এসে গেলো। সারকথা, আল্লাহর মদদের অনুপস্থিতির মূল কারণ হলো আমাদের ঈমান-আমলের বৈপরীত্য। আমাদের সোনালী অতীত পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে ইসলামের চারিত্রিক মাধুর্য্যের গুণে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং বুযুর্গানেদ্বীনের মানব সেবার বলে এবং তাঁদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের বলে। আজ আমরা মানব সেবা ছেড়ে দিয়েছি, নৈতিক বল হারিয়ে ফেলেছি, পূর্ব পুরুষদের সোনালী ইতিহাসও ভুলে গিয়েছি। পক্ষান্তরে আজকে যারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু তারা মুসলমানদের খেদমতে খালক বা পরোপকারিতার অথবা পরোপকারিতামূলক চরিত্রকে গ্রহণ করেছে, বিশেষ করে খ্রিস্টান মিশনারীরা বিভিন্ন প্রকার এনজিও, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আর্তমানবতার সেবার আড়ালে কতো লোককে যে তাদের দ্বীন মাযহাবে দাখিল করছে। তার কোনো ইয়ত্তা নাই।

ইসলামের সৌন্দর্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুরো জীবনটাই ছিল পরোপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যার নযীর খুঁজে পাওয়া যায় না। নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে এবং পরেও মানবসেবা ও সৃষ্টির খেদমত করেছেন, মক্কী জীবনেও খেদমত করেছেন, মাদানী জীবনেও খেদমত করেছেন। নিম্নে মক্কী জীবনের একটি ঘটনা এবং মাদানী জীবনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো–

মক্কী জীবনের একটি ঘটনা

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কার গলিতে প্রত্যুষে বের হয়ে দেখলেন, এক বৃদ্ধা রমণী কতগুলো বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে কোথায় যেন যাচ্ছে। বৃদ্ধার কষ্ট দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিল গলে গেল। আগে বেড়ে বললেন, বুড়ি মা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার তো বড়ই কষ্ট হচ্ছে, আপনার বোঝাগুলো আমাকে দিন, আমি আপনাকে পৌঁছিয়ে দিই। অসহায় বৃদ্ধা এমন সময় এমন সাহায্যকারী পেয়ে কতো যে খুশি হলো তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। খুশিতে বোঝা যুবকের ঘাড়ে দিয়ে বৃদ্ধা তার মনের দুঃখের সব কথা এক এক করে যুবকের কাছে বলতে লাগলো। বৃদ্ধা তার মনের সাধ মিটিয়ে মুহাম্মাদকে গালি দিতে লাগলো, মুহাম্মাদই ঘরে ঘরে বাপ-বেটায়, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে। মুহাম্মাদ লোকটি ভালো লোক ছিল, কেমন করে তার এরূপ মাথা খারাপ হল? তার উৎপাত আর সহ্য করা যায় না। বাপ-দাদার ধর্মের নিন্দা আর বরদাশত করা যায় না। সেই জন্য বাবা আমি মনস্থ করেছি এদেশে আর থাকবো না। এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বুড়ির খবর ছিল না সে যতো কুৎসা করছে, যতো গালি দিচ্ছে, চরম সঙ্কট মুহূর্তে বিপদের সাথী বোঝা বহনকারী খোদ মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুৎসাই সে বর্ণনা করছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের পাহাড়। তিনি নীরবে সব গালি-গালাজ শুনছেন আর বোঝা নিয়ে বুড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছেন। বুড়ি যখন তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল তখন বুড়ি জিজ্ঞাসা করলো

বাবা তুই কে? তুই আমার যে উপকার করলি এমন তো কারোর পেটের সন্তানও করে না! তখন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মা আমিই সেই মুহাম্মাদ যার সম্পর্কে আপনি এতো কিছু বলেছেন।

বুড়ি এই বাক্য শুনে হতবাক হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং বলতে লাগলো যে, বাবা তুমি মানুষ না দেবতা? না তুমি ফেরেশ্‌তা? তোমার মতো ফেরেশ্‌তা-খাসলত লোকের বিরুদ্ধে লোকেরা আমার কাছে এতো মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছে। বাবা আমি এখনি তোমার কালিমা পড়ছি। তোমার ধর্মই সত্য। আমাকে তোমার ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

মাদানী জীবনের একটি ঘটনা

একদা একদল লোক এসে মদীনায় মেহমান হল। দলের মধ্যে একজন লোক ছিলো অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির। সাহাবীগণের নিয়ম ছিল তারা মেহমানদেরকে ভাগ করে এক দুইজন করে নিজেদের ঘরে নিয়ে যেতেন। অন্যান্য মেহমানদের তারা নিয়ে গেলেন কিন্তু দুষ্টু প্রকৃতির লোকটিকে কেউ নিল না। সে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এখানেই থেকে গেল। দুষ্ট প্রকৃতির লোকটি খানা খাওয়ার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে বেশি খানা খেল, যাতে হযরতের ঘরের লোকদের খানা শেষ হয়ে যায়। খানা খাওয়ানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেহমানকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। দুষ্ট প্রকৃতির লোকটি পেটে বদ হজমীর কারণে মল-মূত্রের দ্বারা বিছানা-কাপড় নষ্ট করে রেখে অন্ধকার থাকতেই পালিয়ে গেল। সকালে হযরত এসে বিছানা নষ্ট দেখে বলতে লাগলেন যে, না জানি রাত্রে আমার মেহমান কতো কষ্ট পেয়েছে। এই আফসোস প্রকাশ করে হযরত নিজ হাতে এইসব ময়লা সাফ করতে গেলেন, নিজ হাতে বিছানার কাপড় ধুতে লাগলেন। সাহাবী (রাযি.) গণ কিছুতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেহমানের মল-মূত্র ধুইতে দিবেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, না আমার মেহমান আমারই ধোয়া উচিত, মেহমানের খেদমত আমারই কর্তব্য। নতুবা অন্য কেউ এ খেদমত করে দিলে যখন মেহমান জানতে পারবে তখন সে অপেক্ষাকৃত বেশি লজ্জা পাবে এবং মনে বেশি কষ্ট পাবে। সুতরাং বিছানা কাপড় তোমরা কেউ ধুবে না; বরং আমিই ধুবো।

ঘটনাক্রমে মেহমান ভুলে তার তরবারী রেখে গিয়েছিল। তরবারীর মায়া পরিত্যাগ করা সহজ ছিল না। সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে তরবারীর তালাশে এমন সময় এসে উপস্থিত হলো যখন উপরোক্ত আলাপ আলোচনা চলছিল। লোকটি

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন আখলাক দেখে আর ঠিক থাকতে পারেনি। তার পাথর দিল গলে মোম হয়ে গেল। কঠোরতার সামনে পাথর গলে না। কোমলতার সামনে অনেক সময় পাথর গলে যায়। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো এবং উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে বলতে লাগলো, আপনি সত্য নবী, আপনার ধর্ম সত্য, আমাকে আপনার কালিমা পড়ান, আমাকে আপনার ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করুন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'।

মানবসেবায় খলীফাতুল মুসলিমীন

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাযি.) তখনও খলীফা হননি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) ছিলেন খলীফা। মদীনার এক প্রান্তে এক অন্ধ বুড়ির বাড়ি। হযরত উমর ফারুক (রাযি.) খেদমতের তালাশে বুড়ির বাড়িতে পৌঁছলেন। রোজ হযরত উমর ফারুক (রাযি.) নির্দিষ্ট সময়ে বুড়ির বাড়িতে আসতেন। কিন্তু এসে দেখতেন যে, কে যেন আগেই বুড়ির সব কাজ করে ফেলেছে। বুড়ির বাজার-সদায় করে দেয়া, লাকড়ি কেটে দেয়া, খানা পাকিয়ে দেয়া, পানি এনে দেয়া, ঘর ঝাড়ু দিয়ে দেয়া, বিছানা কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেয়া এবং তা মাঝে মাঝে রোদে শুকাতে দেয়া, উযূ-গোসলের পানির ব্যবস্থা করে দেয়া, এমনকি বৃদ্ধ বয়সে ঘরে পেশাব-পায়খানা করে রাখলে তাও পরিষ্কার করে দেয়া ছিল বুড়ির বাড়ির কাজ। কিন্তু হযরত উমর ফারুক (রাযি.) এসে রোজই দেখতেন কে যেন তার আগেই এসে সব কাজ করে চলে গেছেন। বুড়ি জানে না কে এসে সব কাজ করে চলে যায়। স্বয়ং খলীফা এসে সব কাজ করে চলে যান– কেউ ভাবতেও পারে না।

কিন্তু যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাযি.) ইন্তেকাল হয়েছে, সেদিন যখন হযরত উমর ফারুক (রাযি.) বুড়ির বাড়িতে গেলেন, তখন দেখেন যে, আজ আর কেউ বুড়ির কাজ করে দিয়ে যায়নি। তখন হযরত উমর ফারুক (রাযি.) বুঝতে পারলেন যে, স্বয়ং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) এসে বুড়ির খেদমত করে দিয়ে যেতেন তখন বড় আক্ষেপ করে হযরত উপম (রাযি.) বললেন, জীবনে কোন ক্ষেত্রে হযরত আবূ বকরের সাথে প্রতিদ্বন্দীতায় জিততে পারিনি, এখানেও পারলাম না। তাঁর কাছে হেরে গেলাম। হযরত উমর ফারুক (রাযি.)ও তারপর বুড়ির বাকি জীবন পর্যন্ত তার খেদমত করতেন। তাছাড়া রাত্রে গাশত (ঘুরাফিরা) করে দুস্থ জনগণের খবরা-খবর নেয়া হযরত উমর ফারুক (রাযি.)-এর অভ্যাস ছিল, সে কথা সকলেরই জানা আছে।

জীবন সায়াহ্নে সহানুভূতি ও হামদর্দীর বিরল দৃষ্টান্ত

হযরত আবু যাহম ইবনে হুযাইফা (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমি ইয়ারমুকের যুদ্ধে আপন চাচাত ভাইয়ের তালাশে বের হলাম। তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সঙ্গে এক মশক পানি নিয়ে গেলাম। যাতে ময়দানে কেউ পিপাসার্ত থাকলে পান করাতে পারি। তালাশ করে তাকে এক স্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলাম। তার মৃত্যুর যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এক ঢোক পানি দিবো কি? সে ইশারায় হ্যাঁ বললো। এমন সময় তাঁর নিকটবর্তী মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর পড়ে থাকা আরেক ব্যক্তি আহ্ করে উঠল। আমার চাচাত ভাই তাঁর আওয়ায শুনে আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার ইশারা করল। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে গেলাম। তিনি ছিলেন হিশাম ইবনে আবিল আস (রাযি.)। তাঁর নিকট পৌঁছামাত্রই মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর পড়ে থাকা তৃতীয় আরেক ব্যক্তি আহ্ করে উঠল। হিশাম আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার জন্য ইশারা করলেন। তাঁর নিকট পৌঁছে দেখি তিনি আর ইহজগতে নেই। এরপর হিশামের নিকট ফিরে এসে দেখলাম। তিনিও ইহজগত ত্যাগ করেছেন। তারপর আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট এলাম ইত্যবসরে সেও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন। এ ধরনের বহু ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত রয়েছে। এ আত্মত্যাগের কি কোনো সীমা আছে যে, আপন ভাই মরণাপন্ন আর পিপাসায় কাতর, এমতাবস্থায় অন্য কারো প্রতি লক্ষ্য করা তো কঠিন ব্যাপার! তদুপরি তাকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রেখে অন্যকে পানি পান করানোর জন্য চলে যাওয়া, আল্লাহ এ সকল প্রাণ-বিসর্জনকারীদের রূহকে অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা সম্মানিত করুন। ইসলামের উন্নতির যুগে সকল শ্রেণী উন্নত আখলাক ও সহমর্মিতার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সাধারণতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে যার যার-তার তার নফছি নফছি মনমানসিকতা খুব বেড়ে যায়। বিশেষত মরণ যন্ত্রণার সময় অন্য কারো কথা মনেই থাকে না। উল্লিখিত সেই সোনালী যুগের সাধারণ-অসাধারণ সবার চরিত্র উন্নত ছিল।

মানব সেবায় নিকট অতীতের আকাবিরে দ্বীন

হযরত মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্দলবী (রহ.)

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন বুর্যূগ ছিলেন মাওলানা মুজাফ্ফার হুসাইন কান্দলবী। এক দুপুরে তিনি দিল্লী থেকে বাড়িতে আসছিলেন। পথে দেখেন যে, এক বৃদ্ধ একটি লাকড়ির বোঝা অতি কষ্টে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। মাওলানা সাহেব আগে বেড়ে বৃদ্ধকে বললেন, বড় মিয়া, আপনার বোঝাটি আমাকে দিন, আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে। বৃদ্ধ বললেন, না বাবা! আল্লাহ তোমার হায়াত দারায করুন। তোমাকে ভালো মানুষের ছেলের মতো দেখা যাচ্ছে। তোমাকে কষ্ট দেব না। আমার বোঝা আমিই বয়ে নিব।' মাওলানা সাহেব বললেন, না বড় মিয়া, আপনি বৃদ্ধ, আমি যুবক, আপনার সাহায্য করা আমার কর্তব্য। আমাকে দেন। এই বলে মাওলানা সাহেব বৃদ্ধের থেকে বোঝাটি নিজের মাথায় নিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে বৃদ্ধের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। মাওলানা সাহেব একটুও লজ্জাবোধ করলেন না। শেষে যখন বৃদ্ধ জানতে পারলেন, ইনি বড় একজন বুর্যূগ আলেম, তখন বৃদ্ধ ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন কিন্তু মাওলানা সাহেব বলতে লাগলেন, বাবা আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, আপনি কোনো অন্যায় করেননি।

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.)

মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)-এর বাড়িতে একজন হিন্দু মেহমান হয়েছিলেন। মাওলানা সাহেব নিজ হাতে হুক্কা সাজিয়ে মেহমানকে খাইয়েছেন, নিজ হাতে সেই মেহমানের পা টিপে দিয়েছেন এবং মেহমানকে পাখা দিয়ে বাতাস করে দিয়েছেন।

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)

মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) একদিন রেল গাড়িতে কোথাও যাচ্ছিলেন। একজন যাত্রীর টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু লোকেরা টয়লেটকে নোংরা করে রেখেছে, তাই যাত্রী পায়খানার দুরাবস্থা দেখে

ফিরে এলো। মাওলানা এ অবস্থা টের পেয়ে নিজে উঠে গেলেন এবং পায়খানার দরজা বন্ধ করে নিজ হাতে সমস্ত পায়খানা পরিষ্কার করে ফিরে এসে বললেন- সাহেব এখন যান, আমি দেখে এসেছি, কে যেন পায়খানা পরিষ্কার করে রেখে গেছে। মাওলানা সাহেব অপরিচিত যাত্রীর উপকারের জন্য ময়লা সাফ করতে গিয়ে একটুও লজ্জা, অপমান বা হীনতা বোধ করেননি।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী (রহ.)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (রহ.)-এর নিকট বেদআতী ফকীরের একদল লোক মেহমান হয়েছিলেন। ফকীরদের সঙ্গে ছিল ডোম, মেথর যারা ফকীরদের খেদমতে নিয়োজিত ছিল।

মাওলানা সাহেব ওই সব মেথরদের খেদমত করেছেন নিজ হাতে। তাতে তিনি একটুও সংকোচবোধ করেননি। তিনি নিজ হাতে শিয়া মুজতাহিদদের হুক্কা সাজিয়ে দিয়েছেন। তাদের গা, পা টিপে মেহমানের হক আদায় করেছেন। তিনি মাওলানা হিসেবে তাতে একটুও সম্মানের হানিবোধ করেননি।

এই ধরনের আখলাক, এই ধরনের খেদমতে খালকের জযবা আবার যেদিন আলেম সমাজে এবং মুসলিম সমাজে জাগবে, সেই দিন আবার মুসলিম জাতির উন্নতি ও মর্যাদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আজকের ইউরোপ আমেরিকা মুসলমানদের আখলাক থেকে গ্রহণ করে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে

তখনকার ইউরোপ আমেরিকা আজকের মতো এতো প্রসিদ্ধ ছিল না। সারা পৃথিবীতেই ইসলামের জয় জয়কার ছিল। সেই দিনে মুসলমানদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সমস্ত বিধর্মীদের অন্তরকেও প্রভাবিত করেছিল। মুসলমানদের এই প্রভাব প্রতিপত্তির মূল কারণ কী ছিল? বিষয়টি গবেষণা ও তত্ত্ব উৎঘাটনের জন্য তৎকালীন আমেরিকার শাসকগোষ্ঠী একটি টিম পাঠাল মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী বাগদাদ শহরে। রমযান মাস আসরের পর ইফতারের পূর্বে তারা কিছু দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্য একটি দোকানে গেল। দোকানের সওদা পসন্দ হলো, দাম ঠিক হলো। কিন্তু দোকানদার খরিদ্দারকে অনুরোধ জানাল আপনি ঠিক একই জিনিস একই দামে আমার পার্শ্ববর্তী দোকান থেকে নিয়ে যান। খরিদ্দার গোয়েন্দা অবাক হয়ে গেলেন, ব্যাপার কি? নিজের দোকানের খরিদ্দার অন্যের দোকানে দিয়ে দেয়া এতো কোনোদিন দেখিনি! ভাবতেও পারিনি। না

জানি-এর মধ্যে কী হেকমত আছে। প্রশ্ন করে জানতে চাইলেন আপনার খরিদ্দার অন্য দোকানে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি? দোকানদার বললেন, অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। এটি সম্পূর্ণ সহায়তামূলক। আলহামদুলিল্লাহ! আজকে আমি যথেষ্ট বেচা-কেনা করেছি। রমযান মাসে সাধারণতঃ আসরের পর দোকান বন্ধ করে চলে যাই। কিন্তু আজকে লক্ষ্য করেছি, আমার পার্শ্ববর্তী দোকানদারের দোকানে কোনো বেচা-কেনা হয়নি। শুধু এই জন্য এ সময় দোকান খোলা রেখেছি। আমার দোকানে যতো খরিদ্দার আসবে সব ঐ দোকানে পাঠিয়ে দিব। এ জন্যই আপনাকে এ অনুরোধ করছি। আমাদের ধর্ম সমাজব্যবস্থাকে এরূপ সহমর্মিতা ও সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। অনুসন্ধিৎসু টিম বললেন, যেই রহস্য উৎঘাটনের জন্য এ দেশে আমাদের আগমন তা আমরা পেয়ে গেছি। যে জাতির ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে এতো হামদর্দী ও সহানুভূতি বিরাজ করে সে জাতির উন্নতির পথ কে রোধ করতে পারে? এটাই তাদের উন্নতির মূলমন্ত্র। ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। নিজের স্বার্থকেই সবচে বড় চোখে দেখে থাকে। কিন্তু ইসলামী আখলাক তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কতো হৃদ্যতা এবং দায়িত্বশীল করে তুলেছে।

সৃষ্টির সেবার সুফল

মাখলুকের খেদমতের সুফল মানুষ দুনিয়াতেও ভোগ করে, আখেরাতেও ভোগ করবে। এই খেদমতই কখনও তার নাজাতের উসীলা হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নে কয়েকটি নসীহতপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে-

জনৈক বুযুর্গের ইন্তিকালের পর তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বপ্নে তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহপাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ক্ষমার কারণ হিসেবে এ-ঘটনাটি উল্লেখ করেন। একদা শীতের রাতে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তায় একটি বিড়াল ছানা দেখতে পেলেন, বিড়াল ছানাটি ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভিজে থর থর করে কাঁপছিল। বিড়াল ছানাটির প্রতি তাঁর দয়া হলো, তিনি এটাকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজ গৃহে এনে লেপের নিচে আশ্রয় দিলেন। ঐ বুযুর্গের ইন্তিকালের পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বল, আমার জন্য কি নিয়ে এসেছ? তিনি চিন্তা করলেন, আমার তো পেশ করার মতো কোনো আমল নাই, তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমার ঈমানের দৌলত বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানো এ জাতীয় কোনো কিছুই থাকার অবকাশ নেই। তাই তাওহীদকেই পেশ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিবেদন করলেন, আমি তাওহীদ নিয়ে এসেছি। এতে ইরশাদ হলো, اَتَذْكُرُ لَيْلَةَ اللَّبَنِ "দুগ্ধ সংক্রান্ত রজনীর কথা কি

তোমার মনে পড়ে? "তুমি একদা দুধ পান করার পরে পেটে ব্যথা অনুভব করায় বলেছিলে, "দুধ পেটে ব্যথার সৃষ্টি করেছে।" এটাই কি তাওহীদের নমুনা? ব্যথাকে দুধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছ এবং আমাকে বাদ দিয়ে দুধকে রোগদানের উৎস স্থির করেছ। অথচ আমিই হচ্ছি সকল কার্যের প্রকৃত উৎস। তখন ওই বুর্যূগ থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ইরশাদ হলো, তুমি তো তোমার দাবির সারবত্তা দেখলে। এখন আমি তোমাকে এমন একটি আমলের কারণে ক্ষমা করে দিচ্ছি যা সম্বন্ধে তোমার ধারণাও ছিল না যে, তা নাজাতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তুমি কোনো এক রাত্রে একটি বিড়াল-ছানার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছিলে। তুমি দয়াপরবশ হয়ে সেটাকে তুলে এনে নিজের লেপের নীচে রেখেছিলে। তুমি আমার সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছ। আমি তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করার অধিক দাবিদার। যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।–আল্লাহর স্মরণের মাহাত্ম্য পৃঃ ৮, ৯

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক তাঁর একটি নগণ্য মাখলুকের খেদমত করাকে বান্দার নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিলেন।

জনৈক পতিতার মাগফেরাতের ঘটনা

বুখারী শরীফে জনৈকা পতিতার সম্বন্ধে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা দুপুর বেলা সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে কুপের কিনারার মাটির আর্দ্রতা চাটছে। এতে তার মনে দয়ার উদ্রেক হল। কিন্তু পানি উঠানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। অগত্যা সে নিজের দো-পাট্টাকে রশি বানাল এবং চামড়ার মোজাকে বালতি বানিয়ে পানি উত্তোলন করতঃ ঐ কুকুরকে পান করাল। কিছুদিন পর সে মারা গেল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই কাজের জন্যই ওই রমণীর মাগফিরাত হয়েছিল। বাস্তবিকই সত্য-

رحمت خدا بہانہ می جوید + رحمت حق بہا نمی جوید

"আল্লাহ পাকের রহমত (মাগফিরাত করার জন্য) উযূহাত তালাশ করে, কোনো মূল্যের অভিলাষী হয় না।"

একটি অসুস্থ কুকুরের সেবা দানের পুরস্কারস্বরূপ যুগশ্রেষ্ঠ বুর্যূগ হযরত আহমাদ কবীর রেফায়ী (রহ.)-কে তরীকতের সবক প্রদান

আধ্যাত্মিক জগতের মহান সম্রাট সাইয়েদ আহমাদ কবীর রেফায়ী (রহ.) সমকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ বুর্যূগ ছিলেন। এই অনন্য সাধারণ বুযুর্গের জীবন অসংখ্য

কারামত ও বুর্যূগীতে ভরপুর। ৫৫০ হিজরী সনে হজ্ব মুবারক সম্পন্ন করে কাফেলাসহ মদীনা মুনাওয়ারার পথে রওয়ানা হন। পবিত্র মদীনা শরীফের সীমানায় পৌছেই তিনি পায়ের জুতা খুলে অতি আদব ও ইহতেরামের সঙ্গে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা আতহারে হাযির হয়ে এভাবে সালাম আরয করলেন "হে নানাজী, আপনার প্রতি সালাম", সঙ্গে সঙ্গে রওযা আকদাস থেকে সালামের উত্তর আসলো- "হে আমার সন্তান! তোমার প্রতি সালাম"। সালামের জবাব শুনে তিনি অধিক আবেগে আপ্লুত হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। উপস্থিত সকলেই সালাম আদান-প্রদানের বিষয়টি শুনতে পান। চৈতন্য আসার পর গভীর প্রেম মত্ততায় নিম্নের কবিতাসমূহ আবৃতি করতে থাকেন।

فِيْ حَالَةِ الْبُعْدِ كُنْتُ رُوْحِيْ اُرْسِلُهَا + تُقَبِّلُ الْاَرْضَ عَنِّيْ وَهِيَ نَائِبَتِيْ

وَهٰذِهٖ دَوْلَةُ الْاِشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ + فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تُحْظٰى بِهَا شَفَتِيْ

অর্থ- দূরে অবস্থানকালে আপনার দরবারে আমার রূহকে পাঠিয়ে দিতাম, যেন সে আমার পক্ষ থেকে আপনার কদমবুচি করে যায়।

এবার স্বশরীরেই আমি আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। সুতরাং আপনার মুবারক হাত বাড়িয়ে দিন যেন আমার ঠোঁট আপনার মুবারক হাত চুম্বন করার সৌভাগ্য লাভ করে।

কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে রওযা মুবারক থেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাত মুবারক বের করে দেন, তিনি হাত মুবারক চুম্বন করে মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হন এবং উপস্থিত সকলেই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাত মুবারক যিয়ারত লাভে ধন্য হন।

অসংখ্য কারামতের অধিকারী আধ্যাত্মিক জগতের মহান সম্রাট সাইয়েদ আহমাদ কবীর রেফায়ী (রহ.) একদিন বাজারে যাচ্ছিলেন, পথে একটি অসুস্থ কুকুর দেখতে পান। কুকুরটি এতোই রোগাক্রান্ত ছিল যে, সমস্ত শরীর ঘা হয়ে পঁচন ধরে গেছে। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অচেতন অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে ছিল। হযরত রেফায়ী (রহ.) কুকুরের এ দূরাবস্থার প্রতি সদয় হয়ে নিজ ঘরে তুলে নিয়ে যথাযথ চিকিৎসা শুরু করেন। নিজ হাতে কুকুরটির পরিচর্যা করেন। নিজ হাতে কুকুরের ঘায়ে নিজেই ঔষধ লাগিয়ে দিলেন। এভাবে কয়েক মাস নার্সিংয়ের পর কুকুরটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে। এর কিছুদিন পর হযরত রেফায়ী (রহ.) কোথাও

যাচ্ছিলেন। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। ফসলী জমির আইলের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। সরু পথের দুই ধারেই ছিল কর্দমাক্ত জমি। আইল দিয়ে পথ চলার সময় মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছার পর দেখলেন আইলের (রাস্তার) বিপরীত দিক থেকে একটি কুকুর একেবারে সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তাটি এতোই সরু পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো একজনকে সরু রাস্তা ছেড়ে কাদায় নামতে হবে। প্রশ্ন দেখা দিল, এখন কে কাদায় নামবে রেফায়ী? না কুকুর? উভয়ের কেউই নামতে রাজি নয়। হযরত রেফায়ী (রহ.) কুকুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি নিচে নেমে দাঁড়াও। আমাকে রাস্তা পার হতে দাও। কুকুরটি বললো, আমি নিচে নামবো কেন? তুমি এতো বড় আল্লাহর ওলী, সারা পৃথিবীতে তোমার খ্যাতি। যারা ওলী-বুর্যূগ হয় তাদের আখলাক হলো, অন্যকে নিজের উপর প্রধান্য দেয়া। তুমি কেমন অলি? আমাকে কাদায় নামতে বলছো, তুমি নামছো না কেন? হযরত রেফায়ী (রহ.) বললেন, দেখ তোমার-আমার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। আমাকে নামায পড়তে হয় কিন্তু তোমার কোনো নামায নেই। আমি যদি কাদায় নামি আমার শরীর নাপাক হয়ে যাবে। গোসল করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি নাম তোমার শরীর নাপাক হবে না, গোসল করতে হবে না। এজন্যই তোমাকে নামতে বলছি। কুকুরটি হযরত রেফায়ী (রহ.) কে বললো– বাহ! খুব চমৎকার কথা বলছেন। কাপড় নাপাক হয়ে যাবে। জনাব যদি আপনার কাপড় নাপাক হয়ে যায়, তাহলে তার ব্যবস্থা অতি সহজ- ধুয়ে ফেললেই তো পাক হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি নিচে নেমে দাঁড়াই তাহলে আপনার অন্তর নাপাক হয়ে যাবে। আপনার মনে এ ভাবনার উদয় হবে, কুকুর তো হলো নিকৃষ্ট প্রাণী। আমি হলাম আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ; যদি আপনার অন্তরে এ ধারণার উদ্রেক হয় তাহলে তা আপনার অন্তরকে এমনভাবে নাপাক করে ফেলবে যা পরিষ্কার করার কোনো উপায় থাকবে না। তাই অন্তর নাপাক করার চাইতে কাপড়-শরীর নাপাক করা ভালো। সুতরাং আপনি নিচে নেমে পড়ুন।

কুকুরটির এ ধরনের তত্ত্বপূর্ণ কথা শুনে আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.) হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং বললেন, তুমি ঠিকই বলছো। কাপড় ধোয়া যাবে, অন্তর ধোয়া যাবে না। এ কথা বলে হযরত কাদায় নেমে পড়লেন। কুকুরকে পথ করে দিলেন। কুকুরের সঙ্গে এ ঘটনার পর হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী (রহ.)-এর প্রতি ইলহাম হলো, হে আহমদ কবীর! আমি তোমাকে এমন এক ইলম দান করলাম যার মর্যাদা অন্য সকল ইলম থেকে ঊর্ধ্বে। আর তোমার এ নিয়ামত লাভ করার উসীলা হলো কিছুদিন পূর্বে একটি রুগ্ন অসুস্থ কুকুরকে সেবা করে সুস্থ করে

তুলেছিলে। আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি সহমর্মিতা প্রর্দশন করেছিলে, তার প্রতিদানের বদলা হিসেবে আজকে একটি কুকুরের মাধ্যমেই তোমাকে ইলমে লাদুন্নী দান করলাম। আর খেদমতে খালকের মাধ্যমেই এ অমূল্য সম্পদ হাসিল হয়েছে।

বিড়াল ছানাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি

মাখলুকের খেদমত করা, সৃষ্টির প্রতি দয়া করা যেমন দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বয়ে আনে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়, নাজাত ও মুক্তির কারণ হয় তেমনি মাখলুকের খেদমতের প্রতি অবজ্ঞা করা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করা আল্লাহ পাকের নারাজী ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হাদীস শরীফে এ ধরনের অনেক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার সামনে জাহান্নামকে পেশ করা হলো। আমি সেখানে বনী ইসরাঈলের এক মহিলাকে দেখলাম তাকে আযাব দেয়া হচ্ছে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে কষ্ট দেয়ার কারণে। বিড়ালটিকে এই মহিলা বেঁধে রেখেছিল। তাকে কোনো ধরনের খাদ্যও দেয়নি। আবার ছেড়েও দেয়নি। ছেড়ে দিলে হয়তো জমিনের কীট-পতঙ্গ খেয়ে বিড়ালটি জীবন ধারণ করতো। আর এভাবেই বিড়ালটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। -মেশকাত, ২/৪৫৬

প্রাথমিক যুগে খুলাফায়ে রাশেদীনই ছিলেন সবচেয়ে বড় লায়েক এবং বড় বুর্যূগ এবং তাঁরাই সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের পায়রবী করতেন এবং তাঁরাই সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন। পরের খলীফাদের চরিত্রে অন্য জিনিস ঢুকে গেছে। অথচ সবচেয়ে বেশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকীদ করে বলে গিয়েছেন খেদমতে খালকের কথা –

سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي السَّفَرِ خَادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلٍ إِلَّا الشَّهَادَةُ

সফরে কওমের নেতা সেই হবে যে কওমের খেদমত করবে। খেদমতের কাজে যে অগ্রণী হবে তার মর্তবার চেয়ে বড় মর্তবা হাসিল করার জন্য অন্য কোনো আমল নেই। একমাত্র জিহাদে শহীদ হওয়া ব্যতীত।

-শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৮০৫০

বলাবাহুল্য যে, এই খেদমত স্বার্থ প্রণোদিত খেদমত নয়, ভোট পাওয়ার

আশায় বা আমার বিপদের সময় সে আমার উপকারে আসবে– এই আশায় যে খেদমত করা হয় সে খেদমতের জন্য এই ফযীলত বর্ণনা করা হয়নি। এই ফযীলত সেই খেদমতের জন্য, যে খেদমতের মধ্যে আল্লাহর মাখলুকের খেদমত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা ব্যতীত আর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। এই জন্যই তো পরবর্তী যুগে তরীকতের প্রধান মাশায়েখগণ আপন মুরীদগণকে খেদমতে খালকের মশক করিয়েছেন। খালেস নিয়্যতে খেদমত করার অভ্যাস করিয়েছেন।

শায়েখ সাদী বলেছেন,

طریقت بجز خدمت خلق نیست * بہ تسبیح وسجادہ ودلق نیست

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে খেদমতে খালকের রিয়াযত করতে হবে। নতুবা শুধু তালি দেয়া কাপড় পরলে, লম্বা তাসবীহ হাতে রাখলে বা জায়নামায কাঁধে করে বেড়ালে সুফী হওয়া যায় না। তার দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে না।

এই ধরনের সর্বস্বীকৃত বাক্যরূপে তরীকতে আরো অনেক কথা মশহুর আছে–

ہر کہ خدمت کرد او مخدوم شد

যে খেদমত করে সে খেদমত পায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য খেদমত এমন জিনিস যে বিধর্মীরাও যদি খেদমত করে তাহলে দুনিয়ার তরক্কী লাভ হবে কিন্তু ঈমান না থাকার কারণে তারা আখেরাতে কোনো কিছু পাবে না। পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ খেদমত করলে দুনিয়াতে তাদের উন্নতি হবে আর আখেরাতের সওয়াবও তারা পাবে। এই জন্যই সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) নাসারাদের সম্পর্কে বলেছেন–

১. তারা বড়ই ধৈর্যশীল।
২. তারা বড়ই অধ্যবসায়ী।
৩. তারা একবার অকৃতকার্য হয়ে বসে থাকে না। কৃতকার্য হওয়ার জন্য পুনরায় চেষ্টা করে।
৪. ইয়াতীম, বিধবা এবং দুস্থ মানবতার সেবা করে।
৫. তারা জালিম বাদশার জুলুম থেকে জনগণকে রক্ষা করে।

এই কাজগুলো জনসেবা ও খেদমতে খালকেরই কাজ। এর কারণে তাদের দুনিয়াতে তরক্কী হয়। যখন মুসলমান খলীফাগণ এই কাজ করতেন তখন মুসলমানগণেরই তরক্কী ছিল। তাদেরই প্রাধান্য ছিল।

এখন মুসলমান রাষ্ট্রপতিগণ বিলাস ব্যসনে, খামখেয়ালিতে মত্ত হয়ে আছে। এই জন্য মুসলমানদের তরক্কী হচ্ছে না। -সহীহ বুখারী ৩৩০

মাজলুমকে সাহায্য করা

● হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলুমকে সাহায্য করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

-সহীহ বুখারী ৩৩১

মজলুম ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না

● হযরত ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুয়ায (রাযি.)-কে ইয়ামানের গভর্ণর করে পাঠানোর সময় বিশেষ কয়েকটি অসিয়্যত করেছিলেন, তার মধ্যে এ বিষয়টিও ছিল যে, মজলুমের বদদু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ তার ও আল্লাহ তা'আলার মাঝে কোনো পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা থাকে না অর্থাৎ তার দু'আ শর্তহীনভাবে কবূল হয়।-বুখারী পৃ. ৩৩১

সঙ্গীদের খেদমত করা নফল ইবাদত থেকে উত্তম

হযরত আবু ক্বিলাবাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে সাহাবীদের একটি দল তাদের এক ব্যক্তির ব্যাপারে উচ্চ প্রশংসা করতে লাগলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তার মতো আর দেখিনি, কোনো স্থানে যাত্রা বিরতি হলে নামায এবং ভ্রমণকালে তিলাওয়াত ও বিরামহীন রোযা রাখে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তার অমুক কাজ কে করে দিতো? তারা বললেন, আমরা। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা প্রত্যেকে তারচেয়ে উত্তম।

সঙ্গীর কাছে সর্বোত্তম আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সঙ্গীদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সে, যে তার সঙ্গীদের কাছে সর্বোত্তম এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম সে, যে তার প্রতিবেশীদের কাছে সর্বোত্তম।

খেদমতের আদব

১. কিছু কিছু খেদমত এমন রয়েছে যা কোনো কোনো ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করার বিষয়টি পসন্দ করেন না। সুতরাং এ ধরনের খেদমত করার জন্য পীড়াপীড়ি না করা। যার দ্বারা মাখদুমের কষ্ট হয়। আর এ বিষয়টি তাঁর প্রকাশ্যে নিষেধ করার দ্বারা বোঝা যায়। আবার কখনো ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা বুঝে নিতে হয়।

২. যদি কোনো মুরুব্বী কাউকে কোনো কাজের আদেশ দেন তাহলে কাজ সম্পাদনকারীর জন্য জরুরী হলো কাজটি পূর্ণ করে অবগত করানো। কেননা অধিকাংশ সময় তিনি তার অপেক্ষায় থাকেন।

৩. প্রথম সাক্ষাতেই শায়েখের শারীরিক খেদমত করা ঠিক নয়। কেননা এটা অনেক সময় বোঝা মনে হয়। যদি খেদমতের আগ্রহ থাকে তাহলে প্রথমে শায়খের সঙ্গে বেতাকাল্লুফী (লৌকিকতা মুক্ত) অবস্থা তৈরি করবে, তারপর খেদমত করবে।

খেদমতের তিনটি শর্ত

হযরত মুহিউস সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.) বলেন, খেদমতের উদ্দেশ্য হলো আরাম পৌছানো, তাই খেদমতের জন্য শর্ত হলো তিনটি।

১. নিয়্যতকে খাঁটি করা। অর্থাৎ এ সময় খেদমতের দ্বারা দুনিয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। শুধু মুহাব্বতের কারণে হবে। অধিকাংশ মানুষ খেদমতকে প্রয়োজন পেশ করার মাধ্যম বানায়। এমনকি ইশার পর আমি কিছু সময় শুয়ে থাকি। আর তালেবে ইলমরা আমার শরীর দাবাতে থাকে। যেহেতু দাবানোর দ্বারা শরীরে আরাম পাওয়া যায় তাই আমার চোখ তখন বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। যখন আমার চোখ বুজতে থাকে তখন খাদেমদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠলো আমার কিছু জিজ্ঞাসা রয়েছে। এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা অন্যদের উপর বদ-গুমানী আসে। তাই আমি জিজ্ঞাসা করে নেই, কে কে খেদমত করার ইচ্ছা করছো? তখন দুই চার জন তালেবে ইলম ছাড়া বাকীদেরকে সরিয়ে দেই।

২. যে খেদমত করবে, যার খেদমত করা হবে দিলের দিক দিয়ে তার সঙ্গে মিল থাকতে হবে।

৩. খেদমত সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যেমন অনেকেই শরীর দাবাতে পারে না। তখন তাকে নিষেধ করা যাচ্ছে না। সে মনে করছে সে আমার খেদমত করছে আর আমি মনে করছি আমি তার খেদমত করছি কারণ, তার খেদমতে আমার কষ্ট হওয়ার পরও আমি তাকে কিছু বলছি না। সে ভাবছে, সে খুব কষ্ট করছে আর আমি ভাবছি তার কারণে আমি কষ্ট ভোগ করছি। আর যে তালেবে ইলমের ব্যাপারে আমার দিল খোলা থাকে, তারা খেদমতের তরীকাও বোঝে।

দৈনন্দিন জীবনের সুন্নাতসমূহ

সালামের গুরুত্ব ও ফযীলত

সালামে মুহাব্বত ও ঐক্য সৃষ্টি হয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না পরস্পরে মুহাব্বত করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে দিব না? যার উপর আমল করলে তোমাদের মধ্যে মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে? সেটা হলো, তোমরা সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও। (অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম দাও।) -সহীহ মুসলিম, ৫৪

হযরত আবু দারদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সালামের খুব প্রচলন ঘটাও। তাহলে তোমরা উন্নত হয়ে যাবে। –তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সালাম আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে একটি নাম, যা আল্লাহ তা'আলা জমিনে পাঠিয়েছেন। অতএব তোমরা পরস্পর তার খুব প্রসার করো। কেননা মুসলমান যখন কোনো কওমের উপর দিয়ে অতিক্রম করে এবং তাদেরকে সালাম করে আর তারা জওয়াব প্রদান করে, তখন তাদেরকে সালাম স্মরণ করিয়ে দেয়ার কারণে সালামকারী ব্যক্তির ওই

কওমের উপর এক ধাপ ফযীলত হাসিল হয়। আর যদি তারা জওয়াব না দেয়, তবে ফেরেশতাগণ –যাঁরা মানুষ থেকে উত্তম, সে ব্যক্তির সালামের জওয়াব প্রদান করেন। –বাযযার, তাবারানী, তারগীব

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলো এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বললো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জওয়াব দিলেন। অতঃপর সে মজলিসে বসে গেলো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন দশ। অর্থাৎ সালামের কারণে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়েছে। অতঃপর আরেকজন লোক এলো এবং 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বললো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে বসে পড়লো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, বিশ। অর্থাৎ তার জন্য বিশটি নেকী লেখা হলো। তারপর তৃতীয় একজন এলো এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা'আতুহু বললো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জওয়াব দিলেন। তারপর সে মজলিসে বসে পড়লো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ত্রিশ। অর্থাৎ তার জন্য ত্রিশটি নেকী লেখা হলো। –আবু দাউদ

হযরত আবু উমামা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সে ব্যক্তি, যে আগে সালাম করে। –আবু দাউদ

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আগে সালাম করে সে অহঙ্কার থেকে মুক্ত। –বায়হাকী

হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, আমাকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আমার প্রিয় বৎস! যখন তুমি আপন ঘরে প্রবেশ করো, তখন ঘরওয়ালাদেরকে সালাম করো। এটা তোমার জন্য এবং তোমার ঘরওয়ালাদের জন্য বরকতের কারণ হবে। –জামে তিরমিযী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি একদিনের মধ্যে বিশবার সালাম করলো, চাই জামা'আতকে করুক কিংবা ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে করুক। আর সেদিন সে ইন্তিকাল করলো তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

–মাজমাউয যাওয়ায়েদ - খণ্ড : ৮ পৃ: ৩০

সালাম প্রদান সম্পর্কিত আদবসমূহ

১. অন্য কথা না বলে আগে সালাম দিবে, এটাই উত্তম।

২. পথচারীকে আরোহী, উপবেশনকারী বা দাঁড়ানো ব্যক্তিকে পথচারী, অবস্থানকারীকে আগন্তুক, অধিক সংখ্যককে কম সংখ্যক এবং অধিক বয়সীকে কম বয়সী কর্তৃক আগে সালাম করা উত্তম।

৩. জামা'আতের মধ্য থেকে একজন সালাম করলে সকলের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট হবে।

৪. সালামের সময় হাত দিয়ে ইশারা করবে না; হাত কপালে ঠেকাবে না কিংবা মাথা ঝুঁকাবে না।

৫. কোনো খালি ঘরে প্রবেশ করলে– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ

অর্থ- হে গৃহবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ পড়বে।

অর্থ- আমাদের প্রতি ও সৎ বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

৬. সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। জামা'আতের মধ্য থেকে একজন জওয়াব দিলে সকলের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

৭. সালামের জওয়াব সালামদাতাকে শুনিয়ে দেয়া জরুরী।

৮. কোনো অমুসলিম আসসালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে তার জবাবে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলবে অথবা ইশারা করে দিলেও যথেষ্ট হবে।

৯. একই সঙ্গে দুইজন একে অপরকে সালাম দিলে প্রত্যেককেই আলাদা জওয়াব দিতে হবে।

১০. নিজের বাড়িতে নিজের মা-বোনকে এবং নিজের স্ত্রীকেও 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে সালাম করবে এবং তারাও 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম' বলে জওয়াব দিবে।

সালাম প্রেরণের সুন্নাত তরীকা

- যদি কেউ কোনো লোককে বা চিঠির মাধ্যমে সালাম পৌঁছাতে চায় তবে 'আমার সালাম পৌঁছে দিবেন' বা 'পত্রে আমার সালাম রইলো' বললেই সালাম হবে।
- কেউ অন্য কারও সালাম পৌঁছালে তার জওয়াবে বলবে–

وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ অথবা وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

সালামের উচ্চারণে প্রচলিত ভুল

অনেকে সালামের সহীহ উচ্চারণ করে না। যেমন– স্লামালাইকুম, সালামু আলাইকুম, আসলামু আলাইকুম, স্লামু আলাইকুম ইত্যাদি। আসসালামু আলাইকুমের শুরু হামযা মিলিয়ে ফেলে। আলাইকুমের (عَلَيْكُمْ) আইনের (ع)-এর উচ্চারণ হামযার (ا) মতো করে। ওয়া আলাইকুমুস সালামকে ওয়ালাইকুম সালাম, হাত উত্তোলন করে সালাম দেয়। এগুলোর ইসলাহ হওয়া প্রয়োজন।

মুসাফাহার সুন্নাত ও আদবসমূহ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ নকল করেন, সালামের পরিপূর্ণতা হলো মুসাফাহা। –তিরমিযী

হযরত বারা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুই মুসলমান যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে, তারা পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

-আবু দাউদ

১. মুসাফাহা করা সুন্নাত। সাক্ষাতের প্রাক্কালে মুসাফাহা করতে হয়। বিদায়ের সময়ও মুসাফাহা করে নিবে। মুসাফাহার দু'আ-

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

(আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করে দিন)

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর দুই বান্দা, যাঁরা পরস্পর কেবল আল্লাহর জন্য মুহাব্বত রাখে, তাঁরা যখন মুসাফাহা করে এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ পড়ে, তাঁরা একে অপর থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অতীত এবং ভবিষ্যতের গুনাহ মাফ করে দেন। -গুনাহে বেলজ্জত

৩. উভয় হাত ব্যবহার করে মুসাফাহা করা সুন্নাত। মা'যূর না হলে এক হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ এবং তাকাব্বুর তথা অহঙ্কারের আলামত।

৪. মুক্ত হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত।

৫. মুসাফাহার পর নিজের হাতে চুমু দেয়া বা নিজের হাত বুকের উপর ফিরানো সুন্নাতের খেলাফ ও বিদ'আত।

৬. কারও সঙ্গে এমন সময় মুসাফাহার জন্য হাত বাড়াবে না, যখন সে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে।

৭. কোনো মজলিসের সকলের সঙ্গে একাধারে মুসাফাহা করতে গিয়ে মজলিসের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটানো অনুচিত।

৮. মুসাফাহা করতে গিয়ে কাউকে কষ্ট দেয়া অনুচিত।

৯. মুসাফাহার সময় হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়া সুন্নাতের খেলাফ।

১০. মনে রাখতে হবে 'মুসাফাহা' এবং 'হ্যান্ডশেক' কখনোই এক কথা নয়।

১১. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযি.) বলেন, সালাম তখন পরিপূর্ণ হবে যখন নিজ ভায়ের সঙ্গে মুসাফাহা করবে। -আদাবুল মুফরাদাত পৃ ৯৬

উদ্দেশ্য হলো সুযোগ হলে মুসাফাহাও করবে। তাছাড়া মুসাফাহা যেহেতু সালামের ফসল, এজন্য প্রথমে সালাম করবে তারপর মুসাফাহা করবে। হযরত জুন্দুব (রাযি.)-এর বর্ণনায় এসেছে- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম না করা পর্যন্ত মুসাফাহা করতেন না।

ইসলাহ : অধিকাংশ মানুষ ভীড়ের পরিস্থিতিতে শুধু মুসাফাহা করে সালাম করে না। এটা সুন্নাতের খেলাফ।

মু'আনাকার আদবসমূহ

১. কারো সঙ্গে দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত হলে মুহাব্বতের সঙ্গে মু'আনাকা অর্থাৎ গলাগলি করাতেও দোষ নেই, কিন্তু শাহওয়াত (যৌন চাহিদা)-এর সঙ্গে মু'আনাকা করা হারাম। -আবু দাউদ

২. মু'আনাকাকারীরা উভয়ে তাদের ডান গলা মিলাবে।

৩. মু'আনাকা শুধু এক দিকেই একবার, তিনবার করা সুন্নাতের খেলাফ।

৪. মু'আনাকার দু'আ- اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِیْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ

-আহকামে যিন্দেগী : ৪৪৭

অর্থ- হে আল্লাহ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দিন।

৫. হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ইরশাদ করেন, যখন সাক্ষাৎ হবে তখন মুসাফাহা করবে এবং যখন সফর থেকে আসবে তখন মু'আনাকা করবে।

-তাবারানী, তারগীব ৩৩৪ পৃ.

৬. হযরত ইবনে উমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাউকে বিদায় দিতেন, তখন তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে নিতেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়তেন না যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতকে নিজে না ছাড়তো। সেই সঙ্গে বলতেন,

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَاتِكُمْ وَخَوَاتِمَ اَعْمَالِكُمْ

অর্থ : "তোমাদের দ্বীন তোমাদের আমানত এবং আমল সবকিছু আল্লাহর সোপর্দ।" -জামে তিরমিযী পৃ. ২৩২

ইসলাহ : ঈদের দিনে সুন্নাত মনে করে কোলাকুলির প্রথা বিদ'আত।

কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ اَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ بِبِسْمِ اللهِ فَهُوَ اَبْتَرُ وَاَقْطَعُ

অর্থ– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা হয় না, সে কাজ বরকতশূন্য হয়ে যায় (অর্থাৎ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ থাকে)। -আবু দাউদ, নাসাঈ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে নিতেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সুন্নাতের অনুসরণার্থে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা আরম্ভ করা চাই। যেমন : খানার শুরুতে, ঘরে প্রবেশ করার সময়, ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, শয়নকালে, জাগ্রত হয়ে, কিতাব অধ্যয়নে ও রান্না-বান্না এক কথায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার সুন্নাত চালু করা চাই।

এভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্মের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার নিয়ম করে নিলে বিনা পরিশ্রমে এবং বিনা কষ্টে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমলনামায় অগণিত সওয়াব যোগ হতে থাকবে। এমনকি এই বিসমিল্লাহর বদৌলতে সাংসারিক কাজ-কর্মও ইবাদতে পরিণত হবে। একজন কাফেরও জাগতিক কাজ-কর্ম সম্পাদন করে আর একজন মুমিনও করে। এতোদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, কাফের আল্লাহ পাকের ধ্যানশূন্য অবস্থায় কাজ করে আর মুমিন আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ রেখে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করে। যার ফলে তার আমল-কাজ

ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। এটা এমন সংক্ষিপ্ত আমল যে এতে না আছে কোনো সময় ব্যয়, না আছে তেমন মেহনত। অথচ উপকারিতা কেমন বড় পরশমণি তুল্য যে দুনিয়া দ্বীনে পরিণত হয়ে যায়।

বিসমিল্লাহ্ সম্পর্কিত কতিপয় আদব

১. হযরত হাসান (রাযি.) কে এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো এটাতো প্রত্যেক লেখার শিরোনাম। চিঠি লিখার মূল সুন্নাত তো হলো, প্রত্যেক চিঠির শুরুতেই বিসমিল্লাহ লিখবে। কিন্তু কুরআন, হাদীসের বাণী ও ইঙ্গিতের ভিত্তিতে হযরত ফুকাহায়ে কিরাম এই মূলনীতি লিখেছেন, যে স্থানে বিসমিল্লাহ কিংবা আল্লাহ তা'আলার নাম লিখা হবে যদি সেখানে সেই কাগজকে হেফাযত করার কোনো গুরুত্ব না থাকে বরং পড়েই সেটা ফেলে দেয়া হয় তাহলে এমন কাগজ এবং বস্তুতে বিসমিল্লাহ অথবা আল্লাহ তা'আলার নাম লেখা জায়েয নাই। এবং এসব ক্ষেত্রে সুন্নাত আদায়ের জন্য না লিখে শুধু মুখে বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে। -মাআরিফুল কুরআন-১ম খণ্ড

২. অনেকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এর পরিবর্তে ৭৮৬ লিখে থাকে অথচ শরীয়াতে সংখ্যাকে কখনও শব্দের বদল হিসেবে স্বীকার করা হয়নি। এগুলো ইয়াহুদীদের আবিষ্কার। এজন্য ইয়াহুদী, নাসারা ৭, ১৪ সংখ্যাকে গুরুত্ব দেয়। এগুলো তারা 'লাকি সেভেন' ও 'লাকি ফরটিন' বলে অভিহিত করে থাকে। অর্থাৎ শব্দ ও সংখ্যার মূল প্রচলনকারী হলো অমুসলিম আহলে কিতাব।

৩. মুসলিম ভাইগণের নিকট আবেদন এই যে, যেখানে বিসমিল্লাহ লিখলে হেফাযত হবে না, যেমন আজকাল পোস্টার, লিফলেট, দোকানপাটের ক্যাশমেমোতে, দাওয়াত পত্রে, বিসমিল্লাহ লেখা থেকে বিরত থাকুন। এক্ষেত্রে সুন্নাত আদায়ের জন্য শুধু মুখে পড়ে নিবেন। কারণ এটা কুরআন শরীফের আয়াত। কাজেই এটার সম্মান ও হেফাযত জরুরী। যদি সংক্ষেপে লিখতে হয় তাহলে "বিসমিহী তা'আলা" লিখাও জায়েয আছে। এতে করে আল্লাহ তা'আলার নামের বরকত এবং রহমতসমূহ অর্জিত হবে। ইয়াহুদীদের আবিষ্কৃত ৭৮৬ লিখা কোনোভাবেই এর বদল হতে পারে না। যদিও এক্ষেত্রে বরকতের নিয়্যতেই লিখা হয় কিন্তু এর যথাযত হেফাযত না হওয়ার কারণে বেবরকতি ও গুনাহ'র কারণ হবে। -গুনাহে বেলজ্জত

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা সুন্নাত

ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সঙ্গে

ইনশাআল্লাহ বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কি না তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নাই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে স্বীকারোক্তি এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার। যদি আল্লাহ্ পাক চান তবে আমি এ কাজটি আগামী কাল করবো। ইনশাআল্লাহ বাক্যের অর্থ তাই।

মুলাকাতের সুন্নাত

১. কারও নিকট সাক্ষাতের জন্য এমন সময় যাবে না, যখন গেলে তার ঘুম, ওযীফা কিংবা বিশেষ কোনো কাজ বা আমলের ব্যাঘাত ঘটবে।

২. কারও কাছে পূর্বে অবগত করা ব্যতীত নাশতা বা খাওয়ার সময়ে যাবে না। গেলেও নিজ যিম্মায় খেয়ে যাবে।

৩. প্রথমে অনুমতি চাইবে, অনুমতি হলে সাক্ষাৎ করবে। অন্যথায় ফিরে আসবে।

৪. প্রথম সাক্ষাতে সালাম দিবে। আর মুসাফাহা-মু'আনাকার জন্য অগ্রসর হওয়া অপর পক্ষের কাজ। সে স্বেচ্ছায় অগ্রসর না হলে বা কোনো বিশেষ কাজে লিপ্ত থাকলে মুসাফাহা-মু'আনাকা করতে গিয়ে তাকে বিব্রত করবে না বা তার কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে না।

৫. দীর্ঘ কথা বলতে হলে তার কথা শোনার সময় হবে কি না তা জেনে নিবে এবং তার অনুমতি নিবে।

৬. মুরুব্বী ও গুরুজনদের নিকট সাক্ষাতের জন্য যেতে হলে তাদের সাক্ষাতের জন্যে নির্ধারিত সময়ে যাবে।

মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের ফযীলত

- হযরত মুআবিয়া (রাযি.) থেকে বর্ণিত– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার মুহাব্বত ওয়াজিব তাদের জন্য যারা আমার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ ও দর্শন করে। -কানযুল উম্মাল ৯/৮

- হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, তোমাকে জান্নাতীদের ব্যাপারে

অবগত করাব কি? আমি বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নবীগণ জান্নাতী, সিদ্দীকগণ জান্নাতী, এবং ঐ লোক জান্নাতী যে শহরের প্রান্তে বসবাসকারী নিজ মুসলিম ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে এবং নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে মিলিত হয়।-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/১৭৪

সাক্ষাতের সময় প্রচলিত কিছু ভুলের সংশোধন

পরস্পর সাক্ষাতের সময় সালাম-মুসাফাহার পর একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে থাকি। শরঈ বিধান না জানার কারণে এমন কিছু কথা বলা হয়ে থাকে যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মক ক্ষতিকারক। যেমন-

১. অনেকেই জিজ্ঞাসা করে আপনি কেমন আছেন? উত্তরে বলে থাকি, আমি ভালো নাই অথবা মোটামুটি ভালো বা আমার অবস্থা খারাপ ইত্যাদি। এ উত্তরটি আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকের ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো, সর্বাবস্থায় সে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ! আমি ভালো আছি।

২. ইদানিং অনেকেই জিজ্ঞাসা করে, আল্লাহ পাক আপনাকে কেমন রাখছেন? এ প্রশ্নটি মারাত্মক ভুল। কেননা এ ক্ষেত্রে যদি অসতর্কভাবে বলে ফেলে আমি ভালো নাই অথবা কষ্টে আছি, তাহলে তো কুফুরী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এ ধরনের প্রশ্ন থেকে বিরত থাকা সকলের জন্য জরুরী।

৩. সাক্ষাৎ বা মুলাকাতে সর্বপ্রথম কথা বলার আগে সালাম বলা সুন্নাত। অতঃপর হালপুরছি করা, অর্থাৎ তবিয়ত কেমন বা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করা। কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রথমে সালাম তারপর কালাম (কথা বলা)। আমাদের অধিকাংশের বেলায় দেখা যায়, সাক্ষাতের সময় একে অপরকে প্রথমে সালাম না দিয়েই হাল-হাকীকত জিজ্ঞাসা করে থাকি। এমনটি ঠিক নয়।

খানা খাওয়ার সুন্নাত ১৭টি

১. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। –আবু দাউদ, হাদীস নং ৬৭৬১

২. দস্তরখানা বিছানো। –বুখারী, হাদীস নং ৫৩৮৬

৩. بِسْمِ اللهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللهِ (আল্লাহর নামে ও তাঁর বরকতে শুরু করলাম।) বলে খানা শুরু করা। ভুলে গেলে শেষ লোকমার আগে যখনই মনে

হয়- بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ বলা। (আল্লাহর নামেই খানা শুরু করলাম ও শেষ করলাম।) -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৯ ; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৫১০৬

৪. ডান হাতে খাওয়া। -বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬। মুসলিম, হাদীস নং ২০২০

৫. তিন আঙ্গুল দ্বারা খাওয়া। প্রয়োজনে তিনের অধিক ব্যবহার করা যায়। -মুসলিম, হক্কানিয়া ২/৩৯০

৬. খানা এক ধরনের হলে এবং এক প্লেটে একাধিক ব্যক্তি খেতে বসলে নিজের সম্মুখ থেকে খাওয়া। -বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬

৭. .খানার বর্তন, পেয়ালা ইত্যাদি সাফ করে খাওয়া এবং আঙ্গুল ভালো করে. চেটে খাওয়া। -মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৩

৮. খাদ্যদ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া। -মুসলিম, হাদীস নং ২০৩৩

৯. হেলান দিয়ে না খাওয়া। -বুখারী, হাদীস নং ৫৩৯৮

১০. খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনোরূপ দোষ-ত্রুটি না লাগানো। -বুখারী, হাদীস নং ৫৪০৯

১১. খানা শেষে এই দু'আ পড়া-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।)

-সুনানে আবু দাউদ,হাদীস নং ৩৮৫২; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৫৭

১২. আগে দস্তরখানা উঠানো, তারপর নিজে উঠা। -ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৯৫

ইসলাহ : অনেক জায়গায় দেখা যায়, লোকজন বসার আগেই দস্তরখান বিছিয়ে রাখা হয়, এটা ঠিক নয়।

১৩. দস্তরখানা উঠানোর দু'আ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

অর্থ- আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা; এমন প্রশংসা যা অশেষ, পবিত্র ও বরকতময়। হে আমার প্রভু! এই খাবারকে অপর্যাপ্ত মনে করে বা চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়ে বা এর প্রতি বিমুখ হয়ে উঠলাম না।

-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৮৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৫২১৭; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৫৮

১৪. খানার পর উভয় হাত ধৌত করা। –তিরমিজী, হাদীস নং ১৮৪৬

১৫. কুলি করা। –বুখারী, হাদীস নং ৫৪৫৫

১৬. দাঁত খিলাল করা। –জামেউল ফাতওয়া

১৭. কারো নিকট ইফতার করলে কিংবা দাওয়াত খেলে খানা শেষ করার পর এই দু'আ পড়া– اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ

(হে আল্লাহ! যে আমাকে খানা খাইয়েছে তুমি তাকে খাওয়াও এবং যে আমাকে পান করিয়েছে তুমি তাকে পান করাও।)

-সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৮০৯

অতঃপর মেযবানকে শুনিয়ে এই দু'আ পড়া–

اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَآئِكَةُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنَ

(নেককারগণ তোমাদের খানা খান। ফেরেশতারা তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং তোমাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুন।)

-মুসনাদে আহমাদ (৩/১৩৮), হাদীস নং ১২৪০৬; সুনানে আবু দাউদ (২/৩৯৫), হাদীস নং ৩৮৫৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং ১৯৪২৫; সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ৮৩৯৪

খানা খাওয়ার সময় যে সব বিষয় আলোচনা নিষেধ

১. অসুস্থতার আলোচনা।

২. মৃত্যুর আলোচনা

৩. কোনো চিন্তা বা পেরেশানির কথা।

৪. সূক্ষ্ম ইলমী আলোচনা।

৫. সালাম করবে না।

৬. খাদ্যের দোষ বের করবে না।

খানা খাওয়ার বিশেষ কিছু আদব

১. উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যিনি মুরুব্বী বা বয়সে বড় তার থেকে খানা শুরু করা। –মুসলিম, ২/১৭১

২. কেউ লোকমা নিতে হাত বাড়ালে নিজের হাত গুটিয়ে নেয়া।

৩. তিন তরীকায় কোনো এক তরীকায় বসে খানা খাওয়া।

ক. উভয় পা খাড়া করে,

খ. এক হাঁটু খাড়া করে অপর হাঁটু বিছিয়ে।

গ. উভয় হাঁটু জমিনে বিছিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসে। –মিরকাত

৪. জুতা খুলে খানা খাওয়া। –মিশকাত, ২/৩৬৮

৫. খানা সামনে এলে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ– হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। -শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৬০৪০; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস নং ৩০১৮৪; মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ১৬৭২

৬. দস্তরখানায় ঝুটা ফেলা সুন্নাতের খেলাফ।

৭. খানার শেষে দস্তরখানা আগে উঠানোর পর আহারকারীর উঠা সুন্নাত। –ইবনে মাজাহ

৮. খাওয়ার সময় নম্রভাবে দরিদ্রের মতো বসে খাবে, অহঙ্কারীদের মতো বসবে না।

৯. ভাত বা তরকারি যদি কিছু কম হয় এবং লোক বেশি হয়, তবে সবাই কিছু কিছু কম খাবে। এমন করবে না, একজনের পেট ভরে যাবে আর একজন কিছুই পাবে না। –সহীহ মুসলিম

১০. খেজুর, আঙ্গুর, বাতাসা, মিঠাই ইত্যাদি জিনিস কয়েকজনে খেতে বসলে প্রত্যেকে এক একটা করে উঠাবে।

১১. খানার বস্তু ধান, চাল, গম পাত্র থেকে নেয়ার সময় মেপে নিবে, অনুমান করে নিবে না, কিন্তু যা পাত্রে থেকে যায় তা মাপবে না।

১২. খানা খেয়ে, পানি পান করে খানা-পানির আসল মালিক আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করবে। –সহীহ মুসলিম

১৩. খানা খুব বেশি খাবে না, এতে ক্ষতি হয়। –মাজমাউল আনহার

১৪. খাওয়া-দাওয়ার কোনো জিনিস অন্য কারও নিকট নিতে হলে ঢেকে নিবে। –সহীহ বুখারী

পানি পান করার সুন্নাতসমূহ

১. পানির পেয়ালা ডান হাতে ধরা। –সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২০

২. বসে পান করা, বসতে অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে পান না করা। –সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০২৪

৩. বিসমিল্লাহ বলে পান করা এবং পান করে আলহামদুলিল্লাহ বলা। –তাবরানী আওসাত, হাদীস নং ৬৪৫২

৪. সোনা/রুপার পাত্র ব্যবহার না করা।

৫. পানির পাত্রে ফুঁক না দেয়া।

৬. কমপক্ষে তিন শ্বাসে পান করা। শ্বাস ছাড়ার সময় পেয়ালা থেকে মুখ সরিয়ে নিবে। –বুখারী, হাদীস নং ৫৬৩১

৭. পাত্রের ভাঙ্গা দিক দিয়ে পান না করা। –আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭২২

৮. পাত্র যদি এমন হয়, যার ভিতর নযরে আসে না, সেটার মুখে মুখ লাগিয়ে পান না করা। কারণ তাতে কোনো বিষাক্ত প্রাণি বা ক্ষতিকর কোনো বস্তু থাকতে পারে। -সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬২৬

৯. পানি পান করার পর এই দু'আ পড়া–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে সুস্বাদু সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছেন, এবং আমাদের গুনাহ'র কারণে পানিকে লবণাক্ত করেননি।)[১]

১০. পানীয় দ্রব্য পান করে কাউকে দিতে হলে ডান দিকের ব্যক্তিকে আগে দেয়া এবং এই ধারাবাহিকতা অনুযায়ী শেষ করা।–বুখারী, হাদীস নং ৫৬১৯

১১. দুধ পান করার পূর্বে এই দু'আ পড়া–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

(হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই পানীয়তে বরকত দিন এবং আমাদেরকে-এর চেয়ে উত্তম বানান।) -জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৫৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৩২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৩২২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৫৫৫৬

দুধ ব্যতীত অন্য কোনো পানীয় দ্রব্য হলে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا خَيْرًا مِّنْهُ.

১২. যে ব্যক্তি পান করাবে সে সবার শেষে পান করবে। –মুসলিম, হাদীস নং ৬৮১

১৩. যমযমের পানি কিবলামুখী হয়ে এ দু'আ পড়ে পান করা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

(হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক ও সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করছি।) -মুসতাদরাকে হাকেম, (১/৪৭৩) হাদীস নং ১৭৩৯

---

১. {এটি মুরসাল এবং যয়ীফ। হিলইয়াতুল আওলিয়ায় (৮/১৩৭) আবু নুআইম রাহ. বলেন, غريب من حديث الفضيل وجابر وهو يزيد الجعفي الكوفي وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كذا رواه مرسلا। মুনাবী রাহ. আততাইসীর বিশরহিল জামিইস সগীর (২/৪৯৩)- এ বলেন, وهو مع إرساله ضعيف }

১৪. উযূর অবশিষ্ট পানি হাতে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাত। এতে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ হয়।

–শামী ১:১২৯, বুখারী, হাদীস নং ৫৬২৬

১৫. মশক, কলসির মুখ, বদনার নল দিয়ে পানি পান করতে হাদীসে নিষেধ আছে। –সহীহ বুখারী

১৬. কাঁধভাঙ্গা বর্তন দিয়ে পানি পান করবে না। –সুনানে আবু দাউদ

সম্মিলিতভাবে খানা খাওয়ার সুন্নাত

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ وَحْدَهُ.

(নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাকী খানা খেতেন না।)

অন্য এক হাদীসে এসেছে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে সাহাবী (রাযি.) গণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পানাহার করি, কিন্তু তৃপ্ত হই না। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খাও। তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ। অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

اِجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ

তোমরা একত্রে খানা খাও এবং আল্লাহর নাম স্বরণ কর। এতে তোমাদের খানায় বরকত হবে।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩২৮৬

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, خَيْرُ الطَّعَامِ كَثْرَةُ الْأَيْدِيْ "উত্তম খানা হলো যার মধ্যে অধিক হাত (বেশি লোক) শরীক হয়।" বহুসংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের বর্ণনা এবং তাঁদের নিজেদের সম্মিলিত খাওয়ার আমলই এ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথকভাবে খানা খেতেন না; বরং সকলকে নিয়ে একসঙ্গে খানা খেতেন এবং এক সঙ্গে খেতে উৎসাহ দিতেন।

একত্রে খানা খাওয়ার আদব

- খাওয়ার পর দস্তরখানে খানা রেখে দস্তরখান থেকে উঠবে না।
- সকলে খানা খাওয়া থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত নিজে খানা বন্ধ করবে না। কারণ হতে পারে অন্যের পেটে এখনও ক্ষুধা রয়েছে। তাই একজন হাত তুলে নিলে সে-ও খানা থেকে হাত তুলে নিয়ে ক্ষুধার্ত থেকে যাবে। তবে যদি কারো অসুবিধা থাকে, তাহলে সে অপারগতা পেশ করবে।

একত্রে খানা খাওয়ার ফায়দাসমূহ

১. অল্প খানায় অনেক বরকত হয়।
২. খানায় তৃপ্তি লাভ হয়।
৩. একটি মহান সুন্নাত যিন্দা করার সওয়াব হয়।
৪. পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ও মুহাব্বতের সওয়াব হয়।
৫. খানা নষ্ট ও অপচয় হয় না।
৬. পরস্পরে শত্রুতা দূর হয় ও মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়।

এগুলো হলো বস্তুগত ফায়দা। আর রূহানী ফায়দার তো কোনো সীমা-পরিসীমাই নেই।

খানা বণ্টনের পদ্ধতি

খানা বণ্টনের সুন্নাত তরীকা হলো, সবসময় মজলিসে বসা ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি মুরুব্বী তাকে প্রথমে হাত ধোয়াবে বা খানা দিবে। অতঃপর তার ডানে ডানে চলতে থাকবে। চাই ডান দিকে ছোট কিংবা বড় যেমন লোকই থাক না কেন।

পড়ে যাওয়া খানা উঠিয়ে খাওয়ার ফায়দা

১. খানা ও রিযিকের মধ্যে বরকত এবং প্রশস্ততা আনে।
২. সন্তানাদির সুস্থতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
৩. অভাব-অনটন ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিরাপদ রাখে।
৪. কুষ্ঠ রোগের মতো ব্যাধি থেকে রক্ষা করে।
৫. সন্তান-সন্ততি নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী থেকে রেহাই পায়।
৬. খানায় শয়তান শরীক হয় না। -তিব্বে নববী

মেহমানদারী করা

মেহমানদারীর ফযীলত সম্পর্কে হযরত জাবির (রাযি.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে স্বীয় প্রিয়বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত করাবে, মহান আল্লাহ তার আমলনামায়

হাজার হাজার নেকী লিখে দিবেন এবং হাজার হাজার গুনাহ মাফ করে দিবেন। সর্বোপরি তার মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। আর তাকে তিনটি জান্নাত তথা জান্নাতুল ফিরদাউস, জান্নাতু আদন ও জান্নাতুল খুলদ থেকে খানা খাওয়াবেন।

হাদিয়া দেয়ার ফায়দা ও আদব

১. হাদিয়া দেয়া একটি সুন্নাত।

২. হাদিয়া দিলে মুহাব্বত বাড়ে। হাদীস শরীফে এসেছে– تَهَادَوْا تَحَابُّوْا অর্থ– তোমরা পরস্পর হাদিয়া লেনদেন কর, মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে।

-আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৫৯৪; আলআদাব, বায়হাকী, হাদীস নং ৮১; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস নং ৬১৪৮; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৮৯৭৬

৩. হাদিয়া দিলে হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়। –মিশকাত, জামে সাগীর

৪. হাদিয়া দিলে রিযিক বৃদ্ধি পায়। –জামে সাগীর

৫. এমন ব্যক্তির হাদিয়া কবূল করা সুন্নাত, যে বিনিময় প্রত্যাশী নয়। বিনিময় প্রত্যাশীর হাদিয়া কবূল করা উচিত নয়। যেমন প্রচলিত বিয়ে-শাদীতে উপঢৌকনের বেলায় হয়ে থাকে।

৬. কেউ হাদিয়া দিলে তার প্রতিদান দেয়া সুন্নাত।

৭. হাদিয়া গোপনে দেয়া সুন্নাত এবং হাদিয়া-গ্রহীতার উচিত তা প্রকাশ করা। যাকে হাদিয়া দিবেন তার কাছ থেকে একান্ত সাক্ষাতে হাদিয়া প্রদানের অনুমতি নিয়ে নেয়া উচিত।

৮. কেউ হাদিয়া দিলে বা উপকার করলে جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলা সুন্নাত। -জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৩৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩৪১৩; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস নং ৯৯৩৭

৯. সুগন্ধি, তেল, দুধ হাদিয়া দিলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা উচিত নয়। –উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩২৭

১০. এমন কিছু বা এতো পরিমাণ হাদিয়া দেয়া ঠিক নয়, যা গ্রহীতার পক্ষে গন্তব্যস্থানে বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। এরূপ করতে হলে তা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিবে।

১১. যার সম্পূর্ণ উপার্জন বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম তার হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয নয়।

১২. যে জিনিস হালাল কি হারাম বলে সন্দেহ হয়, তা গ্রহণ না করাই ভালো। –মুসনাদে আহ্মাদ

১৩. কেউ হাদিয়া দিলে তার মূল্য জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়।

১৪. একে অন্যকে হাদিয়া তোহফা দেয়া-নেয়ার প্রচলন রাখলে পরস্পর দিল ছাফ থাকে, একের দিলে অন্যের মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। কিন্তু অল্প বলে হাদিয়া দিতে লজ্জাবোধ করবে না। অল্প দিতে লজ্জাবোধ হলে বুঝতে হবে, দিল সাফ নেই।

১৫. যদি কেউ তোমাকে ভালোবেসে আতর লাগিয়ে দেয় বা কিছু দুধ পান করতে দেয় বা বালিশে হেলান দিয়ে বসতে দেয় বা তেল লাগাতে দেয়, তবে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করো না। কারণ এতে বড় একটা ইহসানের বোঝা নেই, অথচ তার দিলটা খুশি হবে। –জামে তিরমিযী

ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ

১. ইশার নামাযের পর বিলম্ব না করে কোনোরূপ দুনিয়াবী কথাবার্তা বা দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত না হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়া।
–বুখারী, হাদীস নং ৫৪৭

২. উযূ অবস্থায় ঘুমানো।–বুখারী, হাদীস নং ৬৩১১

৩. শোয়ার পূর্বে ভালোভাবে বিছানা ঝেড়ে নেয়া।–বুখারী, হাদীস নং ৬৩২০

৪. শোয়ার পূর্বে উভয় চোখে তিনবার সুরমা লাগানো।
–মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৮২৪৯

৫. কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ পড়ে ঘুমানো।

৬. তাসবীহে ফাতেমী (সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার) পড়ে ঘুমানো। –বুখারী, হাদীস নং ৩১১৩

৭. শোয়ার আগে তিন কুল (সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস) তিন তিনবার পড়ে উভয় হাতে দম করে সমস্ত শরীরে তিনবার হাত বুলানো।
–বুখারী, হাদীস নং ৫০১৭

৮. সূরা তাবারাকাল্লাযী ও সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা তিলাওয়াত করে শোয়া। –তাবরানী কাবীর, হাদীস নং ২১৯৫

৯. ডান হাত গালের নিচে রেখে ডান কাতে শোয়া। –বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৪

১০. ঘুমের আগে এই দু'আ পড়া :

بِسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا
فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

(হে আমার প্রতিপালক! তোমার নামেই আমার পার্শ্ব রেখেছি, তোমার নামেই তা উঠাবো। তুমি যদি আমার জানকে আটকে রাখো (অর্থাৎ, আমাকে মৃত্যু দাও)

তাহলে তাকে ক্ষমা কর। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও (মৃত্যু না দাও) তাহলে তোমার নেক বান্দাদের যেভাবে রক্ষা কর সেভাবে তাকে রক্ষা কর।)

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২০

অথবা اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

(হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে ঘুমাই এবং জাগ্রত হই।)

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১৪

১১. শোয়ার পর ঘুম না এলে এই দু'আ পড়া–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ

(আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালিমার মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ, শাস্তি, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট, শয়তানের কু-মন্ত্রনা এবং সেগুলোর (শয়তান) উপস্থিতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) -জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৬৯৬

১২. কোনোরূপ দুঃস্বপ্ন দেখলে বাম দিকে থু-থু নিক্ষেপ করা এবং নিম্নের দু'আ তিনবার পড়া : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

অর্থঃ শয়তান ও এই স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৬২

ঘুমানোর আরো কিছু সুন্নাত

- ঘুমানোর সময় আগুন খোলা অবস্থায় জ্বালিয়ে রাখবে না, হয় নিভিয়ে রাখবে, না হয় ঢেকে রাখবে।–সহীহ বুখারী
- পায়ের উপর পা দিয়ে এমনভাবে শোয়া নিষেধ যাতে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। সতর না খুললে ক্ষতি নেই।
- এমন ছাদের উপর শুবে না যার কিনারা বন্ধ নয়। কেননা গড়িয়ে পড়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।
- উপুড় হয়ে শোয়া মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

إِنَّمَا هٰذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ

উপুড় হয়ে শোয়া তো জাহান্নামীদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭২৪

ঘুম থেকে উঠার সুন্নাতসমূহ

১. ঘুম থেকে উঠে তিনবার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে উভয় হাতের তালু দ্বারা চোখ ডলা।

২. ঘুম থেকে উঠে কালেমায়ে তাইয়্যিবা পড়া।

৩. অতঃপর এই দু'আ পড়া–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَلَمْ يُمْسِكْهَا فِىْ مَنَامِىْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার রূহকে ঘুমের মধ্যে আটকে না রেখে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবিত করেছেন, তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন স্থল।)

৪. ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা। –বুখারী, হাদীস নং ৬৩২৪

লেবাসের সুন্নাত ও আদব

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত সুন্নাতসমূহ

১. প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা কাপড় বেশি পসন্দ করতেন।

২. জামা-পায়জামাসহ সকল প্রকার পোশাক পরিধানের সময় ডান হাত ও ডান পা আগে প্রবেশ করানো। –আবু দাউদ

৩. পুরুষদের জন্য পায়জামা, লুঙ্গি, প্যান্ট এবং জামা, জুব্বা ও আবা পায়ের টাখনুর ওপরে রাখা। টাখনুর নিচে নামিয়ে পোশাক পরিধান করা হারাম।

টাখনুর নীচে পোশাক পরিধানের ক্ষতি

ক. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার করে, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।

–বুখারী শরীফ : ৫৭৮৮

খ. হাদীস শরীফে এসেছে, তিন ধরনের লোকের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না। তাদের গুনাহ মাফ করবেন না। এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হলো– ১. যারা টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে ২. যারা উপকার করে খোটা দেয় ৩. এমন ব্যবসায়ী মিথ্যা শপথ করে পন্য বিক্রি করে। –আবূ দাউদ, ৪০৮৭

গ. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে সে ঈমানদার হওয়া সত্বেও আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। –শু'আবুল ঈমান : ৫৭২০

ঘ. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে ঐ ব্যক্তির নামায আল্লাহ পাক কবূল করবেন না। –আবূ দাউদ : ৪০৮৬

৩. টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে ফযীলতের মহান রাত্রি শবে বরাতেও তার দু'আ কবূল করা হবে না। -শু'আবুল ঈমান, ৩৬২/৫

৪. সাধারণভাবে কাপড় পরিধান করার সময় এই দু'আ পড়া-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

-মুস্তাদরাক, হাদীস : ৭৪০৯

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই এটা আমাকে দিয়েছেন।)

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০২৫; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ৭৪০৯

এবং নতুন কাপড় পরিধান করে এই দু'আ পড়া-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এমন পোষাক দান করেছেন যার মাধ্যমে আমি সতর ঢাকতে পারি এবং শোভা গ্রহণ করতে পারি।)

-জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৬০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৫৭

৫. জামা পায়জামা নিসফে সাক অর্থাৎ পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত হওয়া ভালো। টাখনু গিরার উপর পর্যন্ত জায়েয।

৬. গোল জামা সতর ঢাকায় অধিক সহায়ক বিধায় তা উত্তম।

৭. পুরুষের জন্য মহিলাদের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা, তদ্রূপ মহিলাদের জন্য পুরুষের কাট-ছাঁটের পোশাক পরিধান করা এবং তাদের বেশ ধারণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ।

৮. মহিলাদের জন্য শাড়ি পরিধান করা জায়েয। তবে সেলোয়ার, কামিজ ও উড়না পর্দা রক্ষায় অধিক সহায়ক, বিধায় তাই উত্তম।

৯. প্রাণির ছবিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করা নাজায়েয।

১০. এতো টাইট-ফিট পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ, যাতে শরীরের অঙ্গ ফুটে উঠে। তেমনিভাবে বেশি পাতলা কাপড় পরাও নিষেধ যার দ্বারা সতর রক্ষা হয় না।

১১. বিজাতীয় লেবাস-পোশাক পরিধান করা নিষেধ।

১২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো এবং সবুজ

রঙের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। তাই এসব রঙের কাপড়ও মাঝে মধ্যে ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

১৩. পুরুষের জন্য কুসুম-লাল, হলুদ, জাফরান এবং গোলাপি রঙ নিষিদ্ধ, আর নিরেট লাল অনুত্তম। মহিলাদের জন্য সব রঙ-এর পোশাক জায়েয। –ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৪/১২৫, শামী : ৯/৫১৫

১৪. কামিজ, জামা, কোর্তা, সদরিয়া ইত্যাদি পরিধান করতে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ঢুকানো সুন্নাত। তেমনি পায়জামা পরিধান করতে প্রথমে ডান পা পরে বাম পা ঢুকানো সুন্নাত।

১৫. বিসমিল্লাহ বলে কাপড় খুলতে শুরু করা এবং খোলার সময় বাম হাত ও বাম পা আগে বের করা সুন্নাত।

১৬. কাপড় পরে মাওলার শুকর আদায় করলে অনেক গুনাহ্ মা'ফ হয়।
–আবু দাউদ

১৭. পোশাক-পরিচ্ছদ এতো ভালোও চাই না যে, লোকে বলে অমুকের জামাটা বড় দামী, অমুকের পায়জামাটা কী সুন্দর! ইত্যাদি। কারণ এতে অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার একেবারে হীন, ময়লা ও নোংরাও না হওয়া উচিত। কারণ এতে না-শুকরী হয়। ফলকথা, নিজের অবস্থা অনুসারে সাদাসিধে ও মধ্যম ধরনের লেবাস-পোশাক পরবে।

১৮. রেশমের কাপড় পরা পুরুষের জন্য হারাম। –আবু দাউদ

১৯. পুরুষের জন্য যে কোনো ধরনের অলঙ্কার পরা হারাম। অবশ্য এক সিকি ওযনের রূপার আংটি জায়েয আছে। –তিরমিযী

২০. যে অলঙ্কারে বাজনা সৃষ্টি হয় তা মহিলাদের জন্যও পরা নিষেধ।
–আবু দাউদ

জুতা পরার আদব

১. জুতা প্রথমে ডান পায়ে, তারপর বাম পায়ে পরা। –সহীহ বুখারী,

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পায়ে জুতা পরে চলতে নিষেধ করেছেন। হয়ত উভয় পা খালি রাখবে আর না হয় উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে। –বুখারী, মুসলিম, মিশকাত

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুতা পরিধানের পূর্বে জুতা ঝেড়ে নিতেন এবং পূর্ণ বিসমিল্লাহ বলে ডান পা জুতায় প্রবেশ করাতেন। –শামায়েল

৪. জুতা কয়েক জোড়া রাখতে পারলে ভালো।

৫. জুতা পায়ে দিতে যদি হাত লাগানোর প্রয়োজন হয়, তবে দাঁড়িয়ে পায়ে দিবে না; বরং বসে পায়ে দিবে।

৬. যেখানে জুতা চুরি হওয়ার ভয় আছে, সেখানে জুতা খুলে প্রবেশ করতে হলে জুতা পরিষ্কার করে তলিতে তলি মিলিয়ে রুমালে পেঁচিয়ে বা জুতার ব্যাগে ঢুকিয়ে নিজের কাছে নিয়ে রাখবে।

৭. জুতা খোলার সময় প্রথমে বাম পা থেকে তারপর ডান পা থেকে খুলবে।

লুঙ্গি পরার সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লুঙ্গি সাড়ে চার হাত লম্বা এবং সাড়ে তিন হাত প্রশস্ত ছিল। –শামায়েল

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লুঙ্গি ছিল সাদা, তিনি সাদা কাপড় পসন্দ করতেন। –বুখারী, মিশকাত

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লুঙ্গির সামনের দিক নিচের দিকে ঝুলানো থাকতো এবং পিছনের দিক একটু উঁচু থাকতো। –মাদারিজুন নবুওয়াত

৪. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি সর্বদা পায়ের গোছার অর্ধেক বরাবর রাখতেন। –আবু দাউদ

৫. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন লুঙ্গি বা কাপড় জুমু'আর দিন থেকে পরিধান করা শুরু করতেন। –যাদুল মা'আদ

৬. কুসুম ফুলের বা জাফরানের রঙ দেয়া কাপড় পুরুষের জন্য নিষেধ।

৭. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লুঙ্গি বা কাপড় পরিধান করতেন, তখন পোশাকের নাম নিয়ে এ দু'আ পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

(হে আল্লাহ! প্রশংসা তোমারই। তুমি আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছো। তোমার কাছে-এর কল্যাণ এবং যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে তা বানানো হয়েছে তা কামনা করি। আর এর অনিষ্ট ও এর মাঝে যে অনিষ্ট আছে তা থেকে আশ্রয় কামনা করি।) -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৪৬৯

পাগড়ি পরিধানের সুন্নাতসমূহ

সাদা পাগড়ি পরিধান করা মুস্তাহাব। সর্বদা ব্যবহারের পাগড়ি তিন হাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সাত হাত আর জুমু'আ ও ঈদের জন্য এগার হাত অথবা বার হাত হওয়া ভালো। –আল আরফুশ শাযী

وَكَانَ عَمَامَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عَامَّةِ الْاَحْيَانِ ثَلٰثَةَ اَذْرُعٍ الشَّرْعِيَّةِ وَفِي الصَّلٰوةِ الْخَمْسِ سَبْعَةُ اَذْرُعٍ وَفِي الْجُمَعِ وَالْاَعْيَادِ وَحِيْنَ الْوُفُوْدِ اِثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا.

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বদা ব্যবহারের পাগড়ি ছিল তিন হাত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ব্যবহার করতেন সাত হাত পাগড়ি এবং জুমু'আ, দুই ঈদ ও কোনো রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ব্যবহার করতেন বার হাত লম্বা পাগড়ি। -আনওয়ারুল মাহমুদ : ২/৪৪২

- পাগড়ির নিচে টুপি পরা সুন্নাত এবং লেবাসের আদব। টুপি ছাড়া পাগড়ি বাঁধা সুন্নাতের পরিপন্থী। –আবু দাউদ
- পাগড়ি গোল করে বাঁধা অথবা শামলা (বর্ধিত অংশ) ছেড়ে বাঁধা– উভয় রকমই সুন্নাত। শামলা ডানে বা পেছনের দিকে অথবা একই সঙ্গে উভয় দিকে ছেড়ে দেয়া যায়। শামলা এক বিঘত, এক হাত বা তারচেয়ে বেশি পরিমাণ রাখা যায়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাগড়িতে শামলা ছিল এবং তিনি তা পিছনের দিকে ঝুলিয়ে বাঁধতেন।

টুপি পরিধানের সুন্নাতসমূহ

- টুপি কাপড়ের হওয়া উচিত।
- টুপি সাদা হওয়া সুন্নাত।
- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন টুপি ব্যবহার করতেন যা মাথার সঙ্গে লেগে থাকতো।

ইসলাহ : বর্তমানে অনেক স্থানে প্লাষ্টিকের টুপি, তালের আঁশের টুপি, কাগজের টুপির প্রচলন দেখা যায়, এর দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে না।

চুলের সুন্নাতসমূহ

১. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মাথার চুলের দৈর্ঘ্য এক বর্ণনা অনুযায়ী কানের মাঝখান পর্যন্ত এবং অন্য বর্ণনা অনুযায়ী

কাঁধ পর্যন্ত এবং অন্য বর্ণনা মোতাবেক কানের লতি পর্যন্ত ছিলো। এ ছাড়া কাঁধ বা কাঁধের কাছাকাছি দৈর্ঘের বর্ণনাও কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে। –শামায়েলে তিরমিযী : ২৪ পৃ.

২. গোটা মাথা মুণ্ডানোও সুন্নাত। তবে যদি কেউ চুল কেটে ছোট করে রাখতে চায়, তাহলে গোটা মাথার চুল সমানভাবে বরাবর করে রাখতে হবে। পিছন দিকে ছোট, আর সামনের দিকে লম্বা চুল রাখা জায়েয নয়।

৩. মাথায় টিকি রাখা বা কোনো দরগায় মান্নত মেনে জন্মচুল রাখা হারাম।

৪. পুরুষের জন্য মহিলাদের ন্যায় চুল রেখে খোপা বাঁধা জায়েয নয়।

৫. মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল ছাঁটা হারাম।

৬. পাকা চুল দাঁড়িতে খেযাব লাগানো মুস্তাহাব, কিন্তু কালো খেযাব লাগানো মাকরুহ। –সহীহ মুসলিম

৭. পুরুষ হয়ে স্ত্রীর বেশ এবং স্ত্রী হয়ে পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম।
–সহীহ বুখারী

৮. অন্যের চুল এনে নিজের চুল বাড়ানো এবং শরীরে উল্কি আঁকা হারাম।

১০. এক মুঠের বেশি না হলে দাঁড়ি কাটা নিষেধ। তবে যদি এক আধটা বেশি লম্বা হয়ে যায় তা সমান করা যেতে পারে।

১১. মাথায় চুল রাখলে তার যত্ন করা উচিত। ধুয়ে তেল লাগিয়ে চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রাখবে। দাঁড়িরও এই হুকুম, কিন্তু বেশি সাজসজ্জায় লিপ্ত হওয়া খারাপ। –জামে তিরমিযী

১২. ছোট ছেলেদের মাথার চুল রাখা অপেক্ষা কামিয়ে ফেলা ভালো।

১৩. দুই একটা চুল-দাঁড়ি পাকলে তা উপড়ে ফেলবে না।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন, এই বার্ধক্য মুসলমানের নূর–জামে তিরমিযী

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাদা চুল তুলে ফেলো না। কেননা এটা কেয়ামতের দিন নূরের কারণ হবে। যখন কোনো মুসলমানের একটি চুল সাদা হয়, তখন এর কারণে তার জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হয়, একটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং একটি মর্তবা বুলন্দ করে দেয়া হয়। –সহীহ ইবনে হিব্বান

চিরুনি করার সুন্নাত তরীকা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিক থেকে চিরুনি করা আরম্ভ করতেন। –শামায়েল

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিকে সিঁথি ছাড়াই মাথার কেশ পরিপাটি করতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সিঁথি করা শুরু করেছিলেন। –শামায়েল

রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার মাঝখানে সিঁথি করতেন।

–আদাবুন্নবী

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চিরুনি করতেন না, বরং একদিন অন্তর অন্তর চিরুনি করতেন।

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চিরুনি না করে মাঝে মাঝে চিরুনি করতেন। –শামায়েল তিরমিযী

- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ প্রথমে মাথায় বা দাঁড়ি মুবারকে তেল ব্যবহার করতেন, এরপর চিরুনি ব্যবহার করতেন।

–যাদুল মা'আদ

দাঁড়ি রাখার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুঠের চেয়ে কম রেখে ছাঁটা বা উপড়ানো হারাম। এক মুঠের চেয়ে লম্বা হলে তা ছেটে ফেলা জায়েয আছে। এরূপ চতুর্দিক থেকে সমান করার জন্য কিছু কিছু ছেঁটে ফেলা বৈধ। তবে এমনভাবে ছাঁটবে না যে দাঁড়ি এক মুষ্টির কম হয়ে যায়।

২. দাঁড়ি রাখা সকল নবী-রাসূল ও ওলি-আউলিয়ার সুন্নাত।

৩. দাঁড়ি এক মুঠের চেয়ে খুব বেশি লম্বা রাখা সুন্নাতের খেলাফ।

ইসলাহ : দাঁড়ি তিন দিকে এক মুষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। যারা দাঁড়ি ছেঁটে কিংবা এক মুষ্টির কম রাখে, তাদের আযান ও ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী।

- দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টির কম ছাঁটা তিনটি গুনাহের সমষ্টি।
  ক. মানব স্বভাবের বিরোধিতা।
  খ. সকল নবী আলাইহিস সালামগণের বিরোধিতা।
  গ. শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন।

দাঁড়ি মুণ্ডানো চব্বিশ ঘণ্টা লাগাতর গুনাহ

দাঁড়ি মুণ্ডানোর গুনাহ চুরি এবং যিনার চেয়ে ভয়াবহ। কেননা এগুলো হল সাময়িক গুনাহ। কিন্তু দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টির কমে ছাটার গুনাহ চব্বিশ ঘন্টা লাগাতর গুনাহ। দাঁড়ি মুণ্ডানো ব্যক্তি নামাযেও গুনাহগার, হজ্বেও গুনাহগার, রোযা অবস্থায়ও গুনাহগার, যাকাত দেয়ার সময়ও গুনাহগার এবং কুরবানী করার সময়ও গুনাহগার। মোটকথা সকল ইবাদতের সময়ই এই গুনাহ প্রকাশ্যভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

গোঁফ রাখার সুন্নাত তরীকা

১. গোঁফ দুই দিক থেকে লম্বা করা জায়েয আছে, কিন্তু তা যেন ঠোঁটের উপর না পড়ে।

২. গোঁফ একেবারে ছোট করে কাটা সুন্নাত। লম্বা মোচ রাখার প্রতি হাদীস শরীফে সতর্কবাণী এসেছে।

ইসলাহ : ক্ষুর, রেজার দিয়ে গোঁফ একেবারে চেঁছে ফেলা সুন্নাতের খেলাফ।

নখ কাটার আদবসমূহ

১. সপ্তাহে একবার নখ কাটা। –শরহুস সুন্নাহ, হাদীস : ৩০৯০

২. শুক্রবার জুমু'আর নামাযে যাওয়ার পূর্বে নখ কাটা।

-জামেউল ফাতাওয়া ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০

৩. উভয় হাত মুনাজাতের আকৃতিতে ধরা। ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি নখ কেটে শেষ করা। অতঃপর সর্বশেষ ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটা।

-ফাতওয়ায়ে আলমগীরি ৫/৩৫৮

৪. ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলি থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বাম পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলির নখ কেটে শেষ করা। –শামী : ৬/৪০৬

তেল, সুরমা, আতর ব্যবহারের সুন্নাতসমূহ

১. তেল ব্যবহার করা সুন্নাত।

২. তেল ব্যবহার করার ইচ্ছা করলে বাম হাতের তালুতে তেল নিয়ে প্রথমে ভ্রুর উপর, তারপর চোখে, তারপর মাথায় লাগানো সুন্নাত।

৩. মাথায় তেল লাগাতে মুখমণ্ডলের দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত।

৪. পুরুষ-মহিলা সবার জন্য সুরমা ব্যবহার করা সুন্নাত।

৫. সুরমা বিশেষভাবে রাতের বেলায় শোয়ার পূর্বে লাগানো উত্তম।

৬. প্রত্যেক চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

৭. আতর ব্যবহার করা সুন্নাত। বিশেষভাবে জুম'আর দিন, ঈদের দিন প্রভৃতিসহ যে কোন গুরুত্ববহ সময়।

হাঁচির সুন্নাত

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হাঁচি পসন্দ করেন এবং হাই অপসন্দ করেন। –সহীহ বুখারী

১. হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা সুন্নাত।

২. কেউ হাঁচিদাতার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শুনলে জওয়াবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা।

৩. হাঁচির জওয়াবে কেউ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বললে হাঁচি দাতার আবার يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ বলা।

৪. হাঁচির সময় হাত কিংবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা এবং আওয়াযকে যথাসম্ভব নিচু রাখা। -আবু দাউদ, তিরমিযী

৫. হাঁচি নিম্নস্বরে দিতে চেষ্টা করা

৬. পর পর তিনবার হাঁচির জবাব দিবে। এর চেয়ে বেশি হাঁচি দিলে সেটা হলো সর্দি। -আবূ দাউদ

৭. হাঁচিদাতা উচ্চস্বরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে যাতে শুনতে পায় এবং সে জবাবের হকদার হতে পারে। -মাজাহেরে হক্ব

৮. নামাযরত অবস্থায় হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়বে না। বলে ফেললে কোনো সমস্যা নেই। যদি কারো হাঁচির জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলে ফেলে তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে। -বেহেশ্‌তী জেওর

হাই ঠেকানোর আদব

১. হাই এলে যথাসাধ্য ঠেকাতে চেষ্টা করা। অর্থাৎ মুখ বন্ধ করে রাখবে। এর নিয়ম হলো ঠোঁট খুব চেপে রাখবে এবং নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরবে। -মাজাহেরে হক্ব

এভাবে করার দ্বারা মুখতো খুলবে না, অনাকাঙ্ক্ষিত আওয়াযও হবে না এবং মুখের আকৃতিও বেশি বিগরাবে না। হাই আটকানো না গেলে শয়তান কুমন্ত্রণা দেয়ার বেশি সুযোগ পেয়ে যাবে। -মাআরিফুল হাদীস

২. হাই আসলে বাম হাতের পিঠ মুখে রাখা। নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হাই আসলে বাম হাতের পরিবর্তে ডান হাত দ্বারা মুখ বন্ধ রাখা।

৩. কারো কারো মতে হাই প্রতিরোধের উত্তম কৌশল হলো, হাই আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে এই খেয়াল সৃষ্টি করবে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কখনোও হাই আসেনি। শুধুমাত্র এই খেয়াল করার দ্বারাই হাই বন্ধ হয়ে যাবে। -মাজাহেরে হক্ব

৯. হাই এলে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। (শক্তি-সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহরই) পড়া।

হাসির সুন্নাত তরীকা

- প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, যখনই হাসি দিতেন মুচকি হাসি দিতেন, তাতে কোনো আওয়ায হতো না। –মাদারিজুন নবুওয়াত
- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে প্রফুল্ল বদনে মুচকি হেসে করতেন, যার লক্ষণ স্বরূপ পবিত্র চেহারা মুবারক পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হতো। –শামায়েল
- হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুচকি হাসিরও একটা সীমা ছিল। মুচকি হাসির কারণে কখনও তাঁর শরীর মুবারকে কম্পন সৃষ্টি হতো না; বরং বেশি থেকে বেশি দাঁড়ি মুবারক সামান্য হরকত করত। –যাদুল মা'আদ

ক্রন্দনের সুন্নাত তরীকা

- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসির ন্যায় ক্রন্দনের মধ্যেও কোনো আওয়ায করতেন না। –যাদুল মা'আদ
- তবে ক্রন্দনের সময় তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো এবং অশ্রু প্রবাহিত হত। –যাদুল মা'আদ
- কখনও সীনা মুবারক থেকে ক্রন্দনের মৃদু আওয়াযও শোনা যেতো।

কথোপকথনের সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরের সঙ্গে কথা বলার আগে প্রথমে সালাম দিতেন। –তিরমিযী

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন ব্যক্তির উপস্থিতিতে কাউকে বাদ দিয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে সে মনে কষ্ট পাবে। তবে হ্যাঁ, তিনের অধিক লোক থাকলে কাউকে বাদ দিয়ে কথা বলতে দোষ নেই। –সহীহ বুখারী

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষের মতো একাধারে কথা বলতেন না; বরং অপরকেও কথা বলার সুযোগ দিতেন। –বুখারী, মুসলিম

৪. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও যদি অপসন্দনীয় কথা অগত্যা বলতেই হতো বা তার জওয়াব দিতে হতো, তাহলে ইশারা ইঙ্গিতে বলতেন। -মুসতাদরাক

৫. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাপ করতে করতে অপরের হাত নিজের হাতে নিয়ে নিতেন, যাতে অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়। –ইবনে সা'দ

অন্যের কথাবার্তা শোনার সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কথা শুনতে চাইলে রাস্তার এক কিনারে দাঁড়িয়ে বা কোথাও বসে কথা শুনতেন। –ইবনে সা'দ

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা শুনতে গিয়ে কারো কথা কাটতেন না; বরং তাকে বুঝিয়ে দিতেন। –নশরুত্তীব

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনী-গরীব সবার কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। যে কথা শুনে সকলে হাসতো, সে কথায় তিনিও হাসতেন এবং যে কথায় সবাই আশ্চর্যবোধ করতো, সে কথায় তিনিও আশ্চর্যবোধ করতেন। –জামে তিরমিযী

৪. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলতে গিয়ে বক্তার দিক থেকে মুখ ফিরাতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই লোক মুখ না ফিরাতো। –যাদুল মা'আদ

৫. হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক লোকের কথা শুনতে থাকলে সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা শুনতেন। –নশরুত্তীব

৬. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেউ চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তিনি নিজের কান তার দিকে পেতে দিতেন। –ইবনে সা'দ

৭. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেউ আলাপে বসে গেলে সে না উঠা পর্যন্ত তিনি উঠতেন না। –নশরুত্তীব

৮. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কেউ অপসন্দনীয় কথা বলতে চাইলে তিনি দ্বীনের কথা দিয়ে এড়িয়ে যেতেন। –বায়হাকী

৯. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালো কাজের কথা শুনলে প্রশংসা করতেন এবং মন্দ কাজের কথা শুনলে নিন্দা করতেন। –নশরুত্তীব

অন্যকে ডাকার সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ডাকতে হলে সরাসরি নাম ধরে ডাকতেন না; বরং উপনাম ধরে ডাকতেন। যেমন- হে আবু বকর, হে আবু উসমান– এভাবে।

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কারো নাম জানা না থাকলে পুরুষদের ইয়া আবদাল্লাহ (হে আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকতেন এবং মহিলাদের 'উম্মে' শব্দ লাগিয়ে উম্মে সালমা, উম্মে হাবীবাহ এভাবে ডাকতেন। যদিও সে অবিবাহিতা হতো। –যাদুল মা'আদ

কারো ডাকে সাড়া দেয়ার সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো ডাকের জওয়াবে নাম না বলে কেবল 'আমি আমি' বললে খুবই নারায হতেন; বরং পুরো নাম অর্থাৎ আমি আবদুর রহমান, আমি আবদুস সালাম প্রয়োজন হলে পিতার নামসহ বলতে নির্দেশ দিতেন। –সহীহ বুখারী

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো সাহাবী বা পরিবারের কেউ ডাক দিলে 'লাব্বাইক' (হাযির জনাব!) বলে জওয়াব নিতেন। –যাদুল মা'আদ

পত্র লেখার সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র লিখানোর তরীকা ছিল, প্রথমত বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পুরোটা লিখিয়ে

অতঃপর যথাক্রমে প্রেরকের নাম, প্রাপকের নাম এবং পূর্ণ সালাম লিখাতেন। এরপর পত্রের বিষয়াদি লিখাতেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি প্রথমত পুরো বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখে আল্লাহ্ পাকের হামদ ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ লিখে যথাক্রমে প্রেরকের নাম, প্রাপকের নাম, পূর্ণ সালাম লিখতেন। অতঃপর পত্রের শেষে প্রাপকের জন্য মুসলিম হলে রহমত, বরকত ও মাগফিরাত আর অমুসলিম হলে হেদায়াতের দু'আ করতেন। –সহীহ বুখারী : ২/৯২৬

২. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্র ডান দিক থেকে লেখা শুরু করাতেন এবং সব কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে নির্দেশ দিতেন। –সহীহ বুখারী

৩. লেখার সময় যদি কোনো বিষয় চিন্তা করতে হয়, তবে কলম কানে গুঁজে রাখবে, এতে লিখার বিষয় ভালো মনে আসবে।

মজলিসে বসার সুন্নাত তরীকা

১. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো বড় মজলিসে বসতেন তখন তিনি অপরের সঙ্গে মিলে মিলে বসতেন (মাঝে ফাঁকা রাখতেন না) এবং বলতেন, তোমাদের কী হলো, আমি তোমাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখছি। –আবু দাউদ

২. সমবেত সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) এমন দৃঢ়ভাবে বসতেন যে মাথা পর্যন্ত নড়াচড়া করতেন না, মনে হতো তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে।
– নববীকৃত আমালুল ইয়াওমি ওয়ান নাহার

৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মজলিসের জায়গা প্রশস্ত হলে) বেশি চাপাচাপি করে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সর্বোত্তম মজলিস তাই যা প্রশস্ত হয় (কেননা চাপাচাপি হলে শ্রোতাদের মন বসে না)। –আবু দাউদ

৪. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মজলিসে পরে তাশরীফ নিলে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন এবং অপরকেও এ নির্দেশ দিতেন। –আবু দাউদ

৫. হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসের শেষে এই দু'আ পড়তেন (হাত উঠিয়ে দু'আ করার নিয়ম ছিল না)–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

(হে আল্লাহ! পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, কাজেই তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তোমার কাছেই তাওবা করছি।) -সুনানে আবু দাউদ ৪৮৬১; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৩৩

৬. সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) যখন কোনো এমন ছোট মজলিসে বসতেন যেখানে লোক সংখ্যা কম, সেখানে তারা গোল হয়ে বসতেন।

৭. গোল হওয়া অবস্থায় একে অপরের সঙ্গে মিলে মিলে বসতেন।

৮. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) আদবের সঙ্গে সুন্নাত তরীকায় বসতেন।

৯. সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.) মুজাহাদার সঙ্গে বসতেন, অর্থাৎ হাজারো জরুরত থাকলেও তা দাবিয়ে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়ান শুনতে থাকতেন।

১০. তাকাব্বুরির কারণে না হলে চারজানু হয়ে বসা অর্থাৎ আসন গেড়ে বসা যেতে পারে।

১১. কিছু রোদে কিছু ছায়ায় এরকম অবস্থায় বসবে না। এমনটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

১২. কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে বসবে না।

১৩. মজলিসের মধ্যে যদি কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু শীঘ্র ফিরে এসে বসার ইচ্ছা করে, তবে সে জায়গা তার হক, অন্য কারও সে জায়গায় বাসা উচিত নয়।

১৪. মজলিসের মধ্যে কোনো দরকারবশত নিজের জায়গা থেকে উঠতে হলে যদি পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা থাকে, তবে পাগড়ি, রুমাল বা অন্য কিছু সেখানে রেখে যাওয়া উচিত। তাহলে মানুষ বুঝবে যে, আবার আপনি ফিরে আসবেন।

১৫. আগে থেকে উপবিষ্ট দুজন লোকের মাঝখানে তাদের বিনা অনুমতিতে অন্য কারও এসে বসা উচিত নয়।

১৬. কোনো লোক মজলিসে এলে একটু সরে বসে তাকে জায়গা করে দিয়ে সম্মান করা উচিত।

১৭. মজলিসে এসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসে পড়বে, মানুষকে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবে না।

১৮. মজলিসে এমন ভাব নিয়ে বসবে না, যাতে সাধারণ লোক কথা বলতে ভয় পায়; বরং সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে বসবে। সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথাবার্তা বলবে।

রাস্তায় বসার আদব-কায়দা

১. বিনা দরকারে রাস্তার পাশে বসবে না। যদি বসতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে–

ক) গায়ের মাহরাম মহিলার দিকে তাকাবে না।
খ) রাস্তা বন্ধ করে বসবে না।
গ) যাতায়াতকারীদের কোনোরকম কষ্ট দিবে না।
ঘ) যদি কেউ সালাম দেয় তার জওয়াব দিবে।
ঙ) ভালো কাজ ও ভালো কথা বলবে।
চ) মন্দ কাজ বা মন্দ কথা থেকে নিজে বিরত থাকবে এবং অপরকে বারণ করবে।
ছ) যদি কারও উপর অত্যাচার চলতে থাকে, তবে উঠে গিয়ে মজলুমের সহায়তা করবে।
জ) কেউ রাস্তা ভুলে জিজ্ঞাসা করলে সঠিক রাস্তা তাকে দেখিয়ে দিবে।
ঝ) কারও যদি বোঝা উঠানোর জন্য বা সওয়ার হওয়ার জন্য সাহায্যের দরকার হয়, তবে তাকে সাহায্য করবে।

বিচার করার আদব

১. হাদীসে আছে, যখন তোমরা কোনো বিচারের মজলিসে অথবা সভা-সমিতিতে বসবে তখন আল্লাহ পাকের কিছু যিকির এবং মজলিসের দু'আ ও দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিবে। নতুবা মজলিস শুধু ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। –আবু দাউদ শরীফ
২. বিচারককে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, ইসলামী শরীয়া সম্পর্কে পারদর্শী ও খোদাভীরু হওয়া জরুরী। –সহীহ বুখারী
৩. বিচারক এমন জায়গায় বসবে যেখানে বাদি, আসামী অবাধে বিচারকের নিকট দিয়ে ঘুরাফেরা করতে না পারে। –তা'লীমুদ্দীন
৪. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'পক্ষের সাক্ষ্য না নিয়ে কখনও রায় প্রদান করতেন না। –জামে তিরমিযী
৫. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারককে ক্রোধের সময় বা অন্যমনস্ক অবস্থায় রায় প্রদান বা বিচার করতে নিষেধ করেছেন। –বুখারী, মুসলিম

৬. তিনি নির্দোষ ব্যক্তি বা আসামীর দিকে খোঁজ করার দরকার ছাড়া কড়া নজরে তাকানো সম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। –বায়হাকী

৭. খবরদার! খবরদার!! নিজের মাতবরী, সরদারী ও শক্তির বলে একজনের মাল অন্যজনকে দেয়া বা হেরফের করা সম্পূর্ণ কবীরা গুনাহ। অধিকন্তু স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের ময়দানে বিচারপ্রার্থীর পক্ষ হয়ে বিচারকের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের সঙ্গীন আদালতে মামলা দায়ের করবেন। –তা'লীমুদ্দীন

৮. কাউকে শাস্তি প্রদান করতে হলে মসজিদে শাস্তি দিবে না। হয়তো পেশাব-পায়খানা করে দিতে পারে। –জামে তিরমিযী

৯. কোনো অমুসলিম বাদী বা আসামীকেও কাফের বলে বিন্দুমাত্র হেয় প্রতিপন্ন করা, হাসি তামাশার পাত্র বানানো বা তার উপর জুলুম করা মহাপাপ। তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

১০. জালেম বিচারকের দু'আ কবূল হয় না। –আল-মুসতাদরাক

১১. তিন ব্যক্তির কালেমা, ইবাদত ও দু'আ কবূল হয় না। তাদের মধ্যে একজন ওই বিচারক, যে জনগণের উপর জুলুম করে। –তাবারানী

১২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জালেম বিচারকের প্রতি এই বলে বদ দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বিচারক, কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী হয়ে আমার উম্মতকে কষ্ট ও বিপদে ফেলে, আপনিও তাকে বিপদে ফেলুন।

১৩. হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিচারক বিচারপ্রার্থীর নিকট থেকে কোনো প্রকার হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করবে না। বিচারকের এসব গ্রহণ করা ঘুষের মধ্যে শামিল হবে। –আবু দাউদ

রাষ্ট্র পরিচালনার আদব

১. খলীফা (রাষ্ট্রপ্রধান), উযীর (মন্ত্রী) তথা কোনো বিভাগীয় প্রধান নির্বাচিত করতে হলে ভোট পদ্ধতি পরিহার করে বাই'আত বা পরামর্শের ভিত্তিতে মনোনীত করা।

২. খলীফা, উযীরসহ কমপক্ষে সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে মুহাক্কিক মুত্তাকী আলেমে দ্বীনকে নির্বাচিত করা। –মুসনাদে আহমদ

৩. খলীফা উজীরসহ সকল বিভাগের প্রধান পুরুষ হওয়া অত্যাবশ্যক।
–বুখারী শরীফ

৪. সকল কাজ-কর্ম পরামর্শ মোতাবেক হওয়া। –হায়াতে মুহাম্মদ

৫. কোনো এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে কুরআনে পারদর্শী লোক দেখে নিযুক্ত করা। –হায়াতে মুহাম্মদ

বিবিধ আদব-কায়দা

১. যে সব রোগে মানুষের ঘৃণা বোধ হয়, তা নিয়ে মানুষের মাঝে যাওয়া উচিত নয়।

২. কুলক্ষণ, কুযাত্রা, অশুভ ইত্যাদি মানা বা বিশ্বাস করা এক প্রকারের শিরক।

৩. ভাগ্য গণনা করা, ভাগ্য নির্ণয় করা, ভবিষ্যতের কথা বলা, জ্বীন তাবে করা ইত্যাদি কাজে ঈমানের ক্ষতি হয়।

৪. যা নিজের জন্য পসন্দ করবে, তা-ই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পসন্দ করবে।

৫. অনুমতি ছাড়া অন্যের কাপড় দিয়ে হাত মুছবে না, হয়ত সে মনে কষ্ট পেতে পারে।

৬. সকলের সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করবে, হাসিমুখে কথা বলবে।

৭. এরকম কথা কখনও বলবে না যে, 'যদি আল্লাহ চান এবং অমুকে চায়' বা 'ওপরে আল্লাহ নিচে তুমি'। হ্যাঁ, এই রকম বলা যেতে পারে, 'যদি আল্লাহ চান এবং তারপর তুমি চাও বা অমুকে চায়।'

৮. ঘর-বাড়ি পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখবে। বাড়ির সামনেও নোংরা রাখবে না। –জামে তিরমিযী

৯. কোনো প্রাণীর ছবি ঘরে রাখা হারাম। –সহীহ বুখারী

১০. নারীদের জন্য যেমন হুকুম আছে যে, অপর পুরুষ যেন তাদের গলার আওয়ায শুনতে না পারে, তেমনই পুরুষেরাও ভালো সুরে গান গেয়ে বা গযল গেয়ে নারীদের শুনাবে না।

১১. গান-বাদ্য কখনও শুনবে না। কারণ শরীয়তের নিষেধ তো আছেই, তা ছাড়া এতে অন্তর একেবারে কালো হয়ে যায়।

১২. সদা সত্য কথা বলবে, মিথ্যা কখনও বলবে না। হ্যাঁ, দুইজন লোকের মধ্যে মন কষাকষি হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে মিল করে দেয়ার মানসে পুরোপুরি সত্য নয়– এমন কিছু কথাও বলা যায়। যেমন একজনের কাছে গিয়ে অন্য জনের প্রশংসাস্বরূপ বলবে, 'সে তো তোমাকে বড় ভালোবাসে, বড় ভালো জানে' ইত্যাদি, এরকম মিথ্যা বলায় দোষ নেই। তবে এক্ষেত্রেও সরাসরি মিথ্যা না বলে কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

১৩. সাক্ষাতে কারও প্রশংসা করবে না, কারও প্রশংসা করার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখবে–

ক) যতোদূর গুণ আছে, তারচেয়ে বেশি বলবে না।

খ) যে বিষয় নিশ্চিতরূপে জানা নেই, তা নিশ্চিত করে বলবে না।

গ) ফাসেক-ফাজেরদের প্রশংসা করবে না।

১৪. কোনো ফাসেকের প্রশংসা করা হলে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কেঁপে উঠে।

১৫. ঘটনাক্রমে নফ্স ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যদি কখনও কোনো গুনাহ্ হয়ে যায়, তবে তা যার-তার কাছে বলে বেড়াবে না। চুপে চুপে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কেঁদে কেঁদে তাওবা করবে বা নিজের পীরের নিকট বলে চিকিৎসা করাবে।

১৬. ঘটনাক্রমে অন্য কারও দ্বারা কোনো গুনাহ্-খাতা হয়ে গেলে মুহাব্বত ও কল্যাণকামিতার সঙ্গে চুপে চুপে নরমভাবে তাকে নসীহত করবে। কিন্তু শুধু তাকে লজ্জা দেয়ার মানসে লোকের মধ্যে বলে শরম দেয়া বা মন্দ বলা বা খোঁটা দেয়া ভারী অন্যায়। মনে ভয় থাকা চাই, হয়তো আমিও ওই গুনাহে পড়ে যেতে পারি। তাছাড়া নিজের দোষ দেখা চাই, অন্যের দোষ দেখে কোনো লাভ নেই, কিন্তু আমাদের চোখে এমনই পর্দা পড়েছে যে, নিজের বড় বড় দোষগুলোও না দেখে পরের সামান্য দোষটাও দেখতে পাই। –জামে তিরমিযী

১৭. মিথ্যা ওয়াদা কখনও করবে না, এমনকি বাচ্চাদেরকে ভুলাবার জন্য মিথ্যা ওয়াদা করবে না। যেমন অনেকে দেয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাদেরকে বলে থাকে, মিঠাই দিবো, বিস্কুট দিবো ইত্যাদি। এরূপ বলবে না। হ্যাঁ, দেয়ার নিয়্যতে বলা যেতে পারে।

১৮. যার যেমন মর্যাদা তার তেমন সম্মান করবে। সকলের সঙ্গে এক রকম ব্যবহার করবে না। –আবু দাউদ

১৯. যে কাজ করবে, খুব চিন্তা করে পরিণামফল ভেবে করবে। কারণ হঠাৎ কাজ করে অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হতে হয়, কিন্তু নেক কাজে দেরী করো না। –শরহুস সুন্নাহ

২০. হিসাব করে খরচ করবে। লোক সমাজে অপ্রিয় হতে হয়, এমন কোনো আচরণ করবে না। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করবে। –বায়হাকী

২১. দেনা-পাওনা, দাবি-দাওয়া মাফ করিয়ে রাখবে, নতুবা কিয়ামতের দিন বড়ই মসীবতে পড়তে হবে। –সহীহ বুখারী

২২. মানুষকে নসীহতের কথা বলতে থাকবে। হ্যাঁ, একান্ত যদি শোনার আশা না থাকে বা উল্টা কষ্ট দিবে এরূপ আশঙ্কা থাকে, তবে চুপ করে থাকা জায়েয আছে, কিন্তু মন্দকে সর্বদা মন্দই মনে করতে থাকবে। মানুষ শরীয়তের কথা শুনে না দেখে তাদের মতো হওয়া যাবে না।

–জামে তিরমিযী

২৩. কোনো জীবকে যবেহ্ করতে হলে ছুরি খুব ধার দিয়ে নিবে, কষ্ট দিয়ে মারবে না। গলা ছিঁড়ে বা গাল চেপে মারলে জানোয়ারের ভয়ানক কষ্ট হয়, এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা এমনটি হারাম করেছেন। –সহীহ মুসলিম

২৪. যে নিজে পদপ্রার্থী হয়, সে অনুপযুক্ত এবং স্বার্থপর। পক্ষান্তরে যে পদ ও দায়িত্ব থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আশা করা যায় যে, বিচারে সে-ই বেশি ন্যায়পরায়ণতা এবং সাধুতা দেখাবে। অতএব, তাকেই দায়িত্ব ও পদ দেয়া উচিত। –সহীহ বুখারী

২৫. ক্রীড়া-কৌতুকরূপে ঢিল বা গুলাল মারা জায়েয নয়, কারণ হয়তো কারও গায়ে লাগতে পারে। –জামে তিরমিযী

২৬. দা, ছুরি বা তরবারি ইত্যাদি দ্বারা হাসি-তামাশারূপেও কারও দিকে ইশারা করবে না। কারণ হয়তো হাত থেকে ছুটে গিয়ে গায়ে লাগতে পারে। –সহীহ বুখারী

২৭. পাখির বাসা থেকে বাচ্চা ধরে এনে তাদের মা-বাপকে কষ্ট দেয়া জায়েয নয়। –আবু দাউদ

২৮. নেশার জিনিস অল্প ব্যবহার করাও নাজায়েয।

২৯. শরীক হয়ে কোনো কাজ করলে সকলের মন সরল থাকা দরকার এবং দিয়ানতদারী ও আমানতদারীর সঙ্গে সব কাজ করবে, নতুবা বরকত উঠে যাবে।–আবু দাউদ

৩০. জুলুম করে, লজ্জায় শরমে ফেলে, নিজের সরদারি বা বড় মানুষি দেখিয়ে যা কিছু নেয়া হয়, তা হারাম। স্মরণ রাখবে– হালাল শুধু সেই জিনিস যা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে দেয়া হয়।

৩১. হাসি তামাশা করে কারো কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখবে না বা নিয়ে আসবে না। –জামে তিরমিযী

৩২. অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করবে না। বিশেষত আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে অঙ্গীকার করে যদি তা ভঙ্গ করা হয়, তবে তার ফরিয়াদি হবেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। –সহীহ বুখারী

৩৩. শরীয়ত মোয়াফেক ঝাড়-ফুঁক করে বা তা'বীয দিয়ে কিছু নযরানা নেয়া জায়েয আছে। –আবু দাউদ

৩৪. এক সন্তানকে কোনো জিনিস দিলে, তবে অন্য সন্তানদেরকেও সেইরূপ দিবে, বে-ইনসাফী করবে না। –সহীহ বুখারী

৩৫. এক কাপড়ের নিচে দুইজন পুরুষ বা দুইজন মেয়েলোক শোয়া বড়ই খারাপ এবং লজ্জার কথা।

রাগ স্তিমিত করার সুন্নাত তরীকা

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ উঠলে বসে পড়তেন। –যাদুল মা'আদ

২. আর বসা অবস্থায় রাগ উঠলে তিনি শুয়ে পড়তেন। –যাদুল মা'আদ
আর এ দু'আ পড়তেন–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)

রাসূলে পাক সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রাগ অবস্থায় এ দু'আ পাঠ করবে, তার কাছ থেকে শয়তান দূরে সরে যাবে, তার রাগ থেমে যাবে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মঙ্গল লাভ হবে। –বুখারী, মুসলিম

৩. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি এমন একটি দু'আ জানি যা পাঠ করলে রাগ দূরীভূত হয়ে যাবে। সে দু'আটি এই– اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

(আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি।)

- সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৮৩; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৫২

সফর সম্পর্কীয় সুন্নাত ও আদব

১. সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে এবং সফর থেকে ফিরে আসার পর দুই রাকা'আত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

২. যথাসম্ভব জামা'আতবদ্ধ হয়ে সফরে যাওয়া উত্তম। একাকী সফরে যাওয়া উচিত নয়।

৩. সফরসঙ্গী একাধিক হলে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া সুন্নাত।

সফরের নিয়্যত করলে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَبِكَ اَحُوْلُ وَبِكَ اَسِيْرُ.

-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৯৬

সওয়ার হওয়ার সময় পড়বে– بِسْمِ اللّٰهِ 'বিসমিল্লাহ'।

সতর্কতা : বিদেশে গিয়ে গোশত খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাণী হালাল কিনা এবং শরঈ পন্থায় যবেহ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।

- ট্রেন, গাড়ি বা বিমান পথে সফর হলে এবং পথিমধ্যে উযূর ব্যবস্থা না থাকলে সফরের প্রস্তুতির সময় তায়াম্মুমের জন্য সামান্য পরিমাণ মাটি নিয়ে নেয়া উচিত।

ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. বিসমিল্লাহ বলে দরজা খুলবে।

২. নিম্নের দু'আটি পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

(মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করে তাঁরই নামে শুরু করলাম, তিনি ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।)-জামে তিরমিযী : ৩৪২৬; সুনানে আবু দাউদ : ৫০৯৭

৩. বাম পা দিয়ে বের হবে।

৪. বের হয়ে আয়াতুল কুরসী পড়বে।

রাস্তায় চলার সুন্নাত ও আদবসমূহ

১. ডান দিক দিয়ে চলা।

২. দৃষ্টি নত করে চলা।

৩. কিছুটা সম্মুখপানে ঝুঁকে চলা।

৪. হাত পা ছুড়ে ছুড়ে অহঙ্কারের সঙ্গে চলবে না।

৫. রাস্তা অতিক্রম করার সময় যথাসম্ভব দ্রুত চলবে।

৬. রাস্তায় কষ্টদায়ক কিছু পেলে তা সরিয়ে দিবে।

৭. মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাত হলে সালাম দেয়া এবং সালামের উত্তর দেয়া।

৮. রাস্তায় চলার সময় লাঠি হাতে রাখা সুন্নাত।

৯. উপর দিকে উঠার সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলা, নিচের দিকে নামার সময় বাম পা আগে বাড়ানো এবং 'সুবহানাল্লাহ' বলা, সমতল স্থান দিয়ে চলার সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সুন্নাত।

১০. বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দেয়া।
১১. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলার সময় কিছুটা সম্মুখ পানে ঝুঁকে চলতেন। দেখলে মনে হতো যেন তিনি উপর থেকে নিচের দিকে অবতরণ করছেন।
১২. স্ত্রীলোক যদি কোনো বিশেষ প্রয়োজনবশত বোরকা পরে বাইরে যায়, তবে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না, বরং রাস্তার কিনারা ধরে চলবে।

সফরে রওয়ানা হয়ে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ.

(হে আল্লাহ! এ সফরকে আমাদের জন্য সহজ করে দাও, এ সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফর সঙ্গী, তুমিই পরিবারের প্রতিনিধি, হে আল্লাহ! সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও পরিবার, ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে মন্দ পরিবর্তন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) -মুসলিম, খ.২, পৃ. ৯৭৮, হাদীস নং ১৩৪২

সফরে নিরাপত্তার আমল

সফর অবস্থায় মাঝে মাঝে সূরা কাফিরূন, সূরা নাসর, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়বে। প্রত্যেক সূরার আগে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে।

হযরত জোবায়ের ইবনে মুতইম (রাযি.) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় উক্ত ৫টি সূরা মাঝে মধ্যে পড়বে, সে সফর অবস্থায় সমস্ত বিপদাপদ থেকে হেফাযতে থাকবে এবং তার সফর কামিয়াব হবে। –হিসনে হাসীন

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

(হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ জনপদ ও এ জনপদে যা কিছু আছে সেগুলোর কল্যাণ কামনা করছি। এবং তোমার কাছে এ জনপদ ও এ জনপদে যা কিছু আছে সেগুলোর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।)

অথবা এই দু'আ পড়বে– أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

(আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার মাধ্যমে তার সৃষ্ট অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।) -সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৮; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৩৭

কোনো বসতিতে বা শহরে অবস্থানকালে এই দু'আ পড়বে– (তিনবার)

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا.

(হে আল্লাহ! এ জনপদে আমাদেরকে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ! এ জনপদের ফল দ্বারা আমাদেরকে রিযিক দিন। আমাদেরকে এর অধিবাসীদের কাছে প্রিয় করে দিন এবং অধিবাসীর সৎ-ব্যক্তিদেরকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন।) -মুজামে আওসাত, তবারানী, হাদীস নং ৪৭৫৫

স্থলযানে আরোহণের সুন্নাত

১. স্থলযানে আরোহণ করার সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে।

২. আরোহণের পর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে এই দু'আ পড়বে–

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

(ওই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি! যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবো।)

৩. অতঃপর তিনবার 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলবে।

৪. তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

৫. একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পড়বে।

৬. তারপর নিম্নের দু'আটি পড়বে :

سُبْحَانَكَ اِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

(হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে বলছি, নিশ্চয় আমি নিজের আত্মার প্রতি অবিচার করেছি, কাজেই তুমি আমায় ক্ষমা কর। কেবল তুমিই পার গুনাহ মার্জনা করতে।) –গুলজারে সুন্নাত, আহকামে যিন্দেগী : পৃ. ৪৯০

নৌযানে আরোহণের সুন্নাত

১. প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পা দিয়ে আরোহণ করবে।

২. তারপর এই দু'আ পড়বে–

وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি, কিয়ামতের দিন সারা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয়। এবং আসমান ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র, আর এরা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।)

৩. যানবাহন থেকে নামার পূর্বে এই দু'আ পড়বে–

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(হে প্রতিপালক! তুমি আমাকে বরকতময় স্থানে অবতারিত কর। তুমিই উত্তম অবতীর্ণকারী।) -আলআওসাত, ইবনে মুনযির ২/৯৯

৪. সকল যানবাহন থেকে নামার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে নামবে।

উড়োজাহাজে আরোহণ করার আদব

উলামায়ে কিরাম বলেন, উড়োজাহাজ যখন মাটিতে থাকে তখন গাড়ির হুকুম। তাই উড়োজাহাজ রানওয়েতে চলার সময় এই দু'আ পড়বে–

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

উড়োজাহাজ যখন আকাশে উড়বে তখন জাহাজে চলার হুকুম। তাই এই দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(আল্লাহর নামেই-এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমা পরায়ণ, মেহেরবান। তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি, কিয়ামতের দিন সারা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয়। এবং আসমান ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র, আর এরা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।)

নিজ ঘরে প্রবেশের সুন্নাত তরীকা

১. সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে এই দু'আ পড়া–

اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

২. অনুমতি না নিয়ে কারও বাড়ির মধ্যে বা কামরার মধ্যে প্রবেশ করবে না। তিনবার ডেকে যদি অনুমতি না পাওয়া যায়, তবে ফিরে আসবে, কিন্তু অসন্তুষ্ট হবে না। হয়ত পুরুষ লোক বাড়িতে নেই। বা এ-সময় কোনো কাজে লিপ্ত আছে, যে অবস্থায় জবাব দেয়া সম্ভব নয়। এইরূপ অনেক কিছু হতে পারে।

অনুরূপ নিজের ঘরেও আওয়ায না দিয়ে প্রবেশ করবে না। হয়ত কেউ বেপর্দা থাকতে পারে বা কোনো গায়রে মাহরাম আওরত ঘরে থাকতে পারে। অবশ্য কেউ সাধারণ মজলিসে বা খোলা জায়গায় একাকি বসা থাকলে তার নিকট যাওয়ার জন্য ইজাযত নেয়ার দরকার নেই।

৩. বাড়ির ভিতর থেকে বা কামরার ভিতর থেকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তবে নিজের নাম-পরিচয় পরিষ্কার করে বলবে, শুধু 'আমি' বলবে না।

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করতেন না; বরং এভাবে আসতেন যে, পূর্ব থেকে গৃহবাসী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কথা বুঝতে পারতো।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের সময় আগে ডান পা দিতেন, বিসমিল্লাহ পড়তেন এবং বলতেন, এর বরকতে শয়তান ঘরে ঢুকবে না।

৬. ঘরে প্রবেশের সময় দরজায় সালাম দিবে, অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে ডান পা দিয়ে ঢুকবে এবং এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

(হে আল্লাহ! তোমার কাছে উত্তম প্রবেশস্থল ও উত্তম বাহিরাগমনস্থল কামনা করছি। আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামেই বের হব। আর আমাদের পালনকর্তা আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা রাখি।) -সুনানে আবু দাউদ : ৫০৯৮

৭. এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দিতেন।

-বায়হাকী শরীফ

৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আনাস (রাযি.)-কে ঘরে কেউ উপস্থিত না থাকলেও ফেরেশ্‌তাদের নিয়্যত করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ বলে, সালাম দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যতোবার ঘরে যাবে, ততোবার অনুমতি নিবে এবং সালাম দিবে, যদিও সেটি আপন মায়ের ঘর হয়। –যাদুল মা'আদ

১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে গিয়ে কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। –যাদুল মা'আদ

১১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি বেলায় (যখন লোকেরা ঘুমিয়ে যেতো) ঘরে আস্তে আস্তে প্রবেশ করতেন। –যাদুল মা'আদ

১২. আর এতো আস্তে সালাম দিতেন, যাতে কারো নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়, যা কেবল জাগ্রত ব্যক্তিই শুনতে পেত।–যাদুল মা'আদ

১৩. আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি মনে মুচকি হাসতে হাসতে গৃহে প্রবেশ করতেন। –উসওয়ায়ে হাসানাহ

১৪. সফর থেকে ফিরার সময় পরিবার-পরিজনের জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসা সুন্নাত।

১৫. সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ঘরে প্রবেশের পূর্বে দুই রাকা'আত নফল নামায পড়ে নিবে।

বিদায়কালীন সুন্নাত

কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়বে–

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ.

(তোমার দ্বীন, আমানত ও তোমার কাজের শুভ পরিণতিকে আল্লাহর কাছে আমানত রাখছি।) -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬০৩; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদীস নং ১০২৭৬

যিনি বিদায় নিবেন তিনি এ দু'আ পড়বেন–

اَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِىْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

(তোমাকে আল্লাহর কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি, যাঁর কাছ থেকে আমানত খোয়া যায় না।) -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৮২৫

চিকিৎসা করার সুন্নাত তরীকা

- চিকিৎসা করা আল্লাহ পাকের হুকুম। যেমন– হাদীস শরীফের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে- إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللهِ 'চিকিৎসা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত।' –মুসতাদরাকে হাকেম

- চিকিৎসা করা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত।
  অতএব, আমরা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত আদায়ের জন্য চিকিৎসা করব।

- চিকিৎসক দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান ও টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য চিকিৎসা করবেন না; বরং আশরাফুল মাখলুকাত মানব-জাতির খেদমত ও সেবা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নিয়্যত রাখবেন। সুতরাং গরীব-ধনীর চিকিৎসার ব্যাপারে তারতম্য করবেন না। কেউ বাকি চাইলে বাকি দিবে এবং তাকে পরিশোধের সুযোগ দিবেন। অপারগ হলে ক্ষমা করে দিবেন।

- চিকিৎসকের এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হবে যে, রোগ নিরাময়ে আমার কোনোই শক্তি নেই। সকল শক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আমি রোগ নিরাময়ের উসীলা মাত্র।

- এ কথারও একীন থাকতে হবে যে, আমার ঔষধের কোনো ক্ষমতা নেই। ঔষধ কার্যকর হওয়া বা না হওয়া একমাত্র আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর নির্ভরশীল।

- কোনো রোগই দুরারোগ্য নয়– এ বিশ্বাসের সঙ্গে চিকিৎসা করা চাই। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,
  আল্লাহ পাক এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি, যার জন্য কোনো প্রতিষেধক পাঠাননি। –সহীহ বুখারী

- রোগীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত দু'আ বলে সান্ত্বনা দেয়া সুন্নাত-

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ

'কোনো চিন্তা নেই, ইনশা-আল্লাহ তুমি অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবে।'

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৫৬

এ জাতীয় বিভিন্ন সান্ত্বনামূলক কথা বলা, যাতে তার মন ভেঙ্গে না যায়।

- কোনো রোগীর কঠিন রোগ দেখলে সে রোগকে গাল-মন্দ করবে না। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো রোগকে গালি দিও না। কারণ এটা আদম সন্তানের গুনাহসমূহ এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমনভাবে কামারের ভাট্টি লোহা থেকে মরিচা এবং ময়লা পরিষ্কার করে ফেলে। –সহীহ মুসলিম

- রোগীর রোগ নির্ণয় করতে পারলে তাকে ঔষধ দিবে, অন্যথায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকট পাঠিয়ে দিবে। খামখেয়ালী করে চিকিৎসা দিবে না। কেননা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যদি কোনো অনভিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসার কারণে রোগীর কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়, তবে সে রোগীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব উক্ত ডাক্তারের উপর বর্তাবে (উপরন্তু রোগী মারা গেলে সে খুনী বলে বিবেচিত হবে)। –আবু দাউদ

- কালিজিরা ও মধু দ্বারা চিকিৎসা করা সুন্নাত।

- হারাম বস্তু দিয়ে তৈরি ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা হারাম। অধিকন্তু হারাম ঔষধের মধ্যে আল্লাহ পাক আরোগ্য রাখেননি; বরং এটা নিজেই রোগের কারণ।

- নাপাক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। -জামে তিরমিযী

- রোগীকে ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নামায আদায়ান্তে দু'আ ও সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা করার পরামর্শ দেয়া সুন্নাত।

রোগী দেখার সুন্নাত তরীকা

- রোগী দেখতে গিয়ে এই দু'আ সাতবার পড়বে এবং রোগী ও উপস্থিতজনেরা আমীন বলবে–

اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

(আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে তোমার সুস্থতা কামনা করছি।)

-জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০৮৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩১০৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৯৭৫

অতঃপর এ দু'আ পাঠ করা বা-এর অর্থ বলে রোগীকে সান্ত্বনা দেয়া–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَآءَ اللهُ.

(চিন্তা করবেন না ইনশা-আল্লাহ দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।)

- হাতে বা কপালে হাত রেখে বলবে, আপনি কেমন আছেন? অতঃপর এ দু'আ পাঠ করা সুন্নাত–

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآءُكَ شِفَآءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

(হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি আরোগ্য দান কর। তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী। তোমার সুস্থতা ছাড়া কোনো সুস্থতা নেই। (কাজেই তুমি অসুস্থতা দূর করে) এমন সুস্থতা দাও যেন কোনো রোগ-ব্যাধি না থাকে।)

- শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৯২০১

- অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়া ও আশাব্যঞ্জক কথা বলা সুন্নাত।
- রোগীকে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসা সুন্নাত, যাতে তার এবং সেবা-শুশ্রূষাকারীদের অসুবিধা না হয়।
- হালাল ঔষধপত্র সেবন করায় শরীয়তে কোনো নিষেধ নেই; বরং হুকুম আছে।
- রোগীকে খাওয়ার জন্য বেশি জোর করবে না। –তিরমিযী
- হারাম জিনিস ঔষধে ব্যবহার করবে না। –আবু দাউদ
- শরীয়তের বরখেলাফ তা'বীয-তুমার, ঝাড়-ফুঁক, জাদু-টোনা ইত্যাদি কিছুতেই ব্যবহার করবে না।
- কারও উপর নযর লাগলে যার নযর লাগার সন্দেহ হয়, তার মুখ হাত (কনুই সমেত), হাঁটু এবং ইস্তেঞ্জার জায়গা ধুইয়ে সেই পানি যার উপর নযর লেগেছে তার উপর ঢেলে দিবে, আল্লাহ চান তো ভালো হয়ে যাবে। –শরহুস সুন্নাহ

- পাকস্থলী ঠিক থাকলে প্রায়ই অসুখ-বিসুখ হয় না। সুতরাং পাকস্থলী যাতে ভালো থাকে সেই বিষয় যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। কারণ পাকস্থলী খারাপ হলে নানা প্রকারের রোগ-পীড়া দেখা দেয়।

রোগীর সেবাযত্ন করার ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ লোককে দেখার জন্য অথবা আপন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যায়, তখন একজন ফেরেশতা ডেকে বলে, তুমি বরকতময়, তোমার চলা বরকতময় আর তুমি জান্নাতে ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। –জামে তিরমিযী

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের খোরফার ভিতরে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের খোরফা কী? ইরশাদ করলেন, জান্নাত থেকে আহরিত ফল।

–সহীহ মুসলিম

হযরত আলী (রাযি.) বলেন, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করতে শুনেছি, যে মুসলমান কোনো অসুস্থ মুসলমানকে সকালে দেখতে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আর যে সন্ধ্যায় দেখতে যায় সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে এবং জান্নাতে সে একটি বাগান লাভ করে।–জামে তিরমিযী

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি অসুস্থ ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তাকে বলবে, সে যেন তোমার জন্য দু'আ করে। কেননা তার দু'আ ফেরেশতাদের দু'আর মতো (কবূল হয়)। –ইবনে মাজাহ

হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্তকে সান্ত্বনা দেয়, সে উক্ত বিপদগ্রস্ত লোকের মতো সওয়াব পায়। –জামে তিরমিযী

বিবিধ সুন্নাত

সন্তান লালন-পালন সম্পর্কে নির্দেশনা ও সুন্নাতসমূহ

সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ তা'আলার দান ও তাঁর আমানত মনে করে তাদের যথাসাধ্য সেবা যত্ন করা, তাদের প্রয়োজনাদি পুরা করা, স্নেহ-মমতায় লালন-পালন করা, তাদেরকে বোঝা মনে না করা এবং উপযুক্ত তা'লীম তরবীয়তের ব্যবস্থা করে তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ নির্দেশনা রয়েছে।

শিশু জন্মকালীন পাঁচটি সুন্নাত

১. ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া।
২. 'তাহনীক' অর্থাৎ কোনো বুর্যূগ বা আল্লাহওয়ালার মুখের চিবানো খেজুর বা মিষ্টিদ্রব্য বাচ্চার জিহ্বার তালুতে দেয়া।
৩. উত্তম নাম রাখা।
৪. সপ্তম দিনে মাথার চুল মুণ্ডানো ও হাত-পায়ের নখ কাটা এবং চুলের ওজন পরিমাণ সোনা বা রূপা অথবা অন্যকিছু সদকা করা।
৫. আকীকা করা।

আকীকার সুন্নাতসমূহ

১. ছেলে বা মেয়ে জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিবসে না করতে পারলে যখনই করুক না কেন যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে।
২. ছেলে হলে আকীকায় দুইটি বকরী বা ভেড়া যবেহ করা, আর মেয়ে হলে একটি বকরী বা ভেড়া যবেহ করা। অথবা কুরবানীর গরু ইত্যাদি বড় পশুর মধ্যে ছেলের জন্য দুই অংশ নেয়া আর মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরী বা কুরবানীর এক অংশ দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর আকীকা না করলেও কোনো দোষ নেই। তবে আকীকা করা সুন্নাত।
৩. যে জন্তু দ্বারা কুরবানী দুরস্ত তার দ্বারাই আকীকা দুরস্ত।

৪. আকীকার প্রাণী জবেহ করার পূর্বে এই দু'আ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ. اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

(হে আল্লাহ! এই জন্তু আমার ছেলের আকীকা। জন্তুর রক্ত, গোশত, হাড্ডি, চামড়া ও চুল আমার ছেলের রক্ত, গোশত, হাড্ডি, চামড়া ও চুলের বিনিময়। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর অভিমুখি হচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত আমার ইবাদত আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য- তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি, আমিই আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে প্রথম।

হে আল্লাহ! এটা আপনার দেয়া পশু আপনারই জন্যই (জবেহ করছি), আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি মহান)

৫. আকীকার গোশত মাতা, পিতা, দাদা, দাদী, নানা, নানীসহ সকলেই ভক্ষণ করতে পারে।

শিশু সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে। –সুরা তাহরীম : ৬

হযরত আমর ইবনে শুআইব স্বীয় পিতা এবং তিনি স্বীয় দাদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল আস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের সন্তানদের সাত বছর হলে নামাযের আদেশ কর। আর দশ বছর হয়ে গেলে নামাযে অলসতা করলে শাস্তি দাও। আর এ সময় তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। –আবূ দাউদ

একটি সু-সন্তান লাভ করার জন্য, সন্তানকে সচ্চরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর জন্য পিতা-মাতা উভয়ের দায়িত্ব রয়েছে। সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই ভালো

সন্তানের পিতা হওয়ার ফিকির থাকতে হবে। আর সেই ফিকির ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত।

প্রথমত সু-সন্তান পেতে হলে একটি সৎ ও নেককার মেয়েকে বিবাহ করতে হবে। গাধার পেটে যেমন ঘোড়া জন্ম লাভ করে না এবং ঘোড়ার পেটে গাধা জন্ম হয় না। কাজেই ভালো নারীর গর্ভেই ভালো সন্তানের বেশি আশা করা যায়। কেননা সন্তান গর্ভে আসার পূর্ব থেকেই মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মায়ের মন মানসিকতা ও মায়ের আচার-আচরণ সবকিছুর প্রভাব পড়ে থাকে গর্ভস্থ সন্তানের উপর। তাই সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে সবধরনের কু-চিন্তা ও পাপের চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং নেক চিন্তা-ভাবনায় থাকতে হবে। তাহলে সন্তানের উপর তার প্রভাব পড়বে।

* শিশু-কিশোরদের সামনে বা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার এমন হওয়া উচিত, যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয়।

● শিশু অবুঝ হলেও এবং কোনো কথা ও আচরণ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে না পারলেও ভালো-মন্দ প্রভাব তার মনে পড়ে এবং তার মন-মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখে। শিশুর মন ভিডিও-এর ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে, তার একটা চিত্র তার মনে অঙ্কিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে, শিশুকালে যেসব চিত্র তার মনে অঙ্কিত হয়েছিল, এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শুধু এমন সব বিষয়ই তার সামনে বলতে হবে বা করতে হবে, যাতে তার মন-মানসিকতা ভালো ও উন্নত হয়ে উঠে। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত–

১. অবুঝ শিশু জাগ্রত থাকা অবস্থায় তার সামনে মাতা-পিতা অশ্লীল কথাবার্তা ও যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না। অন্যথায় তার মনে নির্লজ্জতা সৃষ্টি হতে পারে।

২. শিশুর সঙ্গে অনাদর-অবহেলার আচরণ করা যাবে না। তাহলে তার মন নিষ্ঠুর ও বিকারগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে।

৩. আবার শিশুকে মাত্রাহীন আদর সোহাগ করলে সে লাগামহীন হয়ে যেতে পারে।

৪. শিশুদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করালে তাদের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা গঠিত হবে। অন্যথায় তাদের মধ্যে নোংরা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

৫. শিশু-কিশোরদেরকে অতি বেশি জাঁকজমক ও বিলাসিতায় লালন-পালন করলে তাদের মধ্যে বিলাসী মনোভাব সৃষ্টি হবে।

৬. শিশুদের সব জিদ, সব দাবি পূরণ করতে নেই। তাহলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে অন্যায় জিদ ও অসঙ্গত দাবি পূরণ থেকে বিরত থাকা উচিত। আবার তাদের কোনো দাবিই যদি পূরণ না করা হয়, তাহলে তাদের মন ছোট হয়ে যাবে এবং তারা সঙ্কীর্ণ মানসিকতার অধিকারী হবে।

৭. অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দিবে না। অন্যথায় তাদের চরিত্রের কু-প্রভাব এদের মনের উপর পড়বে।

৮. ছেলেদেরকে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেয়া মোটেও উচিত নয়।

৯. শিশুদেরকে বাঘের ভয়, শিয়ালের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখাবে না। কারণ এতে তারা ভীরু কাপুরুষ প্রকৃতির হয়ে যেতে পারে।

১০. শিশুরা অন্যায় করলে আল্লাহর ভয় দেখাবে, জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখাবে। এর দ্বারা তাদের মনে খোদাভীতি সৃষ্টি হবে। অন্যায় কাজে বাধা না দিলে অন্যায়কে তারা ন্যায় বলে ভাববে।

১১. ভালো কাজের জন্য আল্লাহর খুশি হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নিয়ামত লাভের কথা শুনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

১২. আল্লাহ সবকিছুই দেখেন, শুনেন ও জানেন– এ বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে আল্লাহমুখী চেতনা সৃষ্টি হবে।

১৩. শিশুদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শুনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা তৈরি হবে।

১৪. শিশুদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে। তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

১৫. শিশুরা ভালো কাজ করলে বা ভালো পড়া-লেখা করলে তাদেরকে সামান্য পুরস্কার এবং বাহবা দিলে ভালো কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এর বিপরীতে মন্দ কাজ করলে অবস্থা অনুযায়ী হালকা তিরস্কার করবে ও সামান্য শাস্তি দিবে। এতে তাদের মনে মন্দ কাজের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হবে।

১৬. কোনো কিছু ইচ্ছাকৃত ভেঙ্গে ফেললে কিংবা কাউকে মেরে বসলে সঙ্গে সঙ্গে উপযোক্ত শাস্তি দিবে যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করে। এসব ব্যাপারে প্রশ্রয় দেয়া বাচ্চাদের ধ্বংসের শামিল।

১৭. সন্ধ্যা হলেই ঘুমুতে দিও না।

১৮. সকালে জাগার অভ্যাস গড়ে তুলো।

১৯. সাত বছর বয়স হলেই নামাযের অভ্যাস গড়াও।

২০. শিক্ষার বয়স হলে প্রথমে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে।

২১. মকতব / মাদরাসায় ঠিক মতো যায় কি না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২২. মাঝে মাঝে আউলিয়া সাহাবা (রাযি.) গণের জীবন কাহিনী শুনাতে থাক।

২৩. যে কোনো লেখকের বই পুস্তক পড়তে দেয়া যাবে না। আজগুবী গল্প কাহিনী যেমনঃ ঠাকুর মার ঝুলি, মিথ্যা কল্প কাহিনী ইত্যাদি।

২৪. স্কুল থেকে এলে কিছু খেলা-ধুলা করতে দেয়া উচিৎ। অন্যথায় সমস্যা বেড়ে মন-মানসিকতা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যে খেলায় পাপ নাই সে খেলা খেলতে পারে।

২৫. পুতুল, জীব-জানোয়ারের আকৃতি এ-ধরনের খেলনা কিনে না দেয়া।

২৬. টি, ভি. ভি, সি, ডি, মোবাইল ফোন, গান বাদ্যের কোনো যন্ত্র না কিনে দেয়া বরং নিজেরা এ সমস্ত জিনিষ ব্যবহারে সর্তক করা। নিজ ঘরকে এ সমস্ত গোনাহের আসবাব-উপকরণ থেকে মুক্ত রাখা। অন্যথায় এর মারাত্মক ছোবল থেকে বাঁচা দুস্কর।

২৭. বাচ্চাদেরকে হাতের কাজও শিখাতে হবে যাতে প্রয়োজনে উর্পাজনক্ষম হতে পারে।

২৮. মেয়েদের জরুরী দ্বীনী ইলমের সঙ্গে প্রয়োজন মাফিক দুনিয়াবী বিদ্যা শিখানো। যাতে চিঠি পত্র লিখতে পারে, সংসারের হিসাব-নিকাশ রাখতে পারে। সেলাই করা, রান্নার কাজ ইত্যাদি শিখানো।

২৯. মায়েদের উচিত বাচ্চাদের পিতার প্রতি ভয় সৃষ্টি করা।

৩০. বাচ্চাদের কোনো কাজ গোপনে করতে দিবে না। যেমন- খানা-পিনা, খেলাধুলা কিংবা যে কোনো ধরনের কাজই হোক না কেন। যখন গোপনে করবে খারাপ মনে করে করবে। তার মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

৩১. ছেলেদের কষ্টের কাজের দায়িত্ব দিবে। তাতে স্বাস্থ্য ও সাহস বাড়বে। অলসতাও সৃষ্টি হতে পারবে না।

৩২. চলাফেরার ব্যাপারে সতর্ক করবে যে, দ্রুত চলবে না বা উর্ধ্বমুখি হয়ে চলবে না।

৩৩. সন্তানকে বিনয়ী করে গড়ে তোলা। যাতে কথায়, চাল-চলনে, আচার ব্যবহারে দাম্ভিকতা প্রকাশ না পায়। সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে পোশাক-পরিচ্ছদ, বংশ ইত্যাদি নিয়ে গর্ব না করে।

৩৪. কখনও তাকে সামান্য কিছু হাত খরচ দিবে যাতে খরচ করে। এ অভ্যাস গড়ে তোলা যাতে লুকিয়ে কোনো কিছু না নেয়।

৩৫. সন্তানকে খানা খাওয়ার, ঘুমানো-সহ সকল কাজের সুন্নাত পদ্ধতি শিখাতে হবে।

৩৬. পিতা-মাতাসহ কার কি হক ও হুকুকুল ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে।

৩৭. দানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদের হাত দ্বারা দান- খয়রাত করানো।

৩৮. শিশুদের সঙ্গে ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করতে হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রাযি.) বলেন, একদিন আমার মা আমাকে কাছে ডাকলেন এবং বললেন এদিকে এসো, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেবো। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের গৃহে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমার মাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দেয়ার অঙ্গীকার করলে? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে চাই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-কথা শুনে তাকে বললেন, মনে রেখো তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমল নামায় একটি মিথ্যার গুনাহ লিখা হতো। –আবু দাউদ

৩৯. সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া-শুনার জন্য ভর্তি করবেন না।

৪০. মাঝে মধ্যে আহলুল্লাহ বুর্যূগগণের সোহবতে ও মজলিসে নিয়ে যাওয়া।

৪১. প্রতিনিয়্যত পিতা-মাতা প্রতি ওয়াক্ত নামাযান্তে সন্তানের জন্য নিম্নোক্ত দু'আসমূহ করতে থাকবেন।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি হতে চোখের শীতলতা (প্রশান্তি) দান করুন, আর আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের ইমাম (নেতা) বানিয়ে দিন। –সূরা ফুরকান : ৭৪

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

অর্থ– হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর।
–সুরা ইবরাহীম : ৪০

৪২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন চরিত অর্থাৎ সীরাতের কিতাব পাঠ করাবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মশুদ্ধি

যাহের ও বাতেনের ইসলাহ্ জরুরী

মানুষের যাহের ও বাতেন উভয়টির ইসলাহ বা পরিশুদ্ধি জরুরী। ইসলামী শরীয়তে এতোদুভয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যাহেরকে ঠিক করা যেমন জরুরী, শরীয়তের আলোকে বাতেনকে পরিশুদ্ধ করাও তেমনি একান্ত আবশ্যক। এই মর্মে কুরআন পাকে ইরশাদ আছে–

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ.

অর্থ- 'তোমরা যাহেরী বাতেনী সবধরণের গুনাহ পরিত্যাগ কর।'

উপরোক্ত আয়াতে যাহের ও বাতেন উভয়টির পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা যাহের বাতেন উভয়টিকে পরিশুদ্ধ কর।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

"যে ব্যক্তি নিজের আত্মার সংশোধন করেছে সে-ই সফল হয়েছে। আর যে নফসকে কলুষিত করল, সে অকৃতকার্য হল।" –সূরা আশ-শামস, ৯-১০

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ, إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

"সেই দিন (কিয়ামতের দিন) সম্পদ এবং সন্তান কাজে আসবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আসবে।" –সূরা শুআরা ৮৮-৮৯

যে ঈমান ও আকীদার উপর সমস্ত আমলের কবূল হওয়া নির্ভরশীল তা কলবেরই কাজ। কলব বা অন্তর হলো বাদশাহ সদৃশ্য, আর অঙ্গ-প্রতঙ্গ তার বাহিনী বা গোলাম। যদি বাদশাহ ঠিক ও সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তার অধীনস্ত সকল লোক নিজে নিজেই তার কথামতো চলতে আরম্ভ করবে।

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই মানব দেহে একটি গোশতের টুকরা রয়েছে, যখন তা ঠিক হয়ে যায় সমস্ত দেহ সুস্থ সঠিক হয়ে যায়। আর যখন তা বিগড়ে যায় তখন সমস্ত দেহ বরবাদ হয়ে যায়। জেনে রেখ সেটিই হলো কলব বা অন্তর।

--সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৯৯

সুতরাং অন্তরের এ গোপন জগৎ মানুষের বাহ্যিক জগতের ভিত্তি।

অন্তর হলো দেহ জগতের বাদশাহ। বাদশাহ যেমন তার অধীনস্ত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারও ঠিক তেমন। যেই জিনিসের ধ্যান-ধারণা আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওই ধ্যান ও খেয়ালের বশীভূত হয়ে কাজে লেগে যায়। চক্ষু দর্শনে, কর্ণ শ্রবণে, হস্ত যুগল তা ধারণে, পদ যুগল সেই দিকে সঞ্চালনে নিয়োজিত হয়। তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। মনের গতিই অর্থাৎ চিন্তা-চেতনাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে কাজ করতে বাধ্য করে। এমনিভাবে অন্তর অসুস্থ হলে তার প্রভাব সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয়ে যায়। তখন চক্ষু দ্বারা অপদৃষ্টি হতে থাকে, বেগানা মেয়ে লোক এবং টিভি, সিডি, সিনেমা দেখতে মন চায়। কান ভালো কথা শুনতে চায় না। গান-বাদ্য, গীবত-শেকায়াত শুনতে ভালো লাগে। যবান ভালো কথা বলতে চায় না। মিথ্যা, গীবত, গালি-গালাজ করতে থাকে, হাত পা ভালো কাজে ব্যবহার হয় না। নেক লোকের সোহবতে যেতে মন চায় না। দ্বীনী কাজও দুনিয়ার স্বার্থ ও লৌকিকতার সঙ্গে হয়। সুতরাং যখন এ অবস্থা হবে তখন বুঝতে হবে যে, আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূহানী ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা করা ফরয। ফরযে কেফায়া না বরং ফরযে আইন। সকলেরই নিজ নিজ অবস্থার আত্মশুদ্ধি করতে হবে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, আলেম হোক বা গাইরে আলেম, তাবলীগের মুবাল্লিগ হোক, আল্লাহর পথের মুজাহিদ হোক, মাদরাসার ছাত্র হোক, কলেজ ভার্সিটির ছাত্র হোক, ব্যবসায়ী হোক, চাকরিজীবি হোক, রাজা হোক মোটকথা সর্বস্তরের মানুষের জন্য অন্তরের চিকিৎসা করা ফরয।

উল্লেখ্য, শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে বটে, কিন্তু তার চিকিৎসা ফরয করা হয়নি। বরং সুন্নাত সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু অপরদিকে

কলবের রোগ তথা অহঙ্কার, রিয়া, হিংসা, না শুকরী, বেসবরী ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয। –মাআরিফুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩৩৫

এ আধ্যাত্মিক রোগসমূহ দূর করা এতো জরুরী যে, এটি ছাড়া মানুষের সমস্ত যিন্দেগীর আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। সংক্ষেপে বিষয়টি হলো, কথায়-কাজে-বিশ্বাসে-যাহেরে-বাতেনে-বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীতে পুরো শরীয়তের অনুসরণ করা ফরযে আইন। এটা ইলমে দ্বীন অর্জন করে হোক বা ওলামায়ে কিরামের সান্নিধ্যে থেকে হোক, বাইয়াত ছাড়া হক্কানী বুর্যূগদের সাহচর্যে থেকে হোক বা সাহচর্য অবলম্বনের পাশাপাশি তাদের কারো হাতে বাইয়াত হয়ে হোক.। তাই তাসাওউফ বা পীর-মুরীদী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে মতানৈক্য করে অথবা পীর-মুরীদীকে মুস্তাহাব মনে করে ইসলাহে নফসকে ভুলে যাওয়া আদৌ ঠিক হবে না। ভালোভাবে বুঝতে হবে ইসলাহের একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম হলো পীর-মুরীদী। এই পদ্ধতি মুস্তাহাব বিধায় আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও আখলাকের ইসলাহ করার কাজটি মুস্তাহাব হবে এমন নয়। বরং এগুলোর ইসলাহ ফরযে আইন। -তাসাউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা-পৃ. ৯৪

হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। ঈমানের দুইটি অংশ।

১. আত্মার ময়লা পরিষ্কার করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অপসন্দনীয় খাসলতগুলো দূর করা।

২. আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় গুণাবলী দ্বারা আত্মার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। মানুষের যাহের-বাতেন উভয়কে দুরস্ত করার নাম তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধি।

যাহেরকে দুরস্ত করার অর্থ এই যে, নামায রোযা ইত্যাদি যে সব আমল যাহেরী শরীরের দ্বারা করতে হয় এবং করা জরুরী, সেগুলো সুন্নাত মোতাবেক সমাধা করা। বাতেনকে দুরস্ত করার অর্থ এই যে, দিলের মধ্যে খাঁটিভাবে ইসলামের আকীদা রাখা এবং যাবতীয় সদগুণ দ্বারা দিলকে সুসজ্জিত করা। যেমন রিয়া ইসলাহ করে ইখলাস পয়দা করা ইত্যাদি।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির মূলকথা হলো, যখন কারো অন্তর শরঈ বিধান পালনে উদাসীনতা সৃষ্টি হয় তখন তার বিরুদ্ধাচরণ করা অর্থাৎ হিম্মত করে আমলে ব্যাপৃত থাকা। অনুরূপ গুনাহ বর্জনের ব্যাপারে যখন উদাসীনতা আসে তখন হিম্মত করে গুনাহ বর্জন করা। এই হিম্মত পয়দা হয় বুর্যূগানে দ্বীনের সোহবতের মাধ্যমে। আর যদি

বুর্যূগানে দ্বীনের সংশ্রব গ্রহণের সুযোগ না হয় তাহলে তাদের কিতাবাদী মুতালা'আ দ্বারাও হিম্মত পয়দা হয়। হিম্মতের দ্বারা সমস্ত কাজ সহজ হয়ে যায়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) ইরশাদ করেছেন, তরীকত অর্থাৎ তাসাওউফ বিহীন শরীয়ত একান্তই একটি দর্শন। আর শরীয়তবিহীন তরীকত ধর্মহীনতা ও খোদাদ্রোহিতা ছাড়া কিছু নয়।

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহ.) ইরশাদ করেন, যার কাজের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক নয় অর্থাৎ শরীয়ত সুন্নাতের অধীনে নয় তার বাতেন অর্থাৎ অভ্যন্তর কখনো পবিত্র হতে পারে না।

তরীকতের উদ্দেশ্য বাতেন সংশোধন

মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যে কোনো ক্ষেত্রেই যখন রসম রেওয়ায প্রাধান্য লাভ করে তখন প্রকৃত বিষয় ঢাকা পড়ে যায়। আধ্যাত্মিকতা ও তরীকতের লাইনে প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু যিকির-শোগল আর ওযীফা নয়। তবে এগুলো আসল উদ্দেশ্য অর্জনের পথে সহায়ক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ লাইনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের বাতেনী আমলকে সংশোধন করা। যতক্ষণ এই উদ্দেশ্য অর্জিত না হবে ততক্ষণ যিকির-শোগল ও ওযীফার পূর্ণ ফায়েদাও লাভ হবে না; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব যিকির-শোগল দ্বারা রিয়া ও তাকাব্বুরিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে তা ক্ষতিকর বলেও বিবেচিত হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) বলেন, যদি কেউ এ-কথা বলে, বাতেনী আমল সংশোধনের পদ্ধতি তো তাসাওউফ বা তরীকতের কিতাবসমূহে লেখা রয়েছে, সেসব লেখা পড়েই তো মানুষ তার বাতেনকে সংশোধন করে নিতে পারে, এক্ষেত্রে আবার শায়খের কী প্রয়োজন? তবে তার জওয়াব হলো, মানুষের শারীরিক বিভিন্ন রোগ এবং তার চিকিৎসার কথাও তো বিভিন্ন ডাক্তারি বই-পুস্তকে পুরোপুরিভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর পরেও আবার ডাক্তার-কবিরাজের প্রয়োজন অনুভব করা হয় কেন? এখানে যে কারণে ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে, ঠিক সে কারণেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও শায়খের প্রয়োজন রয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, শারীরিক রোগের দ্বারা মানুষের শরীরে যে কষ্ট হয় তা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজেই অনুভব করতে পারে, আর তাই সে ডাক্তার-কবিরাজ তালাশ করে। এখানে রোগের মূল কারণ নির্ধারণ এবং তার উপযুক্ত ঔষধ নির্বাচনের জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন হয়। পক্ষান্তরে বাতেনী রোগ যাকে পরিভাষায় 'রাযায়েল' (মন্দ স্বভাব) বলা হয়ে থাকে– যেমন

অহঙ্কার, আত্মগরিমা, তাকাব্বুরি, লৌকিকতা, দুনিয়ার লোভ, হিংসা ইত্যাদি। এগুলো এমন গোপন রোগ যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিজেরও এসব রোগের অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না, সে নিজেও বুঝতে পারে না যে, আমি রোগাক্রান্ত। এ কারণে কোনো ঔষধ বা চিকিৎসা গ্রহণের প্রতি তার খেয়ালও হয় না। একজন কামেল শাইখ যিনি রূহানী রোগের একজন দক্ষ ডাক্তার হয়ে থাকেন, তাঁকে এ কাজটিও করতে হয় যে, তিনি বাতেনী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে একথা বলে দিবেন যে, তোমার মধ্যে অমুক রোগ রয়েছে।

ডাক্তার-হাকিমগণের সাধারণতঃ দু'টি কাজ। একটি হলো রোগ নির্ধারণ, আর অপরটি হচ্ছে ঔষধ নির্বাচন। কিন্তু এ বাতেনী রোগের ডাক্তারদের তৃতীয় আরও একটি কাজ করতে হয়, তাহলো নিজের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞ অসচেতন রোগী যে নিজেকে সুস্থ মনে করে থাকে, তাকে তার রোগ সম্পর্কেও অবগত করা। বর্তমানে বেশিরভাগ লোকের অবস্থাই এরূপ। গাফলত ও অসচেতনতার উপকরণ অধিক হয়ে যাওয়ার ফলে লোকেরা সাধারণতঃ নিজেদের বাতেনী রোগের প্রতি লক্ষ্যই করে না। সাধারণ লোকের কথা আর কী বলবো, খাসভাবে ওলামায়ে কিরামের মধ্যেও অনেকেই এর মধ্যে নিমজ্জিত। কারো ভিতর বাতেনী রোগ আছে কিনা সেটা অবগত হওয়া এবং সে ব্যাপারে সতর্কতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বুর্যূগানে দ্বীনের সংস্পর্শ, তাঁদের কিতাবপত্র পাঠ করা এবং তাঁদের পক্ষ থেকে সতর্কীকরণ। এছাড়া বাতেনী রোগ থেকে সতর্ক হওয়ার আর কোনো পথ নেই। এজন্য বুর্যূগানে দ্বীন বলেন, শুধু ইখলাস থাকলে চলবে না। সুন্নাত থাকতে হবে। আর উভয়টা অর্জনের জন্য সুন্নাতওয়ালার সোহবতে থাকতে হবে।

তাসাওউফ-তরীকত তথা পীর-মুরিদী বিষয়ে ভ্রান্তির নিরসন

তাসাউফ, তরীকত, সুলুক, ইহসান এই চারটি পরিভাষা এক ও অভিন্ন। একই বিষয়ের একাধিক শিরোনাম। কিছু লোকের সঙ্কীর্ণ ধারণা হলো- তাসাউফ মানে হলো যিকির-আযকার। আমরা যখন শাইখের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করব তিনি আমাদের কিছু যিকির-আযকার বাতলে দিবেন এটাই তাসাওউফ। না! বস্তুত যিকির ও দু'আ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। শুধু এর মাধ্যমেই তাসাউফের মূল মাকসাদ হাসিল হয় না। বরং এগুলো তাসাউফের উদ্দেশ্য হাসিলের একটি মাধ্যম। কিছু লোকের ধারণা, তাসাউফের উদ্দেশ্য নির্জনে বসে মুরাকাবা করা বা চিল্লাকাশি করা। না! এসব তাসাউফের মূল লক্ষ্য নয়। বরং মূল লক্ষ্যে পৌঁছার একাধিক পথ মাত্র।

ইদানিং এ লাইনে যে বিষয়টি সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে তাহলো বিভিন্ন তথাকথিত ভণ্ড বেদাতী পীর, বড় বড় দরবার শরীফ সাজিয়ে দেশব্যাপী

ব্যাপক প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে নিরীহ সহজ-সরল সাধারণ মুসলমানদের ওরশ শরীফের নামে দাওয়াত দিয়ে তাদের পকেট ভারী করছে। সাধারণ মানুষ তাদের প্রচারণার ফাঁদে পড়ে নিজেদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করছে। নামায নাই, রোযা নাই, দ্বীনদারির কোনো খবর নাই, অথচ পীর সাহেব যেন তাদের সবকিছুর ঠিকাদারি নিয়ে নিয়েছেন। এ ধরনের পীরের প্রাদুর্ভাব অনেক বেড়ে গেছে। বৎসরে একবার দরবার শরীফে হাযিরা দিয়ে পীরের কদমে নযর নিয়াজ দিয়ে নিজেদের সার্থক ও যথেষ্ট মনে করছে। বহু লোক পীর-মুরিদী সম্পর্কে এ ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করে থাকেন। মুলত এ সমস্ত গোমরাহ পীর-ফকির নিজেরা গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে জাতিকে গোমরাহীর পথে আনার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

আত্মশুদ্ধির জন্য যেসব উপায় অবলম্বনের কথা বলা হলো, এগুলোর সঙ্গে বাতেনী আমল সম্পর্কে ইলম হাসিল করা জরুরী। শরীয়তের পরিভাষায় তাযকিয়ার সারমর্ম হলো, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যেমন বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান দিয়েছেন, যথা নামায পড়, রোযা, রাখ, যাকাত দাও, হজ্ব কর, মিথ্যা বলিও না ইত্যাদি তেমনি আত্মার উৎকৃষ্ট গুণাবলী অর্জন এবং দোষসমূহ পরিহার করতে আদেশ করেছেন। আর এগুলো আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শুকর আদায় করা, মুসীবত ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা, তাওয়াক্কুল তথা একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা, বিনয়ী হওয়া, ইখলাস ইত্যাদি যাবতীয় অর্জনীয় গুণকে তাসাওউফের পরিভাষায় ফাযায়েল বা আখলাকে ফাযেলা বলে। এসবগুণ অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। তেমনি অভ্যন্তরীণ বর্জনীয় বিষয়গুলোকে রাযায়েল বা আখলাকে রযীলা বলে। যেমন অহঙ্কার, হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, বে-সবরী, নাশুকরী ইত্যাদি। উল্লিখিত আত্মার অর্জনীয় সৎগুণাবলী এবং বর্জনীয় আত্মার দোষসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে সংজ্ঞায়িত হলো। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম গাযালী (রহ.) লিখিত কিতাব তাবলীগে দ্বীন, হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর শরীয়ত তরীকত কিতাব থেকে আত্মার সৎগুণাবলী অর্জন ও অন্তরের রোগ থেকে পরিশুদ্ধির উপায় সম্পর্কে জেনে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ অতি জরুরী।

আখলাকে হামীদা বা উত্তম চরিত্র

প্রকৃত মানুষ হওয়ার যদি বাসনা মনে থাকে তবে প্রত্যেক মানুষেরই যাবতীয় কাজ-কর্মে, স্বভাব-চরিত্রে ও আদত-আখলাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন। -সূরা আল কলম : ৪

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"আমি উৎকৃষ্ট চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।"

-সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস নং ২১৩০১; মুসনাদে বাযযার, হাদীস নং ৮৯৪৯

হযরত আবু ছা'লাবা খাশানী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ওই ব্যক্তি যে স্বভাবের দিক দিয়ে হবে সবচেয়ে উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক অপ্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে ওই ব্যক্তি যার স্বভাব হবে সবচেয়ে মন্দ। -তাবারানী শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যার আচার-ব্যবহার উৎকৃষ্ট এবং যে তার স্ত্রীদের নিকট উৎকৃষ্ট।-বায়হাকী, খ. ৭ পৃ. ২৩২

হযরত আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আম্মাজান হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাযি.)-কে লক্ষ্য করে বলেন, "হে উম্মে হাবীবাহ! উত্তম চরিত্রের অধিকারী ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করবে।"

হযরত কা'আব ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, বনি সালামার জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলাম কী? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, উৎকৃষ্ট আখলাক। এমনিভাবে লোকটি পাঁচবার প্রশ্ন করল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রতিবার একই উত্তর দিলেন, ইসলাম হলো উৎকৃষ্ট আখলাক।

হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দু'আ করতেন, اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার অবয়বকে সুন্দর করেছ সুতরাং আমার আখলাককেও সুন্দর করে দাও।

-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৯৫৯; মুসনাদে আবু ইয়া'লা, হাদীস নং ৫০৭০

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, হে আমার বন্ধু! উৎকৃষ্ট আচরণ প্রদর্শন করবে, চাই কাফেরের সঙ্গে হোক না কেন। তাহলে নেককার লোকের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। যে উত্তম আখলাকের অধিকারী হবে তাকে আমি আরশের ছায়ায় স্থান দিব এবং তাকে হাউজে কাওছারের পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করবো এবং আমার নিকটে স্থান দিব। -তাবারানী পৃ. ৪০৭

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি দশ বৎসর কাল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ঘরের কাজ-কর্ম করেছি, কিন্তু কখনও তিনি আমাকে উহ্ শব্দটি পর্যন্ত বলেননি বা কখনও কোনো কটূ কথা বলেননি যে, অমুক কাজ কেন করলে? বা কেন করলে না? -বুখারী, মুসলিম

আসওয়াদ (রাযি.) বলেন, তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাড়িতে থাকতেন তখন তিনি কী করতেন? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) উত্তরে বলেন, তিনি বাড়ির কাজে লিপ্ত থাকতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন। বাজার থেকে নিজেই সওদা নিয়ে আসতেন।

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতো বড় দু-জাহানের বাদশাহ হওয়া সত্ত্বেও তিনি গরীব, দু:খ-পীড়িতকে দেখতে যেতেন ও সেবা শুশ্রূষা করতেন এবং তাদের জানাযার সঙ্গে যেতেন।

আখলাকে রাযীলা বা কু-চরিত্র

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বদস্বভাব ঈমানকে এমন ভাবে নষ্ট করে দেয় যেমন মাকাল ফল (এক ধরনের তিক্ত ফল) খাবারকে নষ্ট করে দেয়।

-বায়হাকী খ. ৬ পৃ. ২৪৭

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ

-আবু দাউদ ফা : আখলাক পৃ . ৩৯

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুর্ভাগ্য, মুনাফিকী ও বদস্বভাব থেকে পানাহ চাচ্ছি।

আবু সা'লাবা খাইশামী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিশপ্ত এবং কিয়ামতের দিনে আমার থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে ওই ব্যক্তি যার স্বভাব-চরিত্র সবচেয়ে খারাপ। -বায়হাকী খ. ৬ পৃ. ২৩৪

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে দুটি স্বভাব কখনও প্রবেশ করতে পারে না, ১. বদ আখলাক ২. কৃপণতা।

হযরত মাইমুন ইবনে মিহরান (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট বদ আখলাকের চেয়ে বড় গুনাহ আর কিছুই নেই। কারণ এ ব্যক্তি একটি গুনাহ থেকে উঠে এসে আর একটি গুনাহে প্রবেশ করে।-তাবারানী পৃ.৪১৩

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে জনৈক মহিলার কথা আলোচনা হলো যে, অমুক মহিলা দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর ইবাদত করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। এ-কথার পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে জাহান্নামী।

-মুসনাদে আহমাদ

আত্মার রোগসমূহ

আত্মার প্রথম রোগ : অধিক খাওয়ার লোভ

লোভের কারণেই অতিভোজন হয়ে থাকে। অতিভোজন বহু সংখ্যক গুনাহের মূল। এ থেকেই কামরিপু বর্ধিত হয়। কাম-বাসনা পূর্ণ করার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। অর্থ সংগ্রহ করতে সুখ্যাতির প্রয়োজন হয়, সুতরাং তাও অর্জন করা দরকার হয়ে পড়ে। অর্থলিপ্সা ও যশোলিপ্সা এই দুই প্রকারের লিপ্সা হতেই সাধারণতঃ অহঙ্কার, কপটতা, পরশ্রী-কাতরতা প্রভৃতি আপদগুলি ক্রমশ আত্মপ্রকাশ করে ধর্মের বিনাশ সাধন করে থাকে।

আত্মার দ্বিতীয় রোগ : অধিক কথা বলার আগ্রহ

অধিক কথা বলার অভ্যাস দূর করাও একান্ত আবশ্যক। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় কর্মের প্রতিবিম্ব আত্মার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে, কিন্তু জিহ্বা আত্মার দূত হওয়ার দরুন জিহ্বা পরিচালনার প্রভাব যতো শীঘ্র আত্মার উপর পড়ে, অন্য কোনোও কাজের প্রভাবই ততো শীঘ্র প্রকাশ পায় না। মনে রাখবেন, যবান মিথ্যা কথায় ব্যবহৃত হলে অন্তরেও অলীক ছবি অঙ্কিত থেকে যায় এবং তদ্দরুন অন্তর বক্রভাব ধারণ করে। বিশেষত মিথ্যার সঙ্গে যদি অযথা বাকবিতণ্ডাও যোগ হয়, তবে তো অন্তর একেবারেই কালিমাময় হয়ে যায়। এমন কি অধিক কথা বলতে বলতে আত্মার জীবনীশক্তি বিনষ্ট হয়ে আল্লাহর মারেফত লাভ করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

আত্মার তৃতীয় রোগ : অনর্থক রাগ করা

ক্রোধ অগ্নিশিখার মতো। সুতরাং একে দমন করা কর্তব্য, নতুবা যে কোনো সময় ওটা আপনাকে আগুনের মতো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। হযরত রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মানুষকে শুধু

ভূপাতিত করার বীরত্ব থাকলেই তাকে বীর বলা হয় না; বরং যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় নিজের কু-প্রভৃত্তিকে ভূপাতিত করতে সক্ষম হয়, সেই প্রকৃত বীর পুরুষ। অধিক রাগ করা, হঠাৎ রেগে যাওয়া অন্তরের মারাত্মক রোগ।

ক্রোধ নিতান্ত অনিষ্টকর জিনিস বিধায় মানুষ গালি-গালাজ, খুন-খারাবি প্রভৃতি পাপে লিপ্ত হয়ে থাকে। এজন্য ক্রোধ দমনে সকলের যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

আত্মার চতুর্থ রোগ : হাসাদ বা হিংসা-বিদ্বেষ

অন্যের সুখ-সম্পদ দেখে মনে মনে কষ্ট অনুভব করা এবং অন্যের সুখ সম্পদ দূর হওয়ার কামনা করাকে হাসাদ বা হিংসা বলা হয়। হাসাদ করা হারাম। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, আমার বান্দার সুখ-সম্পদ দেখে যাদের মনে কষ্ট হয় তারা যেন আমার বান্দার প্রতি অনুগ্রহের ফায়সালার প্রতি ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, আগুন যেমন শুকনা কাষ্ঠখণ্ডকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে হিংসাও তেমনি নেকীসমূহকে ভস্মীভূত করে দেয়।"

আত্মার পঞ্চম রোগ : কার্পণ্য বা বখীলী

কার্পণ্য একটা মারাত্মক রোগ। আল্লাহ তা'আলা এ সম্বন্ধে ইরশাদ করেন, খোদাপ্রদত্ত ধন-সম্পদে যারা কৃপণতা করে, তাদের পক্ষে তাদের কৃপণতা মঙ্গলজনক নয়; বরং নিতান্ত অমঙ্গলজনক। যে ধনে তারা কৃপণতা করছে, হাশরের দিন তা দ্বারা গলাবেড়ি প্রস্তুত করে তাদের গলায় পরানো হবে। অতএব, মুসলমানের পক্ষে কৃপণতা করে দোযখের পথ পরিষ্কার কখনও উচিত নয়। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে, বান্দা থেকেও দূরে।

আত্মার ষষ্ঠ রোগ : সম্মান কামনা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, যারা পৃথিবীতে স্বীয় প্রভুত্ব দেখাতে না চায় এবং অনাচার সৃষ্টি করতে না চায়, তাদের জন্যেই পরকালের শান্তি সঞ্চিত রয়েছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ছাগলের পালে দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘ পতিত হলে যে রকম ক্ষতির আশঙ্কা না হয়, ধনলিপ্সা ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষের ঈমান ও ধর্মের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। -জামে তিরমিযী

আত্মার সপ্তম রোগ : দুনিয়ার মুহাব্বত

'দুনিয়া' কেবল ধন ও সম্মানের প্রতি অনুরাগকেই বলা হয় না, বরং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তুমি যে অবস্থায় থাকনা কেন, তাহাই দুনিয়ার অন্তর্গত। দুনিয়ার মায়াই সমস্ত পাপ কর্মের মূল। দুনিয়ার কাজ কারবার, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জীব-জন্তু ইত্যাদি যে কোনো বস্তুর সঙ্গে আত্মাকে আবদ্ধ করার নাম 'হুব্বে দুনিয়া' বা দুনিয়ার মুহাব্বত। অবশ্য ইলম, মারেফত এবং যাবতীয় পুণ্যকর্ম দুনিয়ার মধ্যে সংঘটিত হলেও এ বিষয়গুলি পরকালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার দরুন এগুলির প্রতি ভালোবাসাকে প্রকৃত প্রস্তাবে দুনিয়ার মায়া বলা যায় না; বরং এই ভালোবাসার সাহায্যে আখেরাতের উভয়বিধ রোগের মূলোৎপাটন করা হবে বলে আশা করা যায়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, মানুষকে পরীক্ষার জন্য জাগতিক পদার্থকে পৃথিবীর সৌন্দর্য উপকরণরূপে সৃষ্টি করেছি। পরীক্ষা হবে কারা এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরকালকে বিনষ্ট করে আর কারা দুনিয়া থেকে সামান্য পাথেয় সংগ্রহ করে পরকালের যাত্রাপথে গমন করে।

আত্মার অষ্টম রোগ : তাকাব্বুর বা আত্মগরিমা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, অহঙ্কারী লোকদের পরিণাম নিতান্ত শোচনীয় হবে। আরো বলেছেন, বড়ত্ব আমার একার অধিকার, যারা-এর বৃথা দাবিদার হবে আমি তাদেরকে ধ্বংস করবো। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কারো হৃদয়ে কণামাত্র অহঙ্কার থাকলেও সে বেহেশ্‌ত পাবে না। যারা ধন ও সম্মানের অধিকারী হয়েও মানুষের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করেন, তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চপদের অধিকারী। দুনিয়াতেও তারা সম্মান পাবেন, আখেরাতেও তারা সম্মানী হবেন।

সৎগুণাবলীতে অন্যের তুলনায় নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করাকেই 'অহঙ্কার' বলে। আরবী ভাষায়-এর নাম তাকাব্বুর।

আত্মার নবম রোগ : খোদপসন্দী বা নিজেকে ভালো মনে করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "নিজেকে নিজে পবিত্র ও দোষমুক্ত মনে করিও না।" নিজেকে নিজে ভালো মনে করা কাফেরদেরই শোভা পায়। এ সম্বন্ধে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, "খোদপসন্দী মানুষকে অধঃপতিত করে।" কারণ মানুষ নিজেকে ভালো মনে করলে উন্নতির চেষ্টা ছেড়ে দেয়; এতেই মানুষ অধঃপতিত হয়।"

আত্মার দশম রোগ : রিয়া বা লোক দেখানো ভাব

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "এমন নামাযীদের প্রতি ধিক্কার, যারা নামাযের প্রতি মন লাগায় না এবং লোক দেখানোভাবে ইবাদত করে থাকে।" ইবাদতের মধ্যে নিয়্যত ঠিক করা এবং ইবাদতকে রিয়া থেকে মুক্ত করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রিয়াকে "শিরকে আসগর" বা ছোট শিরক বলা হয়। "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই" এটাই তাওহীদ বা একত্ববাদের মূলমন্ত্র। রিয়াকার উপাসক নিজ ইবাদত বন্দেগী মধ্যে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের মনতুষ্টির ইচ্ছা করে। সুতরাং এটা প্রকারান্তরে 'শিরক' বা অংশীবাদের মধ্যেই গণ্য হয়।

আত্মার দশটি সৎ গুণাবলী

আত্মার প্রথম গুণ : তাওবা

তাওবা যার অর্থ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। অবশ্য তিনি তাওবাকারীদেরকে পসন্দ করেন।" হাদীস শরীফেও এরূপ বর্ণিত আছে– "কেউ তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তাতে কিরূপ আনন্দিত হন, তা তোমরা নিম্নের উদাহরণ দ্বারা বুঝতে পারবে। যেমন কোনো এক ব্যক্তি ঘটনাক্রমে এক জনমানবহীন মরুভূমিতে গিয়ে উপস্থিত হল। পরে তার আরোহণের জন্তুটি খাদ্য এবং পানীয়সহ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। লোকটি তা খুঁজতে খুঁজতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। এমতাবস্থায় সে বাহন ব্যতীত দুর্গম মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে বাইরে আসতে পারে না, অধিকন্তু সেখানে পড়ে থাকলেও খাদ্য বিহীন অবস্থায় তার মৃত্যুবরণ করতে হবে। লোকটি এই চিন্তা করতে করতে হতাশ হয়ে পড়লো। অবশেষে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে একটি বৃক্ষের ছায়ায় শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো। অতঃপর হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখল, তার আরোহণের উটটি খাদ্যসম্ভারসহ তার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। এরূপ নিরাশার আঁধারে আশার আলো দেখতে পেয়ে তখন ওই লোকটির যেরূপ আনন্দের সীমা থাকবে না, তদ্রূপ কোনো বান্দা পাপ থেকে ধর্মের পথে প্রত্যাবর্তন করতঃ তাওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত হয়ে থাকেন।

আত্মার দ্বিতীয় গুণ : খওফ বা আল্লাহ-ভীতি

দুনিয়ার মুহাব্বত যেমন সকল গুনাহ'র মূল, আল্লাহর ভয়ও তেমনি সকল নেকীর মূল। খোদাভীরু লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বিদ্যা-বুদ্ধি, দয়া-মায়া, সুপথ-প্রদর্শন, অল্পেতুষ্টি প্রভৃতি সৎস্বভাবসমূহ দান করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন, সমস্ত জিনিসই তাকে ভয় করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "কারও মধ্যে দুইটি ভয় একত্র হবে না" অর্থাৎ ইহকালে অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করলে পরকালে ভয়হীনতা লাভ হবে।

আত্মার তৃতীয় গুণ : যোহদ বা দুনিয়া বিমূখতা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "হে আমার রাসূল! তাদেরকে পরীক্ষার জন্যে আমি পার্থিব যে ধন-সম্পদ দিয়ে রেখেছি, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিও না। কেননা আপদ-বিপদে জড়িত করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে এই সমস্ত দিয়েছি। তোমার প্রতিপালকের দানই সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী। ধার্মিকদের জন্যই এই উৎকৃষ্ট স্থায়ী দান রক্ষিত আছে, সুতরাং ধর্মহীনদের অভিশপ্ত ও অস্থায়ী ধন-সম্পদে প্রলুব্ধ হওয়া নিতান্ত অশোভনীয়।

আত্মার চতুর্থ গুণ : সবর বা ধৈর্যশীলতা

কুরআনে পাকে বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ধারণের তাকীদ ও ফযীলত সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন। যেমন :

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণকারীদের সঙ্গে আছেন।"

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

"ধৈর্য ধারণকারীদেরকে সুসংবাদ দান করুন।"

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا

"হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর।"

কুরআনে পাকে ৭০ স্থানে ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি তাকীদ ও ফযীলত এসেছে। উল্লিখিত বিষয়ে মুমিনের জন্য উভয় অবস্থায়ই উপকারী। কোনো অবস্থাতেই তার কোনো ক্ষতি নাই। তবে শর্ত হলো, শরীয়তের পরিসীমার ভিতরে থাকতে হবে।

হাদীসে পাকে আছে– মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিচিত্র। আর এটা শুধু মুমিনেরই একক বৈশিষ্ট্য। কারণ যখন মুমিন সুখ-শান্তি ভোগ করে তখন সে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে, যা তার জন্য মঙ্গলজনক। আর যদি কষ্ট মুসীবতে পতিত হয় তখন ধৈর্যধারণ করে, সেটাও তার জন্য মঙ্গলজনক।"

-মুসনাদে আহমাদ

মুহিউস সুন্নাহ হযরতওয়ালা হারদূঈ (রহ.) বলেন, ইবাদত দুই প্রকার। ১ম. এমন সব ইবাদত যা আদায়ের জন্য সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।

২য়. এমন সব ইবাদত যেগুলোর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। বরং সব সময়েই তা করা যায়। যেমন সবর ও শুকর অর্থাৎ ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। এগুলোর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় নেই। অবস্থাভেদে হুকুম বর্তায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যেমন কোনো অবাঞ্চিত বা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে আমাদের কর্তব্য হবে সবর করা বা ধৈর্য ধারণ করা। আর যদি মনের চাহিদা মুতাবিক কাজ হয়, তখন কর্তব্য হচ্ছে শুকরিয়া আদায় করা বা মহান আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মোটকথা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা হল সার্বক্ষণিক ইবাদত। কেননা ধৈর্যের সম্পর্ক হচ্ছে মনের বিপরীত অবস্থার সঙ্গে। এমনি কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক হচ্ছে মনের চাহিদা মোতাবেক অবস্থার সঙ্গে। সুতরাং চাই মনের চাহিদা মোতাবেক অবস্থা হোক বা-এর বিপরীত অবস্থা হোক সর্বাবস্থাতেই ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সবরের চারটি স্তর

১. ইবাদতের প্রতি অটল থাকা।

আল্লাহর বিধান এবং নির্দেশ সুন্দরভাবে আদায় করা, নফস যতোই কষ্টকর মনে করুক না কেন। যেমন : শীতকালে ফজরের সময় জামা'আতে হাযির ও উযূ করা।

২. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

গুনাহ যা আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন, তা যতোই চিত্তাকর্ষক এবং মযাদার হোক না কেন এবং যতোই মন ভুলানো হোক না কেন তাকে বর্জন করতে হবে এবং নফসের বিরোধিতার কষ্ট সহ্য করে নিতে হবে। সুন্দরী সুশ্রী বেগানা মহিলা ও দাঁড়ি বিহীন বালকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে দৃষ্টিকে হেফাযত করা। হাদীসে পাকে কু-দৃষ্টি থেকে হেফাযতের বিনিময়ে ঈমানের স্বাদ-মধুরতা ও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

৩. বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।

৪. কোনো মুসিবতে পতিত হওয়ার শুরুতে প্রথম অর্ন্তজ্বালার মুহূর্তেই সবর করা।

বিপদ মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা। আত্মনিয়ন্ত্রণহারা না হওয়া এবং মুসীবতের সময় নিজে বা আল্লাহর শানে বেয়াদবীমূলক আচরণ প্রকাশ না করা। এ-সবই সওয়াবের কাজ।

হযরত রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক বলেন, কোনো বান্দা মুসীবতে পতিত হওয়ার পর যদি একমাত্র আমারই উপর ভরসা করে এবং আমার প্রতি আনুগত্য সহকারে দৃঢ়পদ থাকে, তাহলে আমার কাছে প্রার্থনা করার পূর্বেই আমি তার মনোবাসনা পুরণ করি। পক্ষান্তরে যদি সে আমাকে উপেক্ষা করে কোনো মাখলূকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাঁর জন্য আসমানের দরজা (সাহায্য) বন্ধ করে দেই।

আত্মার পঞ্চম গুণ : শোকর বা কৃতজ্ঞতা

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর, তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আরো বেশি নিয়ামত প্রদান করব। পক্ষান্তরে যদি তোমরা না শুকরী কর তাহলে নিশ্চয় আমার শাস্তি ভীষণ ভয়াবহ।" -সূরা ইব্রাহীম : ৭

যেসব অবস্থা মানুষের মনের অনুকূল ও পসন্দীয় অর্থাৎ সুখের অবস্থা, এমতাবস্থায় এভাবে শুকর আদায় করা–

১. এটা নিজ ক্ষমতার অর্জিত মনে না করে আল্লাহ তা'আলার খাস অনুগ্রহের দান মনে করা।

২. আল্লাহর দান পেয়ে খুশি প্রকাশ করা।

৩. অবস্থাকে নিজের প্রাপ্য বা দাবির হক মনে না করে বরং নিজ পজিশন ও মর্যাদা অপেক্ষা ওই দানকে অতিরিক্ত ও অধিক মনে করা।

৪. আল্লাহ পাকের দান পেয়ে মনে ও মুখে কালিমাতুশ শুকর "আলহামদু লিল্লাহ" বেশি বেশি বলে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা।

৫. নিয়ামতকে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধ কাজে খরচ না করে, উদ্ধত না হয়ে আরও অধিক আল্লাহর তাবেদারী ও লোকের উপকারের দিকে ঝুঁকে পড়া। এই উপায়ে শুকুর আদায় করা। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নেয়ামত তাঁরই অনুগত বান্দা হিসেবে ভোগ করা।

আত্মার ষষ্ঠ গুণ : ইখলাস বা খালেস নিয়্যত

মুসলমানের নিয়্যতই ইখলাসের মূল। নিয়্যতের মধ্যে ইখলাস হয়ে থাকে। ইখলাসের পরিপক্ক অবস্থাকেই 'সিদক' বলা হয়। ইখলাসের অর্থ- নিয়্যতে অন্য

কোনো বিষয়ের সংমিশ্রণ না থাকা। নিয়্যতের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা হল শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিয়্যতের উপরই আমলের ফলাফল নির্ভর করে।

আত্মার সপ্তম গুণ : তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভর করা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর উপরই মুসলমানগণের ভরসা রাখা কর্তব্য। আরও বলেন "হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর উপর নির্ভর কর।" আরও ইরশাদ করেন, যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহই তাদের সকল কাজের জন্য যথেষ্ট।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর, তিনি তোমাদেরকে পাখিদের ন্যায় রিযিক দিবেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয়, সন্ধায় পূর্ণ উদরে ঘরে ফিরে আসে।" বাস্তবিক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করলে তিনি আমাদের ধারণার বাইরের স্থান থেকে রিযিক দিয়ে থাকেন।

আত্মার অষ্টম গুণ : মুহাব্বত

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ নেক বান্দাদেরকে ভালোবাসেন, নেক বান্দাগণও আল্লাহকে ভালোবাসেন।" হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হৃদয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সমস্ত জিনিসের চেয়ে বেশি ভালোবাসা না হয়, ততক্ষণ তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না।" হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন, "যে একবার আল্লাহর মুহাব্বতের স্বাদ পেয়েছে দুনিয়ার প্রতি তার অনুরাগ থাকতেই পারে না।"

আত্মার নবম গুণ : তকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট, তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"

রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে নিজের প্রিয়পাত্র করতে চান, তাকে কোনো দুখ-কষ্টে পতিত করে পরীক্ষা করে দেখেন- সে অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট কিনা। অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট হলেই তাকে বন্ধুরূপে নির্বাচিত করেন।"

আত্মার দশম গুণ : মৃত্যুচিন্তা

যে সমস্ত জিনিস খোদার নৈকট্য লাভে সহায়ক, মৃত্যু চিন্তা তন্মধ্যে অন্যতম। মৃত্যুর কথা স্মরণ করলেই দুনিয়ার মুহাব্বত দূর হয়ে যায় এবং ক্রমশ আল্লাহ তা'লার মুহাব্বত অন্তরে স্থান পেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "দুনিয়ার আমোদ-প্রমোদ ধ্বংসকারী মওতের কথা বেশি পরিমাণে স্মরণ কর।" হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাশরের দিন শহীদগণের সঙ্গে আর কোনো সম্প্রদায় উঠবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ যারা দিবা-রাত্রি বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, তাঁরাও শহীদদের দলে উঠবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মৃত্যুর মতো এমন উত্তম পথ প্রদর্শক আর নেই।" অর্থাৎ মৃত্যুর কথা স্মরণ করলেই মানুষ উত্তম নসীহত পেতে পারে।

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও মুহাব্বত

স্বভাব-চরিত্র ভালো করার জন্য এবং আমল আখলাক দুরস্ত করার জন্য বুর্যূগদের সাহচর্য অবলম্বন করা একান্ত দরকার। কেননা তাঁদের নিকট বসে তাঁদের মূল্যবান উপদেশ এবং তাঁদের সোহবতের বরকত হাসিল করতে পারলে অতি সহজে আমল আখলাক দুরস্ত হয়। বিশেষ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নেক সোহবত ব্যতীত দ্বীন হাসেল হয় না। অতএব, যার ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব বুঝার, ঈমানকে দৃঢ় করার এবং ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করার বাসনা থাকে, তার কোনো নেক সালেহ লোকের সোহবত অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এখানে নেক সালেহ বলে ওই সালেহকে বুঝানো উদ্দেশ্য যিনি মুসলিহও বটে অর্থাৎ নিজে সৎ হওয়ার পাশাপাশি অন্যকেও নেক রাস্তার দিক-নির্দেশনা দানে সক্ষম ও অন্যের ভুল-ত্রুটির সংশোধনে পারঙ্গম। কেননা যার সোহবতে থাকা হবে তার শুধু সালেহ হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং তাকে মুসলিহও হওয়া চাই।

আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

হে ঈমানদারগণ! তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সাদেকীন-এর সংস্রব অবলম্বন করো। –সূরা তাওবা : ১১৯

তাকওয়ার গুণ অর্জন করার পদ্ধতি হচ্ছে, সাদেকীন ও নেককার বান্দাদের সংস্রব এবং আমলের ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ। উক্ত আয়াতের মধ্যে সাদেকীন

অর্থাৎ মুত্তাকী-পরহেযগার বান্দাদের সংস্রব অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ঈমান এবং নেক আমল কেবল ইলম থাকলে ও ইচ্ছা পোষণ করলেই অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন মুত্তাকী লোকের সোহবত বা সংস্পর্শ লাভ করা। প্রকৃত ঈমান ও মারেফাত নেককার লোকদের মুহাব্বত এবং আন্তরিকতার বন্ধন ছাড়া আসতে পারে না। চিকিৎসাবিদ্যা শুধু বই পড়েই অর্জন করা যায় না। বাবুর্চিগিরি বই পড়েই শিক্ষা করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন হয় উক্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত লোকের সংশ্রবে থাকার। অনুরূপভাবে দ্বীনও সংস্রব ব্যতীত অর্জিত হয় না।

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন–

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

"নিজেকে কেবল ওই সমস্ত লোকের সঙ্গে নিবদ্ধ রাখুন, যারা প্রাতে অপরাহ্নে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করে নিছক তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।"–সূরা কাহাফ: ২৮

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও মুহাব্বতের বরকতে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু লাভ হয়

যাকেরীন তথা সালেহীন ও ওলীআল্লাহদের মর্তবা সর্ম্পকে হাদীস শরীফে এসেছে যে, এক ব্যক্তি তার নিজের কোনো কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য সালেহীন বা আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে যিকিরের মজলিসে বসল। অতঃপর আল্লাহপাক যখন ফেরেশতাদের সম্মুখে ঐ সকল যাকেরীনের জন্য ক্ষমার ঘোষণা দিলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলতে লাগলেন, আয় আল্লাহ, অমুক ব্যক্তিটি তো নিছক নিজের কাজেই এসেছিল এবং সে সুবাদে কিছুক্ষণ ওখানে বসেছিল। পরন্তু সে গুনাহগারও। জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন:

هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ

অর্থ- তারা আমার এমনই মাকবূল ও মাহবুব বান্দার দল যে, তাদের মজলিসে অংশগ্রহণকারীও (আমার রহমত হতে) বঞ্চিত হয় না। আমি আমার ঐ গুনাহগার বান্দাটিকে ক্ষমা করে দিলাম।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন-

اِنَّ جَلِيْسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِيْ جَمِيْعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اِكْرَامًا لَهُمْ

অর্থ- ইহা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ পাক তার ওলীদেরকে যত নিয়ামত ও অনুগ্রহ দান করেন, তাঁদের সম্মানার্থে তাঁদের মজলিসে অংশগ্রহণকারী এবং তাদের সঙ্গে উঠা-বসাকারী বান্দাদেরকেও তিনি ঐসকল নিয়ামত দান করেন। যেভাবে মহামান্য মেহমানের খাতিরে তাঁর নগন্য খাদেমকেও ঐ সকল সম্মানজনক খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় যা মূলত ঐ মেহমানের জন্যই তৈরী করা হয়ে থাকে। –ফাত্হুল বারী -১১/২১৩

ঈমানের স্বাদ লাভের উপায়

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَّا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ

অর্থাৎ ঈমানের স্বাদ ও মিষ্টতা ওই ব্যক্তিই লাভ করবে যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান রয়েছে।

১. তার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত অন্য সবকিছু থেকে বেশি হবে।

২. কোনো মানুষের সঙ্গে ভালোবাসা হলে সেটাও হবে মহান আল্লাহর জন্যই।

৩. ঈমান গ্রহণের পর কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া তার জন্য এমন অপসন্দ ও কষ্টকর হবে যেমনটি আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া কষ্টকর।

-সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬ ; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩

ফায়দা : উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহর নিকটতম ইলম ও আমলের অধিকারী বান্দাদের সোহবত এবং তাঁদের সঙ্গে বন্ধন ও সম্পর্কের বিরাট গুরুত্ব বোঝা যায়। নবীদেরকেই যখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর নিকটতম প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে নিয়ে সময় কাটাতে, তখন সাধারণ মুমিনদের জন্য তো এর প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি। কারণ নেককার লোকের সোহবত মানুষকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে মুক্ত রেখে পরকালের দিকে ধাবিত করে। দুনিয়াবী অতিরিক্ত ঝামেলা হতে মুক্ত

রেখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের পাশাপাশি আল্লাহ ও রাসূলের মারেফাত অর্জনের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করে রাখে। এটা বিরাট দৌলত।

সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত

হযরত আবু মূসা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সৎসঙ্গী এবং বদসঙ্গীর উদাহরণ যথাক্রমে আতর বিক্রেতা এবং ইটের ভাটার অগ্নি প্রজ্জ্বালকের মতো। আতর বিক্রেতার নিকট থেকে মানুষ আতর লাভ করবে, দানসূত্রে হোক কিংবা ক্রয়সূত্রে। (তা না হলে অন্তত) আতরের সুগন্ধ অবশ্যই পাবে। আর ভাটার অগ্নি প্রজ্জ্বালকের নিকট গেলে হয়ত তার কাপড় পুড়ে যাবে তা না হলে কমপক্ষে তার ধোঁয়া অবশ্যই পাবে।

–মুসলিম : ২/৩৩০ পৃ.

মেশ্‌কওয়ালার নিকট থেকে মেশ্‌ক যদি না নিতে পারে, কিনতে না পারে, তথাপি তার কাছে গেলে ঘ্রাণ তো নিশ্চয়ই পাবে। অনুরূপ নেককার পরহেযগার লোকের নিকট গেলে কিছু না কিছু ফায়দা অবশ্যই পাবে। উক্ত হাদীস দ্বারা আল্লামা নববী (রহ.) নেককার লোকের সোহবতকে মুস্তাহাব প্রমাণিত করেছেন। স্মরণ রাখবেন, নেককার ও বুর্যূগদের সংস্রবে মানুষের রং বদলে যায়। যতো বড় বদকারই হোক না কেন, নেককার লোকের সংস্রবের দ্বারা নেককার হয়ে যায়। এটা আত্মশুদ্ধির জন্য নীরব এবং ক্রিয়াশীল একটি দার্শনিক পদ্ধতি।

হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত লোকমান হাকীম নিজ পুত্রকে বলেছিলেন, হে আমার ছেলে! উলামায়ে কিরামের সাহচর্য অবলম্বন করবে এবং নেককার লোকের বাণী শ্রবণ করবে। আল্লাহ পাক মুর্দা দিলকে হিকমতের নূর দ্বারা এমনভাবে যিন্দা করে দেন যেমন মুষলধারে বৃষ্টি শুষ্ক ভূমিকে তাজা করে দেয়। –তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/১৩০ পৃ.

যেহেতু নেককারদের মজলিসে আল্লাহর রাসূল ও আখেরাতের কথা আলোচনা হয়; সুতরাং তাঁদের কথার মাধ্যমে আল্লাহ, রাসূল এবং আখেরাতের মারিফত হাসিল হয়, যা রূহ এবং কলবের খাদ্য। এর দ্বারা কলবের মধ্যে সজীবতা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই যে সমস্ত লোক নেককারদের সোহবত অবলম্বন করে তাদের দ্বীন, ঈমান, তাকওয়া পরহেযগারী অন্যদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। নেককারদের সোহবতে থেকে যখন তার দিল যিন্দা হবে তখন তার দ্বীনও যিন্দা হয়ে যাবে।

আওলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর দরবারের গেইট

কামালাতে আশরাফিয়া কিতাবে আছে, হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে জামান শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, আল্লাহ পাক যদি কোনো মানুষের ভাগ্যকে চমকাতে চান, তার নসীবকে জাগাতে চান তখন আল্লাহ পাক ঐ যুগের যে সকল বুর্যূগানে দ্বীন এবং আওলিয়ায়ে কিরাম আছেন তাদের মাহাসেন, (সৌন্দর্য) তাদের খুবি, তাদের ভালাই, তাদের সুন্দর সুন্দর গুণাবলী তার সামনে খুলে দেন। কারণ কোনো আল্লাহওয়ালার ভালো গুণ যখন সামনে আসবে তখন তাঁর সঙ্গে মুহাব্বত হবে। তখন সে এর বরকতে আল্লাহ পাককে পেয়ে যাবে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে আওলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ পাকের দরবারের গেইটের মতো। দরজা না খুলে যেমন দরবারে প্রবেশ করা যায় না তেমনি আওলিয়ায়ে কিরামের সোহবত ছাড়া, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছা যায় না।

রূহানী চিকিৎসক দিয়ে আত্মার চিকিৎসা জরুরী

শাইখে আকবর (রহ.) লিখেছেন, যদি তোমার কর্ম অপরের ইচ্ছাধীন না হয়, তবে তুমি সারাজীবন সাধনা করেও মনের খাহেশাত থেকে নিস্তার পাবে না। অতএব, যখনই তুমি এমন ব্যক্তি পেয়ে যাও, যার প্রতি অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা হয়, তখনই তার খেদমতে লেগে যাও। তার সামনে তুমি মুর্দার ন্যায় থাকো, যাতে তিনি তোমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এবং তোমার ইচ্ছা বলতে যেন কিছুই না থাকে।

قال را بگزار مرد حال شو + پیش مرد کامل پامال شو

"নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা ও উচ্চ ডিগ্রীর অহমিকা পরিত্যাগ করে কোনো একজন কামেল আল্লাহওয়ালার খেদমতে নিজেকে মিটিয়ে দাও।"

চিকিৎসা দ্বারা উপকার হয়। আর চিকিৎসা না করালে ডাক্তারও অসুস্থ থাকে। এমনিভাবে আলেম, আবেদ হলেই রিয়া, গোস্বা বা অহঙ্কার চলে যায় না বরং আরো বাড়ে। খান্দানী অহঙ্কার তো পূর্ব থেকেই আছে এখন আরো যোগ হয়েছে ইলম ও আমলের নিসবত। আর যদি ইবাদতও করতে থাকে তবে তো রোগসমূহ আরো বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং আত্মিক রোগ-ব্যাধি চিকিৎসার মাধ্যমেই দূরীভূত হয়। শুধু ইলম ও ইবাদতের মাধ্যমে দূরীভূত হয় না। সুতরাং মানুষের আমল-আখলাক উন্নত করা অর্থাৎ আখলাকে হামীদা অর্জনের জন্য এবং আখলাকে রাযীলা বর্জনের জন্য অর্থাৎ খারাপ বিষয়াবলীর ইসলাহের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হলো নেক সোহবত। এমনিভাবে অসৎ সঙ্গী দ্বীন-ঈমান বরবাদীর কারণ হবে।

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে আমল ও ইসলাহের যে স্তর শরীয়তে কাম্য, তা কোনো কামেল বুযুর্গের তরবীয়ত ব্যতীত হাসিল হয় না। প্রয়োজন হলো কামেল বুযুর্গের সংশ্রব ও সাহচর্য, তাঁর মুহাব্বত, অনুসরণ অনুকরণ। তৎসঙ্গে প্রয়োজন ইসলাহ ও তরবীয়তের চিন্তা-ফিকির ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা। আর যদি শাইখের হাতে হাত রেখে ইসলাহের অঙ্গিকারকে দৃঢ় করা হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। কারণ এর দ্বারা মুরীদের প্রতি পীর সাহেবের সুদৃষ্টি ও মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়, যা তার ইসলাহের জন্য খুবই জরুরী।

বাই'আত সুন্নাত হওয়ার দলীল

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজাঈ (রাযি.) বলেন, আমরা নয় জন কিংবা আট জন অথবা সাত জন লোক হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইআত হবে না? আমরা নিজ নিজ হাত প্রসারিত করে দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ বিষয়ের উপর বাইআত হবো? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই বিষয়ের উপর যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করবে এবং (যাবতীয় আহকাম) শুনবে ও মান্য করবে। –সহীহ মুসলিম

পীর-মাশায়েখের মধ্যে বাইআত করার যে প্রথা প্রচলিত আছে তার সারমর্ম হলো, যাহেরী ও বাতেনী আমলের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং গুরুত্ব প্রদান করার অঙ্গীকার নেওয়া। উল্লিখিত হাদীসে এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কেননা হাদীসটিতে যাদেরকে বাই'আত করার আহ্বান করা হয়েছে তাঁরা যেহেতু সাহাবা ছিলেন, তাই নিশ্চয়ই এটা ইসলাম গ্রহণের বাই'আত ছিল না। হাদীসে পাকের শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আমলের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং আমলের উপর দৃঢ়পদ থাকার জন্যই এ বাই'আত ছিল।

অতএব, পীর-মাশায়েখের বাইআত সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রচলিত বাইআত ব্যতীতও তা'লীম-তরবীয়ত সম্ভব, কিন্তু বিশেষভাবে বাই'আত করার মধ্যে স্বভাবগতভাবে এই বিশেষত্ব রয়েছে যে, এতে মুরীদের প্রতি শাইখের তাওয়াজ্জুহ অধিক হয়, মুরীদের মাঝে শাইখের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। শাইখ নির্দিষ্টকরণ অথবা নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির শাইখ হওয়ার মধ্যেও এই রহস্য নিহিত যে, এর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। অবশ্য

হাতে হাত অথবা মহিলাদের হাতে (যখন তারা নিকটে থাকে) কাপড় ইত্যাদি ধরিয়ে দেওয়ার কাজটি শুধু অঙ্গীকারকে দৃঢ় করার জন্য উৎকৃষ্ট নিয়মমাত্র।

শাইখ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ৪টি অপরিহার্য শর্ত

মুরীদের উপর শাইখের ৪টি হক, সারা জীবন সে অনুযায়ী কাজ করবে।

১. ইত্তিলা (অবহিত করা)।
২. ইত্তিবা (অনুসরণ)।
৩. ই'তিকাদ (ভক্তি বিশ্বাস রাখা)।
৪. ইনকিয়াদ.(আত্মসমর্পণ)।

অনুরূপ অসৎ সঙ্গী পরিহার করা উচিত: যেহেতু ব্যক্তির প্রভাব তার সাথীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাই যে কোনো ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। মানসিকতা গঠনের ক্ষেত্রে সাহচর্য ও সংস্রবের বিরাট প্রভাব রয়েছে।

আত্মশুদ্ধির সহজ উপায় (সহজ তিনটি সুন্নাত)

বুর্যূগানেদ্বীন বলেন, সহজ তিনটি সুন্নাতের উপর আমল শুরু করলে অন্যান্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়, শওক-যওক পয়দা হয়। এটি অভিজ্ঞতার কথা।

১. আগে আগে সালাম দেয়া, বেশি বেশি সালাম দেয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম দেয়া, সালামের রেওয়ায চালু করা। চাই পরিচিত হোক অথবা অপরিচিত। সালাম সহীহ-শুদ্ধভাবে দেয়া। সাধারণতঃ সালাম দেয়ার সময় সালামের শুরুর হামযা ও মীমের পেশকে স্পষ্টভাবে আদায় করা হয় না। তাই সহীহ করে সালাম এইভাবে দেয়া চাই–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

(আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।)

এবং কেউ সালাম দিলে এইভাবে উত্তর দিবে–

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

২. প্রত্যেক উত্তম কাজ ও উত্তম স্থানে ডান দিককে প্রাধান্য দেয়া এবং তুলনামূলক নিম্নমানের কাজ ও নিম্নমানের স্থানে বাম দিককে প্রাধান্য দেয়া।

যেমন মসজিদ উত্তম স্থান তাই ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা, পায়খানা নিম্নমানের স্থান, তাই বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা। খানা খাওয়া উত্তম কাজ, তাই ডান হাত দিয়ে খানা খাওয়া। নাক সাফ করা তুলনামূলক নিম্নমানের কাজ, তাই বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করা।

৩. আল্লাহ তা'আলার যিকির বেশি বেশি করা। দৈনিক কমপক্ষে ১০০ বার ইস্তিগফার, ১০০ বার কালেমায়ে তাইয়্যিবা, ১০০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করা। যে সমস্ত ফরয নামাযের পর সুন্নাত নেই, সেগুলোর ফরযের পর, আর যে সমস্ত ফরয নামাযের পর সুন্নাত আছে, সেগুলোতে সুন্নাত থেকে ফারেগ হওয়ার পর মুস্তাহাব হলো এই–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

(চিরঞ্জীব, সাধিষ্ঠ, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই কাছে তাওবা করি।)

আয়াতুল কুরসী, তিন কুল অর্থাৎ সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস ফজর ও মাগরিবে তিন-তিনবার, বাকি ওয়াক্তে এক-একবার পড়া। তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়া।

উত্তম হলো, আমরা যখন নিচ থেকে ওপরের দিকে উঠি তখন–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার) বলতে বলতে ওপরে উঠা। উপর থেকে নিচের দিকে নামার সময় সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ বলতে বলতে নামা এবং সমতল ভূমিতে চলার সময় لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলতে বলতে চলা। এই সমস্ত আমল আমরা এই নিয়্যতে করবো যাতে আল্লাহ তা'আলার মুহাব্বত বাড়ে ও গায়রুল্লাহর মুহাব্বত কমে।

গুনাহ'র দুনিয়াবী ক্ষতি এবং নেককাজে নগদ উপকারিতা

গোনাহর কারণে জগতে নানাবিধ অশান্তির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাক বলেন-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

অর্থ- "লোকদের কৃতকর্মের (অর্থাৎ লোকদের গুনাহর) দরুন জলে-স্থলে সমস্ত স্থানে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।" –সূরা-রূম : ৪১

হযরত আলী (রাযি.) বলেছেন, কোনো প্রকার বালা-মুসিবতই গুনাহ ব্যতীত নাযিল হয় না। বালা-মুছিবতও তাওবা ব্যতীত কিছুতেই দূর হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থ– যে সমস্ত মুসিবত তোমাদের উপর আসে, তা তোমাদের কৃতকর্মের দরুনই আসে; অথচ অনেক বিষয় আল্লাহ তা'আলা মাফও করে দেন।

–সূরা শুরা : ৩০

আবহাওয়া খারাব হয়ে রোগ-পীড়া বৃদ্ধি হওয়া, শস্যাদির বরকত কমে যাওয়া, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বা অসময়ে বৃষ্টি হয়ে দুর্ভিক্ষের প্রার্দুভাব হওয়া এই সমস্ত পাপের ফলের পরিচায়ক।

আল্লাহ তা'আলার হুকুম অমান্য করলে তথা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা ও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হলে কেবল মৃত্যুর পর আখেরাতেই যে মারাত্মক আযাব ও শাস্তি ভোগ করতে হবে তা নয়, বরং দুনিয়াতেও এই সংসার জীবনে নানারকম নিশ্চিত ক্ষতি, বালা-মুসিবত, অশান্তি, অনাচার, দুর্ভোগ ও কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখিন হতে হয়। যার ফলে দুনিয়ার জীবন সম্পূর্ণ বিষাক্ত, বিস্বাদময় ও বিপর্যস্ত হয়ে উঠে। কুরআন ও হাদীসে এই বাস্তব তথ্যটি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'লার হুকুম অমান্য করার কারণেই ইবলিস আসমান হতে বিতাড়িত হয়ে যমীনে

নিক্ষিপ্ত হয়েছে, অভিশপ্ত আখ্যা পেয়েছে, তার সুরত বদলে গেছে, আল্লাহ তা'আলার গযবে পতিত হয়ে কত প্রকার লাঞ্ছনাই সে ভোগ করছে। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সময় তুফানে পৃথিবীর সমস্ত লোক পানিতে ডুবে অপমৃত্যু বরণ করেছে, পাপের অভিশাপই তাদেরকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়েছে। আদ বংশধর প্রবল বাতাসের থাবায় বিধ্বংস হয়েছে। সামূদ জাতি অদৃশ্য প্রচণ্ড গর্জনে নিপাত হয়েছে। হযরত লূত আলাইহিস সালামের কওম প্রস্তর বর্ষিত হয়ে নিঃশেষ হয়েছে। এসব কিছু আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা ও গোনাহের কারণেই হয়েছে। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের কওমের উপর আসমান হতে অগ্নি বর্ষিত হয়েছে। মহাপাপী ফেরাউন সদলবলে উত্তাল সাগরে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে। কারূন সারাজীবনের উপার্জিত অগাধ ধন-সম্পদসহ আল্লাহ পাকের গজবে মাটির নীচে ধ্বসে গেছে। বনী ইসরাঈল গোত্রের উপর বহুবার বহুবিধ আযাব এসেছে। এসব ঘটনা যে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা, হুকুমের অমান্যতা ও গোনাহের কারণে হয়েছে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই। ঐ শুনুন আল্লাহ পাক বলেন,

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

অর্থ- আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুম করেন নাই; তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল। –আনকাবুত ঃ ৪০

ধর্মপরায়নতা দ্বারা রাজত্ব স্থায়ী হয়। ইমাম বুখারী রহ. হযরত মুয়াবিয়া রাযি. থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আবূ হুরাইরা (রাযি.) বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– যতকাল কুরাইশগণ ধর্ম ঠিক রাখবে ততকাল তাদের মধ্যে খেলাফত ঠিক থাকবে।

গুনাহের কারণে দেশ-জাতির অস্তিত্ব খতম হয়ে যায়। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হয়। ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেন, মুসলমান কর্তৃক সাইপ্রাস বিজয়ের দিন হযরত আবু দারদা রাযি. একাকি বসে কাঁদছিলেন। তা দেখে হযরত যোবায়ের ইবনে নজির রহ. বললেন, হে আবু দারদা এমন শুভ বিজয়ের দিনে আপনার কাঁদার কারণ কি? হযরত আবু দারদা রাযি. জবাবে বলিলেন, ভাই যোবায়ের, আমি সাইপ্রাসবাসীর দূরাবস্থা দেখে এই জন্য কাঁদছি, হায়! পাপপথে চালিত হলে মানুষ এবং জাতি এইরূপ বিপর্যয়ের শিকার হয়। অর্থাৎ, কাল যে জাতি রাজত্ব করছিল আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করায় আজ তাদের কি শোচনীয় পরিণতির শিকার হতে হলো।

রাষ্ট্রীয় যুলুম

এইড্‌স, ক্যান্সার, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হওয়া, ভূমিকম্প, শিশু মৃত্যু, মেয়েলোকের বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি সহ আরো যেসব আসমানী বালা মুসীবত উম্মতের উপর নেমে আসে সে সবই আমাদের কৃত গুনাহের কাজের ফসল।

দেশের শাসকবর্গের দ্বারা যুলুম, অত্যাচার, প্রজাপীড়ন জনগণের গুনাহ ও নাফরমানির কারণেই হয়ে থাকে। হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, আমি হেকমতের কিতাবে পাঠ করেছি, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহ। আমি সমস্ত বাদশার বাদশা। তাদের (অর্থাৎ শাসকবর্গের) অন্তঃকরণ আমার হাতের মধ্যে। জন-সাধারণ যখন আমার আদেশ পালন করে তখন তাদের শাসকগণের দিল দয়া এবং মায়া দ্বারা পূর্ণ করে দেই। যখন লোকগণ অবাধ্য হয় তখন তাদের শাসকগণের হৃদয় নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা এবং ক্রোধ দ্বারা পূর্ণ করে দেই। কাজেই তারা লোকদিগকে কঠোর শাস্তি ও যুলুম করে থাকে।– আবু নঈম।

কাজেই এমতাবস্থায় তোমরা অনর্থক শাসকগণকে মন্দ বল না বরং আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। গুনাহর কাজ পরিত্যাগ কর, আমিই তাদের তোমাদের উপর সদয় করে দিব।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয় প্রকার লোকের উপর লানত করেছেন। অথচ সকল নবী-রাসূলগণের দু'আ, বদ দু'আ নিশ্চিত কবুল হয়ে থাকে।

১। যারা বিকৃত করে কুরআনের অর্থ করবে।

২। যারা আল্লাহর সৃষ্ট তকদীরকে অবিশ্বাস করবে।

৩। যারা আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল মনে করবে।

৪। যারা জোর জবরদস্তি করে নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দুষ্ট-দুরাচার ও অযোগ্যদিগকে পদায়ন করে নেতৃত্বের আসনে বসাবে। আর যোগ্য, সৎ, ন্যায়-নিষ্ঠাবান খোদাভিরু কর্মকর্তাদিগকে অপসারিত করে অপমানিত ও ক্ষমতাহীন করবে।

৫। যারা (আমার রূহানী ও জিসমানী) আওলাদে রাসূল ও খাঁটি উলামায়ে কিরামকে অবমাননা করবে।

৬। যারা আমার উম্মত হয়ে আমার সুন্নত পরিত্যাগ করে ভিন্ন আদর্শ, ভিন্ন পথ, বিজাতীয়দের রীতি-নীতির অনুসরণ করবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বর্ণনা করেন, আমরা দশজন লোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, পাঁচটি অতি মারাত্মক বিষয় রয়েছে; আমি দু'আ করছি আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদেরকে ঐগুলি হতে বাচিঁয়ে রাখেন...

১. কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীল ও লজ্জাহীনতা প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ হলে তাদের মধ্যে প্লেগ রোগ দেখা দিবে। আর নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হবে যা পূর্বে কখনও দেখা দেয় নাই। যেমন : ক্যান্সার, এইড্স ইত্যাদি।

২. লোকেরা মাপে কম দেয়া আরম্ভ করলে তাদের মধ্যে অভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে; তারা মহাজনদের অত্যাচারে নিপতিত হবে।

৩. লোকেরা যাকাত বন্ধ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রহমতের বৃষ্টি হতে বঞ্চিত করে দিবেন। পশু-পক্ষী না থাকলে এক বিন্দু বৃষ্টিও তাদের উপর বর্ষিত হত না।

৪. ওয়াদা ভঙ্গ করলে ভিন্ন জাতির দুশমনকে জয়ী করে তাদের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হবে; তারা বলপূর্বক ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করবে।–ইবনে মাজা

ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)-কে ভূমিকম্পের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, মানুষ যখন জায়েয কাজের ন্যায় যিনা-ব্যভিচার, শরাব পান ও গান-বাদ্য প্রকাশ্যভাবে আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়ে পৃথিবীতে কম্পন হতে আদেশ করেন, যাতে লোকেরা সতর্ক হয়ে পাপাচার ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

বিশেষত আমাদেরই কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, গুনাহেরকাজ করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেই শাস্তি কখনও দুনিয়াতে হয়, আবার কখনও শুধু আখেরাতের জন্য জমা করে রাখা হয়। অনেকের পাপ করতে করতে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে, দুনিয়ার মায়ায় জড়িয়ে পড়তে হয়, ধর্ম ও আখেরাতের কথা ভালো লাগে না, নেক লোকের সংসর্গে গিয়ে নেক কাজ করার সাহস হয় না, মনে দুর্বলতা এসে যায়– এটাও এক প্রকার শাস্তি, যা দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়।

গুনাহ'র কারণে দুনিয়াতে ২৭ প্রকার ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে

১. গুনাহ'র কারণে ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম থাকতে হয়।

২. কামাই রোযগারের বরকত উঠে যায়।

৩. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে দূরত্বভাব সৃষ্টি হয়। ফলে নেক কাজে মন বসে না।
৪. মানুষের সঙ্গেও দূরত্বভাব তৈরি হতে থাকে। বিশেষ করে নেককার লোকদের সঙ্গে। ফলে তাদের সোহবতে থাকতে মন চায় না।
৫. অধিকাংশ কাজের মধ্যে পেরেশানি দেখা দেয়।
৬. দিলের মধ্যে অন্ধকার ভাব দেখা দেয়।
৭. মাঝে মধ্যে শরীর এবং মনে দুর্বলতা দেখা দেয়।
৮. নেক কাজ থেকে মাহরূম থাকতে হয়।
৯. হায়াত কমে যায় এবং যিন্দেগীর বরকত খতম হয়ে যায়।
১০. এক গুনাহ অন্য গুনাহ'র ওসীলা হয়ে দাঁড়ায়।
১১. তাওবার ইরাদা আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে।
১২. অল্পদিনেই ওই গুনাহ'র প্রতি দিলের ঘৃণাভাব শেষ হয়ে যায়।
১৩. আল্লাহ তা'আলার দুশমনদের ওয়ারিস হতে হয়। কেননা প্রত্যেক গুনাহই আল্লাহ তা'আলার কোন না কোন দুশমনের দ্বারা শুরু হয়েছে।
১৪. গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট বেইজ্জত হয়ে যায়।
১৫. অন্যান্য মাখলুকেরও ক্ষতি হয়। তাতে তারা ওই গুনাহগারের প্রতি লা'নত করে।
১৬. জ্ঞান-বুদ্ধি হ্রাস পায়।
১৭. গুনাহগার ব্যক্তি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লা'নতের তলে পড়ে যায়। কারণ অনেক গুনাহ'র জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন।
১৮. গুনাহগার ব্যক্তি ফেরেশতাদের নেক দু'আ থেকে মাহরূম হয়ে যায়।
১৯. পৃথিবীতে নানারকম ফাসাদ দেখা দেয়।
২০. লজ্জা-শরম শেষ হয়ে যায়।
২১. আল্লাহ তা'আলার আযমত দিল থেকে বের হয়ে যায়।
২২. নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং বালা-মুসীবতে ঘিরে ধরে।
২৩. প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দা ও অপমানসূচক উপাধি মিলতে থাকে।
২৪. শয়তান তার ঘাড়ে চেপে বসে।
২৫. দিলের প্রশান্তি দূর হয়ে যায়।
২৬. মৃত্যুর সময় মুখ থেকে কালেমা বের হয় না, বরং ওই গুনাহ'র কথাই বের হতে থাকে।
২৭. আল্লাহ পাকের রহমত থেকে হতাশা সৃষ্টি হয়। ফলে সে তাওবা করে না। এভাবে শেষ পর্যন্ত তাওবা ছাড়া মারা যায়। (নাউযুবিল্লাহ)

উপরোক্ত বিষয়গুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য জাযাউল আ'মাল গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।

সকল মুসলমানেরই উচিত এমন শাস্তি এবং আরও যেসব কঠোর শাস্তি আছে, সেগুলোর কথা স্মরণ করে গুনাহ'র নিকটেও না যাওয়া। এসব গুনাহ অন্তরের হোক, চোখ বা কানের হোক, যবানের হোক বা আল্লাহ ও বান্দার হক নষ্ট করার হোক; সব ধরণের গুনাহ থেকে চিন্তা-ফিকির করে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের আসল রোগ ও তার খাঁটি ঔষধ বলে দিচ্ছি। তোমাদের মূল রোগ 'গুনাহ'।-এর খাঁটি ঔষধ তাওবা করা ও অনুনয়-বিনয় করে গুনাহের মাফ চাওয়া। –বায়হাকী

নেক কাজের ২৭ প্রকার উপকার যা দুনিয়াতে পাওয়া যায়

১. নেক কাজের দ্বারা দুনিয়াতে রিযিক বৃদ্ধি পায়।
২. ইলমে বরকত হয়।
৩. কষ্ট ও পেরেশানী দূর হয়।
৪. নেক মকসুদগুলো সহজে পুরো হয়।
৫. যিন্দেগীতে সুখ আসে।
৬. রহমতের বৃষ্টি হয়।
৭. বিভিন্ন বালা-মুসীবত দূর হয়।
৮. আল্লাহ তা'আলা সাহায্যকারী হয়ে যান।
৯. নেক লোকদের দিলকে মযবূত রাখার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম করা হয়।
১০. খাঁটি ইয্যত পাওয়া যায়।
১১. মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।
১২. মানুষের দিলের মধ্যে আমলকারীর প্রতি মুহাব্বত ঢেলে দেওয়া হয়।
১৩. কুরআন মাজীদ রোগমুক্তির ওসীলা হয়।
১৪. লোকসানের উত্তম বদলা পাওয়া যায়।
১৫. দিন দিন নেয়ামতসমূহ বাড়তে থাকে।
১৬. ধন-সম্পদ বাড়ে।
১৭. দিলে শান্তি আসে।
১৮. ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে ফায়দা পৌঁছে।
১৯. জীবিত অবস্থায়ই গায়েবী সুসংবাদ পাওয়া যায়।
২০. মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা সুসংবাদ শোনায়।

২১. প্রয়োজনের সময় মদদ পাওয়া যায়। যেমন সালাতুল হাজত দ্বারা।
২২. দিলের দ্বিধা দূর হয়। যেমন ইস্তেখারা নামাযের মাধ্যমে।
২৩. নেতৃত্ব স্থায়ী হয়।
২৪. আল্লাহ তা'আলার গযব কমে যায়, যেমন দান-খয়রাত করলে।
২৫. হায়াত বৃদ্ধি
২৬. অভাব ও অনাহার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
২৭. অল্প জিনিসে বরকত বেশি হয়।

আল্লাহ তা'আলার ফরমাঁবরদারী এবং বন্দেগীর যে সকল পার্থিব উপকারিতা তা অনেকটা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে সবরকম দুঃখ কষ্ট দূর হতে থাকে এবং সকল মুশকিল আসান হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ- وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۭ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۭ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অর্থ– যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদের জন্য সব মুশকিল এবং মুছিবত হতে মুক্তির পথ করে দেন। তাদের ধারণা বহির্ভূত স্থান থেকে তাদের রিযিক সরবরাহ করে থাকেন। যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। –সূরা তালাক : ২-৩

আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর বরকতে সুখময় জীবন লাভ হয়। বাস্তবিক নেককার ও পরহেযগার লোকদের মতো সুখশান্তি বাদশাহদের ভাগ্যেও জোটে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

যারা নেক কাজ করবে, পুরুষই হোক আর স্ত্রী হোক; যদি তারা ঈমানদার হয় তবে আমি তাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করি।

৫০টি কবীরা গুনাহ

কবীরা গোনাহ যা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না এবং একটি গুনাহই জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তা'আলা যার উপর মেহেরবানী করেন তিনি তা থেকে মুক্ত। উম্মতের ধ্বংস এবং বিভিন্ন মুখ্য পেরেশানী ও মুসীবতের মূল কারণ হচ্ছে গুনাহ। গুনাহের সঠিক পরিচয় না জানার কারণে গুনাহকে গুনাহ মনে করা হয় না। কোনটা কবীরা গুনাহ, কোনটা সগীরা গুনাহ সেটার ধারণা নাই। যার কারণে অনায়াসে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে। কেউ শখ করে গুনাহ করছে, কেউবা পয়সা খরচ করে গুনাহ করছে। আবার কেউ গুনাহর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। কাজেই গুনাহকে গুনাহ মনে না করার অন্যতম কারণ হলো গুনাহের ইলম না থাকা।

নিম্নে ৫০টি কবীরা গুনাহের বর্ণনা করা হলো। আরও কবীরা গুনাহ আছে। গুনাহ দুই প্রকার। সগীরা ও কবীরা। পার্থক্য এই যে, কবীরা গুনাহ–তাওবা, অনুশোচনা এবং পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প ছাড়া মাফ হয় না। অর্থাৎ পূর্বে কৃত গুনাহের জন্য অনুশোচনা করতে হবে। ভবিষ্যতে না করার সংকল্প হতে হবে। আর সগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'আলা নেক কাজের বদৌলতে আপনাআপনি মাফ করে দেন। কুরআন শরীফে আছে– নেক কাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত যতোই তাহাজ্জুদ, অন্যান্য নেক আমল করা হোক তা মাফ হবে না।

ঠিক উলামায়ে কিরাম বলেন, সগীরা গুনাহকে ছোট মনে করে অবহেলা করো না। এরূপ চিন্তা করো না যে, সগীরা গুনাহ তো, করলে কি অসুবিধা! এরূপ করা কবীরা গুনাহ, ছোট গুনাহকে ছোট মনে করলে তা কবীরা গুনাহ হয়ে যায়। ছোট গুনাহ আর বড় গুনাহের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন ছোট বিচ্ছু, আর বড় বিচ্ছু। বুদ্ধিমান মানুষ ছোট বিচ্ছুও হাতে নেয় না। কারণ তাও কম বিষাক্ত নয়। জেনে বুঝে কোনো ছোট গুনাহ করলে আল্লাহর সামনে দুঃসাহস দেখানো। এতে করে এটা বড় গুনাহ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা যদি বড় বড় পাপ থেকে বিরত থাক, তবে তোমাদের ছোট ছোট পাপকে আমি সরিয়ে দিব, মা'ফ করে দিব।

কবীরা গুনাহ করলে ঈমান অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে।

১. তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কারো প্রতি বিদ্রূপ করে হাসা।
২. কাউকে খোঁটা দেওয়া।
৩. কাউকে মন্দ আখ্যা দিয়ে ডাকা।
৪. বদগুমানী (কু-ধারণা) করা।
৫. কারো দোষ তালাশ করা।
৬. কারো গীবত করা।
৭. বিনাকারণে কাউকে দোষারোপ করা।
৮. চোগলখুরী করা।
৯. তোহমত (অপবাদ) লাগানো।
১০. ধোঁকা দেওয়া।
১১. কাউকে তার অতীতের গুনাহ্‌র উপর লজ্জা দেওয়া।
১২. কারো ক্ষতির উপর খুশি হওয়া।
১৩. তাকাব্বুরী (অহঙ্কার) করা।
১৪. ফখর (গৌরব) করা।
১৫. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অসহায় লোকদের সাহায্য না করা।
১৬. কারো মালের ক্ষতি করা।
১৭. কারো চরিত্রের উপর আঘাত হানা।
১৮. ছোটদেরকে স্নেহ না করা।
১৯. বড়দেরকে সম্মান না করা।
২০. মাপে কম দেওয়া।
২১. পার্থিব মনোমালিন্যের কারণে কোনো মুসলমানের সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বন্ধ রাখা।
২২. কোনো প্রাণীর ছবি তোলা।
২৩. অন্যের জমির উপর মিথ্যা ওয়ারিসী দাবি করা।
২৪. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করা।
২৫. দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুঠের কম কেটে ফেলা।
২৬. কাফের ফাসেকদের লেবাস ও বেশভূষা অবলম্বন করা।
২৭. পুরুষগণ মহিলাদের পোশাক ও বেশভূষা অবলম্বন করা।
২৮. মহিলাগণ পুরুষের পোশাক ও বেশভূষা অবলম্বন করা।

২৯. যিনা (ব্যভিচার) করা।
৩০. চুরি করা।
৩১. ডাকাতি করা।
৩২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
৩৩. এতীমের মাল আত্মসাৎ করা।
৩৪. পিতা-মাতার নাফরমানী করা।
৩৫. নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা (না-হক খুন করা)।
৩৬. মিথ্যা কসম করা।
৩৭. ঘুষ গ্রহণ করা।
৩৮. ঘুষ দেওয়া।
৩৯. ঘুষের লেনদেনে সহায়তা করা।
৪০. মদ পান করা।
৪১. জুয়া খেলা।
৪২. জুলুম করা।
৪৩. কারো জিনিস বিনা অনুমতিতে নেওয়া।
৪৪. সুদ গ্রহণ করা।
৪৫. সুদ দেওয়া।
৪৬. সুদের চুক্তিপত্র লেখা।
৪৭. সুদের সাক্ষী হওয়া।
৪৮. মিথ্যা কথা বলা।
৪৯. আমানতের খেয়ানত করা।
৫০. ওয়াদা খেলাফী করা। এখানে ৫০টি কবীরা গুনাহ উল্লেখ করা হলো। এছাড়াও অনেক কবীরা গুনাহ রয়েছে।

প্রচলিত খেলাফে সুন্নাত কাজ ও বদরুসূমাত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন,

وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِيْ كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ أُنَادِيْهِمْ أَلَا هَلُمَّ. فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ. فَأَقُوْلُ سُحْقًا سُحْقًا.

"আমি হাউজে কাউসারে সকলের অগ্রগামী হবো। কিছু সংখ্যক লোককে আমার হাউজে কাউসার থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে, যেমন পলায়নকারী উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবো তোমরা এদিকে আস, তোমরা এদিকে আস। তখন (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) বলা হবে এই লোকেরা আপনার ইন্তেকালের পর দ্বীন ও সুন্নাতের মধ্যে পরিবর্তন করেছে এবং বিদ'আত সৃষ্টি করেছে। তখন আমি বলবো এমন লোক দূর হোক, এমন লোক দূর হোক।" –সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯

উল্লিখিত হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয়, দ্বীন-ঈমান হেফাযতের একমাত্র মাধ্যম হলো কুরআনে কারীম ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা। বিদ'আত, কুসংস্কার থেকে নিজের ঈমান-আমলকে হিফাযত করা।

প্রচলিত উরসের স্বরূপ

উরস বলতে বুঝায় কোনো বুর্যূগ বা পীরের মৃত্যুদিবসে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লোক সমাগম করা। ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোনো বিধান নেই।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.), তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগে এ-ধরনের উরস পালনের কোনো প্রমাণ নেই। উরস পালন যদি জায়েয হতো, তাহলে সাহাবায়ে কিরামই (রাযি.) সর্বপ্রথম রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর রওযা শরীফে উরস পালন করতেন। অথচ এর কোনো প্রমাণ নেই। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি একটি নতুন আবিষ্কার। উরস পালন করা সম্পূর্ণ বিদ'আত ও হারাম।

প্রচলিত উরস অনেক গুনাহ'র সমষ্টি। ইসলামের নামে নতুন নতুন আবিষ্কার, ধর্মের নামে অধর্ম, পীর পূজা, মাজার পূজা, পীরের পায়ে সিজদা, মাজারে সিজদা, মাজারে গিলাফ জড়ানো, নারী-পুরুষের মিলনমেলা, পর্দাহীনতা, মালের অপচয়, অবৈধ অর্থ উপার্জনের মাধ্যম। মানুষকে দ্বীনের সহীহ রাস্তা থেকে সরিয়ে ভণ্ড, বিদ'আতী ও বদদ্বীন বানানোর কৌশল। মাজার পূজারীরা গান-বাজনার অনুষ্ঠানকে নেক কাজ মনে করে। মাজারের নামে মান্নত, নযর-নেয়ায আদায় করে শিরকি গুনাহ'র মধ্যে লিপ্ত থেকে হারাম তরীকায় অর্থ উপার্জন করে নিজেরা ভাগ করে এবং বছরান্তে মহাধুমধামে উরস শরীফ পালন করে। এতে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক এজেন্টদের মাধ্যমে মান্নত, নযর-নেয়াযের নামে সহজ-সরল মানুষদের থেকে গরু, ছাগল, উট, মহিষ উসূল করে উরসের আগে পরে নিলামে বিক্রয় করে অনেক টাকা হাতিয়ে নেয়। এ উপলক্ষ্যে মেলা, বাউল-গান ভক্তবৃন্দদের মিলন মেলায় পরিণত হয়।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ মাহরাম, গায়রে মাহরামের কোনো বিচার-বিবেচনা না করে একই সঙ্গে বাস, লঞ্চ ইত্যাদি যানবাহনে সফর করে। এদের মধ্যে নামাযের কিংবা পর্দার কোনো গুরুত্বই থাকে না।

পরিশেষে উরসে উপস্থিত হয়ে দ্বীনের কোনো সহীহ তা'লীম তরবীয়ত না পেয়ে বদদ্বীনীতে আরও পাকা হয়ে ফিরে যায়। এলাকায় বা দেশে ফিরে এদেরকে দ্বীনের কোনো সহীহ কাজে পাওয়া যায় না। এ ধরনের বাতিল পীরের বাতিল তরীকার প্রচার প্রসারের কাজকেই একমাত্র দ্বীনের কাজ মনে করে। লক্ষ লক্ষ টাকায় বড় বড় তোরণ নির্মাণ, পোস্টার, ব্যানারে সাড়া দেশ ছেয়ে ফেলে। এতে কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে।

আখেরী যামানায় এ ধরনের দাজ্জালের উত্তরসূরীরা ইসলামের নামে মানুষকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার প্ররোচনা চালিয়ে আকৃষ্ট করে। বড় বড় জলসায় জশনে জলুশের আয়োজন করে দ্বীনের সহীহ তা'লীমের পরিবর্তে ভ্রান্ত তা'লীম দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বর্তমানে এটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এমন এমন কিছু গোমরাহ পীর রয়েছে যারা বলে, তাদের কাছে মুরীদ হলে নামায, রোযা, পর্দার কোনো পাবন্দী করতে হয় না। এদের মুরীদ হলে নামায-রোযা

ছাড়াই তাদেরকে সোজা জান্নাতে যাওয়ার কথা বলা হয়। কাজেই ভিত্তিহীন ধর্মের নামে এ ধরনের বাতিলপন্থীদের থেকে ঈমান আমলের হিফাযতের জন্য সকলকে সোচ্চার হওয়া আবশ্যক। তাদের দরবারে কিছু ধর্মজ্ঞানহীন মন্ত্রী আমলাদের বিভিন্ন কৌশলে হাত করে তাদের সহযোগিতায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উরস পালন করার মাধ্যমে সর্ব সাধারণকে আরো বেশি এদিকে ঝুঁকতে উদ্বুদ্ধ করে।

প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে বা পরে অনেকবার এই ১২ই রবীউল আউয়াল এসেছে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে একবারও এই দিনে কোনো আনন্দ উৎসব করেননি। করেছেন বলে তার কোনো প্রমাণও নেই। সাহাবা (রাযি.) গণের যুগেও প্রতি বছর বারই রবীউল আউয়াল এসেছিলো। কিন্তু কোনো বছরই কোনো সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মোৎসব পালন করেননি। কারো থেকে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ সাহাবা (রাযি.) গণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এতোই আশেক ছিলেন যে, তাঁর ইশারায় নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে সামান্য পরিমাণ দ্বিধা করতেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মোৎসব পালনে যদি এতোই নবীপ্রেম নিহিত থাকতো, তাহলে সাহাবা (রাযি.) গণ কেন করেননি?

এরপর সাহাবা (রাযি.) গণের সুযোগ্য উত্তরসূরী হলেন তাবেঈগণ। তাবেঈনের যুগেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মোৎসব পালিত হয়নি। এরপর এসেছে তাবে তাবেঈনের যুগ। সে যুগেও এ ঈদে মীলাদুন্নবী পালিত হয়নি। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগেও রাসূলের জন্মোৎসব পালিত হয়নি। ছয় শ বছর পর্যন্ত এর কোনো অস্তিত্ব ছিলো না।

সর্বপ্রথম এই প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের মুসেল নামক শহরে উমর বিন মুহাম্মদ আবিষ্কার করে। আর সর্বপ্রথম এর প্রচলন ঘটায় বাদশাহ আবু সাঈদ মুযাফফর। -বারাহীনে কাতিআহ, ১৬৩/১৬৪

আর হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ اَحْدَثَ فِيْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয় আবিষ্কার করবে, যা দ্বীনের মধ্যে প্রমাণিত নেই, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।"-সহীহ বুখারী, : ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম, : ১৭১৮

সুতরাং যে কাজের প্রচলন ইসলামের সোনালী যুগে ছিলো না তা বিদ'আত হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া দিন দিন তার সঙ্গে গর্হিত কর্মকাণ্ড আরো বর্ধিত হচ্ছে। বর্তমানে মিছিল-মিটিং, আনন্দ-র‍্যালি ইত্যাদি হচ্ছে। এসব ইতোপূর্বে ছিলো না। বছরের পর বছর যতোই দিন বাড়ছে, ততোই উৎসবপ্রিয়দের কর্মপরিধি বাড়ছে। আগামীতে আরো কী হবে? তা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

বর্ষবরণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

-সূরা বাকারা : ২০৮

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ

যে যেই সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে তাকে সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা হবে।

যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ ও ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ইত্যাদিকে ইসলামী বিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই এই ত্রুটি বেশি দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি-নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলে বিশ্বাসই করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেন এদের কোনো আগ্রহ নেই। তেমনি এর অনুশীলনেও তাদের কোনো আগ্রহ নেই। আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্ম ইসলাম। আমাদের আদর্শ ইসলাম। মুসলমানের প্রকৃত পরিচয় ইসলাম। বংশ, গোত্র, ভাষা ও ভূখণ্ড এগুলোও আমাদের পরিচয়। তবে তা আদর্শিক পরিচয় নয়। প্রাকৃতিক পরিচয়। আমাদের আদর্শিক পরিচয় ইসলাম। ইসলাম আমাদের চিন্তা ও কর্মের নিয়ন্ত্রক। হাদীস পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন থেকে

পারবে না যতক্ষণ তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আমার উপর আনিত শরীয়তে সুন্নাতের তাবে বা অনুগত না হয়। এখানে আমার মুসলিম ভাইবোনের বিবেচনার বিষয় আমাদের উৎসবপ্রবণ বিশেষ করে বাংলা নববর্ষের পহেলা বৈশাখের বর্ষবরণে যে সমস্ত কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এগুলো কি শরীয়তসম্মত? ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের নীতি না বিজাতীয়দের রীতি-নীতি? অথচ আমরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করি। বিজাতীয়দের এ সমস্ত অনুষ্ঠান বহু পাপাচারের সমষ্টি। আমরা নির্দ্বিধায় এতে নিজেও অংশগ্রহণ করছি। এবং আমাদের পরিবার-পরিজন নিজেরাও অংশগ্রহণ করে যাচ্ছি। নিজেদের জাতিসত্তাকে ভুলে গিয়ে হিন্দুদের রীতি-নীতি উদারচিত্তে গ্রহণ করে নিচ্ছি। অনুরূপভাবে ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনেও প্রাচীন বর্বরতাকে অতিক্রম করেছে। সকল প্রকার গুনাহ'র সমষ্টি হলো থার্টি ফাস্ট নাইটের অনুষ্ঠান। ইংরেজি খ্রিস্টানীদের তরীকায় মহোৎসব যা এতো ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মুসলিম অধ্যুষিত দেশে তাদের কৃষ্টি-কালচার এদেশের মুসলমান সন্তানগণ এমনভাবে গ্রহণ করেছে যা তাদের পাশ্চাত্যকে পিছে ফেলে দিয়েছে। থার্টি ফাস্ট নাইটের নষ্টামী, বদমায়েশী বেহায়াপনাকে গ্রহণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সর্বাত্মক ব্যবস্থা করেও ব্যর্থ। এমনিভাবে আমাদের অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলোতে বিজাতীয় অনুসরণ অনুকরণকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়েছে। এক কথায়, বিধর্মীদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কৃষ্টি-কালচার রীতি-নীতি লেবাস পোশাক শিক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে গেছে। ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনকে বাদ দিয়ে বিজাতীয়দের সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারলেই নিজেদেরকে ধন্য মনে করি। অথচ আমাদের নিজস্ব একটা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আছে। তা আজ আমরা বেমালুম ভুলেই গেছি। ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলিম সংস্কৃতির কথা শুনলে আমাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায়। আজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মূর্তি পূজকদের আগ্রাসন মহামারি আকার ধারণ করেছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি পোশাক-পরিচ্ছেদ, বিয়ে-শাদি প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ করে চলছি। বর্তমানে এ পর্যায় এসে গেছে– যদি কেউ এসব বিষয়ে মুসলিম জাতি গোষ্ঠীকে গোমরাহিতে আচ্ছন্ন ব্যক্তি ও সমাজকে সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেয় তখন তার টুটি চেপে ধরতে কষ্ট বোধ করে না। তাকে মৌলবাদী, রাজাকার আরো কতো কী গালি ও অপবাদ তার দিকে ধেয়ে আসে। অতএব, আমার উদারপন্থী মুসলিম ভাইগণ এখনও সময় আছে। নিজেকে মুসলমান দাবি করে বিজাতীয় রীতি-নীতিকে ভালো জানা, ভালোবাসা, অনুকরণ করার অশুভ পরিণাম ফল আখেরাতে ভোগ করতে হবে। শুধু ইসলামী নাম ও

ইসলামী খৎনা করে নাজাতের আশা অনিশ্চিত। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমরা নিজেদের জাতিসত্তা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ বিজাতীয় তরীকাকে আপন করে নিয়েছি। এমনকি নিজ পরিচয় না দেয়া পর্যন্ত বুঝার কোনো উপায় নেই যে, কোন ধর্ম মতের অনুসারী।

জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গুনাহের মহোৎসব

একটি জাতীর নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-নীতি থাকে। জাতিগত হিসাবে আমরা মুসলমান। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি কুরআন সুন্নাহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত–মুসলমান হিসাবে জিন্দেগীর সকল পর্যায়ে নিজেদেরকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে রাখতে হবে। আনন্দ-সুখের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য দুঃখ-মুসীবতের ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়। প্রত্যেক ভাষা আল্লাহ্ পাকের সৃষ্ট নেয়ামত। প্রত্যেক ভাষাভাষির তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। সকল ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা তার অধিকার। এ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যুলুম। আমরা ভাষাগত দিক থেকে বাঙালী। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য যাঁরা জীবন দান করেছিল তাঁদেরকে বলা হয় ভাষাশহীদ। ৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে এ অধিকার আদায় করতে যাঁরা জীবন দান করেছেন আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। জাতিগত ভাবে তাঁরা আখেরাতে বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। আজকে তাঁরা কবরজগতের বাসিন্দা। মুসলিম হিসাবে কুরআন সুন্নাহ আলোকে তাদের পরকালের উপকার হয়, আখেরাতে নাজাত-মুক্তি ও সাওয়াব লাভ করতে পারে এ ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গকারী জাতীয় বীরদের প্রতি আমাদের সঠিক দায়িত্ব হলো তাদের জন্য দু'আ করা, সাওয়াব পৌঁছানো, তাদের কবর জিয়ারত করা। কিন্তু কুরআন সুন্নাহর আলোকে তা না করে বিজাতীয়দের কৃষ্ট-কালচার অনুসরণে প্রভাতফেরী, গান-বাদ্যের আয়োজন করার মাধ্যমে তাদের মৃত্যু দিবস পালন করা হবে তাদের প্রতি অবিচার করা, যুলুম করা, অন্যায় করা। তাদের প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা ও প্রতিদানের মূল্যায়ন হবে দু'আ করা। কুরআন সুন্নাহর আলোকে পরলোকগতদের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটি যথার্থভাবে উপস্থাপন করা। এ উপলক্ষে প্রচলিত সকল গুনাহর কাজ বর্জন করা।

বিজাতীয়দের তরীকা মুহাব্বতের কারণে এক আবেদের নির্মম পরিণতি

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বর্ণনা করেন, মক্কা মুকাররমার শায়েখ ওয়াহহান নামে একজন বিশিষ্ট

আবেদ আলেম ছিলেন। ইন্তেকালের পর তাকে জান্নাতুল মুয়াল্লার মতো বরকতী গোরস্থানে দাফন করা হয়। কিছুদিন পর অন্য একজন লোকের ইন্তেকাল হয় তার ইচ্ছা অনুযায়ী ওই আলেমের কবরে তাকে দাফন করার অসিয়্যত করেন। তার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে ওই আলেমের কবরে কবরস্থ করার জন্য লোকজন কবর খনন করে দেখতে পেলেন, ওই কবরে এক সুন্দরী রূপসী বালিকার অক্ষত লাশ উপস্থিত। সকলেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। মেয়েটির অবয়ব দেখে মনে হয় একজন খ্রিস্টান বালিকা। তখন হজ্বের মওসূম, জানাযায় উপস্থিত একজন ওই বালিকার মুখাবয়ব দেখে বলে উঠলেন, বালিকাটি আমার পরিচিত। সে ফ্রান্সের অধিবাসী। একজন খ্রিস্টানের কন্যা। আমি তার গৃহ শিক্ষক ছিলাম। সে আমার কাছে পড়া-শোনা করতো। এবং তাকে সময় সময় কিছু দ্বীনী বই-পুস্তকের তা'লীম ও দাওয়াত দিতাম। এক পর্যায়ে সে গোপনে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো। বালিকাটির লাশ এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণটি তো সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান এবং নেককার ছিল। কিন্তু ওই মুসলমান আলেমের লাশ কোথায় গেল?

অনন্তর সে লোকটি মেয়েটিকে চিনতো। তাকে সকলেই অনুরোধ করলো, আপনি যখন হজ্ব সমাপনান্তে ফ্রান্সে যাবেন তখন ওই বালিকাকে যেখানে দাফন করা হয়েছে তার কবরে কার লাশ আছে তা দেখে আমাদেরকে অবহিত করবেন। মক্কা মুকাররমা থেকে ওই আলেম ব্যক্তির পরিচিত একজন লোককে সঙ্গে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হল। সে লোকটি ফ্রান্সে গিয়ে তার মা-বাবার কাছে জানতে পারলেন, মেয়েটির কিছুদিন পূর্বে মৃত্যু হয়েছে এবং তাকে খ্রিস্টানদের গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। সে তাকে মেয়েটির লাশ স্থানান্তরের ঘটনাটি জানালে তাদের অনুমতিক্রমে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে গিয়ে কবরটি খনন করে দেখতে পেলেন, ওই মেয়েটির কবরে মক্কা মুকাররমার দাফনকৃত ওই আলেমের লাশ। মক্কাবাসীদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছার পর দারুণ উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল সৃষ্টি হল। মক্কা মুকাররমায় দাফনকৃত এই লাশ কাফেরের দেশে খ্রিস্টানদের কবরস্থানে স্থানান্তর হওয়ার কারণ কী? তার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাকে ভালো জানে। তিনি একজন আলেম আবেদ ছিলেন। কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত আমল-আখলাকে কোনো ব্যতিক্রম ছিল কি না তা জানার জন্য তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রী উত্তরে বললেন, তিনি নামাযী, কুরআন তিলাওয়াতকারী, তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। তিনি আমাকে খুব যত্ন করতেন। অনুসন্ধিৎসু লোকজন ওই আলেমের স্ত্রীকে লাশ স্থানান্তরের ঘটনা জানিয়ে পুনরায় বললো, আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে বলুন, তার আচার-আচরণে

ইসলামের খেলাফ কোনো কিছু লক্ষ্যণীয় ছিল কি না? তার স্ত্রী বললো, আমি তো তার মধ্যে ওই রকম কিছু পাইনি। তবে এতটুকু মনে আছে, তিনি যখন আমার সঙ্গে সহবাস করতেন গোসল ফরয হলে কখনও কখনও বলতেন, খ্রিস্টান ধর্মের এই বিষয়টি উত্তম, তাদের ধর্মে সহবাসের পর গোসল করা ফরয নয়। তখন আর কারো বুঝতে বাকি রইলো না খ্রিস্টান ধর্মের একটি আদর্শকে তিনি পসন্দ করতেন। কুফুরীর একটি রীতি-নীতিকে পসন্দ করার কারণে বাহ্যত নেককার ঈমানদার হওয়ার পরও তার এই নির্মম পরিণতি।

যে ব্যক্তি যে জাতির রীতি-নীতি, আচার-আচরণ অবলম্বন করবে সে আখেরাতে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লামা আবু বকর রউফ মানাবী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার কিতাব ফয়যুল কাদীরে উল্লেখ করেন, বিজাতীয়দের প্রকাশ্য চলাচল ইখতিয়ার করা, তাদের রীতি-নীতি অনুযায়ী চলা, তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষায় তাদের তরীকা অবলম্বন করা– এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, এসব ক্ষেত্রেই বিজাতীয়দের অনুকরণ করা হারাম। আমরা ইসলাম ধর্ম অনুসরণের দাবিদার।

ভাইগণ! আজকে আমরা বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচার রীতি-নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে নিজেকে মুসলিম আশেকে রাসূল দাবি করছি। উম্মত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে ইত্তেবা ও অনুসরণ উদ্দেশ্য তাহলো, মুহাব্বত ও ভালোবাসার সঙ্গে হওয়ার অনুসরণ।

হাদীসে পাকে আছে, যে জাতির রীতি-নীতি, আচার-আচরণ গ্রহণ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

পরিশেষে বলছি, যদি মুসলমানদের নববর্ষ উদযাপন করার বিধান থাকতো তাহলে মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে হিজরী নববর্ষ পালন করতে হতো। আরবী নববর্ষের মাস হলো মুহাররম। কিন্তু পহেলা মুহাররমে নববর্ষ কোথাও উদযাপিত হয় না। আসলে নববর্ষ পালন আমাদের সংস্কৃতি নয়। এটা বিজাতীয়দের থেকে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে।

বলার ভুলঃ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া!

এ-কথাটি ভুল। মৃত্যুশয্যায় মুমূর্ষু ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে 'জনাব কোতয়ালী সাহেব গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।'

এভাবে বলা ভুল। পাঞ্জা লড়ার বিষয়টি সাধারণতঃ সমশক্তি সম্পন্নদের মাঝে হতে হয়, যেখানে হারজিত উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারটি এমন

নয়। মৃত্যু হলো সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম। এর সাথে একজন দুর্বল মানুষের পাঞ্জা লড়ার প্রশ্নই আসে না। কোনো মুসলমান এ বিশ্বাসও রাখে না। অসাবধানতার কারণে এ-ধরনের কথা মুখে চলে আসে, যা পরিহার করা জরুরী।

ভুল আমল : গোসল শেষে উযূ করা!

দেখা যায় অনেকে গোসল শেষ করে আবার পুরা উযূ করে। উযূ কেন করছে জিজ্ঞাসা করলে বলে থাকে, নামায পড়ব তাই। এর মানে হল তারা মনে করে, নামায পড়ার জন্য গোসল করাটা যথেষ্ট হয়নি। তাই নামাযের জন্য আবার উযূ করে থাকে। এটা একটা ভুল আমল। গোসলের পর উযূ করার কোনো বিধান নেই। ফরয গোসল হলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয এবং পূর্ণ উযূ করে নেওয়া সুন্নত, যা গোসলেরই একটি অংশ। তাই যথাযথভাবে গোসল করার পর নতুন করে আবার উযূ করা ঠিক নয়।

বিদ'আত : জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা!

সুন্নাত পদ্ধতিতে আকীকা না করে নিজের মনমতো কোনোদিন জন্ম-অনুষ্ঠান পালন করা। সে অনুষ্ঠানে সুন্নাত পরিপন্থী অনেক কাজ করা। যেমন– ১. সাত দিনের হিসেবের প্রতি খেয়াল না করা, ২. নির্ধারিত দিনে বাচ্চার চুল না কাটা, ৩. সদকা না করা, ৪. বকরি বা ভেড়া জবাই না করা এবং ৫. যশ ও খ্যাতির জন্যে যত ধরনের গর্হিত কাজ করতে হয় সব কিছু করা। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে হিফাযত করুন।

ভুল রীতি : সালাম বা মুসাফাহার পর বুকে হাত রাখা!

কোনো কোনো মানুষকে সালাম বা মুসাফাহার পর নিজ বুকে হাত রাখতে দেখা যায়। এ কাজটিকে যদি সালাম-মুসাফাহার সুন্নাত নিয়মের অংশ মনে করা হয়, তাহলে এটি বিদআত। আর এমনিই করা হলে এটা একটি অনর্থক কাজ। মুহাব্বতের প্রকাশ তো সালাম-মুসাফাহার মাধ্যমেই হয়ে গেল। বাড়তি কিছুর তো প্রয়োজন নেই। মোটকথা, এটা সংশোধনযোগ্য।

একটি প্রচলিত মারাত্মক গোনাহ

মামী, চাচী এবং সৎ-শাশুড়ির সাথে পর্দা না করা!

কোনো কোনো মানুষ মামী, চাচী এবং সৎ-শাশুড়ির সাথে পর্দা করাকে জরুরী মনে করে না। তারা বলে, এদের সাথে পর্দা নেই। এটা সম্পূর্ণ ভুল। এরা গাইরে মাহরাম এবং এদের সাথে পর্দা করা জরুরী।

তেমনি খালু, ভগ্নিপতি, দেবর, স্বামীর বড় ভাই, চাচাশ্বশুর, মামাশ্বশুর, খালুশ্বশুর সবাই গাইরে মাহরাম। এদের সবার সাথেই পর্দা করা জরুরী। এটা মনে না করা যে এদের সাথে পর্দা নেই।

বুঝে-শুনে বললে কাফির হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর যদি সঠিক মাসআলা জানা থাকে এবং তা স্বীকারও করে তবে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সাথে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করা হয় তবে তা অনেক বড় গোনাহ।

একটি ভয়াবহ ভুল : কুরবানীর ঈদ কি যবাইয়ের উৎসব?

দ্বীনী ইল্‌মের ব্যাপক চর্চা না থাকার কারণে কোনে কোনে বে-দ্বীন মানুষ অজ্ঞতাবশত কিংবা জেনে-শুনে এই মারাত্মক ভ্রান্ত কথা বলে থাকে যে, কুরবানীর ঈদ পশু জবাইয়ের উৎসবের নাম। এ-জন্য তাদের ধারণামতে সেই দিনের আনন্দ হলো পশু জবাই করার আনন্দ এবং মুসলিমদের এই উৎসবও ভিন্ন জাতির নানা উৎসবের মতোই একটি উৎসব। যেমন- হিন্দুদের রয়েছে বলিদান উৎসব (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ 'কুরবানীর ঈদ' শব্দেই এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন বিদ্যমান রয়েছে। কেননা কুরবানীর ঈদ শব্দটির অর্থ হল আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের ঈদ। এটি এমন ঈদ, যে ঈদে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া রিয্‌ক (গৃহপালিত পশু) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পেশ করে থাকে। তাহলে এই উৎসব পশু জবাইয়ের উৎসব নয়; বরং আল্লাহ পাকের নৈকট্য উপকরণ পেশ করতে পারার সৌভাগ্য অর্জনের আনন্দ। এটি গোশত ভক্ষণের উৎসব নয়; বরং খালেস আল্লাহ পাকের ইবাদত।

ভুল মাসআলা : মহিলারা নামাযে বিলম্ব করা!

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, ফরয নামাযের সময় হয়ে যাওয়ার পরও মহিলারা নামায আদায় করতে দেরি করেন। কারণ, পুরুষরা এখনো মসজিদ থেকে নামায পড়ে ফিরে আসেনি বা মসজিদের জামা'আত শেষ হয়নি। তাদের ধারণা, পুরুষের নামায শেষ হওয়ার পর মহিলাদের নামাযের সময় হয়। যেন এটি শরীয়তের একটি মাসআলা। এ বিষয়টি ঠিক নয়। পুরুষ যেমন নামাযের সময় হওয়া মাত্র নামায পড়তে পারে তেমনি মহিলারাও পড়তে পারবে। পুরুষরা মসজিদ থেকে ফিরেনি এই উযূহাতে নামাযের মুস্তাহাব সময় শেষ হতে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।

জুমার দিনের ব্যাপারেও একই কথা। অর্থাৎ সেদিন মহিলাদের জোহরের নামায পড়ার জন্য পুরুষদের জুমা পড়ে ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে না। সময় হওয়ার পর মহিলারা নামায আদায় করতে পারবেন।

একটি মারাত্মক গুনাহ্
রিংটোন হিসেবে বাদ্য ও গানের ব্যবহার

গানের সঙ্গে বাদ্য ইত্যাদি শোনা কবীরা গুনাহ। তাছাড়া গান পৃথকভাবে শোনাও গুনাহ। তাই যে কোনো ধরনের বাদ্য ও গান রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করাও গুনাহ। তেমনিভাবে গানের কোনো অংশবিশেষ রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা নাজায়েয। প্রকাশ থাকে, বাদ্য বা গান রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করলে নিজের গুনাহ তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে যে স্থানে মোবাইলটি ব্যবহার হচ্ছে তার আশেপাশের মানুষকে বাদ্য ও গান শুনানোর দায়ভার তাকেই নিতে হবে। এছাড়া মসজিদে গান-বাদ্য বাজানো আরও মারাত্মক গুনাহ'র কাজ।

একটি মারাত্মক গুনাহ
রিংটোন হিসেবে তিলাওয়াত, আযান ও যিকির

তিলাওয়াত, যিকির, আযান ইত্যাদি সবই ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ। প্রত্যেক ইবাদতের কাজের নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারিত। মনগড়া অর্থাৎ নিজের খেয়াল-খুশিমতো এগুলো করলে তা ইবাদত হবে না এবং তাতে সওয়াবও হবে না। মোবাইল ফোনের রিংটোনে এসবের ব্যবহার অপব্যবহারের শামিল। মোবাইল ফোনে কল এলে কুরআন তিলাওয়াত হতে থাকলে ব্যস্ততার দরুন তিলাওয়াতের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই মনোযোগ দেয়া হয় না। অথচ তিলাওয়াতের আদব হলো মনোযোগ দিয়ে শুনা। কল এলে যেহেতু রিসিভের জন্য ব্যস্ততা সৃষ্টি হয় এবং এটিই মূল উদ্দেশ্য, তাই আয়াতের মাঝখানে রিসিভ করার ফলে তার মাঝখানে কাটা পড়ে এবং শব্দ ও আয়াতের পূর্ণ উচ্চারণ হয় না, আর এ-কারণে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। আবার মোবাইল নিয়ে টয়লেটে কিংবা বাথরুমে প্রবেশের পর কল এলে অপবিত্র স্থানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম, যিকির বা আযানের ধ্বনি বেজে উঠে। এতে করে পবিত্র কালামের বেহুরমতী হয়। কাজেই তিলাওয়াত, যিকির, আযান, হামদ্ ও নাত ইত্যাদি মোবাইলের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। -ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি, ৫/৩২৩, আর রদ্দুল মুখতার, ১/১৭৮

চিন্তাগত ভুল : আদাব ও নফল বিষয়াদির জ্ঞানচর্চাও কি নফল?

শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। কিছু বিষয় রয়েছে যা ফরজ ও ওয়াজিব, আর কিছু বিষয় রয়েছে যা নফল বা মুস্তাহাব পর্যায়ের। নফল বিষয়াদির মধ্যে কিছু রয়েছে যা স্বতন্ত্র আমল বা ইবাদত, যেমন নফল নামায, নফল রোযা ইত্যাদি। আবার কিছু রয়েছে যা ফরয বা ওয়াজিব আমলের অংশ যেমন উযূ, নামায ইত্যাদি আমলের আদব ও নফল পর্যায়ের কাজসমূহ, কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, আদব ও নফল শ্রেণীর বিষয়গুলো ব্যাপক অবহেলার শিকার। এর পিছনে যে মানসিকতা কার্যকর তা এই যে, এগুলো তো নফল কিংবা আদব। অর্থাৎ এগুলো ছেড়ে দিলে গোনাহ নেই। যখনই কোনো নফল আমলের ক্ষেত্র আসে কিংবা কোনো আদব পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তখন প্রথমে এই নেতিবাচক দিকটিই মনে আসে অথচ এখানে এভাবেও চিন্তা করা যেত যে, এ কাজে অনেক সাওয়াব ও অনেক উপকারিতা রয়েছে। নফল ও আদব পর্যায়ের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক চিন্তা পরিত্যাগ করে উপরোক্ত নেতিবাচক চিন্তা অবলম্বন করা মুমিনের জন্য শোভনীয় নয়।

আমি এখানে যে ভুল চিন্তাটি সম্পর্কে বলতে চাই তা এই যে, অনেকে আদব ও নফল বিষয়ের প্রচার-প্রসার এবং নিজের অধীন লোকদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের কাজটিকেও একটি নফল কাজ মনে করেন। ফলে কোনো মুরুব্বী যদি এ বিষয়ে তাগিদ করেন তাহলে একে 'বাড়াবাড়ি' বলে গণ্য করেন। মনে রাখা উচিত যে, এই চিন্তা ভুল। সঠিক কথা এই যে, আদব ও নফল শ্রেণীর বিষয়াদির পঠন-পাঠন এবং ইসলাহ-তরবীয়ত, দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে এর চর্চা ও প্রচার-প্রসার করা ফরযে কিফায়া। দলীলের নিরিখে এ বিষয়টি স্পষ্ট। ফিকহে হানাফীর তৃতীয় ইমাম- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশাইবানী (রহ.) 'কিতাবুল কাস্‌ব'-এ বিষয়টি পরিষ্কার বলেছেন। মূল কিতাবে এবং শামসুল আইম্মা সারাখসী (রাযি.)-এর ভাষ্যগ্রন্থে এ বিষয়ে অনেক দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। দেখুন-কিতাবুল কাস্, তাহকীক: শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ পৃ. ১৫৯-১৬০ আলমাবসূত, সারাখসী ৩০-২৬০

জবাই হালাল কি না?

হালাল জানোয়ার সহীহ তরীকায় যবাই না হলে তা হারাম

কোনো হানাফী মাযহাব অবলম্বীর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ না বলা এবং আল্লাহর নাম ব্যতিরেকে মুরগী-ছাগল ইত্যাদি যবাই করা সকল উলামায়ে

কিরামের ঐক্যমতে হারাম। সেটা নিজে খাওয়া এবং অন্যকে খাওয়ানো উভয়ই সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থ– আল্লাহ তা'আলার নাম নেওয়া ব্যতীত যবাইকৃত পশু তোমরা খেও না।
–সূরা আনআম :১২১

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

–সূরা মায়েদা : ৪

অর্থ– যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তোমরা সেটা খাও।

এমনিভাবে হারাম উপায়ে জবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া ও ক্রয়-বিক্রয় উভয়টাই হারাম। কেননা পশুর গোশত হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে– জবেহকারী জবেহ করার সময় মহান রাব্বুল আলামীনের নাম নিতেই হবে। অন্যথায় তার মধ্যে এবং মৃত জানোয়ারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

–জামেউল ফতোয়া, ৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬।

যবাইকৃত মুরগীর নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার পূর্বেই ফুটন্ত পানিতে ছেড়ে দেওয়া

মোরগ-মুরগীর নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার পূর্বেই ফুটন্ত পানিতে চুবিয়ে রাখা হলে সেই ড্রেসিংকৃত মোরগ-মুরগীর গোশত খাওয়া জায়েয নয়।

যবাইকৃত মুরগীকে কম গরম পানিতে চুবানো

কম গরম পানিতে পরিস্কারকৃত মুরগীর গোশত খাওয়া, খাওয়ানো, ক্রয়-বিক্রয় এবং হোটেলে উক্তরূপ গোশত খাওয়া জায়েয আছে। পক্ষান্তরে পানি যদি এত বেশি গরম ও উত্তপ্ত হয় যে, পানির তাপ গোশতের ভিতরে নিমিষেই প্রবেশ করতে পারে, তাহলে নাপাকী প্রবেশের কারণে গোশতও নাপাক হয়ে যাবে, যা খাওয়া যাবে না। –জামেউল ফতোয়া, ৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮০।

আল্ আসমাউল হুসনা

আল্লাহ্ তা'আলার ৯৯ (সিফাতী) নাম

بِاسْمِهٖ تَعَالٰى

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ : আল্লাহ্ তা'আলার অনেক সুন্দর নাম রয়েছে, অতএব তোমরা তাঁকে সে নামে ডাক।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَّنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চই আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই (৯৯) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামসমূহের অর্থ বুঝে তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে এবং ইসলামের সঙ্গে বরকতের উদ্দেশ্যে মুখস্থ করত যথাযথ সংরক্ষণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -তিরমিযী, বায়হাকী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ○ اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ ○ اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○ اَلْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○ اَلْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○ اَلْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ○ اَلْحَفِيْظُ

الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ ○ اَلرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ○ اَلْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ ○ اَلْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ○ اَلْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ○ اَلْمُحْيِى الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ○ اَلْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ○ اَلْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ○ اَلْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ ○ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ○ اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِى الْمَانِعُ الضَّآرُّ النَّافِعُ ○ اَلنُّوْرُ الْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ○

আল্লাহ্‌র গুণবাচক ৯৯টি নামের অর্থ

নং	নাম	অর্থ	নং	নাম	অর্থ
১	اَلرَّحْمٰنُ	তিনি অত্যন্ত দয়াময়	২	اَلرَّحِيْمُ	তিনি পরম দয়ালু, দয়াবান
৩	اَلْمَلِكُ	তিনি অধিপতি,বাদশাহ	৪	اَلْقُدُّوْسُ	তিনি অতি পবিত্র,
৫	اَلسَّلَامُ	তিনি শান্তিময়, শান্তিদাতা	৬	اَلْمُؤْمِنُ	তিনি নিরাপত্তা দানকারী
৭	اَلْمُهَيْمِنُ	তিনি মহা রক্ষক	৮	اَلْعَزِيْزُ	তিনি প্রভাবশালী
৯	اَلْجَبَّارُ	তিনি মহাপরাক্রমশালী	১০	اَلْمُتَكَبِّرُ	তিনি মহিমান্বিত, অহঙ্কারের অধিকারী
১১	اَلْخَالِقُ	তিনি সৃষ্টিকর্তা	১২	اَلْبَارِئُ	তিনি উদ্ভাবনকারী
১৩	اَلْمُصَوِّرُ	তিনি আকৃতি দাতা	১৪	اَلْغَفَّارُ	তিনি পরম ক্ষমাশীল
১৫	اَلْقَهَّارُ	তিনি মহাপরাক্রান্ত	১৬	اَلْوَهَّابُ	তিনি মহাদাতা,
১৭	اَلرَّزَّاقُ	তিনি রিযিকদাতা	১৮	اَلْفَتَّاحُ	তিনি মহা বিজয়দানকারী

১৯	اَلْعَلِيْمُ	তিনি মহাজ্ঞানী	২০	اَلْقَابِضُ	তিনি সংকোচনকারী, পরাভূতকারী
২১	اَلْبَاسِطُ	তিনি সম্প্রসারণকারী	২২	اَلْخَافِضُ	তিনি অবনতকারী
২৩	اَلرَّافِعُ	তিনি উন্নয়নকারী উচ্চ মর্যাদাদানকারী	২৪	اَلْمُعِزُّ	তিনি সম্মানদাতা
২৫	اَلْمُذِلُّ	তিনি অপমানকারী	২৬	اَلسَّمِيْعُ	তিনি সর্বশ্রোতা
২৭	اَلْبَصِيْرُ	তিনি সর্বদ্রষ্টা	২৮	اَلْحَكَمُ	তিনি বিচারক
২৯	اَلْعَدْلُ	তিনি ন্যায়পরায়ণ	৩০	اَللَّطِيْفُ	তিনি সূক্ষ্মদর্শী
৩১	اَلْخَبِيْرُ	তিনি সর্বজ্ঞ	৩২	اَلْحَلِيْمُ	তিনি সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল
৩৩	اَلْعَظِيْمُ	তিনি অতিমহান	৩৪	اَلْغَفُوْرُ	তিনি অতিক্ষমাশীল
৩৫	اَلشَّكُوْرُ	তিনি কৃতজ্ঞ গুণগ্রাহী,	৩৬	اَلْعَلِيُّ	তিনি অতিমহান
৩৭	اَلْكَبِيْرُ	তিনি সুমহান, বড়	৩৮	اَلْحَفِيْظُ	তিনি মহারক্ষক
৩৯	اَلْمُقِيْتُ	তিনি অন্নদাতা, আহারদানকারী	৪০	اَلْحَسِيْبُ	তিনি হিসাব গ্রহণকারী
৪১	اَلْجَلِيْلُ	মহিমান্বিত	৪২	اَلْكَرِيْمُ	তিনি দানশীল
৪৩	اَلرَّقِيْبُ	তিনি নিরীক্ষণকারী	৪৪	اَلْمُجِيْبُ	তিনি প্রার্থনা কবূলকারী
৪৫	اَلْوَاسِعُ	তিনি সম্প্রসারণকারী, সর্বব্যাপী	৪৬	اَلْحَكِيْمُ	তিনি প্রজ্ঞাময়
৪৭	اَلْوَدُوْدُ	তিনি প্রেমময়, শ্রেষ্ঠ বন্ধু	৪৮	اَلْمَجِيْدُ	তিনি মর্যাদাশীল, অনুগ্রহকারী
৪৯	اَلْبَاعِثُ	তিনি রাসূল প্রেরক পুনরুত্থানকারী,	৫০	اَلشَّهِيْدُ	তিনি সাক্ষী, বিদ্যমান

৫১	اَلْحَقُّ	তিনি সত্য, সত্য প্রকাশক	৫২	اَلْوَكِيْلُ	তিনি কর্মবিধায়ক, কার্য সমাধাকারী
৫৩	اَلْقَوِيُّ	তিনি শক্তিশালী	৫৪	اَلْمَتِيْنُ	তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান
৫৫	اَلْوَلِيُّ	তিনি প্রকৃত বন্ধু অভিভাবক,	৫৬	اَلْحَمِيْدُ	তিনি সর্ব প্রশংসিত
৫৭	اَلْمُحْصِيْ	তিনি হিসাব রক্ষক	৫৮	اَلْمُبْدِئُ	তিনি আদি সৃষ্টিকারী
৫৯	اَلْمُعِيْدُ	তিনি পুনরুত্থানকারী	৬০	اَلْمُحْيِيْ	তিনি জীবনদাতা
৬১	اَلْمُمِيْتُ	তিনি মৃত্যুদাতা	৬২	اَلْحَيُّ	তিনি চিরঞ্জীব
৬৩	اَلْقَيُّوْمُ	তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, অস্তিত্ব রক্ষাকারী	৬৪	اَلْوَاجِدُ	তিনি অভাবহীন
৬৫	اَلْمَاجِدُ	তিনি মহান, বড় দাতা, সম্মানিত মহৎ	৬৬	اَلْوَاحِدُ	তিনি একক
৬৭	اَلْاَحَدُ	তিনি এক অদ্বিতীয়	৬৮	اَلصَّمَدُ	তিনি অমুখাপেক্ষী
৬৯	اَلْقَادِرُ	তিনি শক্তিমান	৭০	اَلْمُقْتَدِرُ	তিনি সর্বময় ক্ষমতাবান
৭১	اَلْمُقَدِّمُ	তিনি অগ্রবর্তীকারী, উন্নতি দাতা	৭২	اَلْمُؤَخِّرُ	তিনি অবনতি দাতা, পরকালের হিসাব গ্রহণকারী
৭৩	اَلْاَوَّلُ	তিনি আদি	৭৪	اَلْاٰخِرُ	তিনি অনন্ত
৭৫	اَلظَّاهِرُ	তিনি প্রকাশ্য	৭৬	اَلْبَاطِنُ	তিনি গুপ্ত, অদৃশ্য
৭৭	اَلْوَالِيْ	তিনি অধিপতি, মুরুব্বী	৭৮	اَلْمُتَعَالِيْ	তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, সর্বোপরি
৭৯	اَلْبَرُّ	তিনি পরম উপকারী	৮০	اَلتَّوَّابُ	তিনি তাওবা কবূলকারী

৮১	اَلْمُنْتَقِمُ	তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শাস্তিদাতা	৮২	اَلْعَفُوُّ	তিনি ক্ষমাকারী
৮৩	اَلرَّؤُوْفُ	তিনি স্নেহময় দয়ার্দ্র,	৮৪	مَالِكُ الْمُلْكِ	তিনি রাজ্যাধিপতি, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক
৮৫	ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	তিনি মহিমাময়,	৮৬	اَلْمُقْسِطُ	ন্যায়পরায়ণ
৮৭	اَلْجَامِعُ	একত্রকারী	৮৮	اَلْغَنِيُّ	তিনি ধনী, কারো মুখাপেক্ষী নন
৮৯	اَلْمُغْنِيُ	তিনি অভাব মোচনকারী, সম্পদ দানকারী	৯০	اَلْمَانِعُ	তিনি প্রতিরোধকারী, বিপদে বাধাদানকারী
৯১	اَلضَّآرَّ	তিনি ক্ষতিগ্রস্থ করার মালিক	৯২	اَلنَّافِعُ	তিনি কল্যাণকারী
৯৩	اَلنُّوْرُ	তিনি জ্যোতির্ময়	৯৪	اَلْهَادِيُ	তিনি পথপ্রদর্শক
৯৫	اَلْبَدِيْعُ	তিনি নমুনা বিহীন সৃষ্টিকারী	৯৬	اَلْبَاقِيْ	তিনি চিরস্থায়ী
৯৭	اَلْوَارِثُ	তিনি উত্তরাধিকারী	৯৮	اَلرَّشِيْدُ	তিনি সত্যদর্শী, সৎপথ-প্রদর্শক
৯৯	اَلصَّبُوْرُ	তিনি ধৈর্যশীল			

দুরূদ শরীফের ফযীলত ও মাসায়েল

কুরআনে পাকে দুরূদ শরীফ পাঠের নির্দেশ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সমস্ত হক বা প্রাপ্য উম্মতের প্রতি রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ ও সালাম পাঠ করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ নবীর প্রতি রহমত পাঠান। অতএব হে ঈমানদাররা! তোমরাও তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাও।"

অনেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের পর পূর্ণ দুরূদ লিখতে অলসতা করে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবর্তে সংক্ষেপে (সাঃ), আরবীতে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- এর জায়গায় ص বা صلعم লিখে। দুরূদ শরীফ লিখার ব্যাপারে এটাও এক ধরনের কৃপণতা। অথচ মুহাদ্দিসীনে কিরাম প্রত্যেক হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের পরে পূর্ণ দুরূদ শরীফ লিখেছেন ফযীলত লাভের আশায়। অথচ সংক্ষেপ করার প্রয়োজন তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি ছিল কারণ সেসব কিতাবে সবচেয়ে বেশিবার এ দুরূদ ব্যবহার করতে হয়েছে।

দুরূদ শরীফ সর্বাবস্থায় পড়া যায়, চলন্ত বা বসা অবস্থায়। এমনকি উযূ ছাড়াও পড়া যায়। তবে উত্তম হলো পাক পবিত্র হয়ে বসে পড়া। সর্বোত্তম দুরূদ হলো দুরূদে ইব্রাহীম। যে দুরূদ নামাযে পড়া হয়। এছাড়াও হাদীস শরীফে দুরূদ ও সালামের অনেক ফযীলত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নে এ সর্ম্পকে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

অপরদিকে দুরূদ শরীফ না পড়ার উপর হাদীসে বড় ধমকি এসেছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিনের কৃপণ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, যখন তার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হয়, তখন সে আমার উপর দুরূদ পাঠ করে না।

১. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তার আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দেয়া হবে। –নাসায়ী, তবারানী

২. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এই আরযী করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অধিক পরিমাণে দুরূদ পেশ করতে চাই। অতএব আমার দু'আয় কী পরিমাণ দুরূদ পাঠ করব। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, যতটুকু তোমার মনে চায় পাঠ কর। আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক চর্তুথাংশ? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা তোমার ইচ্ছা। তবে এরচেয়ে বেশি পরিমাণ পাঠ করা তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। আমি আরজ করলাম তবে অর্ধেক? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা তোমার ইচ্ছা। তবে এর চেয়ে বৃদ্ধি করলে তা তোমার জন্যই কল্যাণকর হবে। এরপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমার দু'আর পুরো সময়টা আপনার প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠে ব্যয় করবো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক তোমার দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল দুঃশ্চিন্তা দূরীভূত করার যিম্মাদারী নিয়ে নিবেন এবং সকল পাপরাশি মুছে দিবেন। -সুনানে তিরমিযী

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন আমার উপর দুরূদ পাঠ করে সে দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। –মুস্তাদরাক লিল হাকিম

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার উপর অধিকহারে দুরূদ পাঠ করতে থাক, কারণ তা তোমাদের জন্য পরিত্রাণ লাভের উপায়। –আবু ইয়ালা মুসেলী

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার নাম উল্লেখ করবে, তার উচিত আমার উপর দুরূদ পাঠ করা। –আবু ইয়ালা মুসেলী

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থেকো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। –নাসাঈ

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হবে, যে অধিকহারে আমার উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকবে। –তিরমিযী, ইবনু হিব্বান

৮. যে অভাবী ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আমার যদি প্রচুর সম্পদ থাকতো তবে আমি বেশি বেশি দান খয়রাত করতাম। সে যেন আপন দু'আর মধ্যে নিম্নের দুরূদ শরীফটি পাঠ করে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লী আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত।

(হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূলের প্রতি রহমত বর্ষণ কর এবং মুমিন-মুসলমান নর-নারীর প্রতিও রহমত দান কর।)

৯. যে ব্যক্তি নিম্নের দুরূদ শরীফ খানা পড়বে, কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আন্‌যিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইন্দাকা ইউমাল ক্বিয়ামাহ।

(হে আল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রহমত বর্ষণ কর এবং কিয়ামতের দিন তোমার নিকটের আসন দান কর।

১০. যে ব্যক্তি নিম্নের দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সত্তর জন ফেরেশতা এক হাজার দিন এর সওয়াব লিখতে থাকবে–

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ.

উচ্চারণ: জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুওয়া আহলুহু।

(আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর শান মোতাবেক উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন।)

৬. দরূদে তুনাজ্জিনা

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি ইশার পর এই দুরূদ শরীফটি ৭০ বার পড়বে, আল্লাহ পাক তাকে বিপদ-আপদ থেকে হেফাযত করবেন। -মাকতুবাত : পৃ. ৯৫

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

(হে আল্লাহ! সায়্যিদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের প্রতি এমন রহমত বর্ষণ করো যার মাধ্যমে আমাদেরকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো। এবং এরই মাধ্যমে আমাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করো। এরই মাধ্যমে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করো। এরই মাধ্যমে আমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে সমস্ত কল্যাণের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দাও। নিশ্চয় তুমি সব কিছুতে সক্ষম।)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আরো কয়েকটি দুরূদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

١- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ سَلِّمْ عَلَيْهِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া সাল্লিম আলাইহি।
-আবু দাউদ/ ইবনুস সুন্নী: ৮০

٢- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ. (نسائي)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ।
- নাসায়ী ১/১৪৫

٣- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ. (ابو داؤد)

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ। -আবু দাউদ ১৪১, মুসনাদে আহমাদ ৫/৭৯

٥- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِىْ شَفَاعَتِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া বাল্লিগহু দারাজাতাল ওয়াসিলাতি ইন্দাকা ওয়াযআলনা ফী শাফাআতিহি য়াউমাল ক্বিয়ামাহ।

- তবরানী/ মাযমাউযযাওয়ায়েদ ১/৩৩৩

٦- صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ. (نسائي)

উচ্চারণ: সাল্লাল্লাহু আলান নাবিয়্যি মুহাম্মাদ। - নাসায়ী

٧ -بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ. (ابن ماجة)

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ। -ইবনে মাজাহ

٨-اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّاتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যি ওয়া আঝওয়াজিহি উম্মাহাতিল মু'মীনিনা ওয়া যুরিরয়্যাতিহী ওয়া আহলে বাইতিহি কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহিম। ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। -আবু দাউদ ১/১৪১

٩-اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা ওয়া সাল্লি আলাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত।

-সহীহ ইবনে হিব্বান ৩/১৮৪

١٠-اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা তারাহ্হাম আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা তারাহহামতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম।

মাসনূন দু'আসমূহ

নোটঃ বাংলায় আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। মারাত্মক ভুলের সম্মুখীন হতে হয় এবং অর্থের বিকৃতিও ঘটে থাকে। আর এ কারণেই কুরআনের আয়াত বা হাদীসের অংশের উচ্চারণ ভিন্ন ভাষায় লিখাকে ফুকাহায়ে কিরাম নাজায়েয বলেছেন। ফুকাহায়ে কিরামের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নোক্ত দু'আসমূহের বাংলা উচ্চারণ দেয়া হয়নি। যারা আরবীতে সঠিক উচ্চারণে অক্ষম তারা কোনো অভিজ্ঞ আলেমের কাছে মশ্‌ক করে নিবে।

তাছাড়া আমল দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হলো, উচ্চারণ সঠিক হওয়া এবং আমল নিয়মিত পালন করা।

১. ফরয নামাযের পর যে সমস্ত আমল করা মুস্তাহাব

ক. اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ (৩ বার)

খ. আয়াতুল কুরসী (১বার)

হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে বেহেশ্‌তের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○ (سورة البقرة)

গ. সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর তিন তিনবার, অন্যান্য নামাযের পর এক একবার।

হযরত আবদুল্লাহ বিন খুবাইব (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদা গভীর অন্ধকার রাতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে আমরা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোঁজে বের হলাম। খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে পেলাম। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, আবদুল্লাহ! তুমি পাঠ কর। আমি বললাম– কি পাঠ করবো? হযরত বললেন, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রতিটি তিনবার করে পাঠ করবে। তাহলে সব বিষয়ে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

ঘ. তাসবীহে ফাতেমী অর্থাৎ ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ), ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) পড়া মুস্তাহাব। যে নামাযের পর সুন্নাত আছে, সে নামাযে সুন্নাতের পর পড়াই উত্তম।

২. ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে এই দু'আ ৭ বার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৮১

৩. ফজর ও মাগরিবের নামাযের পরে এই দু'আ ১ বার পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজ্য ও সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দেন, তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সবকিছুতে সক্ষম।

৪. সায়্যিদুল ইস্তিগ্‌ফার (সকাল-সন্ধ্যা ১বার)

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি যদি এ দু'আটি সকালে একীনের সঙ্গে পড়ে আর সন্ধ্যার পূর্বে সে মারা যায়, তাহলে সে বেহেশতীদের মধ্যে গণ্য হবে এবং তা যদি সন্ধ্যাবেলায় একীনের সঙ্গে পড়ে আর সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাহলে সেও বেহেশতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সায়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দা বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার প্রদত্ত নিয়ামত নিয়ে তোমার কাছে ফিরে এসেছি (তোমার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি) এবং আমার গুনাহ নিয়ে তোমার কাছেই ফিরে এসেছি (আমার গুনাহের কথা স্বীকার করছি)। অতএব তুমি ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। –সহীহ বুখারী, (২/৯৩৩) হাদীস নং ৬৩২৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৭২

৫. ঘরে প্রবেশের সময় এ দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ- আয় আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট উত্তম প্রবেশ স্থান ও উত্তম বের হওয়ার জায়গা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলার নামে প্রবেশ করছি ও আল্লাহ তা'আলার নামে বের হচ্ছি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করছি। -সুনানে আবু দাউদ, হদীস নং ৫০৯৮

৬. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ- আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ব্যতীত (আমাদের) কোনো উপায় ও শক্তি নেই।

-সুনানে আবু দাউদ, খ.২ পৃ. ৭৪৭

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এই দু'আ পড়ে, তখন তাকে বলা হয়– তোমার কাজ সম্পাদন করে দেওয়া হয়েছে এবং তোমাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে হিফাযত করা হয়েছে। আর তখন শয়তান (ব্যর্থ হয়ে) তার নিকট থেকে দূর হয়ে যায়।

–জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২৬

৭. বাজারে প্রবেশকালে অসংখ্য নেকী অর্জন ও গোনাহ মাফির দু'আ

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে নিম্নের দু'আটি পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিখে দেন এবং তার দশ লক্ষ গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং তার দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করে দেন।

এক রেওয়ায়েতে দশ লক্ষ মর্তবা উন্নত করার পরিবর্তে জান্নাতে একটি মহল তৈরি করে দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। –তিরমিযী

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজ্য ও সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। কল্যাণ তাঁরই হাতে, তিনি সবকিছুতে সক্ষম।

-জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪২৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৩৫

৮. আল্লাহর রহমত ও বৃষ্টি লাভের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ○ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَآءُ ○ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ

অর্থ- সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি উভয় জাহানের প্রতিপালক। যিনি পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু, বিচার দিবসের মালিক, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আপনি অমুখাপেক্ষী আর

আমরা আপনার প্রতি মুহতাজ, আপনি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং বর্ষিত বৃষ্টিকে আমাদের জন্য জীবন চলার মাধ্যম বানিয়ে দিন।

-আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩৭৪, হাদীস নং ১১৭৩

অতঃপর এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا, اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পান করান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পান করান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পান করান। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন (বৃষ্টি বর্ষণ করুন)। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সাহায্য করুন। -বুখারী, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস নং ১০১৩ ও ১০১৪

৯. রহমতের বৃষ্টির জন্য নিম্নের দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদেরকে এবং আপনার প্রাণীকুলকে পানি পান করান, আপনার রহমত ছড়িয়ে দিন এবং মৃতশহরকে জীবিত করুন।

-মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস

১০. উপকারী ও দ্রুত বৃষ্টি পাওয়ার জন্য দু'আ-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَآرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন, যা আমাদের ফরিয়াদ অনুযায়ী (ফসল উৎপাদনের উপযোগী) হয়,সুপেয় হয়, উপকারী হয়, অপকারী না হয়। আর তা যেন তাড়াতাড়ি আসে, দেরিতে নয়।

-সুনানে আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩৭৪, হাদীস নং ১১৬৯ (১১৭১)

১১. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهٖ

অর্থ : হে আল্লাহ! যে মেঘ প্রেরণ করা হয়েছে, এর অনিষ্ট থেকে আমরা আপনার আশ্রয় চাই। -ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ৫১, হাদীস নং ৩৮

১২. বৃষ্টি শুরু হলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا, اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

অর্থ- হে আল্লাহ! অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন। -ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ৫১, হাদীস নং ৩৮৮৯

অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় পড়বে -

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا, اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের ওপরে নয়। হে আল্লাহ! টিলাসমূহ, পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা ও বৃক্ষ উৎপাদনস্থলে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। -বুখারী, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস নং ১০১৩

১৩. মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের অনিষ্টতা থেকে হিফাযতের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়তে থাকবে-

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার গযব দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না এবং তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না। আর এর পূর্বে আমাদের নিরাপত্তা দান কর। -তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৩, হাদীস নং ৩৪৫০

১৪. ঝড়-তুফান শুরু হলে এ দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এ বায়ুর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। -মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬১৬, হাদীস নং ৮৯৯

অথবা এ দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَّلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

অর্থ- হে আল্লাহ! এ বায়ুকে রহমতে রূপান্তরিত করেন, আযাবে নয়। হে আল্লাহ! এ বায়ুকে উপকারী বানিয়ে দিন, অপকারী বানাবেন না।

-মু'জামুল কাবীর, খ. ১১, পৃ. ২১৩, হাদীস নং ১১৫৩৩

১৫. সূর্য কিংবা চন্দ্রগ্রহণের সময় বার বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়তে থাকবে

উল্লেখ্য, সঙ্গে সঙ্গে নফল নামায পড়বে, সদকা-খয়রাত করবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করবে।

১৬. নতুন চাঁদ দেখে নিম্নের দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি চাঁদকে বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের প্রতীক হিসেবে উদিত করুন। হে চাঁদ! আমার ও তোমার রব একমাত্র আল্লাহ।

-তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৪, হাদীস নং ২৪৫১

১৭. রজব ও শা'বানের চাঁদ দেখে নিম্নের দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ- হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাসে আমাদের প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন। এবং আমাদের হায়াত বাড়িয়ে রমযান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

-বায়হাকী ফী দাওয়াতিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ১৪২, হাদীস নং ৫২৯

১৮. যখন চাঁদের উপর দৃষ্টি পড়ে তখন এই দু'আ পড়বে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ

অর্থ- আমি এই অন্ধকারচ্ছন্নকারীর অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১৯. মজলিস শেষে কাফ্ফারা স্বরূপ নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে-

হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ বয়সে এই অভ্যাস ছিল, যখন মজলিস থেকে উঠার ইচ্ছা করতেন তখন এই দু'আ পড়তেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে ও তোমার প্রশাংসা করে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তোমার কাছেই তাওবা করছি। -তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং ৩৪৩৩

এক ব্যক্তি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকাল আপনি একটি দু'আ পাঠ করেন যা পূর্বে করতেন না। তিনি ইরশাদ করলেন, এই দু'আ মজলিসের (ভুল-ভ্রান্তির জন্য) কাফ্ফারাস্বরূপ।

২০. কেউ হাদিয়া দিলে অথবা কোনো ইহ্সান করলে এই দু'আ পড়তে হয়–

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

(অথ : আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন)

২১. আয়নায় নিজেকে দেখার সময় এ দু'আটি পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনি আমার আকৃতি সুন্দর করেছেন। সুতরাং আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।

-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৯৫৯; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস নং ৮৫৪২

২২. কোনো দুঃসংবাদ শুনলে পড়বে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ- নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো।

২৩. কোনো সুসংবাদ শুনলে অথবা কেউ কেমন আছেন বললে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

২৪. ভবিষ্যতে কোনো বিষয়ে ওয়াদা করলে বলবে-

اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অর্থ- আল্লাহ যদি চান।

২৫. মনের চাহিদা মোতাবেক অবস্থা হলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

অর্থ- সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যাঁর নেয়ামতের বদৌলতে সর্বপ্রকার পূণ্যময় কাজ সমাধা ও সম্পন্ন হয়। -ইবনে মাজাহ, ২৭০

২৬. মনের ব্যতিক্রম কিছু হলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অর্থ- সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শোকর আদায় করি।

- ইবনে মাজাহ, ২৭০

২৭. কাউকে হাসি মুখে দেখলে পড়বে-

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

অর্থ- আল্লাহ আপনাকে চির হাসি মুখ রাখুন। - বুখারী, ১/৪৬৫

২৮. ইফতারের পূর্বে নিম্নের দু'আটি বেশি বেশি পড়বে-

يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْلِيْ

অর্থ- হে করুণার আধার! আমায় ক্ষমা কর।

২৯. ইফতারের পর এই দুটি দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দিয়েই ইফতার করেছি। -আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৭১৯, হাদীস নং২৩৫৮

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অর্থ- তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে, শিরা-উপশিরা সিক্ত হয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ প্রতিদানও সাব্যস্ত হয়েছে।

৩০. নতুন ফুল দেখার দু'আ

নতুন ফুল তোমার নিকট এলে চোখে মুখে লাগিয়ে এই দু'আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهٗ فَاَرِنَا اٰخِرَهٗ

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে আমাদেরকে এর শুরু দেখালে, সেভাবে এর শেষ দেখাও। এরপর নিকটস্থ কোনো বালক-বালিকাকে ফুলটি দিয়ে দিবে।

-বায়হাকী

৩১. সূর্য উঠার সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا

অর্থ- সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আজকের দিনে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি। -মুসলিম ১/২৭৪

৩২. মাগরিবের আযানের সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ! এখন আপনার রাত্রির আগমন ও দিনের গমন এবং আপনার প্রতি আহবানকারী মুআযযিনের ধ্বনির (আযানের) সময়। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। -মুসতাদরাকে হাকিম, ১/৩১৪

৩৩. কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়বে-

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

অর্থ- তোমার দ্বীন-ঈমানকে এবং তোমার আমানতদারীকে এবং তোমার হোসনে খাতিমাকে (ঈমানের উপর মৃত্যু) আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করছি।
-সুনানে আবু দাউদ, ১/৩৫০

৩৪. সাপের ভয় হলে এ দু'আ পড়বে-

اِنَّا نَسْئَلُكَ بِعَهْدِ نُوْحٍ وَبِعَهْدِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُوْدَ اَنْ لَّا تُؤْذِيْنَا

অর্থ- ওহে সাপ! আমরা নূহ আলাইহিস সালাম এবং সুলাইমান আলাইহিস সালামের অঙ্গীকারের কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তোরা আমাদের কোনো ক্ষতি করিস না এবং আমাদের কষ্ট দিস না। -তিরমিযী ১/২৭৪

৩৫. সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্তির বিশেষ আমল

بِسْمِ اللهِ (বিসমিল্লাহি -৩ বার)

اَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ (৭-বার)

অর্থ- আমি যে অনিষ্টতা পেয়েছি (যে রোগ ভোগ করছি, তার অনিষ্টতা) এবং যে অনিষ্টতার (যে রোগের আশঙ্কা করছি) ভয় করি তা থেকে আল্লাহ পাক ও তাঁর কুদরতের কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

৩৬. কাউকে কঠিন রোগাক্রান্ত বা খারাপ অবস্থায় দেখলে চুপে চুপে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

অর্থ- তুমি যে বিপদে বা রোগে পতিত হয়েছ, তা হতে আল্লাহ পাক যে আমাকে মুক্ত রেখেছেন এবং আমাকে যে অনেক মাখলুক হতে ভালো অবস্থায় এবং সম্মানে রেখেছেন এজন্য আমি আল্লাহ পাকের শোকরগুজারী এবং প্রশংসা আদায় করছি। -তিরমিযী ২/১৮২

৩৭. দুর্ভিক্ষের সময় নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে পান করাও, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সাহায্য কর।

৩৮. নতুন ফল সামনে এলে নিম্নের দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ফলে বরকত দাও, আমাদের শহরে বরকত দাও। এবং মাপপাত্র সা' ও মুদে বরকত দাও।

৩৯. রোগী দেখে দ্রুত সুস্থতার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি রোগীর সামনে ৭ বার পড়বে এবং রোগীসহ উপস্থিত সকলে প্রতিবারেই আমীন বলবে।

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অর্থ- আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর কাছে তোমার সুস্থতা কামনা করছি।

অতঃপর এ দু'আ পড়বে- لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

৪০. আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক নামাযের পর ১বার পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِيْ يُبَلِّغُنِيْ حُبَّكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ نَّفْسِيْ وَاَهْلِيْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার ভালোবাসা চাই, আর যে আপনাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসা চাই এবং ওই কাজের শক্তি চাই যা আমাকে আপনার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যাবে। হে আল্লাহ! আপনার ভালোবাসাকে আমার কাছে আমার জান, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় বানিয়ে দিন।

এটা এমন একটি দু'আ যার বরকতে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত ও আল্লাহর ওলীদের মুহাব্বত হাসিল হয়, এবং যে সকল আমলের উসীলায় আল্লাহ পাকের

মুহাব্বত হাসিল হয়, ওই সকল আমলেরও তওফীক নসীব হয় এবং অন্তরে আল্লাহ পাকের মুহাব্বত জান্-মালের মুহাব্বতের চেয়েও অধিক ও গভীর হয়ে যায়। পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আল্লাহ পাকের মুহাব্বত তদাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে যায়।

হযরত আবু দারদা (রাযি.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি বড় আলেম ও ফকীহ্ ছিলেন। শাম দেশে বসবাস করতেন এবং দামেশকে ইনতিকাল করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট উপরোক্ত দু'আটি পড়ে দরখাস্ত করতেন। -তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২২, হাদীস নং ৩৪৯০

৪১. গুনাহ্ মাফ ও আল্লাহ্ পাকের রহমত কামনার জন্য বেশি বেশি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন।

৪২. দ্বীনের উপর দৃঢ়তার জন্য প্রত্যেক ফরয নামাযের পর নিম্নের দু'আটি ১১ বার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى طَاعَتِكَ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমরা আপনার ইবাদত করার জন্য সাহায্য চাই।

৪৩. চরিত্র সংশোধনের পরীক্ষিত আমল

যদি সন্তান বা স্ত্রী অবাধ্য হয় অথবা স্বামী অত্যাচারী হয় অথবা কোনো কর্মচারীর অফিসার অত্যাচারী হয় অথবা মহল্লার কোনো দুশমন কাউকে জ্বালাতন করে তাহলে এসব পরিস্থিতিতে নিম্নের ওযীফাটি খুবই পরীক্ষিত। ৪০ দিন ইশার নামাযের পরে শুরু ও শেষে ১১ বার দুরূদ শরীফসহ ২০০ বার পাঠ করবে। ৪০ দিন পার হওয়ার পর প্রত্যহ মাত্র ২১ বার করে পাঠ করবে।

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا عَزِيْزُ يَا لَطِيْفُ يَا غَفَّارُ

অর্থ- হে অন্তরসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের পরিবর্তনকারী! হে রাত্র-দিনের স্রষ্টা! হে পরাক্রমশালী! হে সূক্ষ্মদর্শী! হে মহাক্ষমাশীল!

৪৪. হেদায়াতের উপর দৃঢ়তা ও ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১বার পাঠ করবে-

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ- হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য পালনে বক্র করো না এবং তোমার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। তুমিই সবকিছুর দাতা।

৪৫. দ্বীন-দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ এ দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর ১ বার পড়বে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের ও পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে অগ্নিযন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।

৪৬. জান-মাল, দ্বীন-ঈমান ও আওলাদ-পরিজনের হেফাযতের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى دِيْنِيْ وَنَفْسِيْ وَوَلَدِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ

অর্থ- আমার দ্বীন, স্বীয় সত্তা, নিজের সন্তান, পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। -কানযুল উম্মাল ২/৬৩৬

এ দু'আর বরকতে আল্লাহ পাক তার দ্বীন-ঈমান, জান-মাল, আওলাদ-পরিজনকে হিফাযতে রাখেন এবং আমলকারীর অন্তর অধীনস্থদের ব্যাপারে পেরেশানী ও উদ্বেগ হতে মুক্ত হয়ে যায়।

৪৭. নেয়ামত, আফিয়াত বা সুখ শান্তি-লাভ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ যিন্দেগীর দু'আ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দু'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

অর্থ- আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাচ্ছি আপনার দেয়া নেয়ামতের (বদলাহীন) ক্ষয়-লয় ও ধ্বংস হতে, আপনার দেয়া আফিয়াতের (সুখ-শান্তি এবং সুস্থ-নিরাপদ দেহ-মন ও জীবনের) অশুভ পরিবর্তন হতে, আকস্মিক বালা-মুসীবত থেকে এবং আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি থেকে।

-মিশকাত শরীফ ১/২১৭

৪৮. সন্তান-সন্ততির হিফাযত ও বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকার আমল

(ক) জুমু'আর নামাযে ইমাম সালাম ফিরানোর পর সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস প্রত্যেকটি ৭ বার করে পড়লে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানের উন্নতি হয়। সন্তানাদি বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পায়।

(খ) বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সমগ্র রাতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হোন এবং তাকে শয়তানের প্রবৃত্তি থেকে হেফাযতে রাখেন।

৪৯. সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ (প্রতিদিন বাদ মাগরিব ৩ বার)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তিনবার নিম্নের কালেমাগুলো পাঠ করবে, সেই রাতে কোনো প্রকার বিষাক্ত প্রাণী তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হযরত সুহাইল (রাযি.) বলেন, আমাদের পরিবারের লোকেরা এই দু'আ মুখস্থ করে রেখেছিল। তারা প্রতি রাতে তা পড়তো। কোনো এক রাতে একটি মেয়েকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সে কোনো প্রকার কষ্ট অনুভব করেনি। দু'আটি হলো-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ- আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

৫০. সর্ব প্রকার আসমানী-যমীনী বালা-মুসীবত থেকে হিফাযতের আমল

হযরত আবান ইবনে উসমান (রাযি.) বলেন, আমি আমার পিতার যবানে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল তিন বার করে এই দু'আ পাঠ করবে, কেউ এবং কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ- আল্লাহর নামে শুরু করছি, যার নাম নিয়ে শুরু করলে আকাশ-মাটির কোনোকিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

--মেশকাত- পৃ: ২০৯

৫১. সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে হেফাযতের জন্য সকাল-বিকাল ৭ বার পাঠের দু'আ

হযরত আবু দারদা (রাযি.)থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকাল বিকাল ৭ বার সত্য দিলে অথবা ফযীলতের প্রতি একীন ছাড়া শুধু এমনিই বলবে, তার দুনিয়া ও আখেরাতের তামাম চিন্তা-ভাবনা ও পেরেশানীর জন্য আল্লাহ তা'আলাই কাফী, সমাধানকারী হয়ে যাবেন।

حَسْبِىَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ- আরশের অধিপতি আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমি তাঁর উপরই ভরসা করি।

৫২. সর্ব প্রকার অশান্তি ও পেরেশানি থেকে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পড়বে

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো পেরেশানি দেখতেন, তখনি তিনি এই দু'আ পাঠ করতেন।

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ

অর্থ- হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী! আমরা তোমার কাছে রহমতের আবেদন করছি।

৫৩. অবাধ্য সন্তান বাধ্য করার জন্য প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি সন্তানের নাম মনে করে কমপক্ষে তিনবার পড়বে-

وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ- আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎকর্ম পরায়ণ কর। আমি তোমারই কাছে তাওবা করছি এবং আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

৫৪. ঋণ পরিশোধের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি পড়বে-

হযরত আবু ওয়ায়েল (রহ.) বলেন, একজন মুকাতাব (মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে আযাদকৃত গোলাম) হযরত আলী (রাযি.)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল, আমি (মুক্তিপণের নির্ধারিত) মাল আদায় করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। হযরত আলী (রাযি.) বললেন, আমি কি তোমাকে সেই কালেমাগুলো শিখিয়ে দিব না? যা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন। যদি তোমার উপর (ইয়ামানের) সীর পাহাড় সমতুল্য ঋণও হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা সেই ঋণ আদায় করে দিবেন। তুমি এই দু'আ পড়–

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ

অর্থ- হে আল্লাহ! হারাম থেকে বিরত রেখে তোমার হালাল রিযিক আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। এবং তোমার কৃপায় আমাকে অভাবমুক্ত কর।

৫৫. দুশ্চিন্তা ও ঋণ থেকে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত দু'আ সকাল-বিকাল ১ বার করে পড়বে-

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযি.) বর্ণনা করেন, একদিন হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এলেন। তাঁর দৃষ্টি একজন আনসারী ব্যক্তির উপর পড়ল, যাঁর নাম আবু উমামা। তিনি ইরশাদ করলেন, হে আবু উমামা! কী ব্যাপার! আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মসজিদে (পৃথকভাবে) বসে থাকতে দেখেছি। হযরত আবু উমামা (রাযি.) আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশ্চিন্তা ও ঋণ আমাকে ঘিরে রেখেছে। তিনি ইরশাদ করলেন– আমি কি তোমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিব না? যখন তুমি তা পাঠ করবে,

আল্লাহ তা'আলা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। হযরত আবু উমামা (রাযি.) আরয করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই শিখিয়ে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন– সকাল-বিকাল এই দু'আ পড়ো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে নিষ্কৃতি কামনা করছি, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে মুক্তি কামনা করছি। এবং ঋণের আধিক্য এবং শত্রুর দাপট থেকে রেহাই চাচ্ছি।

হযরত আবু উমামা (রাযি.) বলেন, আমি সকাল-বিকাল এই দু'আ পড়লাম। আল্লাহ তা'আলা আমার চিন্তা দূর করে দিলেন এবং আমার সমস্ত ঋণও পরিশোধ করে দিলেন। –আবু দাউদ

৫৬. কারো অত্যাচারের আশঙ্কা হলে এই দু'আ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১১ বার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُمْ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নিবে, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। হে আল্লাহ! তাদের দমনের ব্যাপারে তোমাকে সামনে রাখছি (তুমিই তাদের দমন কর) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি।

৫৭. যাদু থেকে নিরাপদ থাকার বিশেষ আমল

হযরত কা'বে আহবার (রাযি.) বলেন, আমি যদি কয়েকটি শব্দের একটি দু'আ পাঠ না করতাম তাহলে ইহুদীরা আমাকে গাধায় পরিনত করে ফেলতো। কেউ একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল সেই দু'আটি কি? তিনি উত্তরে বললেন,

أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِیْ لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِیْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ

অর্থ : আমি সকল সৃষ্টিজীবের অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করছি, যার চেয়ে বড় আর কেউ নেই এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার আশ্রয় কামনা করছি, কোনো নেককার বা পাপী যা লঙ্ঘন করতে পারে না। আমি আরো আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার জানা অজানা আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট ও উৎপন্ন বস্তুর অনিষ্ট থেকে।

-মুআত্তা মালেক, হাদীস নং ৩৫০২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১৫৪৬১

৫৮. অন্তরকে অহঙ্কারমুক্ত রাখার জন্য বেশি বেশি পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَّفِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার চোখে ছোট করো এবং মানুষের চোখে বড় বানিয়ে দাও।

৫৯. সুস্বাস্থ্যের জন্য নিম্নের দু'আটি পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি নিরাপত্তা ও মুক্তি কামনা করছি।

৬০. কঠিন মুসীবত ও শত্রু থেকে হেফাযতের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ১১ বার করে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ وَذُرِّيَّتِيْ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যা ইচ্ছে কর। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে বেষ্টন করে রেখেছেন।

৬১. দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি সকাল-সন্ধ্যায় ১ বার করে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ,لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ، وَاَنَّ اللهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার উপরই ভরসা করি। তুমিই সম্মানিত আরশের অধিপতি। আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না। মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই। আমি জানি, আল্লাহ পাক সব কিছুতে সক্ষম এবং আল্লাহ পাকের ইলম সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি আমার নফসের অনিষ্ট থেকে এবং অন্যান্য সকল জীবের অনিষ্ট থেকে। সকল জীবের কেশরাজির অগ্রভাগ তোমারই হাতে। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত।

ফায়দা : এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাযি.)-এর নিকট এসে বললো, আপনার বাড়ি জ্বলে গেছে। তিনি বললেন, জ্বলেনি। অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, আগুন লেগেছিল কিন্তু আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা মাত্র নিভে গেল। তিনি বললেন, আমি জানতাম আল্লাহ তা'আলা এমন করবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি উল্লিখিত দু'আ সকালে পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হবে না এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সকাল পর্যন্ত সে কোনো দুর্ঘনায় পতিত হবে না। আর আমি সকালে এ দু'আটি পড়েছিলাম। -কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ৪৯৬০

৬২. শিরকে খফী (সূক্ষ্ম শির্ক) থেকে রক্ষাকারী দু'আ (সকাল-বিকাল ৩ বার)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কালো পাথরের উপর দিয়ে পিপীলিকার পদ-চালনের চেয়েও অধিকতর সূক্ষ্ম ও গোপনভাবে আমার উম্মতের ভিতর শির্ক প্রবেশ করবে। -কানযুল-উম্মাল ২/৮১৬

এতদশ্রবণে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) খুবই ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং আরয করলেন- فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذٰلِكَ؟-

ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে এ থেকে রক্ষা পাওয়া কীভাবে সম্ভব? নাজাতের কী উপায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে

এমন একটি দু'আ বলে দিব না যা পাঠ করলে তুমি শিরকে খফী, শিরকে জলী ইত্যাদি সর্বপ্রকার শির্ক থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি এই দু'আ পাঠ করো–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

অর্থ- আয় আল্লাহ, তোমার নিকট আমি একান্তভাবে পানাহ্ চাই জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শির্ক করা থেকে। আর না জেনে-না বুঝে শিরক হয়ে গেলে তজ্জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। -কান্যুল-উম্মাল ২/৮১৬

৬৩. কঠিন বিপদ-আপদ ও শত্রুর কবল থেকে হিফাযতের আমল (সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার)

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাও কঠিন বালা-মুসীবত থেকে দুর্ভাগ্যের আক্রমণ থেকে, ক্ষতিকারক ফয়সালা থেকে এবং দুশমনদের আনন্দ উল্লাস থেকে। অতএব, এ সকল মুসীবত থেকে হেফাযতের জন্য এভাবে দু'আ পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

অর্থ– হে আল্লাহ! আমি কঠিন মুসীবত, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ক্ষতিকারক ফয়সালা ও দুশমনের আনন্দ-উল্লাস থেকে আপনার দরবারে পানাহ চাই।

জাহদুল-বালা ওই চরম বিপদাপদকে বলে যার ফলে মানুষ জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে পসন্দ করে। -মেরকাত ৫/২২২

৬৪. দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি নিয়মিত পড়বে প্রত্যেক নামাযের পর

হযরত শাহর বিন হাওশাব (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উম্মে ছালামা (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে অবস্থান করতেন তখন তিনি অধিকাংশ সময় কোন্ দু'আটি পড়তেন? তিনি বললেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ পড়তেন–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ- হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনি আপনার দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখুন। -তিরমিযী শরীফ

যে ব্যক্তি এই দু'আ করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ সে দ্বীনের উপর মযবুত থাকবে এবং এর বরকতে ঈমানের সঙ্গে মৃত্যু হবে।

৬৫. অন্তরে হিদায়াত লাভ ও নফসের খারাবী থেকে হিফাযতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দিন (অর্থাৎ হেদায়াতের কথা ও বিষয়াবলী আমার অন্তরে দান করে দিন) এবং আমার নফছের খারাবি থেকে আমাকে রক্ষা করুন। -জাওয়াহেরুল বুখারী ৫৭১ পৃ.

৬৬. কঠিন কঠিন রোগ থেকে হিফাযতের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি সকাল-সন্ধ্যা ৩ বার পড়বে

হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহপাকের নিকট এই দু'আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ

অর্থ- আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাই শ্বেত-রোগ থেকে, উন্মাদগ্রস্ততা থেকে, কুষ্ঠরোগ থেকে এবং কঠিন কঠিন ব্যাধিসমূহ থেকে।

৬৭. আল্লাহ পাকের ক্ষমা ও মাগফিরাত লাভের জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি অধিক পরিমাণে পড়বে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.)- কে এই দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ- আয় আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, আপনি স্বার্থহীন মেহেরবান। আপনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন (ক্ষমা করা আপনার অতি প্রিয় জিনিস)। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে-কদরে এই দু'আ করতে বলেছেন। অতএব, শবে-কদরের সম্ভাব্য রাত্রিগুলিতে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে এ দু'আ করা উচিত।–জাওয়াহিরুল বুখারী ৫৭১ পৃ.

৬৮. কবর-আযাব, দোযখ, ধন-দৌলতের খারাবী ও অভাব-অনটনের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ দু'আ

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যগুলোর দ্বারা দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ

অর্থ- হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, কবরের ভয়াবহতা থেকে, দোযখের আযাব থেকে এবং ধন-সম্পদ ও অভাব অনটনের অনিষ্ট থেকে।

–আবু দাউদ শরীফ

৬৯. সন্তান, স্ত্রী, উপরস্ত কর্মকর্তা অথবা কঠিন সমস্যায় নিম্নের দুটি দু'আ প্রত্যেক নামাযের পর ৭ বার পাঠ করে এভাবে দু'আ করুন, "আয় আল্লাহ ! আমার সন্তান, স্ত্রী অথবা উপরস্ত কর্মকর্তাকে আমার আনুগত্য বানিয়ে দাও।"

কেউ আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় করছে না, ব্যবসায় টাকা আটকে আছে, উল্লেখিত আমল করুন। ইনশাআল্লাহ এই আসমায়ে হুসনার বরকতে আল্লাহ তা'আলা সব কাজ সহজ করে দিবেন। (১)

يَا سُبُّوْحُ يَا قُدُّوْسُ يَا غَفُوْرُ يَا وَدُوْدُ

(২) অতঃপর এ দু'আটি ৭ বার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ

অর্থ- হে আল্লাহ! কোথাও কোনো সহজতা নেই অর্থাৎ চারদিকে সমস্যা আর সমস্যা। শুধু সেটাই সহজ যেটাকে আপনি সহজ করে দেন এবং আপনি আমাদের দুশ্চিন্তাকে সহজ করতে পারেন হে আল্লাহ! আপনি যখনই চাইবেন।

-সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৯৭৪

৭০. নিম্নের দু'আটি বিভিন্ন বালা-মুসীবত থেকে রক্ষার জন্য ৩৪১ বার, রিযিক বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের জন্য ৩০৮ বার, বিশেষ কাজ সমাধার জন্য ১১১ বার, বিভিন্ন পেরেশানী বিপদ থেকে রক্ষার জন্য ১৪১ বার পড়বে- প্রত্যেকটি আমলের আগে ও পরে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়বে

দু'আটি হলো- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

৭১. জরুরত পুরা করা, আরোগ্য লাভ অথবা আপনজন দূরে কোথায় গেলে নিরাপদে ফিরে আসার আমল

প্রতিদিন ফজরের সুন্নাত আদায়ের পর ফরজের পূর্বে সুরায়ে ফাতেহা ৪১ বার পড়বে। অতঃপর দু'আ করা।

৭২. শত্রুর অনিষ্ঠ থেকে নিরাপদ ও বিজয় লাভের জন্য বিশেষ আমল

ঈশার নামাযের পর ১১ দিন। প্রতিদিন ১০০০ বার পড়তে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ১১ দিনের চেয়ে বেশি পড়া যায়।

দু'আটি হলো: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

৭৩. উপরস্ত ব্যক্তির জুলুম থেকে হিফাযতের তদবীর

যে ব্যক্তি তার উপরস্ত ব্যক্তির আচরণে অতিষ্ঠ। চাই উপরস্ত ব্যক্তি স্বামী, স্ত্রী হোক বা অন্য কেহ। নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমাটির আগে পরে তিন তিন বার দুরূদ শরীফ পড়ে দৈনিক ৭০ বার পাঠ করে দু'আ করবেন। ইনশা-আল্লাহ এ আমলের বরকতে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

অর্থ- আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী। তিনি যাকে চান রিযিক দান করেন। তিনি শক্তিশালী পরাক্রমশীল।

৭৪. হার্টের রোগীদের জন্য বিশেষ আমল

প্রতিদিন নিম্নোক্ত আয়াতটি ৪১ বার পাঠ করে পানিতে দম করে তা পান

করবে। আয়াতটি হলো: اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থ- যারা ঈমানদার তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্ত।

অথবা প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কথাবার্তা বলার পূর্বে ডান হাত হার্টের উপর রেখে নিম্নের দু'আটি ৭ বার পড়ে হাত সরিয়ে ফুঁক দিবে।

يَا قَوِيُّ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ قَوِّنِيْ وَقَلْبِيْ

অর্থ- হে পরাক্রমশীল শক্তিধর! আপনি আমার অন্তরকে মযবুত করে দিন।

৭৫. বাতেনী পরিপক্কতার বিশেষ আমল

নিজের বাতেনী পরিপক্কতার জন্য নিম্নের দু'আটি দৈনিক ৩৬০ বার পাঠ করবে আগে পরে ৩ বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে। দু'আটি হলো-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ- হে চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই, আপনি পবিত্র। নিশ্চই আমি যালেমদের অর্ন্তভূক্ত ছিলাম।

৭৬. যে কোনো হাজত পূরণের জন্য নিম্নের দু'আটি ১২০০০ (বার হাজার) বার পড়ে দু'আ করা। আগে পরে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ-

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

অর্থ- হে কল্যাণের সঙ্গে আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কারকারী। হে উদ্ভাবক।

৭৭. সর্ব প্রকার রোগ থেকে মুক্তির আমল

প্রতিদিন সূরায়ে ফাতেহা ১১ বার পাঠ করে পানিতে দম করে পান করতে থাকবে। সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নিলে আরো উত্তম। আগে পরে তিনবার দুরূদ শরীফ পড়ে নিবেন।

৭৮. যে কোনো অনিষ্টতা ও শত্রু থেকে নিরাপত্তা লাভের আমল

প্রতিদিন ফজর ও মাগরিবের পর তিন কুল অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রতিটি তিন তিন বার।

৭৯. গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিশেষ আমল

গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নিম্নের দু'আটি ৫০০ বার পড়বে। আগে পরে ১০০ বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করা।

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

৮০. রোগ মুক্তির বিশেষ আমল।

রোগ মুক্তির জন্য প্রতিদিন সকাল-বিকাল আগে পরে তিনবার করে দুরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের দু'আটি ১৪২ বার পড়বে। দু'আটি হলো: يَاسَلَامُ

অর্থ- হে শান্তিদাতা।

৮১. রিযিকের বরকত ও সর্বপ্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ধনাঢ্যতা হাসিলের আমল।

নিম্নের দু'আটি দৈনিক (যে কোনো সময়) আগে পরে ১১ বার দুরূদ শরীফ আর ১১১১ বার করে নিয়মিত পাঠ করবে। দু'আটি হলো: يَا مُغْنِيُ

অর্থ– হে অমুখাপেক্ষীকারী।

৮২. তাড়াতাড়ি বিবাহ ও উত্তম আত্মীয় লাভের আমল

ক. পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকদের মধ্যে থেকে যে কোনো একজন নিম্নের দু'আটি ১১১১ বার ইশার নামাযের পর পড়বে। আগে পরে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে। দু'আটি হলো: يَالَطِيْفُ يَاوَدُوْدُ

অর্থ– হে সুক্ষ্মদর্শী, হে প্রিয়তম।

খ. ছেলে অথবা মেয়ে নিম্নের দু'আটি ১১১১ বার পড়বে। আগে পরে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে। يَا جَامِعُ অর্থ– হে জমাকারী।

৮৩. সকল কাজের সফলতার আমল

যে কোনো কাজের সফলতার জন্য আগে ও পরে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে নিম্নের আয়তটি ৭৮৬ বার পড়বে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ– মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু।

৮৪. সন্তানের হিফাযতের তদবীর

সন্তানের হিফাযতের জন্য নিম্নের দু'আটি সন্তানের হাতে বা গলায় তাবিজের ভিতর ভরে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ هَآمَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لآمَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

৮৫. সূরা ফালাকের আমল

৩৬০ বার পড়ে পানিতে দম করে পান করবে এবং দোকান ও ঘরে ছিটিয়ে দিবে। যদি এই পরিমাণ পাঠ করা সম্ভব না হয় তাহলে ২৪০ বার পড়বে। তাও সম্ভব না হলে ১২০ বার পড়বে। এটা অনেকে মিলেও পড়তে পারে। আবার ৩ কিস্তিতেও পড়তে পারে।

৮৬. জামে দু'আ

হযরত আবু উমামা (রাযি.) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করলেন, হুযূর! আপনি আমাদেরকে অনেক দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এতসব দু'আ আমাদের মুখস্থ থাকে না। তাই এমন একটি সংক্ষিপ্ত দু'আ শিখিয়ে দিন যা সকল দু'আকে শামিল করে নিবে। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের দু'আটি শিক্ষা দিলেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে যে কল্যাণের আবেদন করেছিলেন আমরাও তোমার কাছে সে কল্যাণের আবেদন করছি এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছে যে অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করেছিলেন আমরাও তোমার কাছে সে অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করছি। তোমার কাছেই প্রার্থনা-কামনা করা হয়। সবকিছুর প্রত্যাবর্তনস্থল তুমিই এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই।

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ সৈয়দ আবরারুল হক (রহ.) কর্তৃক মনোনীত সংক্ষিপ্ত অথচ জামে দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ . وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ . مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖٓ اَجْمَعِيْنَ .

اے اللہ ! آپ رب العلمین ہیں سارے جہاں کے پالنے والے ہیں

اے اللہ ! آپ رحمٰن ہیں بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ حتی کہ کفروشرک کو بھی توبہ کرنے پر معاف فرمادیتے ہیں

اے اللہ ! آپ رحیم ہیں بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔

اے اللہ آپ کریم ہیں بڑی بڑی نعمتیں بغیر استحقاق کے عطاء فرمانے والے ہیں۔آپ نے انسان بنایا پھر معاش ایسی دی جو لاکھوں سے بہتر ہے پھر ایمان کی دولت دی جس سے کروڑوں لوگ محروم ہیں۔دیگر اعمال صالحہ کی توفیق عطافرمائی ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں

اے مولائے کریم ! جہاں آپ نے محض اپنے فضل وکرم سے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہی ہماری درخواست ہے کہ ہم کو اور ہر مؤمن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمادیجئے

اے مولائے کریم ! ہمارے دل میں اور ہر مؤمن کے دل میں سنت سے عشق اور سنت کی محبت عطافرما۔

اے مولائے کریم ! ہمارے اور ہر مؤمن کے جملہ مقاصد حسنہ پورا فرما جملہ حاجات وضروریات کو محض اپنی فضل وکرم سے پوری فرما۔

اے مولائے کریم! ہم کو اور ہر طالب علم کو علم نافع عطا فرما

اے مولائے کریم! ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو ہماری عزیزوں کو دوستوں کو ہمارے بزرگوں کو علماء کو صلحاء کو ہمارے مدارس مساجد مراکز دینیہ اور تمام خوانقاہوں کو جملہ شرور و فتن وآفات سے حفاظت فرما۔

اے مولائے کریم! ہم کو اور جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں خواہ وہ کسی بھی طریقہ سے مصروف ہو خواہ تبلیغ میں ہوں یا تعلیم میں یا تزکیہ یعنی اصلاح نفس میں ہو ان سب کی خدمات کو قبول فرما۔

ہمیں اور انہیں اصول صحیحہ کے مطابق باخلاص دین کے کام میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔

اے مولائے کریم! ہمارے اور تمام اساتذہ و مشائخ کے درجات کو بلند فرما اور جو حیات میں ہیں انکو صحت قوت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما

اے مولائے کریم! سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و طفیل میں ہمارے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمالیجئے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

মুনাজাতে মাকবূল

اے خدائے پاک رحمٰن ورحیم * قاضیٔ حاجات وہاب وکریم

আয় খোদায়ে পাক রহমা-নো রহীম * ক্বাযিয়ে হাজা-তো ওয়াহহাবো কারীম

অর্থ- হে পবিত্র আল্লাহ, পরম অসীম দয়াবান, সকল হাজত পূরণকারী, বড়ই দাতা মেহেরবান।

اے الہ العالمین اے بے نیاز * دین ودنیا میں ہمارے کارساز

আয় ইলা-হাল আলামীন আয় বে-নিয়ায * দীনো দুনইয়া মেঁ হামারে কার সায

অর্থ- সব জগতের মা'বূদ হে তুমি বেনিয়ায, দ্বীন ও দুনিয়ায় পূরণ কর সকল কাজ।

ہم گنہگار اور تو غفار ہے * ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے

হাম গুনাহগার আওর তু গাফ্ফার হায় * হাম ভরে আইবূঁ ছে তু ছাত্তার হায়

অর্থ- আমরা গুনাহগার তুমি যে গাফ্ফার, লুকিয়ে রাখ সকল দোষ তুমি যে ছাত্তার।

تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے * جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے

তু ওহ ক্বাদের হায় কেহ্ জো চাহে কারে * জিসকো চাহে দে জিসে চাহে না দে

অর্থ-: তুমি বড় শক্তিশালী যা ইচ্ছা তাই কর, যাকে ইচ্ছা দান কর, যাকে ইচ্ছা মাহরূম কর।

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے * در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے

তু ওহ্ দাতা হায় কেহ্ দেনে কে লিয়ে * দার তেরী রহমাত কে হারদম হেঁ খুলে

অর্থ- দেওয়ার জন্য তৈরি আছ তুমি তো দাতা, সর্বদা যে খোলা আছে তোমার রহমতেরই দরজা।

تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو * پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو

তেরে দার পর হাত ফায়লাতা হায় জু * পাহি লেতা হায় ওহ্ হার মাকসূদ কো

অর্থ- তোমার কাছে হাত দু'টি উঠাবে যে, যা আশা সকল কিছু পেয়ে যাবে সে।

ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے * جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے

হার ঘড়ি দেনে কো তু তাইয়ার হায় * জু না মাঙ্গে উছছে তু বেযার হায়

অর্থ- দেওয়ার জন্য তৈরি আছ সর্বসময়, তার উপর নারায হও যে না চায়।

ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ * آپڑے اب تیرے در پر یا الہ

হার তরফ ছে হো কে হাম খারো তাবাহ * আ পড়ে আব্ তেরে দার পর ইয়া ইলাহ

অর্থ- সর্বদিক থেকে মোরা অপদস্থ ও ধ্বংস হয়ে ওগো আল্লাহ্, তোমার দরবারে আমরা এখন এসেছি।

گرچہ یارب ہم سراپا ہیں بڑے * اب تو لیکن آپڑے در پر تیرے

গার চে ইয়া রব হাম ছারা পা হেঁ বুরে * আবত লেকিন আ পড়ে দার পর তেরে

অর্থ- মাওলা ওগো যদিও মোদের পাপে শরীর ভরা, এখন তো এসেছি তোমার নিকট কি আর যাবে করা।

تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا * کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا

তু গনী হায় আওর হাম হেঁ বে নাওয়া * কওন পোছে গা হামে তেরে ছেওয়া

অর্থ- জানি তুমি বড় ধনী আমরা সবাই অসহায়, কে নিবে খবর মোদের তুমি ছাড়া কেউই নাই।

ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں * ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں

হায় তুহী হাজাত রাওয়ায়ে দো জাহাঁ * হাম তেরা দর ছোড় কার জায়ে কাহাঁ

অর্থ- দোজাহানের সকল হাজত তুমি পূরণকারী, কোথায় যাব মোরা তোমার দরবার ছাড়ি।

صدقہ اپنے عزت واجلال کا * صدقہ پیغمبر کا انکی آل کا

ছদক্বা আপনে ইজ্জতো ইজলাল্ কা * ছদক্বা পয়গম্বরকা উনকী আল্ কা

অর্থ- স্বীয় ইযযত ও জালালের উসিলায়, পয়গম্বর ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উসীলায়।

اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر * یہ مناجات اور دعا مقبول کر

আপনি রহমত হাম্ পে আব মাব্যুল কার * এহ মুনাজাত আওর দু'আ মাকবূল কার

অর্থ- নিজ রহমত আমাদের উপর বর্ষণ করুন, নিরবে চাওয়া এই দু'আসমূহ কবূল করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারীম
২. বুখারী
৩. মুসলিম
৪. আবু দাউদ
৫. নাসায়ী
৬. মুসনাদে আহমদ
৭. তিরমিযী
৮. মিশকাত শরীফ
৯. সহীহ ইবনে হিব্বান
১০. ইলাউস সুনান
১১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ
১২. তাবারানী
১৩. দুররে মানসূর
১৪. বাইহাকী
১৫. কানযুল উম্মাল
১৬. মুসনাদে বাযযার
১৭. তুহফাতুল আহওয়াযী
১৮. আল আরফুশ শাযী
১৯. সহীহ ইবনে খুযাইমা
২০. আলমুসতাদরাক লিলহাকেম
২১. আশিয়্যাতুল লুমআ'ত
২২. আততারগীব ওয়াততারহীব
২৩. তাবকাতে ইবনে সাদ
২৪. ফাতাওয়া শামী
২৫. ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী
২৬. আ'মালুস সুন্নাহ
২৭. মাআরিফুল কুরআন
২৮. আল আশবাহ
২৯. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সা.
৩০. হায়াতুল মুসলিমীন
৩১. আত্মার পরিচর্যা
৩২. জাযাউল আমাল ইবনে মাঝাহ
৩৩. রাসায়েলে আবরার
৩৪. ফাযায়েলে আখলাক
৩৫. নামাযের হাকীকত
৩৬. ইসলামী যিন্দেগী
৩৭. মারাকিল ফালাহ
৩৮. আলওয়ালওয়ালিজিয়্যা
৩৯. শরহে বেকায়া
৪০. শরহুস সুন্নাহ
৪১. ফতহুল কাদীর
৪২. যাদুল মাআদ
৪৩. শরহুস সুন্নাহ
৪৪. দুররুল মুখতার
৪৫. ফাতহুল বারী
৪৬. তুহফাতুল আলমায়ী
৪৭. আহসানুল ফাতাওয়া
৪৮. বাহরুর রায়েক
৪৯. আদাবুলমুফরাদাত
৫০. কুদুরী
৫১. জামে সাগীর
৫২. মাদারিজুন নবুওয়াত
৫৩. তাবলীগে দ্বীন
৫৪. মালফুযাতে আবরার
৫৫. বেহেশতী জেওর
৫৬. আহসানুল ফাতাওয়া
৫৭. শরীয়ত ও তরীকত
৫৮. ইমদাদুল ফাতাওয়া

সংকলকের আরও একটি মূল্যবান কিতাব



শিশু-কিশোর মননে সুন্নাতের শিক্ষা বদ্ধমূল করে দিতে শিশুশ্রেণী সমূহে নেসাবভূক্ত করার উপযোগী, অনুশীলনীসহ এই প্রথম তৈরী করা হয়েছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ-
নেসাবে তা'লীমুস সুন্নাহ্

মুহীউস সুন্নাহ প্রকাশনী
মাদরাসা দাওয়াতুল হক, দেওনা